সাইয়েদ কুতুব শহীদ

তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন

১৪তম খন্ড

কোরআনের অনুবাদ
হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ

আল কোরআন একাডেমী লন্ডন

সাইয়েদ কুতুব শহীদ

তাফসীর
ফী যিলালিল কোরআন

১৪তম খন্ড

সূরা আল মোমেনুন, আন নূর,
আল ফোরকান, আশ শোয়ারা

কোরআনের অনুবাদ ও
তাফসীর ফী যিলালিল কোরআনের অনুবাদ সম্পাদনা
হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ

এ খণ্ডের অনুবাদ
মাওলানা সোলায়মান ফারুকী
হাফেজ আকরাম ফারুক
হাফেজ শহীদুল্লাহ এফ. বারী

আল কোরআন একাডেমী লন্ডন

তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন
(১৪তম খন্ড সূরা আল মোমেনুন থেকে সূরা আশ শোয়ারা)

প্রকাশক
খাদিজা আখতার রেজায়ী
ডাইরেক্টর আল কোরআন একাডেমী লন্ডন
স্যুট ৫০১ ইন্টারন্যাশনাল হাউজ ২২৩ রিজেন্ট ষ্ট্রীট, লন্ডন ডব্লিউ ১ বি ২কিউ ডি
ফোন ও ফ্যাক্স : ০০৪৪ ০২০ ৭২৭৪ ৯১৬৪ মোবাইল: ০৭৯৫৬ ৪৬৬৯৫৫

বাংলাদেশ সেন্টার
১৭ এ-বি, কনকর্ড রিজেন্সী, ১৯ পশ্চিম পান্থপথ, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫
ফোন ও ফ্যাক্স : ০০৮৮০-২-৮১৫ ৮৫২৬, ৮১৫ ৮৯৭১

বিক্রয় কেন্দ্র : ৫০৭/১ ওয়্যারলেস রেলগেইট মাসজিদ (দোতলা), মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
১১ ইসলামী টাওয়ার, (নীচতলা), দোকান নং ৩৬ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ও ফ্যাক্স : ০০৮৮-২-৯৩৩ ৯৬১৫, মোবাইল : ০১৮১৮ ৩৬৩৯৯৭

প্রথম সংস্করণ
১৯৯৯

১০ম সংস্করণ
সফর ১৪৩১, জানুয়ারী ২০১০, মাঘ ১৪১৬

কম্পোজ
আল কোরআন কম্পিউটার

বিনিময় : দুইশত বিশ টাকা মাত্র

Bengali Translation of Tafseer

'Fi Zilalil Quran'

Author
Syed Qutb Shaheed
Translator of Quranic text into Bengali
&
Editor of Bengali rendition
Hafiz Munir Uddin Ahmed

14th Volume
(Surah Al Momenoon to Surah Ash Shuara)

Published by
Khadija Akhter Rezayee
Director Al Quran Academy London
Suite 501 International House 223 Regent Street London W1B 2QD
Phone & Fax : 0044 020 7274 9164 Mob : 07956 466955

Bangladesh Centre
17 A-B Concord Regency, 19 West Panthopath, Dhanmondi, Dhaka-1205
Phone & Fax : 00880-2-815 8526, 815 8971

Sales Centre: 507/1 Wireless Rail Gate Masjid (1st Floor), Moghbazar, Dhaka-1217
11 Islami Tower (Garand Floor), Stall No- 36, Bangla Bazar, Dhaka
Phone & Fax : 00880-2-933 9615, Mobile : 01818 363997

1st Edition
1999

10th Edition
Safar 1431, January 2010

Price Tk. 220 .00

E-mail: info@alquranacademylondon.co.uk website: www.alquranacademylondon.co.uk
ISBN-984-8490-28-0

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

একদিন যে মানুষটিকে
স্বয়ং আরশের মালিক
আল্লাহ জাল্লা জালা'লুহু
কোরআনের তোহফা দিয়ে মহিমান্বিত করেছিলেন,
আমাদের মতো নগণ্য বান্দার পক্ষে
তাঁকে কোনো উপহার দেয়ার ধৃষ্টতা
সত্যিই বড়ো বেমানান!

আসমানযমীন, চাঁদসুরুজ, মহাদেশমহাসাগর
তথা সারে জাহানের সবটুকু রহমত
যার পবিত্র নামে উৎসর্গিত
তার নামে আবার কার উৎসর্গ প্রয়োজন?
কোরআনের মহান বাহককে
কোরআনের এই তাফসীরের নিবেদন
কোনো নিয়মতান্ত্রিক উৎসর্গ নয়

এ হচ্ছে কোরআনের ছায়াতলে আশ্রয় নেয়ার
আমাদের হৃদয়ে লালিত স্বপ্নের একটা বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

মানবতার মুক্তিদূত
সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ
রাহমাতুললিল আ'লামীন
হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

প্রকাশকের কথা

আল্লাহ তাবারকা ওয়া তায়ালার হাজার শোকর, এক সুদীর্ঘ প্রতীক্ষার পর এই শতকের ক্ষণজন্মা ইসলামী চিন্তানায়ক সাইয়েদ কুতুব শহীদ-এর বিশ্ববিখ্যাত তাফসীর 'ফী যিলালিল কোরআন'-এর বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হলো। ৫ বছরের চাইতে কিছুটা কম সময়ের ভেতর আল্লাহ তায়ালা যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ (সর্বমোট ২২ খন্ডে সমাপ্ত) এই তাফসীরের অনুবাদ প্রকাশনার কাজ শেষ করার যে তাওফীক আমাদের দান করেছেন তার জন্যে আমরা একান্ত বিনয়ের সাথে আল্লাহ তায়ালার কৃতজ্ঞতা জানাই। (প্রথম প্রকাশনা অনুষ্ঠান ৬ জানুয়ারী ৯৫ ও সমাপনী অনুষ্ঠান ১২ই মে ২০০০)

'ফী যিলালিল কোরআন' ও তার প্রণেতা সাইয়েদ কুতুব শহীদ-এর পরিচয় আজকের ইসলামী বিশ্বে নতুন করে দেয়ার অবকাশ নেই। আমরা শুধু এটুকুই বলতে পারি যে, ইসলাম প্রতিষ্ঠার মহান সংগ্রামে শহীদ কুতুবের নাম যেমনি চিরস্মরণীয় হয়ে আছে, তেমনি তাঁর রচিত তাফসীর 'ফী যিলালিল কোরআন'ও অনন্তকাল ধরে কোরআন অনুধাবনের ক্ষেত্রে একটি 'মাইলফলক' হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

পৃথিবীর ২৫ কোটির বেশী লোক যে ভাষায় কথা বলে, যে ভাষার স্থান বিশ্ব ভাষার দরবারে পঞ্চম, সে ভাষায় কোরআনের এই সেরা তাফসীর গ্রন্থটির অনুবাদ বহু আগেই প্রকাশ হওয়া উচিত ছিলো। বিগত দু'-তিন দশকে অনেক উৎসাহী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান এই দুরূহ কাজের একাধিক উদ্যোগও গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু নানা কারণে কোনো উদ্যোগই বাস্তবায়িত হতে পারেনি। আল্লাহ তায়ালা আমাদের মতো কতিপয় গুনাহগার বান্দাকে যে তাঁর এ মহান খেদমতের জন্যে নির্বাচিত করেছেন সে জন্যে তাঁর দরবারে আবারও গভীর কৃতজ্ঞতা আদায় করি।

'ফী যিলালিল কোরআন'-এর কঠিন অনুবাদ, জটিল সম্পাদনা সর্বোপরি ব্যয়বহুল প্রকাশনা নিসন্দেহে আমাদের জন্যে ছিলো একটি সাহসী পদক্ষেপ, বলতে গেলে এর সবটুকুই ছিলো একটি আবেগ তাড়িত সিদ্ধান্ত। কিন্তু কোনো দ্বীনি 'জোশের' পেছনে যে কিছু দুনিয়াবী 'হুশ'ও প্রয়োজন, তা আমরা প্রথম দিকে টেরই করতে পারিনি। টের যখন পেলাম তখন আমাদের পথ চলা প্রায় শেষ হয়ে গেছে। আল্লাহ তায়ালার হাজার শোকর, যাত্রার শুরুতে তিনি যদি এর বাণিজ্যিক ঝুঁকির কথাটি আমাকে ভুলিয়ে না রাখতেন তাহলে এই তাফসীরের বাংলা অনুবাদ প্রকাশনার এই উদ্যোগটি কোনোদিনই সফল হতে পারতো না।

তাফসীর 'ফী যিলালিল কোরআন' বাংলাদেশের সর্বশ্রেণীর বুদ্ধিজীবীমহল ও ওলামায়ে কেরাম তথা কোরআনের পাঠকদের মাঝে যে পরিমাণ সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়েছে, তা দেখে আমরা সত্যিই আনন্দে অভিভূত হয়ে গেছি। দেশের শীর্ষস্থানীয় ইসলামী চিন্তাবিদরা এই তাফসীরটির ব্যাপারে যে মূল্যবান অভিমত প্রকাশ করেছেন, তার প্রতিটি বাক্যই উল্লেখ করার মতো। বিশেষ করে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মোফাসসেরে কোরআন মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী, মনীষী বুদ্ধিজীবী জাতীয় অধ্যাপক মরহুম সৈয়দ আলী আহ্‌সান, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ-এর চেয়ারম্যান, সাবেক সচিব শাহ আবদুল হান্নান, বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের খতীব মাওলানা ওবায়দুল হক-এ দেশবরেণ্য চিন্তাবিদদের সবাই আমাদের উদ্বোধনীসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে হাযির হয়েছেন। অনেকেই আবার ব্যক্তিগতভাবে আমাদের বাংলাদেশ অফিসে এসে আমাদের এই প্রকল্পের জন্যে দোয়া করে গেছেন। আমি তাদের প্রতি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ।

সম্মানিত পাঠক-পাঠিকাদের কাছে আমাদের একান্ত অনুরোধ, এই মহান গ্রন্থের কোথাও যদি কখনো কোনো ভুল-ভ্রান্তি আপনাদের নযরে পড়ে তাহলে কোরআনের স্বার্থেই তা মেহেরবানী করে আমাদের জানাবেন। সর্বজন শ্রদ্ধেয় ওলামায়ে কেরামের কাছেও আমাদের বিনীত নিবেদন, এই কেতাব আপনার-আমার কারোর নয়– হেদায়াতের এ মহান উৎসটির একমাত্র মালিক হচ্ছেন আল্লাহ তায়ালা, তাই একে যথাসম্ভব নির্ভুল করার প্রচেষ্টায় আপনি আপনার মূল্যবান পরামর্শ দিলে আমরা আনন্দের সাথেই তা গ্রহণ করবো এবং সেই আলোকে আগামী সংস্করণগুলোকে আরো সুন্দর, আরো নিখুঁত করার প্রয়াস পাবো।

৯৫ সালের জানুয়ারী মাস থেকে ২০০৩ সালের জানুয়ারী পর্যন্ত– এই ৯ টি বছর যারা সর্বাবস্থায় আমাদের সাথিত্য দিয়েছেন গভীর কৃতজ্ঞতার সাথে লক্ষ মানুষের প্রিয় 'তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন'কে নতুন সাজে সাজানোর সুখবরটুকু আমরা তাদের দিতে চাই। আসলে এ কাজটি আমাদের নয় বছর আগেই করা উচিৎ ছিলো, আল্লাহ তায়ালা আমাদের এই অনিচ্ছাকৃত বিলম্বের জন্যে ক্ষমা করুন।

'তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন'–এর গায়ে এখন থেকে আমরা যে নতুন সাজ পরাতে চাই, তাহচ্ছে গোটা তাফসীর জুড়ে এর সূচীপত্র জুড়ে দেয়া। গত নয় বছরে বহুবার আমরা একথাটি অনুভব করেছি, যে এই মহান তাফসীরটি থেকে আরো বেশী উপকার পাবার জন্যে এই তাফসীরে একটা পূর্ণাংগ সূচীপত্র থাকা একান্ত প্রয়োজন। এখন থেকে কোন্ বিষয় কোন্ খন্ডের কোথায় পাওয়া যাবে এটা জানার জন্যে একজন সন্ধিৎসু পাঠককে সারা তাফসীরের আট হাজার পৃষ্ঠা চষে বেড়াতে হবেনা। এখন প্রতিটি খন্ডের সূচীপত্র দেখে পাঠক সহজেই নিজের প্রয়োজনীয় অংশ বেছে নিতে পারবেন। দ্বিতীয় দিকটি ছিলো এই তাফসীরে ব্যবহৃত মূল কোরআনের অংশকে নতুন করে বিন্যাস সাধন করা। এই পূনর্বিন্যাসের ফলে তাফসীরের পৃষ্ঠা সংখ্যা কমে আসায় স্বাভাবিকভাবেই এর দামও কমে আসবে। যারা আমাদের কালের শ্রেষ্ঠ এই তাফসীরটিকে আরো সুন্দর দেখতে চান তাদের আমরা আর মাত্র কয়েকটি মাস সময় ধৈর্য্য ধরার আবেদন জানাবো। আল্লাহর তায়ালার ওপর ভরসা করে আমরা এ মাস থেকেই এই পুর্নবিন্যাস প্রক্রিয়া শুরু করেছি। আপনার হাতে এখন যে কপিটি আছে তা আমাদের এ নতুন প্রক্রিয়ারই অংশ।

বিদায়ের আগে উর্ধাকাশের দিকে গুনাহর হাত বাড়িয়ে বলি ঃ 'রাব্বানা লা তুয়াআখেযনা ইন নাসীনা আও আখতা'না'–'হে আমাদের মালিক, যদি আমরা কোথাও কিছু ভুলে গিয়ে থাকি কিংবা কোথাও যদি আমরা কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি করে বসি–তুমি তার কোনোটার জন্যেই আমাদের পাকড়াও করো না। তুমি আমাদের শাস্তি দিয়ো না।' আমীন! ছুম্মা আমীন!!

খাদিজা আখতার রেজায়ী

লন্ডন

জানুয়ারী ২০০৩

সম্পাদকের নিবেদন

আহনাফ বিন কায়েস নামক একজন আরব সর্দারের কথা বলছি। তিনি ছিলেন একজন বীর যোদ্ধা। তার সাহস ও শৌর্য ছিলো অপরিসীম। তার তলোয়ারে ছিলো লক্ষ যোদ্ধার জোর। ইসলাম গ্রহণ করার পর আল্লাহর নবী (সা.)-কে দেখার সৌভাগ্য তার হয়নি, তবে নবীর বহু সাথীকেই তিনি দেখেছেন। এদের মধ্যে হযরত আলীর (রা.) প্রতি তার শ্রদ্ধা ছিলো অপরিসীম।

একদিন তার সামনে এক ব্যক্তি কোরআনের এই আয়াতটি পড়লেন, 'আমি তোমাদের কাছে এমন একটি কেতাব নাযিল করেছি, যাতে 'তোমাদের কথা' আছে, অথচ তোমরা চিন্তা-ভাবনা করো না।' (সূরা আল আম্বিয়া, ১০)

আহনাফ ছিলেন আরবী সাহিত্যে গভীর পারদর্শী ব্যক্তি। তিনি ভালো করেই বুঝতেন 'যাতে শুধু তোমাদের কথাই আছে' এই কথার অর্থ কি? তিনি অভিভূত হয়ে গেলেন, কেউ বুঝি তাকে আজ নতুন কিছু শোনালো! মনে মনে বললেন, 'আমাদের কথা' আছে, কই কোরআন নিয়ে আসো তো? দেখি এতে 'আমার' কথা কী আছে? তার সামনে কোরআন শরীফ আনা হলো, একে একে বিভিন্ন দল উপদলের পরিচিতি এতে পেশ করা হচ্ছে–

একদল লোক এলো, তাদের পরিচয় এভাবে পেশ করা হলো যে, 'এরা রাতের বেলায় খুব কম ঘুমায়, শেষ রাতে তারা আল্লাহর কাছে নিজের গুনাহখাতার জন্যে মাগফেরাত কামনা করে।' (সূরা আয যারিয়াত, ১৭-১৯)

আবার একদল লোক এলো, যাদের সম্পর্কে বলা হলো, 'তাদের পিঠ রাতের বেলায় বিছানা থেকে আলাদা থাকে, তারা নিজেদের প্রতিপালককে ডাকে ভয় ও প্রত্যাশা নিয়ে, তারা অকাতরে আমার দেয়া রেযেক থেকে খরচ করে।' (সূরা হা-মীম সাজদা-১৬)

কিছু দূর এগিয়ে যেতেই তার পরিচয় হলো আরেক দল লোকের সাথে। তাদের সম্পর্কে বলা হলো, 'রাতগুলো তারা নিজেদের মালিকের সেজদা ও দাঁড়িয়ে থাকার মধ্য দিয়ে কাটিয়ে দেয়।' (সূরা আল ফোরকান-৬৪)

অতপর এলো আরেক দল মানুষ, এদের সম্পর্কে বলা হলো, 'এরা দারিদ্র ও সাচ্ছন্দ্য উভয় অবস্থায় (আল্লাহর নামে) অর্থ ব্যয় করে, এরা রাগকে নিয়ন্ত্রণ করে, এরা মানুষদের ক্ষমা করে, বস্তুত আল্লাহ তায়ালা এসব নেককার লোকদের ভালোবাসেন।' (সূরা আলে ইমরান-১৩৪)

এলো আরেকটি দল, তাদের পরিচয় এভাবে পেশ করা হলো সে, 'এরা (বৈষয়িক প্রয়োজনের সময়) অন্যদেরকে নিজেদেরই ওপর প্রাধান্য দেয়, যদিও তাদের নিজেদের রয়েছে প্রচুর অভাব ও ক্ষুধার তাড়না। যারা নিজেদেরকে কার্পণ্য থেকে দূরে রাখতে পারে তারা বড়ই সফলকাম।' (সূরা আল হাশর-৯)

একে একে এদের সবার কথা ভাবছেন আহনাফ। এবার কোরআন তার সামনে আরেক দল লোকের কথা পেশ করলো, 'এরা বড়ো বড়ো গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে, যখন এরা রাগান্বিত হয় তখন (প্রতিপক্ষকে) মাফ করে দেয়, এরা আল্লাহর হুকুম আহকাম মেনে চলে, এরা নামাজের প্রতিষ্ঠা করে, এরা নিজেদের মধ্যকার কাজকর্মগুলোকে পরামর্শের ভিত্তিতে আঞ্জাম দেয়। আমি তাদের যা দান করেছি তা থেকে তারা অকাতরে ব্যয় করে।' (সূরা আশ্-শুরা, ৩৭-৩৮)

হযরত আহনাফ নিজেকে নিজে ভালো করেই জানতেন। আল্লাহর কেতাবে বর্ণিত এ লোকদের কথাবার্তা দেখে তিনি বললেন, হে আল্লাহ তায়ালা, আমি তো এই বইয়ের কোথাও 'আমাকে' খুঁজে পেলাম না। আমার কথা কই? আমার ছবি তো এর কোথায়ও আমি দেখলাম না, অথচ এ কেতাবে নাকি তুমি সবার কথাই বলেছো।

এবার তিনি ভিন্ন পথ ধরে কোরআনে নিজের ছবি খুঁজতে শুরু করলেন। এ পথেও তার সাথে বিভিন্ন দল উপদলের সাক্ষাত হলো। প্রথমত, তিনি পেলেন এমন একটি দল, যাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'যখন তাদের বলা হয়, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই, তখন তারা গর্ব ও অহংকার করে এবং বলে, আমরা কি একটি পাগল ও কবিয়ালের জন্যে আমাদের মাবুদদের পরিত্যাগ করবো?' (সূরা আছ ছাফফাত ৩৫-৩৬) তিনি আরো সামনে এগুলেন, দেখলেন আরেক দল লোক। তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'যখন এদের সামনে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয় তখন এদের অন্তর অত্যন্ত নাখোশ হয়ে পড়ে, অথচ যখন এদের সামনে আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্যদের কথা বলা হয় তখন এদের মন আনন্দে নেচে ওঠে।' (সূরা আয যুমার, ৪৫)

তিনি আরো দেখলেন, কতিপয় হতভাগ্য লোককে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে, 'তোমাদের কিসে জাহান্নামের এই আগুনে নিক্ষেপ করলো? তারা বলবে, আমরা নামায প্রতিষ্ঠা করতাম না, আমরা গরীব মেসকীনদের খাবার দিতাম না, কথা বানানো যাদের কাজ-আমরা তাদের সাথে মিশে সে কাজে লেগে যেতাম। আমরা শেষ বিচারের দিনটিকে অস্বীকার করতাম, এভাবেই একদিন মৃত্যু আমাদের সামনে এসে হাযির হয়ে গেলো।' (সূরা আল মোদ্দাসসের, ৪২-৪৬)

হযরত আহনাফ কোরআনে বর্ণিত বিভিন্ন ধরনের মানুষের বিভিন্ন চেহারা ছবি ও তাদের 'কথা' দেখলেন। বিশেষ করে এই শেষোক্ত লোকদের অবস্থা দেখে মনে মনে বললেন, হে আল্লাহ, এ ধরনের লোকদের ওপর আমি তো ভয়ানক অসন্তুষ্ট। আমি এদের ব্যাপারে তোমার আশ্রয় চাই। এ ধরনের লোকদের সাথে আমার কোনোই সম্পর্ক নেই।

তিনি নিজেকে নিজে ভালো করেই চিনতেন, তিনি কোনো অবস্থায়ই নিজেকে এই শেষের লোকদের দলে শামিল বলে ধরে নিতে পারলেন না। কিন্তু তাই বলে তিনি নিজেকে প্রথম শ্রেণীর লোকদের কাতারেও শামিল করতে পারছেন না। তিনি জানতেন, আল্লাহ তায়ালা তাকে ঈমানের দৌলত দান করেছেন। তার স্থান যদিও প্রথম দিকের সম্মানিত লোকদের মধ্যে নয় কিন্তু তাই বলে তার স্থান মুসলমানদের বাইরেও তো নয়!

তার মনে নিজের ঈমানের যেমন দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো, তেমনি নিজের গুনাহখাতার স্বীকৃতিও সেখানে সমানভাবে মজুদ ছিলো। কোরআনের পাতায় তাই এমন একটি ছবির সন্ধান তিনি করছিলেন, যাকে তিনি একান্ত 'নিজের' বলতে পারেন। তার সাথে আল্লাহ তায়ালার ক্ষমা ও দয়ার প্রতিও তিনি ছিলেন গভীর আস্থাশীল। তিনি নিজের নেক কাজগুলোর ব্যাপারে যেমন খুব বেশী অহংকারী ও আশাবাদী ছিলেন না, তেমনিভাবে আল্লাহ তায়ালার রহমত থেকেও তিনি নিরাশ ছিলেন না। কোরআনের পাতায় তিনি এমনি একটি ভালো-মন্দ মেশানো মানুষের ছবিই খুঁজছিলেন এবং তার একান্ত বিশ্বাস ছিলো এমনি একটি মানুষের ছবি অবশ্যই তিনি এই জীবন্ত পুস্তকের কোথাও না কোথাও পেয়ে যাবেন।

কেন, তারা কি আল্লাহর বান্দা নয় যারা ঈমানের 'দৌলত' পাওয়া সত্তেও নিজেদের গুনাহ্র ব্যাপারে থাকে একান্ত অনুতপ্ত। কেন, আল্লাহ তায়ালা কি এদের সত্যিই নিজের অপরিসীম রহমত থেকে মাহরূম রাখবেন? এই কেতাবে যদি সবার কথা থাকতে পারে তাহলে এ ধরনের লোকের কথা থাকবে না কেন? এই কেতাব যেহেতু সবার, তাই এখানে তার ছবি কোথাও থাকবে না–এমন তো হতেই পারে না। তিনি হাল ছাড়লেন না। এ পুস্তকে নিজের ছবি খুঁজতে লাগলেন। আবার তিনি কেতাব খুললেন।

কোরআনের পাতা উল্টাতে উল্টাতে এক জায়গায় সত্যিই হযরত আহনাফ 'নিজেকে' উদ্ধার করলেন। খুশীতে তার মন ভরে উঠলো, আজ তিনি কোরআনে নিজের ছবি খুঁজে পেয়েছেন, সাথে সাথেই বলে উঠলেন, হ্যাঁ, এই তো আমি!

'হ্যাঁ এমন ধরনের কিছু লোকও আছে যারা নিজেদের গুনাহ স্বীকার করে। এরা ভালো মন্দ মিশিয়ে কাজকর্ম করে–কিছু ভালো কিছু মন্দ। আশা করা যায় আল্লাহ তায়ালা এদের ক্ষমা করে দেবেন। অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা বড়ো দয়ালু বড়ো ক্ষমাশীল। (সূরা আত্ তাওবা ১০২)

হযরত আহনাফ আল্লাহর কেতাবে নিজের ছবি খুঁজে পেয়ে গেলেন, বললেন, হাঁ, এতোক্ষণ পর আমি আমাকে উদ্ধার করেছি। আমি আমার গুনাহর কথা অকপটে স্বীকার করি, আমি যা কিছু ভালো কাজ করি তাও আমি অস্বীকার করি না। এটা যে আল্লাহর একান্ত দয়া তাও আমি জানি। আমি আল্লাহর দয়া ও তাঁর রহমত থেকে নিরাশ নই। কেননা এই কেতাবই অন্যত্র বলছে, 'আল্লাহর দয়া থেকে তারাই নিরাশ হয় যারা গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট।' (সূরা আল হেজর ৫৬)

হযরত আহনাফ দেখলেন, এসব কিছুকে একত্রে রাখলে যা দাঁড়ায় তাই হচ্ছে তার 'ছবি'। কোরআনের মালিক আল্লাহ তায়ালা নিজের এ গুনাহগার বান্দার কথা তাঁর কেতাবে বর্ণনা করতে সত্যি ভুলেননি!

হযরত আহনাফ কোরআনের পাঠকের কথার সত্যতা অনুধাবন করে নীরবে বলে উঠলেন হে মালিক, তুমি মহান, তোমার কেতাব মহান, সত্যিই তোমার এই কেতাবে দুনিয়ার গুণী-জ্ঞানী, পাপী-তাপী, ছোট-বড়, ধনী-নির্ধন, সবার কথাই আছে। তোমার কেতাব সত্যিই অনুপম!

❑ ভারতীয় উপমহাদেশের মহান ইসলামী চিন্তানায়ক মওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (র.) তার এক রচনায় হযরত আহনাফ বিন কায়েসের এ ঐতিহাসিক গল্পটি বর্ণনা করেছেন। হযরত আহনাফের এই গল্পটি পড়ার পর এক সময় আমিও তার মতো কোরআনের পাতায় পাতায় নিজের ছবি খুঁজেছি। খুঁজতে গিয়ে একেকবার হোঁচট খেয়ে দাঁড়িয়ে গেছি, চিন্তায় ডুবে গেছি বহুবার। সন্ধান করেছি কোরআনের এমন একটি তাফসীরের যা 'আমাকে' আমার চোখে আরো পরিচ্ছন্ন করে তুলে ধরবে।

❑ আমার আজো সেদিনের কথা স্পষ্ট মনে পড়ে। ১৯৬৬ সালের আগস্ট মাসের ঢাকার রাজপথ। প্রচন্ড রোদ মাথায় নিয়ে পুরানা পল্টন দিয়ে একটি মিছিল এগিয়ে চলেছে মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকার দিকে। মিছিলের গগনবিদারী শ্লোগানঃ মানবতার দুশমন ইসলামের দুশমন নাসের নিপাত যাক, ইখওয়ানকে বেআইনী করা চলবে না, ইখওয়ান নেতা সাইয়েদ কুতুবের মুক্তি

চাই। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের স্কুল কলেজ মাদ্রাসা বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে ইসলামের পতাকাবাহী একটি সংগঠনের পক্ষ থেকে তৌহিদী জনতার এই মিছিলে সেদিন আমিও অংশ গ্রহণ করেছিলাম।

মাত্র এক বছর আগে আমি ম্যাট্রিক পাস করেছি। মফস্বল শহর থেকে রাজধানী শহরে এসেছি মাত্র দু'বছর আগে। দেশীয় রাজনীতির কিছুই যেখানে বুঝি না, সেখানে হাজার হাজার মাইলের দূরবর্তী দেশ মিসরে কি হচ্ছে তা জানবো কি করে? আমার বলতে কোনো দ্বিধা নেই, এই মিছিলে অংশ গ্রহণের আগে অনেকের মতো আমিও 'ইখওয়ানুল মুসলেমুন'-এর নেতা সাইয়েদ কুতুব সম্পর্কে খুব বেশী কিছু জানতাম না।

এরপর এলো সেই ৬৬ সালের ২৯ আগস্টের কালো রাত্রি। শুনলাম হযরত মুসার পুন্যভূমি মিসরে ফেরআউনের প্রেতাত্মা জামাল নাসের ইখওয়ানুল মুসলেমুনের বরেণ্য নেতা মুসলিম জাহানের ক্ষণজন্মা ইসলামী চিন্তানায়ক সাইয়েদ কুতুবকে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলিয়েছে। শুনে বিশ্বাসই হচ্ছিলো না, ফেরাউন স্বয়ং বেঁচে থাকলে সে যে কাজ করতো আজ তার এই নিকৃষ্ট অনুসারী তাই-ই করতে উদ্যত হলো! ফেরাউনও এই হুংকার দিয়েছিলোঃ 'অবশ্যই আমি কেটে দেবো তোমাদের হাত-পা বিপরীত দিক থেকে, তারপর তোমাদের সবাইকে আমি শুলীতে চড়িয়ে দেবো।' (সূরা আল আরাফ, ১২৪)

আর এই নরাধম সেই মুসা, ঈসা ও মোহাম্মদের (আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক তাদের সবার ওপর) অনুসারী কতিপয় বান্দাকে সত্যিই ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলিয়ে দিলো! সারা দুনিয়ার মুসলিম জনতার ব্যাপক দাবী দাওয়ার প্রতি যামানার নব্য ফেরাউন কোনো সম্মানই প্রদর্শন করলোনা!

সাইয়েদ কুতুবের ফাঁসির এ হৃদয়বিদারক ঘটনা দুনিয়ার হাজার হাজার মুসলমানের মতো আমার মনেও তার সম্পর্কে জানার এক ব্যাপক আগ্রহ সৃষ্টি করে দিয়ে গেলো। এই মহাপুরুষের জীবন সংগ্রাম, তার সাহিত্য সাধনা, সর্বোপরি ইসলামী আন্দোলনে তাঁর অবদান সম্পর্কে জানার জন্যে আমি ব্যাকুল হয়ে উঠলাম। আমার এ ব্যাকুলতাই একদিন আমাকে এই অমর চিন্তানায়কের তাফসীর 'ফী যিলালিল কোরআন' এর সাথে পরিচয় করিয়ে দিলো।

কিভাবে কোন সূত্রে এই গ্রন্থ আমি প্রথম দেখেছি তা আজ আর মনে নেই। তবে যদ্দুর মনে পড়ে, ১৯৬৯ সালে আমি ঢাকার একটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকার সহকারী সম্পাদক থাকা কালে একবার এই পত্রিকার জন্যে শহীদ কুতুবের ওপর কিছু লিখতে গিয়েই সর্বপ্রথম 'ফী যিলালিল কোরআন' এর খোঁজ পাই।

৬৯ সালে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বর্ষে ভর্তি হয়েছি। তাও আবার আমি ছিলাম বাংলা সাহিত্যের ছাত্র। বাংলা–শহীদ কুতুবের তাফসীরে ব্যবহৃত ভাষার সম্পূর্ণ বিপরীত একটি ভাষা। আল্লাহ তায়ালা আমার মরহুম আব্বা হযরত মাওলানা মানসুর আহমদ ও আমার মারহুমা আম্মা মোসাম্মত জামিলা খাতুনকে জান্নাতুল ফেরদাউস নসীব করুন, তাদের চেষ্টা ও সান্নিধ্যে জীবনের প্রথম দিকে কোরআনের ভাষা শেখার সুযোগ পেয়েছিলাম বলে তার ওপর ভিত্তি করেই এক সময় শহীদ কুতুবের সেই কালজয়ী তাফসীরটি পড়তে শুরু করলাম। কিন্তু অচিরেই এটা আমি অনুভব করলাম যে, আমার জানা যে আরবীর দৌড় কোরআন হাদীস পর্যন্ত সীমাবদ্ধ, তা মোটেই এই কাজের জন্যে যথেষ্ট নয়।

'ফী যিলালীল কোরআন'-এর আরবীতে প্রচুর পরিমাণ আধুনিকতার মিশ্রণ থাকায় তার মর্মোদ্ধারের জন্যে বুঝতে পারলাম আমার আরবীর গন্ডিকেও একটু বিস্তৃত করতে হবে। সুযোগ

সুবিধের সীমাবদ্ধতার কারণে 'ফী যিলালিল কোরআনের' গহীন সাগরে ডুব দিয়ে এর মুক্তা আহরণের পূর্ণাঙ্গ ক্ষমতা কোনোদিনই আমার হয়ে ওঠেনি। তবু আমি কখনো আমার মনে সে আগ্রহের মৃত্যু হতে দেইনি।

অতপর ১৯৭৯ সালে লন্ডনে এসে আমি আরবী সাহিত্যের একটা বিস্তৃত পরিসরে পা রাখার সুযোগ পেলাম। আবার সেই লালিত আগ্রহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো, তবে এবার কিছুটা ভিন্ন আকৃতিতে, ভিন্ন ধরনে। 'ফী যিলালিল কোরআন' পড়ে এর মর্মোদ্ধার করাই এখন আমার মুখ্য উদ্দেশ্য নয়, এবার আমার স্বপ্ন এই অমূল্য সৃষ্টিকে বাংলা ভাষায় রূপান্তর করা।

১৯৯৪ সালের প্রথম দিককার কথা।

১০ই জানুয়ারী সোমবার সারাদিনের কাজকর্ম সেরে ঘরে ফিরে চিরাচরিত নিয়ম অনুযায়ী কিছু পড়তে, কিছু লিখতে বসলাম। প্রসংগক্রমে 'ফী যিলালিল কোরআন'-এর তরজমার কথা এলো, এই গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনার কথা জীবন সাথী খাদিজা আখতার রেজায়ীকেই সবার আগে বললাম। সব নেক কাজের মতো এখানেও সে আমাকে সাহস যোগালো, এমনকি শুরুর দিকে নিজের 'সেভিংস' ব্যবহার করার আগ্রহ প্রকাশ করে আমাকে সে গভীর কৃতজ্ঞতাপাশেও আবদ্ধ করে নিলো। কোরআনের মালিকের দরবারে আজ আমি দোয়া করি, জীবনভর 'কোরআনের ছায়াতলে' দেয়া তাঁর অগুনতি সহযোগিতার বিনিময়ে তুমিও তাকে 'আরশের ছায়াতলে' তোমার একান্ত সান্নিধ্যে রেখো!

সেদিনের সেই মুহূর্তটি ছিলো আমার জীবনের এক স্মরণীয় সন্ধ্যা। আমি আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়লাম। সাথে সাথেই আমি মূল তাফসীর খুলে এর ভূমিকাটা তরজমা করতে শুরু করলাম। কেন যেন নতুন উৎসাহ ও উদ্দীপনায় আমি ব্যস্ত হয়ে উঠলাম এই মহান গ্রন্থটিকে বাংলায় রূপান্তরের জন্যে।

সে রাতটি ছিলো 'লায়লাতুল মেরাজ'। এই রাতেই আল্লাহর আদেশে আল্লাহরই এক নবী আল্লাহর আরশে গমন করলেন এবং বিশ্ব মানবের জন্যে মুক্তির মিশন নিয়ে পুনরায় দুনিয়ায় ফিরে এলেন। মুক্তির সেই মিশনের পথ প্রদর্শক হচ্ছে আল কোরআন। জানি না এর তরজমার দিনক্ষণটির সাথে এই সম্মানিত রাতের কোনো সম্পর্ক আছে কি না-না এটা নিছক একটি ঘটনামাত্র!

'ফী যিলালিল কোরআন' এর ব্যতিক্রমধর্মী নাম দিয়েই এই গ্রন্থের বৈশিষ্ট্যর সন্ধান মেলে। (এর মানে হচ্ছে 'কোরআনের ছায়াতলে')। ইসলামী জীবন দর্শনের একজন একনিষ্ঠ সাধক তার জীবনের যে দিনগুলো কোরআনের ছায়াতলে কাটিয়েছেন তারই জ্ঞানলব্ধ অভিজ্ঞতা হচ্ছে, 'ফী যিলালিল কোরআন'। তিনি তার মূল ভূমিকায় এই তাফসীরের প্রতিপাদ্য নিজেই সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। লেখকের এই মূল ভূমিকা 'কোরআনের ছায়াতলে' সহ আরো কিছু প্রবন্ধ আমরা এই তাফসীরের প্রথম খন্ডে প্রকাশ করেছি। আশাকরি এর সাথে প্রকাশিত এই প্রবন্ধগুলোও আপনার কাজে লাগবে। এক, শহীদের সংগ্রামী জীবনালেখ্য 'সাইয়েদ কুতুব শহীদ একজন মহান মোফাসসের' দুই, তারই একটি মূল্যবান প্রবন্ধের বাংলা রূপান্তর 'আল কোরআনের সাথে আমার সম্পর্ক', সর্বশেষে যে গ্রন্থটি লেখার জন্যে তাঁকে ফাসির কাষ্ঠে ঝুলতে হয়েছিলো সেই ঐতিহাসিক গ্রন্থ 'মায়ালেম ফিত তারীক'-এর ভূমিকা। যে নামে আমরা এর অনুবাদ পেশ করেছি তা হচ্ছে, 'কোরআনের উপস্থাপিত আগামী বিপ্লবের ঘোষণাপত্র'। মূল তাফসীর পড়ার আগে এই লেখাগুলো একবার পড়ার জন্যে আমি আপনাকে বিশেষভাবে অনুরোধ জানাবো।

আল কোরআন একটি জীবন্ত গ্রন্থের নাম, আল কোরআন একটি চালিকা শক্তির নাম, সর্বোপরি আল কোরআন একটি জীবন্ত আন্দোলনের নাম। জাহেলিয়াতের নিকষ আঁধারে নিমজ্জিত

একদল মানুষের জীবনকে আলোকমালায় উদ্ভাসিত করার জন্যেই আল্লাহর এক সাহসী বান্দার ওপর এই কেতাব অবতীর্ণ হয়েছিলো, সুতরাং এই পুস্তক থেকে হেদায়াত পেতে হলে এই কেতাবের প্রদর্শিত সেই সাহসী বান্দার সংগ্রামের পথ ধরেই আমাদের এগুতে হবে।

আরেকটি কথা,

'ফী যিলালিল কোরআন' আরবী কোরআনের আরবী তাফসীর, তাই মূল লেখকের এতে কোরআনের কোনো তরজমা দেয়ার প্রয়োজন হয়নি; কিন্তু আমাদের বাংলাভাষীদের তো সে প্রয়োজন রয়েছে। এই তাফসীরে কোরআনের যে বাংলা অনুবাদ দেয়া হয়েছে তা একান্ত আমার নিজস্ব। এর যাবতীয় ভুলভ্রান্তি ও ত্রুটি-বিচ্যুতির দায়িত্বও আমার একার। বাজারে প্রচলিত কোনো 'অনুবাদ' গ্রহণ না করে সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিভংগিতে কথ্য ভাষার এক নতুন 'স্টাইল' এখানে ব্যবহার করা হয়েছে। একজন কোরআনের পাঠক শুধু তরজমা পড়েই যেন কোরআনের বক্তব্য বুঝতে পারেন সেটাই হচ্ছে এই নতুন ধারার লক্ষ্য। অনুবাদের এই নতুন স্টাইলে আমি যদি সফল হই তবে তা হবে একান্তভাবে আমার মালিকেরই দয়া, আর ব্যর্থ হলে তা হবে আমারই অযোগ্যতা ও অক্ষমতা।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে যখন আমি 'তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন' সমাপ্ত করার সীমাহীন তাগাদায় দিন কাটাচ্ছিলাম তখন এই নতুন ধারার অনুবাদটিকে আলাদা গ্রন্থাকারে পেশ করার স্বপ্ন বহুবারই আমার মনে এসেছে, আল্লাহ তায়ালার হাজার শোকর এখন সে প্রতিক্ষীত স্বপ্নও বাস্তবায়িত হয়েছে। অবশেষে ২০০২-এর মার্চ মাসে ঢাকায় 'কোরআন শরীফ ঃ সহজ সরল বাংলা অনুবাদ' গ্রন্থটির উদ্বোধনী উৎসব সম্পন্ন হয়। বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট, মন্ত্রী পরিষদের বিশিষ্ট সদস্যরা, বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন ভাইস চ্যান্সেলর, কয়েকটি জাতীয় দৈনিকের সম্পাদকসহ দেশের বহু জ্ঞানীগুনী ব্যক্তি এতে উপস্থিত ছিলেন। সেই থেকে শুরু করে গত কয়েক মাসে এই গ্রন্থটির আকাশচুম্বি জনপ্রিয়তা কোরআন পিপাসু অনেকের মনেই নতুন আশার আলো সঞ্চার করেছে। আল্লাহ তায়ালার অগনিত বান্দার কাছে এখন কোরআন বুঝা যেন আগের চেয়ে কিছুটা সহজ মনে হচ্ছে। এই কেতাবের পাতায় তারা এখন দেখতে পেলো, আল্লাহ তায়ালা কোরআনকে আসলেই বান্দার জন্যে সহজ করে নাযিল করেছেন। নিযুত কোটী সাজদা আল্লাহ তায়ালার দরবারে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর একজন নিবেদিত কোরআন কর্মীর দিবস রজনীর পরিশ্রমকে কবুল করেছেন। হে আল্লাহ! মহা বিচারের দিনে এই ওসীলায় আমি তোমার শুধু ক্ষমাটুকুই চাই।

আমি আর বেশীক্ষণ আপনাদের এই অশান্ত বিয়াবানে অপেক্ষা করাবো না। আমরা সবাই এখন এক সাথে আশ্রয় নেবো 'ফী যিলালিল কোরআন' তথা- কোরআনের ছায়াতলে। কোরআনের এই সুনিবিড় ছায়াতল আমাদের দুনিয়া আখেরাতে সার্বিক প্রশান্তি আনয়ন করুক, এর ছায়াতলে এসে যেন আমরা সবাই এই কেতাবে নিজের ছবিকে আরো পরিষ্কার করে দেখি এবং সে মোতাবেক নিজেকে যথাসম্ভব ত্রুটিমুক্ত করে তুলতে পারি, এই মহান গ্রন্থটির প্রকাশনার মুহূর্তে গ্রন্থের মালিকের দরবারে এই হোক আমাদের ঐকান্তিক দোয়া।

আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন!

বিনীত,

হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ

সম্পাদক 'তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন'

অনুবাদ ও প্রকাশনা প্রকল্প ও

ডাইরেক্টর জেনারেল আল কোরআন একাডেমী লন্ডন

জানুয়ারী ১৯৯৫

এই খন্ডে যা আছে

সূরা আল মোমেনুন

আয়াত ১১৮ রুকু ৬

মক্কায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿٢﴾ وَالَّذِينَ هُمْ
عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴿٣﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ﴿٤﴾ وَالَّذِينَ هُمْ
لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ
غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٧﴾ وَالَّذِينَ
هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿٨﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿٩﴾
أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ﴿١٠﴾ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١١﴾
وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ﴿١٢﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ

রুকু ১

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে—

১. নিসন্দেহে (সেসব) ঈমানদার মানুষরা মুক্তি পেয়ে গেছে, ২. যারা নিজেদের নামাযে একান্ত বিনয়াবনত (হয়), ৩. যারা অর্থহীন বিষয় থেকে বিমুখ থাকে, ৪. যারা (রীতিমতো) যাকাত প্রদান করে, ৫. যারা তাদের যৌন অংগসমূহের হেফাযত করে, ৬. তবে নিজেদের স্বামী-স্ত্রী কিংবা (পুরুষদের বেলায়) নিজেদের অধিকারভুক্ত (দাসী)-দের ওপর (এ বিধান প্রযোজ্য) নয়, (এখানে হেফাযত না করার জন্যে) তারা কিছুতেই তিরস্কৃত হবে না, ৭. অতপর এ (বিধিবদ্ধ উপায়) ছাড়া যদি কেউ অন্য কোনো (পন্থায় যৌন কামনা চরিতার্থ করতে) চায়, তাহলে তারা সীমালংঘনকারী (বলে বিবেচিত) হবে, ৮. যারা তাদের (কাছে রক্ষিত) আমানত ও (অন্যদের দেয়া) প্রতিশ্রুতিসমূহের হেফাযত করে, ৯. যারা নিজেদের নামাযসমূহের ব্যাপারে (সমধিক) যত্নবান হয়। ১০. এ লোকগুলোই হচ্ছে (মূলত যমীনে আমার যথার্থ) উত্তরাধিকারী, ১১. জান্নাতুল ফেরদাউসের উত্তরাধিকারও এরা পাবে; এরা সেখানে চিরকাল থাকবে। ১২. (হে মানুষ, তোমার সৃষ্টি প্রক্রিয়াটা লক্ষ্য করো,) আমি মানুষকে মাটি (-র মূল উপাদান) থেকে পয়দা করেছি, ১৩. অতপর তাকে আমি শুক্রকীট হিসেবে একটি সংরক্ষিত জায়গায় (সুনির্দিষ্ট সময়ের

مَّكِينٍ ﴿١٣﴾ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ

عِظَٰمًا فَكَسَوْنَا الْعِظَٰمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَٰهُ خَلْقًا ءَاخَرَ ۚ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ

الْخَٰلِقِينَ ﴿١٤﴾ ثُمَّ إِنَّكُم بَعْدَ ذَٰلِكَ لَمَيِّتُونَ ﴿١٥﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَٰمَةِ

تُبْعَثُونَ ﴿١٦﴾ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَآئِقَ ۖ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ

غَٰفِلِينَ ﴿١٧﴾ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءًۢ بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّٰهُ فِى الْأَرْضِ ۖ وَإِنَّا عَلَىٰ

ذَهَابٍۭ بِهِۦ لَقَٰدِرُونَ ﴿١٨﴾ فَأَنشَأْنَا لَكُم بِهِۦ جَنَّٰتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَٰبٍ ۘ لَّكُمْ

فِيهَا فَوَٰكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿١٩﴾ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَآءَ

تَنۢبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْءَاكِلِينَ ﴿٢٠﴾ وَإِنَّ لَكُمْ فِى الْأَنْعَٰمِ لَعِبْرَةً ۖ

نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِى بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَٰفِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٢١﴾

জন্যে) রেখে দিয়েছি, ১৪. এরপর এ শুক্রবিন্দুকে আমি এক ফোঁটা জমাট রক্তে পরিণত করি, অতপর এ জমাট রক্তকে মাংসপিন্ডে পরিণত করি, (কিছুদিন পর) এ পিন্ডকে অস্থি পাঁজরে পরিণত করি, তারপর (এক সময়) এ অস্থি পাঁজরকে আমি গোশতের পোশাক পরিয়ে দেই, অতপর (বানানোর প্রক্রিয়া শেষ করে) আমি তাকে (সম্পূর্ণ) ভিন্ন এক সৃষ্টি (তথা পূর্ণাঙ্গ মানুষ)-রূপে পয়দা করি; আল্লাহ্ তায়ালা কতো উত্তম সৃষ্টিকর্তা (কতো নিপুণ তাঁর সৃষ্টি); ১৫. (একটি সুনির্দিষ্ট সময় দুনিয়ায় কাটিয়ে) এরপর আবার তোমরা মৃত হয়ে যাও; ১৬. তারপর কেয়ামতের দিন তোমরা (সবাই) পুনরুত্থিত হবে। ১৭. আমিই তোমাদের ওপর এ সাত আসমান বানিয়েছি এবং আমি আমার সৃষ্টি সম্পর্কে (কিন্তু মোটেই) উদাসীন নই। ১৮. আমিই আসমান থেকে পরিমাণমতো পানি বর্ষণ করেছি এবং তাকে যমীনে সংরক্ষণ করে রেখেছি, আবার (এক সময়ে) তা (উড়িয়ে) নিয়ে যাবার ব্যাপারেও আমি সম্পূর্ণ ক্ষমতাবান। ১৯. তারপর (সংরক্ষিত সেই পানি) দিয়ে তোমাদের জন্যে খেজুর ও আংগুরের বাগান সৃষ্টি করি। তোমাদের জন্যে তাতে প্রচুর ফল পাকড়াও (উৎপাদিত) হয়, আর তা থেকে তোমরা (পর্যাপ্ত পরিমাণ) আহারও (গ্রহণ) করো, ২০. আর (যমীনে সংরক্ষিত পানি থেকে) এক প্রকার গাছ সিনাই পাহাড়ে তেল (-এর উপাদান) নিয়ে জন্ম লাভ করে, খাদ্য গ্রহণকারীদের জন্যে তা ব্যঞ্জন (হিসেবেও ব্যবহৃত) হয়। ২১. (হে মানুষ,) তোমাদের জন্যে অবশ্যই চতুষ্পদ জন্তুর মাঝে (প্রচুর) শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে; তার পেটের ভেতরে যা কিছু আছে তা থেকে আমি তোমাদের (দুধ) পান করাই, (এ ছাড়াও) তোমাদের জন্যে তাতে আরো অনেক উপকারিতা রয়েছে, তার (গোশত) থেকে তোমরা আহারও করো।

وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴿٢٢﴾

২২. (আবার কিছু আছে) তার ওপর তোমরা (বাহন হিসেবে) সওয়ার হও, অবশ্য নৌ-যানেও তোমাদের (কখনো কখনো) আরোহণ করানো হয়।

সংক্ষিপ্ত আলোচনা

আলোচ্য সূরাটি হচ্ছে সূরা 'আল মোমেনূন'। সূরাটির এই বিশেষ নামই এর মধ্যে কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হবে তার দিকে ইংগিত করছে। সূরাটি শুরু হচ্ছে মোমেনদের গুণাবলীর কথা দিয়ে। এরপরই আলোচনার গতি ফিরে যাচ্ছে মানুষের নিজেদের মধ্যে ও প্রকৃতির সর্বত্র ছড়িয়ে থাকা ঈমানের প্রমাণাদি পেশ করার দিকে, তারপর সেইভাবে ঈমানের ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য পেশ করা হয়েছে যেমন করে নূহ (আ.) থেকে নিয়ে শেষ নবী মোহাম্মদ (স.) পর্যন্ত সকল রসূল পেশ করেছেন। আলোচ্য সূরার মধ্যে সেসব সন্দেহ সংশয় এবং বিভিন্ন প্রশ্নাবলীর জওয়াব দেয়া হয়েছে যা ঈমানের তাৎপর্য সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে উত্থাপন করা হয়ে থাকে। অতীতে অনেক সময় রসূলরা সেসব হঠকারী ব্যক্তির অযৌক্তিক প্রশ্নবাণে জর্জরিত হয়ে তাদেরকে প্রতিহত করার জন্যে আল্লাহর সাহায্য কামনা করেছেন এবং তাদেরকে ধ্বংস করা ও মোমেনদের সাহায্য করার জন্যে দোয়াও করেছেন। তারপর আলোচনার গতি ফিরে গেছে রসূলদের ইন্তেকালের পর, ক্ষমতার মালিক একমাত্র আল্লাহ তায়ালা ভিন্ন কেউ নয়-এই প্রশ্নে মানুষের মধ্যে গড়ে ওঠা নানা প্রকার মতপার্থক্যের দিকে। এখান থেকে আবার প্রিয় নবী মোহাম্মদ (স.) সম্পর্কে মোশরেকদের আপত্তিকর মন্তব্যসমূহের দিকে আলোচনার মোড় ফিরেছে এবং সূরাটি সমাপ্ত করা হয়েছে কেয়ামতকে অস্বীকারকারী কাফেরদের শাস্তির দৃশ্যের একটি স্বার্থক চিত্রায়নেরর মধ্য দিয়ে। প্রকৃতপক্ষে, সে কঠিন অবস্থার দৃশ্যের বর্ণনা দ্বারা সন্দেহবাদীদের অন্তরকে চিন্তান্বিত করতে চাওয়া হয়েছে, বরং পরোক্ষভাবে তাদেরকে সে আযাব এসে পাকড়াও করবে বলে ধমক দেয়া হয়েছে। যাতে করে তারা আল্লাহর একচ্ছত্র ক্ষমতার কথা স্বীকার করে ও সময় থাকতেই শুধরে যায়।

এই হচ্ছে সূরা 'আল মোমেনূন' অথবা সূরাতুল ঈমান, যেখানে মোমেননদের সকল প্রকার গুণাবলী ও ঈমানের অকাট্য প্রমাণাদির কথা তুলে ধরা হয়েছে এবং এই গুণাবলী বর্ণনা করাই সূরাটির লক্ষ্য ও মূল আলোচ্য বিষয়।

সূরাটিকে প্রধানত চারটি অংশে ভাগ করে ঈমানদারদের চারটি অবস্থার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে,

প্রথম পর্যায়ে, মোমেনদের কৃতকার্য হওয়ার জন্যে জরুরী শর্তাবলীর উল্লেখ করতে গিয়ে বলা হয়েছে,

'অবশ্যই মোমেনরা কৃতকার্য হবে'..........

একথা ঘোষণা দেয়ার পর পরই তাদের মধ্যে যে সব গুণাবলী থাকা দরকার সেগুলোর উল্লেখ করে, বলা হয়েছে এসব গুণ থাকলে অবশ্যই তারা কৃতকার্য হবে। তাদের জন্যে কৃতকার্য

হওয়াকে বাধ্যতামূলক করে দেয়া হয়েছে। এ কথাগুলো বলতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, মানুষের নিজেদের মধ্যে এবং গোটা পরিবেশে ঈমানের এসব প্রমাণ থাকতে হবে। এরপর তুলে ধরা হয়েছে মানব জীবনের সূচনা থেকে আজ পর্যন্ত যতো প্রকার অবস্থা ঘটেছে ও ঘটবে এবং ভ্রূণ থেকে নিয়ে পূর্ণাংগ মানুষ সৃষ্টির যেসব পর্যায় এসেছে এসব অবস্থাকে, আরো যে সব স্তর মানুষকে সাধারণভাবে অতিক্রম করতে হয় সেগুলোরও সংক্ষিপ্ত বিবরণ পেশ করা হয়েছে। তারপর কেয়ামত দিবসে পুনরায় মানুষ যখন যিন্দা হয়ে উঠবে সেই সময় পর্যন্ত মানুষের পর্যায়ক্রমিক অবস্থারও একটা চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এরপর কথার গতি পরিবর্তন হয়ে এগিয়ে গেছে মানব জীবন থেকে বিশ্ব প্রকৃতির মধ্যে অবস্থিত প্রমাণাদির দিকে। আকাশ সৃষ্টি, বৃষ্টির পানি বর্ষণ, ফল ফসল, বৃক্ষ ও তরুলতাদি উৎপন্ন হওয়া এবং জীবজন্তু সব কিছুকে মানুষের খেদমতে নিয়োজিত করার দিকে, আর সে সব নৌযান এবং ভারবাহী পশুগুলোর দিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে, যা মানুষ ও পণ্য বহন করে সাগরের উত্তাল তরংগ ও মরু মরীচিকার বুক চিরে চিরে দেশ থেকে দেশান্তরে পাড়ি জমায়।

দ্বিতীয় পর্যায়ে আলোচনা এসেছে মানব প্রকৃতি থেকে নিয়ে বিশ্ব প্রকৃতির বুকে ছড়িয়ে থাকা রহস্যরাজি ও সেই ঈমানের তাৎপর্য সম্পর্কে, যা মানব মনে মহান সৃষ্টিকর্তা এক আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে চেতনা জাগিয়ে তোলে এবং একমাত্র তাঁর কাছ থেকেই যে রসূলরা মানবতার মুক্তিদূত হিসাবে প্রেরিত হয়েছেন সে সম্পর্কে বিদগ্ধ হৃদয়ে প্রতীতি জন্মায়। আল্লাহর আয়াতের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করি,

'হে আমার জাতি, তিনি ছাড়া তোমাদের জন্যে কোনো মাবুদ নেই।'

একথা যেমন নূহ (আ.) উচ্চারণ করেছিলেন, তেমনি পরবর্তীতে আগত সকল নবী রসূলরা এই একই কথার দিকে দাওয়াত দিয়েছেন, যার ধারা এসে সমাপ্ত হয়েছে শেষ নবী ও রসূল মোহাম্মদ-(স.)-এ এসে। কিন্তু আফসোস কোরায়শ জাতির জন্যে, তাদের মধ্যেই লালিত-পালিত এবং তাদের পরম প্রিয়জন ও আস্থাভাজন এমন মধুর মানুষটিকে একথা বলে তারা উপেক্ষা করেছে যে, 'আরে, এতো তোমাদের মধ্যে বাস করে, এতো একজন সাধারণ মানুষ! এর কাছে কি করে আল্লাহর বার্তা আসবে! 'এ কাজের জন্যে চাইলে তো আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদেরকেই নাযিল করতে পারতেন!' ....একইভাবে পুনরুত্থান সম্পর্কে রসূলের কথাকে হেসে উড়িয়ে দিয়ে বলতো 'এ ব্যক্তি কি তোমাদের কাছে এ ওয়াদাও করছে যে, তোমরা মরে যাবে এবং সবাই মাটি ও হাড্ডিতে পরিণত হবে, এ অবস্থা থেকেও কি তোমাদেরকে কেউ বের করে আনবে?'.......আর সকল রসূলদের একই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা গেছে যে সবাই আল্লাহরই কাছে সাহায্য প্রার্থী হয়েছেন এবং কামনা করেছেন যে আল্লাহ তায়ালা যেন তাদের দোয়া কবুল করেন। অতপর তিনি যেন সকল প্রত্যাখ্যানকারীদেরকে ধ্বংস করে দেন ....আর এই পর্যায়টি সকল রসূলের প্রতি নির্দেশের সাথে শেষ হচ্ছে যে,

'হে রসূলরা খাও ....এবং আমিই তোমাদের রব, অতএব একমাত্র আমাকে ভয় করো।'

এরপর আসছে তৃতীয় পর্যায়ের আলোচনা রসূলদের অবর্তমানে মানুষের মধ্যে এই বিভেদ-অনৈক্য ও বিচ্ছিন্নতা সম্পর্কে। এক আল্লাহ তায়ালাই সর্বময় শক্তি ক্ষমতার মালিক এই প্রশ্নে যেহেতু সবাই এক এবং এই একই দাওয়াত নিয়ে এসেছেন, 'অতপর, তারা এই মৌলিক বিষয়টিকে নানাভাগে বিভক্ত করে ফেলেছে, প্রতি ভাগই তাদের নিজ নিজ মত ও পথ নিয়ে খুশী। (আয়াত ৫৩)

আসলে আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাদেরকে যে সব নেয়ামত দিয়েছেন তার শোকরগোযারী না করে তারা ভুলে গেছে যে, পৃথিবীর ক্ষণস্থায়ী সময়টি মোটেই চিরদিনের নয় এবং খাওয়া পান করা ও মওজ করার জন্যে নয়। এ জীবন যে অবশ্যই একটি পরীক্ষা, একথাটা একেবারেই তারা বে-মালুম ভুলে বসে আছে। আর ভাবছে, আজকে যেমন আছে এমনই চিরদিন চলবে। অবশ্য, এই ভুলে থাকা মানব শ্রেণীর মধ্যে মোমেন মুসলমান অর্থাৎ আল্লাহর কৃপাধন্য আত্মসমপর্ণকারী আর একটি দল রয়েছে , তারা ভয়ে ভয়ে থাকে। যাবতীয় কাজ কর্ম, কথা বার্তা ও চাল চলনে সদা-সর্বদা সাবধানে থাকে, পাছে আল্লাহ তায়ালা অসন্তুষ্ট হন এ চিন্তা তাদেরকে কোনো ব্যাপারেই বে-পরওয়া হতে দেয় না। তারা বিনা শর্তে ও দ্বিধাহীন চিত্তে একমাত্র তাঁরই আনুগত্য করে, তাঁর অস্তিত্বে, তাঁর ক্ষমতায় ও তাঁর গুণাবলীতে অন্য কাউকে তারা শরীক করে না, কিছুতেই তারা ভাবে না যে, শক্তি-ক্ষমতা বা অন্য কোনো গুণাবলীতে অন্য কারো এতটুকু অংশ আছে- এজন্যে অন্য কারো কাছে তারা ধর্ণা দেয় না বা কারো ওপর তারা ভরসাও করে না; তবুও সার্বক্ষণিক এ ভয় তাদের লেগে থাকে, কিছু বিচ্যুতি হয়ে যাচ্ছে না তো! আল্লাহ তায়ালা তাদের এ অনুভূতিতে খুশী হয়ে তাদের কথা গর্বভরে তাঁর পাক পবিত্র কালামে বর্ণনা করছেন,

'তাদের অন্তরগুলো ভীত সন্ত্রস্ত, কারণ তাঁর কাছেই তাদের ফিরে যেতে হবে।'

আর পাশাপাশি তাদের চিত্র আঁকা হচ্ছে যারা অপরিণামদর্শী, যারা আজকের এ নগদ নিয়ে বড়ই খুশী, এদেরকে হঠাৎ করে যখন অকল্পনীয় আযাবে পেয়ে বসবে, তখন তারা চরমভাবে অস্থির হয়ে যাবে, কিন্তু তখন কোনো উপায়ই থাকবে না। এজন্যে এখনই তাদেরকে আযাবের ভয় দেখিয়ে সাবধান হতে বলা হচ্ছে, বলা হচ্ছে, অবশ্যই আমার আয়াত (ও শক্তির নিদর্শনসমূহ) তোমাদের কাছে এসেছিলো, কিন্তু তোমরা সেগুলো থেকে মুখ ফিরিয়ে চলে যেতে। অহংকারী হয়ে চলতে এবং গল্প গুজব করে বে-ফায়দা সময় কাটাতে। রসূলুল্লাহ (স.)-এর সাথে তাদের ব্যবহারটা বড়ই অদ্ভূত, তাঁকে তারা চির সত্যবাদী, বিশ্বস্ত ও সত্যপন্থী বলে জানতো, চিনতো, তাঁর কোনো কাজে তারা অসন্তুষ্ট ছিলো না এবং তাঁকে কোনো সময়ই তারা বিমুখ করেনি, অথচ যখন তিনি তাদের কাছে সত্য সঠিক জীবন ব্যবস্থা নিয়ে এলেন, যার জন্যে তিনি তাদের কাছে কোনো প্রতিদানও চাইছিলেন না, এমতাবস্থায় তাদের কাছে তাঁর কোন জিনিস খারাপ লাগছিলো এবং কেনই বা তাঁর আনীত সত্যকে তারা অস্বীকার করছিলো? অথচ তারা আল্লাহকে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর মধ্যে বিরাজমান সব কিছুর মালিক বলে জানতো ও মানতো, আসমান যমীনের রব বা কর্তা হিসাবেও তাঁকে তারা মানতো, আর এটাও মানতো যে বিশ্বের সব কিছুর ওপর তাঁর নিরংকুশ ক্ষমতা ছড়িয়ে রয়েছে, এতদসত্তেও তারা 'মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হয়ে উঠতে হবে' কেথাটাকেই মানতে চাইতো না। তারা মনে করতো আল্লাহর সন্তান আছে, নাউযুবিল্লাহ!- তিনি মানবীয় এসব ধারণা কল্পনা ও দুর্বলতার সম্পূর্ণ উর্ধে! তারা আল্লাহর সাথে অন্য অনেক কিছুকেই সর্বময় ক্ষমতার মালিক বা পূজনীয় মনে করতো 'অতপর (তাদের জন্যে ঘোষণা) যেসব জিনিসকে (তাঁর সাথে তারা শরীক বানাচ্ছে সেসব কিছুর দুর্বলতা) থেকে তিনি প্রশ্নাতীতভাবে পবিত্র।'

আর এ সূরার শেষ পর্যায়ে এসে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে তাদের শরীকদেরকে পরিত্যাগ করতে ঘোষণা দিচ্ছেন এবং তাদের ধ্যান-ধারণাকে বাতিল বলে ঘোষণা দিচ্ছেন, তারপর রসূলুল্লাহ (স.)-কে সম্বোধন করে বলছেন তিনি যেন তাদের সকল মন্দ ব্যবহারের জবাব সর্বোত্তম

জিনিস বা সব থেকে ভালো ব্যবহার দ্বারা দেন।(১) আল্লাহ রব্বুল আলামীন আরো চাইছেন, তিনি যেন শয়তানদের যাবতীয় ষড়যন্ত্র ও অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্যে তাঁরই সাহায্য প্রার্থনা করেন। তিনি যেন রাগ না করেন, আর ওরা যা কিছু অন্যায় বলছে তার জন্যে হৃদয়কে যেন তিনি কখনো সংকীর্ণ না করেন, আর এসব কথার পাশপাশি কেয়ামতের সেই ভয়াবহ দৃশ্যাবলী ছবির মতো তিনি তাঁর সামনে ফুটিয়ে তুলছেন, যার ব্যবস্থা তিনি তাদের জন্যে করছেন– সে দৃশ্য হচ্ছে অতি কঠিন আযাবের দৃশ্য, তাদের নিরন্তর অপমান ও সদা-সর্বদা ভীতি প্রদর্শনের দৃশ্য। তারপর সূরাটি সমাপ্ত করা হচ্ছে আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনার সাথে। এরশাদ হচ্ছে,

'মহামহীয়ান আল্লাহ, যিনি বিশ্ব জাহানের প্রকৃত সম্রাট। তিনি ছাড়া এমন কেউ সর্বশক্তিমান নেই (যার সামনে মাথা নত করা যায়), তিনি মহান আরশের মালিক।'

এখানে আরো দেখা যায়, সূরাটির প্রথমাংশে কৃতকার্যতার শর্তাবলী বর্ণনা করার সাথে সাথে কাফেরদের ব্যর্থতার কথাও পেশ করা হয়েছে। এরশাদ হচ্ছে,

'আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে 'ইলাহ' হিসেবে ডাকে, যার কোনো যুক্তিই তার কাছে নেই, সে অবস্থায় (জেনে নাও যে) অবশ্যই তার রবের কাছে তার হিসাব (গৃহীত হবে), নিশ্চয়ই কাফেররা সফল হবে না।' (আয়াত ১১৭)

এ আয়াতে মানুষের মনযোগকে আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে দেয়া হচ্ছে এবং তাঁর রহমত ও ক্ষমার দিকে মানুষকে এগিয়ে দেয়া হচ্ছে। এরশাদ হচ্ছে,

'আরো বলো, হে আমার রব, ক্ষমা কারো এবং রহম কারো অবশ্যই তুমি সর্বোত্তম রহমকারী।'

তাফসীর

আয়াত ১-২২

সূরাটির গোটা পরিবেশই হচ্ছে বর্ণনামূলক, যেখানে মানুষকে হেদায়াতের পথে এগিয়ে নেয়ার জন্যে প্রচুর যুক্তিতর্ক ও আবেগপূর্ণ অকাট্য কথা রয়েছে, আরো আছে এমন এমন সুন্দর কথা, যা হৃদয়কে মুগ্ধ করে এবং বিবেককে সজোরে নাড়া দিয়ে যায়। যে পরিবেশের মধ্যে এসব যুক্তি বিজয়ী হয়েছে তার জন্যে প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তু ছিলো ঈমান....... এ ঈমানের উৎসের যে দৃশ্যটা নযরে পড়ে তা হচ্ছে নামাযে বিনয়-নম্রতা, এরশাদ হচ্ছে, 'যারা নামাযে বিনয়াবনত থাকে' তারপর মোমেনদের গুণাবলীর মধ্যে পরবর্তী বিষয়ের বর্ণনায় বলা হয়েছে, 'আর যারা যথারীতি তাদের যাকাত আদায় করে .... যৌনাংগসমূহের যথাযথ হেফাযত করে.....।' .... আর একথা বলার সময় যে আবেগের ছোঁয়া সেখানে পাওয়া যায় তার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে, 'তিনি হচ্ছেন সেই সত্ত্বা যিনি তোমাদের কান, চোখ ও অন্তরসমূহ সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু খুব অল্পই তোমরা শোকরগোযারী করো।'

উপরোক্ত গুণাবলী উল্লেখ করার পর পরিশেষে বলা হয়েছে, আর এসব কিছু সূক্ষ্ম ও সুগভীর ঈমানের ছায়াতলে লালিত পালিত হয়।

জান্নাতুল ফেরদাউসের ওয়ারিশদের গুণাবলী

'অবশ্যই সেই সব মোমেন সাফল্যমন্ডিত যারা তাদের নামাযে বিনয়াবত থাকে.......যারা জান্নাতুল ফেরদাওসের উত্তরাধিকারী তারা সেখানে চিরদিন থাকবে। (আয়াত ১-১১)

এ যে আল্লাহর ওয়াদা, অবশ্যই তা সত্য, বরং মোমেনদের সাফল্য মন্ডিত হওয়ার ফয়সালা আরো বড় সত্য, কারণ এ যে আল্লাহর ওয়াদা, কখনো আল্লাহ তায়ালা তাঁর ওয়াদা খেলাফ করেন

(১) এ সূরাটি হচ্ছে মক্কী, যার কারণে এসময়ে ইচ্ছা করলেও তাদের দুর্ব্যবহারের জওয়াবে কোনো প্রতিশোধ নেয়ার মতো অবস্থা মুসলমানের ছিলো না।

না। আল্লাহ রব্বুল আলামীনের এ ওয়াদাকে কেউ বদলে দেয়ার ক্ষমতাও রাখে না। এ সাফল্য দুনিয়া ও আখেরাতের উভয় স্থানে, প্রত্যেক মোমেন, ব্যক্তি হিসাবে এবং দলগতভাবে উভয় অবস্থাতেই তারা সফলকাম। এ এমন মহামূল্যবান সাফল্য যা একজন মোমেন তার অন্তর দিয়ে অনুভব করে এবং এর সত্যতা তার বাস্তব জীবনে বিভিন্ন অবস্থার মাধ্যমে সে দেখতে পায়, সাধারণভাবে মানুষ কৃতকার্যতা বলতে যা বুঝে তাও যেন মোমেনরা লাভ করে, আরো এমন কিছু সফলতা মোমেন বান্দাদের জন্যে আল্লাহ তায়ালা নির্ধারণ করে রেখেছেন যার তাৎপর্য তারা নিজেরাও ভালো করে জানে না।

এখন আসুন আমরা বুঝতে চেষ্টা করি, কারা সেই মোমেন যাদের সাথে আল্লাহ তায়ালা এ ওয়াদা করেছেন এবং তাদের সাফল্যের এই ঘোষণা তিনি দিয়েছেন?

কারা সেই মোমেন ব্যক্তি যাদের জন্যে কল্যাণ, সৌভাগ্য এবং পৃথিবীর পবিত্র সম্পদকে আল্লাহ রব্বুল ইযযত অবধারিত করে দিয়েছেন? তাদের জন্যে সাফল্য ও নাজাত এবং আখেরাতের জন্যে সওয়াব ও আল্লাহর সন্তুষ্টি বাধ্যতামূলক করে দিয়েছেন, এ ছাড়া আল্লাহ তায়ালা উভয় জীবনের জন্যে আরো যা কিছু চেয়েছেন, যা একমাত্র তিনি ছাড়া আর কেউ জানে না?

কে সেই উত্তরাধিকারী মোমেন; যারা হবে ফেরদাওসের উত্তরাধিকারী, যেখানে তারা থাকবে চিরদিন? নিশ্চয়ই ওরা হচ্ছে সেই সব ব্যক্তি যাদের গুণাবলী সম্পর্কে সূরাটি শুরু করার পরপরই বিস্তারিত আলোচনা এসেছে। বলা হচ্ছে,

'যারা তাদের নামাযের মধ্যে বিনয়ানত' 'যারা বেফায়দা জিনিস থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়' 'যারা রীতিমতো যাকাত প্রদান করে' 'যারা তাদের লজ্জাস্থানগুলোকে হেফাযত করে নিজেদের স্ত্রী অথবা তাদের অধিকারভূক্ত দাসীদের বাদে অন্য সবার কাছ থেকে ....।'

'যারা তাদের সকল প্রকার আমানত এবং ওয়াদাগুলোকে সংরক্ষণ করে'

'যারা তাদের সকল নামাযকে হেফাযত করে শেষ পর্যন্ত।

এখন দেখতে হবে এসব গুণাবলীর মূল্য কি?

এগুলোর মূল্য হচ্ছে, এগুলো দ্বারা একজন মুসলমানের ব্যক্তিত্ব সর্বোচ্চ পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছে যায় এবং সে মর্যাদা হাসিল হয় সৃষ্টির সেরা মানুষ মোহাম্মদ (স.)-এর পূর্ণাংগ অনুকরণ ও অনুসরণের মাধ্যমে। আল্লাহ রব্বুল আলামীন নিজে তাঁকে সুন্দরতম সে গুণাবলী শিখিয়েছেন এবং তিনি তাঁর কেতাবে সে শ্রেষ্ঠ গুণাবলীর উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন,

'অবশ্যই (হে রসূল) তুমি শ্রেষ্ঠ চরিত্রের ওপর দাঁড়িয়ে আছো।'

হযরত আয়শা (রা.)-কে একদিন, রসূলুল্লাহ (স.)-এর চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, 'মহাগ্রন্থ আল কোরআনই হচ্ছে তাঁর চরিত্র।' এরপর তিনি সূরায়ে মোমেনূন এর আয়াত 'ক্বাদ আফলাহাল মোমেনূন' থেকে পড়তে শুরু করলেন এবং 'যারা তাদের নামাযসমূহের ওপর হেফাযতকারী হয়' পর্যন্ত পড়লেন, তারপর তিনি বললেন, এই আয়াতগুলোতে যেসব গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে তারই বাস্তব রূপ ছিলেন রসূলুল্লাহ (স.)।(২)

(২) নাসাঈ শরীফে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

আবারও লক্ষ্য করুন তাঁর ব্যক্তিত্বের মধ্যে এ গুণাবলীর কি কি প্রভাব পরিলক্ষিত হয়?

একটি দলের মধ্যে যখন এ গুণাবলী সৃষ্টি হয় তখন তার দ্বারা কি কি কাজ সাধিত হয়? আর গোটা মানব জাতি যখন এ মহৎ গুণাবলীর অধিকারী হয় তখন তারা সম্মিলিতভাবে কি কি কল্যাণের ফল্গুধারা বইয়ে দিতে পারে। পর্যায়ক্রমে একবার সেগুলোর দিকে লক্ষ করুন,

১। 'যারা তাদের নামাযে (ভয় ভরা মন নিয়ে) বিনয়াবনত'......নামাযে দাঁড়ানো অবস্থায় যখন তারা মহান আল্লাহর সামনে উপস্থিত বলে মনে করে, তখন তাদের হৃদয়ে প্রচন্ড ভয় জাগে, যার লক্ষণ ফুটে উঠে তাদের প্রতিটি অংগ প্রত্যংগে এবং তাদের প্রতিটি নড়া চড়ায়, প্রতিটি মুহূর্তে। মহান আল্লাহর সামনে দন্ডায়মান থাকার চেতনা তাদের আত্মার ওপর পরিব্যাপ্ত থাকে। এর ফলে তাদের মন-মস্তিষ্ক থেকে অন্য সকল চিন্তা চেতনা ও ব্যস্ততা দূর হয়ে যায়। এ সময়ে আল্লাহর চিন্তা চেতনা ছাড়া অন্য কিছু তাকে অস্থির করে না, প্রকৃতপক্ষে, আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে থাকার অনুভূতি তাকে সংগোপনে আল্লাহর কাছে কিছু চাওয়ার জন্যে উদ্বুদ্ধ করে এবং সে তখন মনে মনে মোনাজাত করতে থাকে। এ ধরনের একান্ত সান্নিধ্য লাভের পবিত্র অনুভূতি তাকে আশে-পাশের সব কিছু ভুলিয়ে দেয় এবং তার মনকে অন্য সবার থেকে সরিয়ে নেয়। তখন তারা আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পায় না, হৃদয়ের গভীরে তাঁকে ছাড়া তারা আর কাউকে অনুভব করে না, এ বিশ্বের অস্তিত্বের সব কিছুই তখন তাদের কাছে অর্থহীন হয়ে যায়, তখন যাবতীয় ক্লেদ থেকে মুক্ত হয়ে তাদের হৃদয়গুলো পবিত্রতায় ভরে যায় এবং তাদের মনমগয পৃথিবীর যাবতীয় সংকীর্ণতা ও আত্মম্ভরিতার আবর্জনা থেকে পরিষ্কার হয়ে ধুয়ে মুছে যায়, এসময় তাদের অন্তরের মধ্যে আল্লাহর অনুভূতি ছাড়া আর কারো কথাই থাকে না....... ফলে মাটির এ দেহের প্রতিটি অণু-পরমাণু তখন যেন মূল উৎসের সাথে সম্মিলিত হয়ে যায় এবং তাদের উদভ্রান্ত-বিভ্রান্ত ও দিশেহারা আত্মাগুলো তাদের বাঞ্ছিত পথ খুঁজে পায়, পৃথিবীর ধূম্রজালে আচ্ছাদিত তাদের অস্থির হৃদয় জীবনের আসল ঠিকানাটির সন্ধান পেয়ে ধন্য ও কৃতার্থ হয়ে যায়, তখন তার কাছে পৃথিবীর বস্তুবাদী মূল্যমান ম্লান হয়ে যায়।

২। 'যারা যে কোনো বে-ফায়দা জিনিস থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।'.....

বে-ফায়দা, অর্থহীন বা মানব জীবনের জন্যে সত্যিকারে যার কোনো প্রয়োজন নেই এমন যা কিছু, তা কথা হোক, কাজ হোক, মূল্যায়ন হোক বা চেতনা হোক, একজন মোমেন অবশ্যই এগুলো থেকে দূরে থাকে। আবার এটাও একজন মোমেন খেয়াল করে যে, মানুষ যে কোনো কথা কাজ ও ব্যবহার করবে তাতে দুনিয়াবী কল্যাণ বেশী না আখেরাতের কল্যাণ বেশী। এ হিসাবে অবশ্যই সে আখেরাতের কল্যাণকে অগ্রাধিকার দেবে, আল্লাহর স্মরণ এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি পাওয়ার প্রত্যাশা তাকে সদা-সর্বদা সতর্ক করে রাখবে। তার মন-মগযে মানুষের অস্তিত্ব ও দিগন্ত ব্যাপী ছড়িয়ে থাকা প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী ও বস্তু নিচয়ের মধ্যে পরিব্যাপ্ত মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীন-এর মহিমা বিরাজ করবে, সুনিপুণ ও বিস্ময়কর পরিচালনার কথা তার যুক্তি বুদ্ধির ওপর নিরন্তর প্রভাব বিস্তার করবে, আল্লাহর রাজ্যের সর্বত্র ছড়িয়ে থাকা সকল রহস্যরাজি এবং তার চিন্তা স্রোতকে সৃষ্টিজগতের মধ্যে বিরাজিত এই মহাবিশ্বের বিশালত্ব ভীষণভাবে আন্দোলিত করবে। ধরার সব কিছু তার হৃদয়াবেগকে প্রচন্ডভাবে নাড়া দেবে, তার আকীদাকে নিয়ন্ত্রিত করবে তার গোটা সত্বাকে পবিত্র করার ক্ষেত্রে এবং তার বিবেককে সকল প্রকার আবিলতা মুক্ত করতে গিয়ে তার ব্যবহারকে সুন্দর করবে। পরিপূর্ণ ঈমানী জীবন গড়ে তোলার লক্ষ্যে যেসব গুণাবলী প্রয়োজন সেগুলোকেও নিশ্চিত করবে, তাকে 'আমর বিল মারূফ' (অর্থাৎ শক্তি ক্ষমতার অধিকারী

হয়ে ভালো কাজের নির্দেশ দান) করতে এবং মন্দ কাজকে নিষেধ করতে উদ্বুদ্ধ করবে। নামাযের মাধ্যমে গড়ে ওঠা এসব মহামূল্যবান গুণ দলীয় জীবনকে মতভেদ, বিশৃংখলা ও আনুগত্যহীনতার কলুষতা থেকে মুক্ত করে। আল্লাহর পথে দৃঢ়তার সাথে টিকে থাকতে এবং এ দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্যে সকল প্রকার দুঃখ কষ্ট ও কঠোরতা স্বীকার করতে উদ্বুদ্ধ করে। সকল প্রকার চেষ্টা সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করার কাজে সাহায্য করার জন্যে, সকল প্রকার ঝুঁকি নিতে এবং শক্রর যে কোনো আক্রমণ প্রতিহত করে দ্বীনকে মযবুত বানাতে তাকে উৎসাহিত করবে। এ কঠিন দায়িত্ব মোমেনের ঘাড় থেকে কখনো নেমে যায় না এবং সে কখনো এ দায়িত্ব থেকে উদাসীন হয় না, আর তার মনও কখনো তাকে এ দায়িত্ব থেকে রেহাই দেয় না। এ মহান ও কঠিন দায়িত্ব পালনকে সে ফরযে আইন অথবা ফরযে কেফায়া বলে বুঝে। ফরযে কেফায়া এই জন্যে মনে করা যায় যে মানুষ তো তার মানবীয় সীমাবদ্ধ প্রচেষ্টাই চালাতে পারে, যেহেতু তার বয়স সীমাবদ্ধ এবং তার শক্তিও সীমিত। তার নিজের জীবন দিয়ে সময় ও শ্রম দিয়ে যতোখানি সংশোধনী প্রচেষ্টা চালানো তার পক্ষে সম্ভব ততোখানিই সে করতে পারে, আর প্রত্যেক মোমেন ব্যক্তি তার সকল সম্পদ, শ্রম ও চূড়ান্ত প্রচেষ্টা দ্বারা তার আদর্শ কায়েম এর কাজ করার জন্যে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

অবশ্য মাঝে মাঝে মোমেন ব্যক্তি একটু ঢিল হয়ে যেতে পারে– বা সে একটু আমোদ আহলাদ করতে পারে, বিচ্ছিন্ন এসব সম্ভাবনাকে মানুষের জন্যে একেবারে নাকচ করে দেয়া যায় না, কিন্তু সামগ্রিকভাবে তারা 'ফুযুল' বা নিরর্থক কাজে জড়িয়ে পড়বে এবং তারা তাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থ বে-ফায়দা কোনো কিছুর জন্যে ব্যয় করবে এটা আশা করা যায় না।

৩। মোমেনদের তৃতীয় গুণ হচ্ছে 'তারা রীতিমতো যাকাত আদায় করবে অর্থাৎ আল্লাহর দিকে এগিয়ে যাওয়ার পর অবশ্যই তারা বাজে কথা এবং বে-ফায়দা কাজ ও ব্যবহার পরিহার করে এবং এইভাবে তাদের অন্তর ও সম্পদকে তারা পবিত্র করবে। অন্তরের পবিত্রতা অর্জন করবে, যাবতীয় সংকীর্ণতা পরিত্যাগ করবে এবং মানবতাকে সমুন্নত করার জন্যে তারা সর্বদা সচেষ্ট থাকবে, শয়তান মানুষকে দারিদ্রের ভয় দেখিয়ে যে ওয়াসওয়াসা দেয় সেই মরদূদ শয়তানের ওপর অবশ্যই তারা বিজয়ী হবে, তারা আল্লাহর কাছেই প্রতিদান ও পুরস্কার পাওয়ার জন্যে আশান্বিত থাকবে। হালাল পথে অর্জিত অর্থ সম্পদের পবিত্রতা তাদের জীবনের বাকি সব কিছুকে পবিত্র করে তুলবে। জরুরী অবস্থা ছাড়া তারা নিজেদের স্বার্থের কথাটাকে মোটেই বড় করে দেখবে না এবং সব সময় শুধু নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্যেই সংগ্রাম করবে না– অন্যদের কথাও মনে রাখবে। মোমেনদের পারস্পরিক সম্পর্ক হবে এতো মধুর, এতো সহানুভূতিপূর্ণ এবং পরস্পরের প্রতি এতো আস্থাপূর্ণ যে কারো সততা ও বিশ্বস্ততা সম্পর্কে তারা কোনো সন্দেহ পোষণ করবে না। প্রকৃত ঈমানদার মুসলমানরা অবশ্যই তাদের দলীয় জীবনের সংহতি বজায় রাখার জন্যে পরস্পর দরদী এবং আস্থাভাজন হবে, তারা হবে সুখে ও দুঃখে, সংকটে সমস্যায় দারিদ্র ও সচ্ছলতার সময়ে ও আনন্দঘন মুহূর্তে ও বেদনায় পরস্পরের প্রতি দরদী, প্রত্যেক ব্যক্তির স্বার্থ যাতে অক্ষুন্ন থাকে তার জন্যে গোটা সমাজের মধ্যে এক তীব্র অনুভূতি বজায় থাকবে, অক্ষমদের সমস্যাকে গোটা দলের সামষ্টিক সমস্যা বিবেচনায় তার সমাধানের জন্যে তারা সামগ্রিকভাবে চেষ্টা চালাবে এবং বিচ্ছিন্নতা ও ভাংগন থেকে তার দল ও দলীয় যিন্দেগীকে রক্ষা করা হবে গোটা দলের যৌথ দায়িত্ব।

৪। মোমেনদের চতুর্থ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, 'তারা তাদের লজ্জাস্থানগুলোর হেফাযতকারী হবে।' প্রকৃতপক্ষে এটাই হচ্ছে রূহ বা আত্মার হেফাযত এবং মুসলমানদের গোটা দলের হেফাযতের উপায়ও এখানে। এই হেফাযতের মাধ্যমেই ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজকে রক্ষা করা সম্ভব হয়। লজ্জাস্থানসমূহকে হেফাযতের মাধ্যমে হালাল বিষয়গুলো বহির্ভূত অন্য সব কিছুর খারাবী থেকে বাঁচা যায়। অন্তরের হেফাযতের মাধ্যম হালাল বিষয় ছাড়া অন্যসব কিছু নিয়ে মাথা ঘামানো থেকে দূরে থাকা যায় এবং বে-হেসাবী প্রবৃত্তির চাহিদা মেটানোকে যখন মানুষ কন্ট্রোল করে তখন গোটা দলের মধ্যে শান্তি-শৃংখলা ও নিরাপত্তা বিরাজ করে এবং ব্যক্তি ও বংশ পরিবারগুলো বিভিন্নমুখী ভাংগন থেকে রক্ষা পায়।

আর যে মানব গোষ্ঠীর মধ্যে অনিয়মিত ও অনিয়ন্ত্রিতভাবে যৌনাচার চলে; সেখানে অবশ্যই শান্তি শৃংখলা বিনষ্ট হয় এবং পারস্পরিক অবিশ্বাস ও আস্থা নষ্ট হয়। কেননা পারস্পরিক অবিশ্বাসের কারণে পরিবার তথা মানব সমাজে কোনো শান্তি থাকে না আর পরিবারের সদস্যদের মধ্যেও কারো প্রতি কারো কোনো মর্যাদাবোধ থাকে না, যেহেতু পরিবারই হচ্ছে সমাজ সংগঠনের প্রথম ভিত্তি। এই সূতিকাগারেই মানব শিশুর জন্ম ও বৃদ্ধি। এখানকার শান্তি, নিরাপত্তা, স্থিতিশীলতা ও পবিত্রতার রক্ষাকবচ হচ্ছে পারস্পরিক বিশ্বাস ও আস্থা, আর তা আল্লাহর ভয়ে গড়ে ওটা সুনিয়ন্ত্রিত যৌন ব্যবস্থার মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। এখানকার নিরাপত্তা ও শৃংলার কারণে বাপ-মা নিশ্চিন্তে ও তৃপ্তির সাথে এই সূতিকাগারে তাদের বাচ্চাকে প্রতিপালন করে। এই সূতিকাগারের পরিচালক তো এই পিতামাতাই। এদের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাস ও মহাব্বত গড়ে তোলা ও এদের নিরাপত্তা বিধান করা দেশের আইন সংস্থা তথা সরকারের দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালনে সেই সরকারই সফল হতে পারে যার মধ্যে আল্লাহর ভয় ও তাঁর আনুগত্য আছে।

যে জনসমাজে লাগামহীন যৌনচার চলতে থাকে সেটা হচ্ছে এক পাপপঙ্কিলময় সমাজ, সে সমাজ গোটা মানব জাতিকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করে, মানুষকে যে মানদন্ড এই অপরাধ করা থেকে বাঁচাতে পারে তা হচ্ছে ইচ্ছার দৃঢ়তা এবং সদিচ্ছাকে বিজয়ী করার সংকল্প। এর সাথে প্রবৃত্তির চাহিদাকে সুন্দর ও ফলপ্রসূভাবে নিয়ন্ত্রণ করার মনোভাবও থাকতে হবে। এই নিয়ন্ত্রণ ও সুশৃংখলা আজকের আধুনিক সমাজে কিছুতেই আশা করা যায় না, যেখানে নিয়মিত মেলামেশা বাচ্চাদের মনের লজ্জা শরমকে দূর করে দিচ্ছে। বাচ্চারা জন্মের পর থেকে সব থেকে বেশী কাছে পায় বাপ-মাকে, নিজেদের অজান্তেই তাদের ভাবধারা, অভ্যাসসমূহ এবং কাজ কর্ম তাদের অন্তরে গভীরভাবে অংকিত হতে থাকে। সন্তানরা মায়ের পর সর্বপ্রথম বাপকেই চেনে এবং তার অনুসরণ করে। এর ব্যতিক্রম যদি হয় তা ব্যতিক্রমই, সেটাকে সাধারণ নিয়ম বলে কেউ মেনে নেয় না। অপরদিকে রয়েছে নিকৃষ্ট পশুদের নিয়ম, সেখানে নরপশুর শুক্র মাদী পশুর জরায়ুতে পৌঁছে দেয়া হয়, এর ফলে যে বাচ্চা পয়দা হয়। সে জানে না তার বাপ-কে, সে জানে না সে কেমন করে ধরা পৃষ্ঠে আগমন করলো এবং কোন উপায়ে হলো একটি জীব হিসাবে তার সৃষ্টি হলো।

এখানে পুরুষরা কোথায় তাদের বীজ বপণ করবে সেই স্থানগুলোকে আল কোরআন সীমাবদ্ধ করে দিয়ে বলছে,

'একমাত্র তাদের স্ত্রীরা ও সেই সকল দাসী যাদের ওপর তাদের ন্যায়ানুগ কর্তৃত্ব রয়েছে, সেখানে তাদেরকে কোনো দোষ দেয়া হবে না।'

বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে স্বামী স্ত্রীর জীবন যাপন করা বা বৈবাহিক সম্পর্কের বিষয়টি নিয়ে কোনো তর্ক-বিতর্ক করার সুযোগ নেই, কেননা সকল যামানায়, সকল দেশে এবং সকল সমাজেই

লোকদের মধ্যে এটা হচ্ছে সর্বজন স্বীকৃত নিয়ম। এখন দাসীর ওপর যতো মানুষের ওপর কর্তৃত্ব লাভের প্রশ্নটির একটু বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

তাফসীর 'ফী যিলালিল কোরআন' গ্রন্থের দ্বিতীয় খন্ডে দাসীদেরকে ব্যবহার করা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা এসেছে। সেখানে আলোচনা করা হয়েছে যে, যখন দাসী সম্পর্কিত এ আয়াতগুলো নাযিল হয়, তখন সারাবিশ্বে আন্তর্জাতিকভাবে দাস প্রথা চালু ও স্বীকৃত ছিলো। আর এখনও বন্দী-বিনিময় না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধবন্দীদেরকে দাস দাসী হিসাবে ব্যবহারের রীতি চালু আছে, যেহেতু ইসলাম মুসলমানরা সেসব দেশ ও শক্তিসমূহের সাথে যুদ্ধরত ছিলো– যারা বস্তুগত শক্তিতে এগিয়ে ছিলো। সেই সময়ে একতরফাভাবে তাদের ওপর দাসত্ব প্রথা রহিত করার নিয়ম চাপিয়ে দেয়া সম্ভবও ছিলো না। এটা করতে গেলে (ম হিলাসহ) মুসলমান বন্দীরা অবশ্যই শত্রু দেশের হাতে থেকে যেতো, এজন্যে যুদ্ধবন্দী ছাড়া দাসত্বপ্রথার অন্যান্য উৎসগুলোকে ইসলাম গুটিয়ে ফেলেছে এবং গোটা মানব জাতির জন্যে বন্দী বিনিময়ের ভারসাম্যপূর্ণ নীতির পক্ষে স্বীকৃতি আদায় করতে সক্ষম হয়েছে।

এই সময় ইসলামী সেনাদলের ছাউনীতে বন্দীনীদের আগমন শুরু হলো। যখন বন্দী বিনিময় নিয়ম অনুসারে বন্দীবিনিময়ও হতে থাকলো তখন এই দাসীদের রাখার প্রয়োজনে তাদেরকে কিভাবে রাখা হবে তার জন্যে নীতিও নির্ধারণ করে দেয়া হলো। বিবাহের মাধ্যমে তাদেরকে স্ত্রীর মর্যাদা দেয়া যাবে না, কিন্তু তাদেরকে স্ত্রীর মতো ব্যবহারের জন্যে ইসলাম অনুমতি দিলো। স্থির হলো যাদের জন্যে এদেরকে ভাগ করে দেয়া হবে তারা এদেরকে ব্যবহার করতে পারবে এবং এক এক জনকে এক এক জনের পূর্ণ কর্তৃত্বে সোপর্দ করা হবে। তবে, ওদের মধ্যে কেউ যদি ইসলাম অনুমোদিত পন্থাসমূহের যে কোনো একটি অনুযায়ী মুক্তি লাভ করতে চায় তাহলে তাকে আর সেভাবে ব্যবহার করা যাবে না।

এভাবে ব্যবহার করার অনুমতি সম্ভবত এই অবস্থাকে সামনে রেখে দেয়া হয়েছে যে, মানুষ হিসাবে সে বন্দী মহিলাদেরও তো প্রাকৃতিক প্রয়োজন আছে। যদি তাদের জন্যে অনুমোদিত কোনো পদ্ধতি খোলা না রাখা হয় তাহলে উচ্ছৃংখলতার নিন্দনীয় অবস্থায় তারা পতিত হবে এবং সেই দায়িত্বহীন পন্থায় তারা জীবন যাপন করবে যা আজকের আধুনিক সমাজে সেনাঘাঁটিগুলোতে যুদ্ধ বিনিময় চুক্তি মেনে নেয়া সত্তেও অবাধে চলছে। এমন যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা ইসলাম অনুমোদন করে না। কিন্তু এটাকে ইসলাম কোনো স্থায়ী ব্যবস্থা হিসাবেও রেখে দেয়নি, বরং ধীরে ধীরে ও পর্যায়ক্রমে তাদেরকে বিভিন্ন পন্থায় স্ত্রীর মর্যাদা বা স্বাধীন হওয়ার সুযোগ দেয়া হয়েছে, যেমন, এক, বন্দী বিনিময় চুক্তির ভিত্তিতে স্বাধীনতা লাভ করে তারা নিজেদের দেশে ফিরে গিয়ে নিজ নিজ পরিবারের সাথে মিলিত হতে পারে। দুই, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের মানসে বা কারো কোনো গুনাহের কাফফারা দান করতে গিয়ে কেউ কোনো দাসীকে মুক্তি দিলে সে দাসী মুক্তি পেতে পারে। তিন, অর্থের বিনিময়ে মুক্তি লাভে ইচ্ছুক কোনো মহিলা নিজেকে মুক্ত করতে পারে। চার, মনিবের ঔরসজাত কোনো সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার পর সে মনিবের মৃত্যু হলে সে দাসী আপনা থেকেই স্বাধীন হয়ে যাবে। পাঁচ, মনিব যদি কোনো সময়ে তার দাসীর চেহারার ওপর আঘাত করে, তাহলে তার কাফফারা হিসাবে সে দাসী মুক্তি লাভ করবে। (৩)

---

(৩) দেখুন মোহাম্মদ কুতুব রচিত 'শোবাহাতুন হাওলাল ইসলাম' গ্রন্থের 'দাসী' সম্পর্কিত অধ্যায়।

যাই হোক, বন্দী রাখা বা দাসত্ব প্রথাকে ইসলাম যুদ্ধকালীন সময়ের জন্যে সাময়িকভাবে অনুমোদন করেছে এবং এটাকে একটা অপরিহার্য সাময়িক প্রয়োজন বলে জানিয়েছে। বন্দী বিনিময়ের প্রয়োজন অনুভব করে সারা বিশ্বে এখন পারস্পরিক সম মর্যাদার ভিত্তিতে যে সমঝোতা গড়ে উঠেছে তারই ভিত্তিতে যুদ্ধ বন্দী বিনিময় আন্তর্জাতিকভাবে এখন স্বীকৃত এক নীতি হিসাবে গৃহীত হয়েছে। এটাকে কখনো ইসলামের সমাজ বিধির অংশ মনে করা হয়নি। এরশাদ হয়েছে,

'অতপর, যদি কোনো ব্যক্তি এই নির্ধারিত সীমা লংঘন করে (যারাই এ সীমার বাইরে যাবে) তারাই হবে সীমা অতিক্রমকারী।' ....

অর্থাৎ, স্ত্রী ও দাসী ছাড়া অন্য যে কোনো পদ্ধতিতে যারাই যৌন সম্পর্ক স্থাপন করবে তারাই হালাল পথের বাইরে চলে যাবে, পরিষ্কার হারামে পতিত হবে। এ হারাম অবস্থায় যে পৌঁছে যাবে সে নিজেকে ধ্বংসের দিকেই এগিয়ে দেবে, কারণ এ চেতনা তাকে অনবরত দংশন করতে থাকবে যে সে এমন চারণ ক্ষেত্রে বিচরণ করছে যা তার জন্যে হালাল নয়। এভাবে সে নিজেকে এবং নিজের ঘরকে ধ্বংস করবে, কারণ (হারাম পথে যাওয়ার কারণে) তার মনে কোনো শান্তি থাকবে না এবং নিজেকে সে আযাব থেকে নিরাপদও মনে করতে পারবে না এবং সে সমাজকেও সে ধ্বংস করবে, কারণ তার সীমাহীন লোভের নেকড়েগুলো এখানে ওখানে নির্বিচারে যারা বিচরণ করে সেই শান্তি বেষ্টনীকে ধ্বংস করে দেবে যাকে ইসলাম রক্ষা করতে চেয়েছে।

৫। মোমেনদের পঞ্চম গুণ সম্পর্কে বলা হচ্ছে,

'যারা তাদের আমানত ও ওয়াদাসমূহকে রক্ষা করে'

অর্থাৎ ব্যক্তিগতভাবে ও দলীয় পর্যায়ে তাদেরকে যেসব আমানত দেয়া হয় তার হক তারা আদায় করে এবং কোনো মুসলিম ব্যক্তি বা দল যদি কারো সাথে কিছু ওয়াদা করে তাহলে সে ওয়াদা তারা পূরণ করে।

ব্যক্তিগতভাবে পরিশোধযোগ্য যেমন বহু আমানত আছে, তেমনি দলীয়ভাবেও অনেক আমানতের হক আদায় করতে হয়। এর মধ্যে প্রথম হচ্ছে মানুষের স্বভাব-প্রকৃতি, মেযাজ ও চরিত্রের আমানত। প্রত্যেক মানুষকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পৃথক মেযাজ রুচি, চাহিদা ঝোঁক প্রবণতা ও বিশেষ বিশেষ কিছু ক্ষমতা দিয়েছেন যেগুলোকে তারা আল্লাহর নিয়ম ও ইচ্ছাতেই হাসিল করেছে। চিন্তা করলে সৃষ্টির এসব স্বাভাবিক নিয়মের মধ্য দিয়ে আল্লাহর অস্তিত্বের সাক্ষ্য পাওয়া যায়, এসব কিছুর মধ্য দিয়ে একথার প্রমাণ পাওয়া যায় যে তিনিই একমাত্র সৃষ্টিকর্তা এবং সকল ক্ষমতা এককভাবে একমাত্র তাঁরই। আন্তরিকভাবে মানুষ একথা বুঝে যে, সারাবিশ্বের সর্বত্র একটিমাত্র নিয়ম চালু আছে, যার অধীনে সব কিছু নড়াচড়া করছে, বেঁচে আছে এবং সেই একই নিয়মে তাদের জীবনাবসান হচ্ছে, মহান সেই আল্লাহর ইচ্ছাই সর্বত্র কার্যকর রয়েছে, সকল নিয়মের নিয়ামক একমাত্র তিনি। প্রকৃতির বুকে বিরাজমান সারা বিশ্ব প্রকৃতির সবকিছু এ নিয়মের অধীনে চলছে, তারা এসব নিয়ম-বিধান মানতে বাধ্য; মানুষকে আল্লাহ তায়ালা কিছু স্বাধীনতা দিয়েছেন। এ স্বাধীনতা হচ্ছে তার ইচ্ছা শক্তি পরিচালনার করার, কিন্তু তার শরীরের অংগ প্রত্যংগে, তার চাহিদা এবং তার স্বভাব প্রকৃতিতে আল্লাহ তায়ালা দিয়েছেন কিছু প্রয়োজন, এসব কিছুকে পরিচালনা করার জন্যে তিনি কিছু নিয়মও দিয়েছেন। এসব নিয়ম অনুযায়ী চললে মানুষেরই কল্যাণ হবে– এ বুঝ শক্তিও তিনি তাকে দিয়েছেন, এটাই হচ্ছে তার জন্যে আল্লাহর দেয়া সব থেকে বড় নেয়ামত ও আমানত, বিশেষ করে মোমেনদের জন্যে এটাই বড় আমানত। তারা প্রকৃতির চাহিদাকে অস্বীকার করবে না, পরিত্যাগ করবে না, এ চাহিদা পূরণের জন্যে আল্লাহ

রব্বুল আলামীনের দেয়া বিধান রূপ আমানতের হক তারা আদায় করবে এবং তাঁর হুকুম মতোই তাদের সকল প্রাকৃতিক চাহিদা মেটাবে।

প্রকৃতির সব কিছুর মতোই মানুষের সাথে আল্লাহর প্রথম চুক্তি সংঘটিত হয়েছিলো। এ হচ্ছে সেই চুক্তি যা সৃষ্টির সূচনাতে সর্বপ্রথম মানুষ আল্লাহর সাথে করেছিলো। এ চুক্তির শর্ত ছিলো মানুষ একমাত্র আল্লাহকেই রব বলে মানবে ও জীবনের সকল ক্ষেত্রে সর্বদা তাঁরই আনুগত্য করবে। এই প্রথম চুক্তির ওপরেই গড়ে উঠেছে পরবর্তী কালের সম্পাদিত সকল চুক্তি। অতপর মোমেন কারো সাথে যে কোনো চুক্তি বা ওয়াদা করে আল্লাহকে সাক্ষী রেখেই তা করে এবং আল্লাহর ভয়েই সে চুক্তি বা ওয়াদা তারা পূরণ করে।

মুসলিম জামায়াত সকল প্রকার আমানত রক্ষা করবে বলে দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। তারা আমানত রক্ষা করছে কিনা বা ওয়াদা পূরণ করছে কিনা সে বিষয়ে তারা আল্লাহর কাছে জওয়াবদিহি করার খেয়াল রাখে এবং তাঁর কাছেই নিজেদেরকে দায়ী মনে করে। এই মূলনীতির ভিত্তিতেই পর্যায়ক্রমে মোমেনের জীবনের সব কিছু পরিচালিত হয়। আল কোরআন সংক্ষেপে মানুষকে সকল প্রকার চুক্তি রক্ষা ও ওয়াদা পূরণের জন্যে নির্দেশ দিয়েছে এবং খাস করে মোমেনদের সম্পর্কে জানিয়েছে যে তারা সকল প্রকার ওয়াদা ও আমানতের মর্যাদা রক্ষা করে। মোমেনের জীবনে ওয়াদা পূরণের এ গুণটি হচ্ছে একটি স্থায়ী গুণ। এ ওয়াদা পূরণের জন্যে তারা সকল সময়ে সজাগ ও বদ্ধপরিকর থাকে। ওয়াদা পূরণ ও পারস্পরিক চুক্তি রক্ষায় দৃঢ় না থাকলে কোনো দলীয় জীবন মযবুত হতে পারে না। এগুণটির অভাবেই দলীয় সংহতি বিপর্যস্ত হয়, দলের সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বাস সৃষ্টি হয়। কেউ কারো ওপর নির্ভর করতে পারে না এবং সংকট সমস্যায় সদিচ্ছা থাকা সত্তেও একে অপরকে সাহায্য করতে ব্যর্থ হয়। মানুষ সামাজিক জীব বিধায় নানা সংকট সমস্যায় পারস্পরিক সাহায্য সহযোগিতার মুখাপেক্ষী হয়, কিন্তু এই মৌলিক গুণটির অভাবে তাদের পারস্পরিক আস্থা ও সৌহার্দ্য সম্প্রীতি বিনষ্ট হয়।

৬। এরপর সাফল্যমন্ডিত মোমেনদের ৬ষ্ঠ গুণ সম্পর্কে জানানো হচ্ছে যে,

'তারা তাদের সকল নামাযের হেফাযতকারী হয়।'

তারা কখনো অলসতাবশত বা হেলায় ও খেলায় নামায পরিত্যাগ করে না– যেভাবে তাদেরকে নামায কায়েম করতে বলা হয়েছে সেই ভাবেই তারা নামায কায়েম করে। তারা কখনো পরিবার ও প্রতিবেশীদের মধ্যে নামায ও নামাযের পরিবেশ গড়ে তোলার ব্যাপারে পিছপা হয় না। তারা নিয়মিতভাবে নামাযের ফরয ও সুন্নাতসমূহ আদায় করে এবং সময় মতোই প্রত্যেক নামায আদায় করে– সঠিকভাবে তারা নামাযের সকল আহকাম ও আরকান আদায় করে এবং মন-প্রাণ ও অন্তরের আগ্রহ সহকারে তারা নামায আদায় করে, আদায় করে উচ্ছ্বসিত হৃদয়াবেগ সহকারে। প্রকৃতপক্ষে নামাযই হচ্ছে বান্দা ও তার মনিবের মাঝে সব থেকে বড় ও মযবুত সেতুবন্ধ বা যোগাযোগ রক্ষাকারী কাজ। নামাযই মোমেন অন্তরের বিশ্বাসের প্রথম ও বাস্তব প্রমাণ এবং নামাযই ঈমানের প্রথম বহিপ্রকাশ। জামায়াতবদ্ধ নামায জানায় যে সে মুসলিম জামায়াতের একজন নিয়মিত সদস্য, নামাযই মুসলিম জীবনে শৃংখলা সময়ানুবর্তিতা, নিয়মানুবর্তিতা, পরিচ্ছন্নতা, পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সহযোগিতার মনোভাব আনে। সুতরাং, যারা নামাযের হেফাযত করে না, তারা মানুষে মানুষে সম্পর্ক সৃষ্টির কোনো ধার ধারে না, তারা অন্তর প্রাণ দিয়ে নামাযের তাৎপর্য সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয় না। নামাযের গুরুত্ব যে কতো বেশী তা বুঝাতে গিয়ে স্বয়ং আল্লাহ রব্বুল আলামীন সাফল্যমন্ডিত মোমেনদের গুণাবলী বর্ণনায় শুরু করেছেন নামাযের গুণ

দ্বারা এবং শেষ করেছেন এর হেফাযত-এর কথায় যাতে করে একথা বুঝানো যায় যে, ঈমানের বুনিয়াদ গড়ে তোলায় নামাযের ভূমিকা কতো বড়ো এবং আনুগত্য প্রকাশ ও আল্লাহর দিকে একাগ্রতা প্রদর্শনে এই এবাদাতের অবদান কতো বেশী।

ওপরে বর্ণিত ছয়টি গুণ মোমেনদের সাফল্যের গ্যারান্টি হিসাবে আলোচ্য সূরাটি জানিয়েছে, বলেছে যাদের মধ্যে এ ছয়টি গুণ থাকবে তারা অবশ্যই সাফল্যমন্ডিত হবে। এ গুণগুলো মোমেন দল ও সমাজের অন্যান্য ব্যক্তিদের মধ্যে সমভাবে ক্রিয়াশীল ও প্রভাব সৃষ্টিকারী হবে। যেসব মানুষের মধ্যে উক্ত গুণাবলী গড়ে উঠবে তারা যেখানেই থাকুক না কেন এবং যে জনপদেই বসবাস করুক না কেন অন্যদের ওপর তাদের প্রভাব পড়বেই এবং তারা মর্যাদাবান মানুষ বলে বিবেচিত হবে, তারা বিবেচিত হবে আল্লাহর কৃপাধন্য মানুষ হিসাবে। প্রকৃতপক্ষে এসব গুণাবলীর অধিকারী মানুষদেরকে আল্লাহ তায়ালা পূর্ণত্ব দান করতে চেয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা চান না, তাঁর প্রিয়তম সৃষ্টি আশরাফুল মাখলূকাত জীব জানোয়ারের মত জীবন যাপন করুক, পশুরা যেভাবে আহার বিহার করে তারাও সেইভাবে আহার বিহার করুক এটাও আল্লাহ তায়ালা চান না।

যখন পৃথিবীতে গোটা মানব জাতির সবাই পশুত্বের স্তর পার হয়ে মানবতার পূর্ণ মর্যাদা লাভ করার চেষ্টা করছে তখন অন্তত যেসব মোমেনরা আল্লাহর পথে চলবে বলে অংগীকারাবদ্ধ, আল্লাহ তায়ালা চান, তারা মানবতার পূর্ণ বিকাশ সাধনে অগ্রণী ভূমিকা রাখুক, যার জন্যে তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাহলে তাদের জন্যে জান্নাতুল ফেরদাউস প্রস্তুত রয়েছে, যার ক্ষয় নেই, লয় নেই, যেখানে তারা চিরদিন থাকবে নিরাপদ নির্ভয়ে, স্থায়িত্বের নেই সীমা, নেই কোনো শেষ। এদের সম্পর্কেই এরশাদ হচ্ছে,

'তারাই হচ্ছে ফেরদাউসের উত্তরাধিকারী, তারা সেখানে চিরদিন থাকবে।'

সকল সাফল্যের শেষ লক্ষ্যই তো এই জান্নাত লাভ এবং মোমেনদের জন্যেই আল্লাহ তায়ালা এই মনোরম বাসস্থান নির্ধারণ করে রেখে দিয়েছেন। কোনো মানুষ এর বাইরে আর কিছুই আশা করে না।

মানবসৃষ্টির পর্যায়ক্রমিক অবস্থাসমূহ

মোমেনদের গুণাবলী বর্ণনা শেষে আলোচনার গতিধারা ফিরে যাচ্ছে মানব জীবনের মধ্যে ঈমানের বিভিন্ন প্রমাণাদি বর্ণনার দিকে, তার অস্তিত্ব ও উন্নতির উপায় নিরূপণের দিকে। অবশেষে আলোচনা এসেছে মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হয়ে যিন্দেগীতে পদার্পণ করতে হবে সে সম্পর্কে এবং এ উভয় জীবনের মধ্যে যে কি সম্পর্ক রয়েছে এবং কি ভাবে এ সম্পর্ককে নিবিড় করা যায় সে সম্পর্কে। এরশাদ হচ্ছে,

'অবশ্যই আমি মানুষকে মাটির নির্যাস থেকে সৃষ্টি করেছি, তারপর তাকে শুক্রবিন্দুতে পরিণত করে স্থাপন করেছি এক সংরক্ষিত আঁধারে......অতপর কেয়ামতের দিন তোমাদেরকে আবার জীবিত হয়ে উঠতে হবে। (আয়াত ১২-১৬)

প্রথমত, এভাবে সৃষ্টির সূত্রপাত হওয়ায় এবং পরবর্তীতে ওপরে বর্ণিত নিয়মে অবিরতভাবে সৃষ্টির কাজ চলতে থাকায়, সৃষ্টিকর্তা যে, আছেন এবং তাঁরই ইচ্ছায় যে এ সৃষ্টি কাজ বিরতিহীনভাবে চলছে তা পরিষ্কার বুঝা যায় এবং পরবর্তীতে চিন্তা করলে বুঝা যায় যে মানুষের চেষ্টা তদ্বীরের দ্বারা এ ধরনের কোনো কাজ সাধিত হয় না। সুতরাং, একথা চিন্তা করার কোনো সুযোগ নেই যে, এসব কিছু হঠাৎ করে পয়দা হয়ে গেছে অথবা খামখেয়ালী প্রকৃতির ইচ্ছায় এবং বিনা পরিকল্পনায় এলোমেলোভাবে ও কোনো নিয়ম শৃংখলা ছাড়াই এ সৃষ্টির কাজ চলছে। এর পেছনে কোনো উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা নেই। অথচ আমরা সৃষ্টি রাজ্যের মধ্যে তাকালে দেখতে পাই

সেখানে কোনো ত্রুটি নেই কোনো অনিয়ম নেই, আপনা থেকেই এমন ত্রুটিহীনভাবে সব কিছু চলছে এটা কোনো সুস্থ ও বিবেকবান ব্যক্তি কিভাবে মেনে নিতে পারে? সুতরাং, এ সত্য মেনে নেয়া ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না যে এ মহা সৃষ্টির পেছনে রয়েছে সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর ইচ্ছা ও সুপরিকল্পিত এক ব্যবস্থাপনা, যার অধীনে পরিপূর্ণ এক শৃংখলার মধ্যে এসব কিছু চলছে।

সার্বক্ষণিকভাবে সব কিছু এই একইভাবে চলতে থাকা যে কোনো সূক্ষ্মদর্শী মানুষের দৃষ্টিতে এ সত্য তুলে ধরবে যে এসব কিছুর স্রষ্টা একজনই এবং তাদেরকে আহ্বান জানাবে যেন সব কিছু থেকে মুখ ফিরিয়ে একমাত্র তাঁর দিকেই রুজু করা হয় এবং তাঁকেই সব কিছুর বিধানদাতা মেনে নিয়ে তাঁর হুকুম মত চলার জন্যে সবাই প্রস্তুত হয়ে যায়।

পূর্ব অধ্যায়ে বর্ণিত মোমেনদের এসব গুণাবলী ও তৎপরতাই বিশ্ব মানবতাকে পরিপূর্ণ বিকাশের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়, তাকে দুনিয়া আখেরাতে উভয় স্থানে সাফল্যমন্ডিত করে, আর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহই হচ্ছে সেই মূল বিষয় যা নিয়ে এই সূরায়ে মোমেনূনের দুটি অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। এরশাদ হচ্ছে,

'অবশ্যই আমি তাকে মাটির নির্যাস দ্বারা সৃষ্টি করেছি অর্থাৎ, আলোচ্য এ আয়াতটি মানুষের উন্নতি ও অগ্রগতির বিভিন্নমুখী সম্ভাবনা সম্পর্কে আভাস দিচ্ছে বিশেষ কোনো একটি গন্ডীর মধ্যে তাকে সীমাবদ্ধ করে দেয়া হয়নি এজন্যে মানুষের মধ্যে এসব সম্ভাবনা কতো বেশী তা কেউই নিরূপণ করতে পারে না, তার সাধ্যানুযায়ী সে চেষ্টা জারি রাখবে এবং যতো প্রকার পদ্ধতি সে প্রয়োগ করতে পারে সেই সকল পদ্ধতিতেই সে অনবরত চেষ্টা চালিয়ে যাবে। এর ফলে সে অবশ্যই তেমনি উপকৃত হবে যেমন করে কাদামাটি থেকে সে মানুষে রূপান্তরিত হয়েছিলো।

মানুষ জন্মের প্রথম উৎসই হচ্ছে এই কাদা মাটি, এটাই হচ্ছে মানব সৃষ্টির প্রথম অবস্থা, তারপর পূর্ণাংগ মানুষে পরিণত হওয়া এটাই তার ক্রমোন্নতির শেষ অবস্থা..........এই তথ্যটিই আমরা মহান আল্লাহর সন্দেহমুক্ত গ্রন্থ আল কোরআন থেকে জানতে পারি। মানব সৃষ্টির রহস্য জানার জন্যে মানুষের তৈরী কোনো বৈজ্ঞানিক জ্ঞান গবেষণায় আমরা বিশ্বাসী নই, আমরা এ বিষয়ে কারো কাছে বাড়তি কিছু জানতেও চাই না। জীব জন্তু পয়দা হলো কিভাবে সে বিষয়েও মানুষের জ্ঞান-গবেষণা আমরা মানি না, আল্লাহর প্রেরিত রসূলদেরকে আমরা সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রতিনিধি বলে বুঝেছি এবং মেনেও নিয়েছি।

অবশ্যই আল কোরআন উপরোক্ত বিষয়টিকে আমাদের কাছে সুস্পষ্ট করে দিয়েছে, যাতে করে আল্লাহর সৃষ্টি সম্পর্কে জ্ঞান গবেষণা করার জন্যে আমাদের সামনে সুনির্দিষ্ট পথ উন্মুক্ত হয়ে যায় এবং সে কাদা মাটি থেকে মানব সৃষ্টির এই জটিল ধারা কিভাবে এগিয়ে গেলো তার পর্যায়ক্রমিক রহস্য উদঘাটনে আমরা সক্ষম হই এবং এর বাইরে আরো বিস্তারিতভাবে জানার জন্যে অন্য কোনো পদ্ধতি নিয়ে আমরা যেন মাথা না ঘামাই, কেননা তাতে সৃষ্টির আরো বড় সত্যসমূহকে জানার পথে আমরা কোনো সহযোগিতা পাবো না।

এখন দেখুন, এই উর্বর মস্তিষ্ক মানুষ প্রদত্ত বৈজ্ঞানিক মতবাদ মানব সৃষ্টি ও তার অগ্রগতি সম্পর্কে আল্লাহর দেয়া তথ্য মানার পথে এক বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ সে মতবাদ একথাকে নাকচ করছে যে মানুষকে কাদা থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। এ সত্যকে অস্বীকার করার কারণে মানুষ নানা প্রকার ভুলের মধ্যে পড়ে যাচ্ছে এবং এর ফলে তারা ক্ষতিগ্রস্তই হচ্ছে। আল কোরআন সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কে এর থেকে আর বেশী কিছু জানায়নি, সুতরাং আল কোরআনের বর্ণনার ওপর অন্য

কারো মত শুনতে ও মানতে গিয়ে আমরা আল্লাহর কেতাব প্রদত্ত চেতনা বিপর্যস্ত করতে চাইনে......কাদা মাটি থেকে মানুষের কায়ায় আসা, তার মধ্যে রূহকে প্রবিষ্ট করানো, তার মধ্যে রক্ত মাংস ও বীর্য সৃষ্টি এবং এক বিশেষ প্রক্রিয়ায় মাতৃ জরায়ুতে সে বীর্যের দ্বারা নতুন প্রজন্মের উৎপত্তি– এসব কার পরিকল্পনা ও পরিচালনায় সম্ভব হয়েছে? এসব বৈজ্ঞানিক জ্ঞান-গবেষণা সব ব্যর্থ হয়ে যেতো যদি না আল্লাহর কেতাব থেকে গৃহীত তথ্যের সাহায্য না নেয়া হতো! এটা সুনিশ্চিত বিদগ্ধ চিত্তের অধিকারী মানুষের কাছে আল্লাহর কেতাব প্রদত্ত তথ্য বহির্ভূত আজকের মানুষের জ্ঞান গবেষণার দাবী সব হেঁয়ালী বলে মনে হবে। তথ্যানুসন্ধানের মাল মশলা ও পদ্ধতিসমূহ মানুষের হাতে যা আছে তা এতোই সীমাবদ্ধ যে তার অনুসরণে যখন মানুষ পথ চলতে চায় তখন সে এমন এক প্রহেলিকার জালে আবদ্ধ হয়ে যায় যা ছিন্ন করে সত্য পথ প্রাপ্তি তার জন্যে সুকঠিন হয়ে পড়ে।

আল কোরআন এসব সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কে বিভিন্ন স্থানে সংক্ষেপে এভাবে বলেছে,.... তিনি মানব সৃষ্টির প্রক্রিয়া শুরু করেছেন কাদামাটি দ্বারা .... এরপর যে পর্যায়ক্রমিক ধারায় এ সৃষ্টি পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছে তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা তো দূরের কথা, কোনো ইংগিতও দেয়া হয়নি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোরআনে বর্ণিত সকল কথার সার সংক্ষেপ যা জানা গেছে তা হচ্ছে মানব সৃষ্টি বাস্তবে এসেছে কাদা মাটির সারাংশ বা নির্যাস থেকে অতপর দেখা যাচ্ছে আয়াতের শেষাংশটি, মানব সৃষ্টির পর্যায়ক্রমিক অবস্থাসমূহকে এক বিশেষ কারণে এখানে অতি সংক্ষেপে ব্যক্ত করেছে।

মাটি থেকে পর্যায়ক্রমে পূর্ণাংগ মানুষ কেমন করে অস্তিত্বে এলো, সে বিষয়ে আল কোরআন একেবারেই নিশ্চুপ, যা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি– এর কারণ হচ্ছে এ বিষয়ের জ্ঞান দান করা আল কোরআনের কোনো মূল লক্ষ্য নয়। এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিক প্রবক্তারা পরস্পর বিরোধী অনেক কথা বলেছে। এক একজন এক এক কথা বলেছে, যেহেতু বাস্তব জীবনে এর কোনো প্রয়োজন নেই, নেই এর সত্যিকারের কোনো প্রয়োগ– এজন্যে পর্যায়ক্রমে যে যতো কথাই বলেছে তা প্রায় সবই মানুষের স্মৃতিপট থেকে মুছে গেছে, এভাবে কতো কথাই মানুষ ভেবেছে বলেছে সে সবই এক এক করে মানুষ ভুলেও গেছে। পরবর্তীকালে কেউ ওগুলো জানতেও পারেনি। আরো হয়তো অন্যান্য আরো বহু কারণ আছে, যার জন্যে ওসব নিয়ে আর কেউ কোনো ঘাটাঘাটিও করেনি, কিন্তু এ বিষয়ে আল কোরআনের অনুসৃত পদ্ধতি ও মানব বুদ্ধি সঞ্চিত মতবাদের মধ্যে যে বিশেষ পার্থক্যটি পরিলক্ষিত হয় তা হচ্ছে আল কোরআন মানুষকে সম্মান দিয়েছে, দিয়েছে পরস্পরের মধ্যে মর্যাদাবোধ, আর জানিয়েছে যে, এই মানুষের কায়ার মধ্যে আল্লাহর সৃষ্ট রূহ (আত্মা বা প্রাণ শক্তি) থেকে কিঞ্চিৎ ফুঁকে দিয়ে প্রবিষ্ট করানো হয়েছে, যা মাটির নির্যাস থেকে তৈরী সে দেহটিকে বানিয়েছে জীবন্ত ও গতিশীল মানুষ এবং তাকে সেই সব বৈশিষ্ট্য দান করেছে যার কারণে সে হয়েছে বৈশিষ্ট্য মন্ডিত একটি মানুষ। পশু থেকে তার সুস্পষ্ট পার্থক্যও নির্ণীত হয়েছে আর এই পর্যায়ে এসে দেখা যায় ইসলামী চিন্তাধারা থেকে বস্তুবাদী মানুষের মতবাদ সম্পূর্ণ পৃথক। যে যাই বলুক না কেন, আল্লাহর কথাই হচ্ছে সঠিক ও সত্য।(৪)

এইই হচ্ছে মানব জাতির সৃষ্টির মূল উপাদান ...... কাদা মাটির নির্যাস ...... এরপর এই মানব সন্তানদের সৃষ্টি ও বৃদ্ধি শুরু হলো অন্য আর এক পদ্ধতিতে যা আজ সর্বজন বিদিত, যা প্রকাশ করতে গিয়ে আল কোরআন বলছে,

---

(৪) মোহাম্মদ কুতুব রচিত ' আল ইনসানু বায়নাল মাদ্দিয়াতে ওয়াল ইসলাম' দ্রষ্টব্য।

'তারপর আমি (শুক্রবিন্দুর আকারে) তাকে এক সুরক্ষিত স্থানে স্থাপন করেছি'....... অর্থাৎ অবশ্য সে পয়দা হয়েছে কাদা-মাটির নির্যাস থেকে। এরপর মানব সন্তানদের আগমন ধারা শুরু হলো ও তাদের বংশ বৃদ্ধির কাজ চলতে থাকলো আল্লাহ রব্বুল আলামীনের এক অমোঘ নিয়মে, আর তা হচ্ছে, নরদেহের পিঠ থেকে নির্গত এক জাতীয় পদার্থ কোনো নারীর বাচ্চাদানীর মধ্যে স্থান লাভ করে ....এখনে উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে........ একটিমাত্র পানি জাতীয় পদার্থের ফোটা, না বহু ফোটা প্রকৃত সত্য কথা হচ্ছে, বাচ্চাদানিতে শেষ পর্যন্ত শুক্রবিন্দুর মধ্যে অবস্থিত অদৃশ্য হাজার হাজার শুক্রকীট– এর মধ্য থেকে একটি মাত্র কীট। সেই স্থানের বর্ণনায় এরশাদ হয়েছে, একটি সুরক্ষিত স্থান, অর্থাৎ জরায়ুর দুই পাশের অস্থি দুটির মধ্যবর্তী কোটরগত স্থানের গভীরে, যে স্থানটি শরীরের ঝাঁকির ক্ষতি থেকে রেহাই পায়, রেহাই পায় সকল প্রকার আঘাত ও ক্ষত থেকে এবং সকল প্রকার কম্পন ও ধাক্কা থেকে!

আল কোরআনের ব্যাখ্যায় জানা যায় যে এই বিন্দুটি মানব সৃষ্টির স্তরসমূহের মধ্যে একটি স্তর, যা মানুষের অস্তিত্বের মধ্য থেকে আর একটি অস্তিত্বের আগমনের জন্যে বানানো হয়েছে, এটাই এক বাস্তব সত্য, কিন্তু এ সত্যকে বুঝতে হলে বেশ কিছু চিন্তা ভাবনার প্রয়োজন রয়েছে। পূর্ণাংগ এই মানুষটির মধ্যে যতো প্রকার গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, তা সবই বিদ্যমান থাকে সে ক্ষুদ্র শুক্রবিন্দুর মধ্যে। এভাবেই যখন শুক্রবিন্দু ভ্রূণে পরিণত হয় তখন তার মধ্যে সেসব বৈশিষ্ট্যকে আবারও নতুন করে ফিরিয়ে দেয়া হয়। আবার এই বৈশিষ্ট্যগুলোকেই অত্যন্ত বিস্ময়করভাবে ফিরিয়ে দেয়া হবে যখন এই মানুষটি পূর্ণাংগ বয়সপ্রাপ্ত হবে।

এই শুক্রবিন্দু মাতৃ ডিম কোষের সাথে মিলিত হয়ে রক্ত পিন্ডতে পরিণত হয়ে প্রথম দিকে বাচ্চাদানীর গায়ের সাথে একটি ক্ষুদ্র বিন্দু আকারে লেগে থাকে এবং মাতৃ শরীর থেকে রক্ত আকারে তার খাদ্য পেতে থাকে।

আবার এই ক্ষুদ্র বিন্দু একটু বড় হয়ে রক্ত পিন্ডের রূপ নেয়, এরপর এটি পরিণত হয় একটি মাংস পিন্ডে, তারপর এটা মিশ্রিত ঘন রক্ত পিন্ডে রূপান্তরিত হয়।

এভাবে ওপরে বর্ণিত শুক্র কীটটি একটি মানব শিশু আকারে পরিণত হয়ে মাতৃ গর্ভে নীরবে বড় হতে থাকে এবং প্রথম প্রথম এর রূপান্তর গ্রহণ করার অবস্থায় সে ভ্রূণটির কোনো নড়া-চড়া অনুভূত হয় না, এবং নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হওয়ার পর যখন এই ভ্রূণের নড়াচড়ার সময় এসে যায় তখন তা একটা নির্দিষ্ট গতিতে নড়াচড়া করতে কিন্তু একটুও কসুর করে না। এসময় এ শুক্রকীটের মধ্যে নিহিত শক্তি ধীরে ধীরে তকদীর ও তদ্বীর এর ভাগ্য লিখন নিয়ে বর্ধিত হতে হতে হাড় পরার স্তরে এসে পৌঁছে যায়। সে অবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে আল কোরআন জানাচ্ছে, '

'তারপর আমি এই পিন্ডকে অস্থিপাজরে পরিণত করি'

অর্থাৎ, এইটিই হচ্ছে হাড্ডিকে গোশত দ্বারা পরিধান করানোর স্তর। এজন্যে বলা হচ্ছে, আমি হাড্ডিকে গোশতের পোষাক পরাই' এখানে এসে মানুষের বুদ্ধি আর কাজ করতে চায় না, সে রহস্যের কথা চিন্তা করে যে কেমন করে সে প্রলম্বিত ভ্রূণ এক অজানা পদ্ধতিতে এগিয়ে যায় এবং এক অভিনব উপায়ে মানব শিশুতে পরিণত হয়। এ অবস্থায় পৌঁছুতে কতো যে সংকটপূর্ণ স্তর পার হতে হয় তা মানুষ বাচ্চা পয়দা না হওয়া পর্যন্ত বুঝতে পারে না, বুঝতে পারে না যে

গোশতের কোষের মধ্যে হাড্ডি কিভাবে সৃষ্টি হয়। ইতিমধ্যে একথা তো জানা গেছে যে, ভ্রূণের মধ্যে হাড্ডির কোষগুলো আগে সৃষ্টি হয়, আর হাড্ডির কোষগুলো প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত একটি গোশত কোষও পরিলক্ষিত হয় না। তারপর ভ্রূণের এই পূর্ণাংগ অবস্থা প্রাপ্তির জন্যে হাড্ডির কাঠামো পূর্ণতা প্রাপ্ত হতে হবে, এইটিই সেই গুঢ় রহস্য- আল কোরআন যার দার উদঘাটন করেছে। জানানো হচ্ছে, 'অতপর, আমি গোশত পিন্ডকে অস্থিপাজরে পরিণত করলাম তারপর হাড্ডিকে গোশতের পোষাক পরালাম ......।

'তারপর তাকে আমি আর একটি সৃষ্টিতে পরিণত করলাম।' অর্থাৎ অবশেষে এসব বৈশিষ্ট্যমন্ডিত মানুষ হয়ে সময়ান্তরে সে গড়ে উঠলো। মাতৃগর্ভে যখন বাচ্চা ভ্রূণ আকারে থাকে তখন তার শারীরিক কাঠামো জীব জানোয়ারের ভ্রূণের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ থাকে, কিন্তু যখন সে ভূমিষ্ট হয় তখন সে 'নতুন এক সৃষ্টিতে' পরিণত হয়। তারপর যখন ক্রমান্বয়ে এ বাচ্চা বেড়ে ওঠে তখন ধীরে ধীরে তার বৈশিষ্ট্যসমূহ প্রকাশ পেতে থাকে, পশুর ভ্রূণটি আত্মপ্রকাশ করে পশু হিসাবে, তার মধ্যে এসব বৈশিষ্ট্য গড়ে ওঠে না, যা একটি মানব শিশুর মধ্যে ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে।

মানব শিশুর ভ্রূণ বিশেষ বিশেষ কিছু গুণ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হতে থাকে এবং যখন সে যৌবনে পদার্পণ করে তখন তার গুণাবলী পূর্ণত্ব লাভ করে এবং তখনই দেখা যায় আল্লাহর কথার বাস্তবতা। এরশাদ হচ্ছে,

'অতপর আমি তাকে আর এক সৃষ্টিতে পরিণত করি।'

অর্থাৎ, ভ্রূণ থাকা অবস্থায় তার যে আকার আকৃতি ছিলো তার থেকে সে ভিন্ন আকৃতি গ্রহণ করে। অপরদিকে পশুর ভ্রূণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়ে পশুই থেকে যায়, তার মধ্যে মানব শিশুর মতো বৈশিষ্ট্যসমূহ সৃষ্টি হয় না। একারণে পশু পশুই থেকে যায় এবং পশুর আকৃতি প্রকৃতির উর্ধে সে উঠতে পারে না, কিন্তু হাসির ব্যাপার হচ্ছে আত্মগর্বী, উগ্রমস্তিষ্ক, বস্তুবাদী ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞান সমৃদ্ধ (?) কিছু মানুষ মনে করে যে পশু (বানর) ধীরে ধীরে রূপান্তরিত হয়ে মানুষে পরিণত হয়েছে। বসতে বসতে তার লেজ খসে পড়েছে, অথচ এসব পাগলরা একটুও হিসাব করে না যে বানর শিশু যখন ভূমিষ্ট হয় তখন দুনিয়ার সকল বানর লেজ বিশিষ্ট হয়, কিন্তু কোনোকালে কোনো মানব শিশুই লেজ বিশিষ্ট হয়নি। তারপর রয়েছে স্বভাব প্রকৃতি, মানব শিশুর ও বানরের স্বভাব প্রকৃতির মধ্যে পার্থক্য চিরদিন একই প্রকার থেকেছে। এভাবে ভ্রূণ থাকাকালে পশু ও মানব ভ্রূণগুলো আকৃতিতে একই প্রকার হলেও ভূমিষ্ট হওয়ার সময় মানব শিশু 'ভিন্ন আর এক সৃষ্টিতে' পরিণত হয় এবং এরপর যতোই বাড়তে থাকে ততোই তার মধ্যে মানব শিশুর সকল গুণ বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠতে থাকে এবং তার মধ্যে নানা প্রকার যোগ্যতার বিকাশ। তখন সে পরিণত হয় 'নতুন আর এক সৃষ্টিতে'। অবশ্য এটা ঠিক যে, প্রাণী হওয়ার কারণে মানুষ ও পশুর মধ্যে অনেক দিক দিয়েই সাদৃশ্য রয়েছে; এতদসত্তেও এ দুই শ্রেণীর জীবের মধ্যে পার্থক্যসমূহও খুবই স্পষ্ট, যার কারণে মানুষ মানুষই হয় এবং পশু পশুর স্তর থেকে উন্নীত হয়ে কখনো মানুষের স্তরে পৌঁছুতে পারে না। এসব মানব সুলভ গুণ বৈশিষ্ট্য নিয়ে মানবতা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। এসব গুণ বৈশিষ্ট্য আল্লাহরই। এখানে আমাদের ভালো করে বুঝে নিতে হবে, যান্ত্রিক সভ্যতা গড়ে তোলার ক্ষমতা শুধু মানব

জাতি পেলেও আল্লাহ তায়ালা মানব জাতিকে যন্ত্র দানব বানাননি এবং যান্ত্রিক সভ্যতার উন্নতি সাধনই তার জীবনের মূখ্য বিষয় নয়, বরং নৈতিকতা ও সেসব নৈতিক দায়িত্ববোধ সৃষ্টি করাই এর আসল কথা, যার দ্বারা পশু ও মানুষের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।(৫) এরশাদ হচ্ছে,

'মহা পবিত্র ও কল্যাণময় আল্লাহ যিনি সর্বোৎকৃষ্ট সৃষ্টিকর্তা'।

একথা সর্ববাদী স্বীকৃত সত্য যে আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত সৃষ্টিকর্তা আর কেউ নেই। এমতাবস্থায় 'সর্বোৎকৃষ্ট' বলতে বুঝায় সকল কিছুকে সুন্দরভাবে সৃষ্টিকারী, এখানে অন্যদের তুলনায় তিনি ভালো সৃষ্টিকারী একথা বুঝানো হয়নি। আবারও খেয়াল করুন, 'আল্লাহ তায়ালা কতো উত্তম সৃষ্টিকর্তা!' অর্থাৎ যিনি মানব প্রকৃতির মধ্যে সেসব ক্ষমতা ও যোগ্যতা দিয়েছেন যা ব্যবহার করে সে উন্নতির এই পর্যায়ে পৌঁছেছে এবং তার এসব যোগ্যতা গড়ে উঠেছে। এমন এক অমোঘ নিয়ম অনুসারে এসব যোগ্যতা গড়ে উঠেছে যার কোনো দিন কোনো পরিবর্তন হয় না, যা মুছে যায় না এবং যে নিয়মের বিপরীতও কোনো নিয়ম কোনো দিন আসে না। তাতেই তো মানুষ তার উন্নতি ও অগ্রগতির এই পরিপূর্ণ স্তরে পৌঁছুতে পেরেছে এবং মানব জীবনের জন্যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যবস্থাপনা সে গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে!

মানুষ যখন বিজ্ঞানের উৎকর্ষ ও আশ্চর্যজনক আবিষ্কারগুলোর দিকে তাকায় তখন সে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায়, অর্থাৎ যখন মানুষ দেখে যে সে নিজ হাতে সরাসরি কাজ না করে মেশিনের সাহায্যে দ্রুতগতিতে এবং বিস্ময়কর ও নিপুণতার সাথে বহু কঠিন কাজ করতে থাকে তখন আসলেই তার বিস্ময়ের সীমা থাকে না। এখন চিন্তা করার বিষয় হচ্ছে ভ্রূণের মধ্যে এই পরিবর্তন ও বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করার এই শক্তি ও যোগ্যতা কোত্থেকে এলো? এক অবস্থা থেকে যখন আর এক অবস্থা আসে তখন যে বিরাট পরিবর্তন দেখা যায়, তার দিকে খেয়াল করলে পূর্ববর্তী অবস্থা থেকে তার বিরাট পার্থক্য মানুষকে দারুণভাবে বিস্মিত করে, প্রশ্ন জাগে, কোত্থেকে এলো এসব পরিবর্তন? কার ইচ্ছায় এ রূপান্তর ঘটলো এবং কেনই বা পর্যায়ক্রমে এসব অবস্থার সৃষ্টি হলো। কিন্তু অত্যাশ্চার্য এসব দৃশ্যের পাশ দিয়ে মানুষ এমনভাবে চোখ বন্ধ করে চলে যায় এবং এগুলো বুঝা থেকে তারা তাদের অন্তরের দরজাগুলোকে এমনভাবে বন্ধ করে নেয় যে এসব রহস্য তাদের কাছে তিমিরেই থেকে যায়। এর কারণ চিন্তা করতে গেলে বুঝা যায় যে, পৃথিবীর সুখ সম্পদ বেশী বেশী ভোগের আশা তাদেরকে এসব অদ্ভুত ও বিস্ময়কর রহস্য উদ্ঘাটন করার কথা ভুলিয়ে দেয় .... এখানে একটি কথা বুঝতে হবে যে এই রূপান্তর, ভাবান্তর এবং প্রকৃতির পরিবর্তন সব কিছুর পেছনে রয়েছে এক এমন মানুষ গড়ার উদ্দেশ্য যা সৃষ্টির বুকে তার অনন্য ভূমিকা রাখবে। সে মানুষ এক জটিল ও অত্যাশ্চার্য সৃষ্টি যার প্রকৃতির দিকে তাকালে দেখা

(৫) মানুষের সৃষ্টি ও অগ্রগতির বর্তমান মতবাদটি গড়ে উঠেছে পরস্পর বিরোধী মূলনীতির ভিত্তিতে, কারণ এই মতবাদের প্রবক্তারা বলতে চায় যে, অন্য জীব জন্তুর উন্নতির মতোই মানুষের অগ্রগতি হয় এবং তারা ধারণা করে যে পশু উন্নতি করতে করতে মানুষে পরিণত হয়েছে, কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতা মানুষ ও পশুর সম্পর্ককে অবাস্তব ও অসম্ভব বলে প্রমাণ করেছে এবং এ কারণেই এটা একটা প্রাচীন ও পরিত্যক্ত মতবাদে পরিণত হয়েছে। আজ সবার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে অন্য কোনো পশুই মানব জাতির বৈশিষ্টসমূহের অধিকারী হয়নি। তারা সর্বদাই পশুত্বের স্বভাব প্রকৃতি নিয়েই এখানে বর্তমান রয়েছে। ডারউইন ও অন্য আরো অনেকে যে মত প্রকাশ করেছে তা আজ সম্পূর্ণভাবে ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে। মানুষ তার সুনির্দিষ্ট গুণ বৈশিষ্টসমূহ নিয়ে মানবতা বিকাশ ও অগ্রগতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এবং নিজস্ব বৈশিষ্টের কারণে সে মানুষ বলে সর্বকালে পরিচিত হয়ে এসেছে এবং এখনও সে মানুষ বলেই পরিচিত হচ্ছে। এটা যান্ত্রিক উন্নতির ফসল নয়, বরং মানুষের নৈতিক ও অন্যান্য উন্নতির পেছনে বাইরের কোনো শক্তির অবদান সুস্পষ্ট।—সম্পাদক

যাবে তার জীবনের প্রতিটি স্তর বিস্ময়ে ভরা। তার এ ছোট্ট দেহের মধ্যে অফুরন্ত ও অকল্পনীয় এক বিরাট সম্ভাবনার বীজ লুকিয়ে রয়েছে যা উপযুক্ত পরিবেশ ও পরিচর্যা পেলে এমন বিস্ময়কর অবদান রাখতে পারে, যা পূর্ব থেকে ধারণাও করা যায় না। তার সম্ভাবনাসমূহের সঠিক বিকাশের জন্যে প্রয়োজন সে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম শুক্রকীটের পর্যায়ক্রমিক পরিবর্তন। এতোই ক্ষুদ্র সে শুক্রকীট যা খালি চোখে দৃষ্টিগোচর হয় না, তার মধ্যেই পর্যায়ক্রমিক সেসব সম্ভাবনা লুকিয়ে থাকে। এভাবে ধাপে ধাপে তার অগ্রগতি ও তার প্রকৃতির রূপান্তর হয়। এভাবেই সে এক পর্যায় থেকে অন্য পর্যায় পৌঁছে গিয়ে সে পরিণত হয় অভিনব 'আর এক সৃষ্টিতে'। জড় পদার্থ বলে যাকে আমরা বুঝতাম, পর্যায়ক্রমে তা কথা বলতে শুরু করে। এরপর দেখা যায় সব শিশুও এক প্রকার হয় না। এক এক শিশু নিজ নিজ স্বতন্ত্র কিছু গুণ বৈশিষ্ট্য নিয়ে এগুতে থাকে এবং এদের মধ্যে থেকে অনেক মনীষী বেরিয়ে আসে যারা মানুষকে অনাগত উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়, যাদের জ্ঞান গবেষণায়, যাদের উৎকর্ষ সাধনে এবং যাদের সফলতা ও সত্য পথ পরিক্রমায় মানব জীবনে অভূতপূর্ব পরিবর্তন আসে।

মানব জীবনের দ্বিতীয় পর্যায়

এরপর মানব জীবন পথপরিক্রমা নানা প্রকার অবস্থার মধ্য দিয়ে পরিসমাপ্তির দিকে এগিয়ে চলেছে। যে জীবনের সূত্রপাত মাটি থেকে হয়েছিলো তা মাটির বুকে বিলীন হয়ে একেবারে শেষ হয়ে যায় না, কারণ তার শরীরের মধ্যে মাটি ছাড়া আর একটি উপাদান আছে যা মাটিতে মিশতে পারে না, আর তা হচ্ছে সেই 'রূহ' যা মহান আল্লাহর কাছে থেকে এসেছে, এজন্যে সে রূহ আল্লাহর কাছেই ফিরে যায়। এ রূহকে এক বিশেষ উদ্দেশ্যে পয়দা করা হয়েছে যা দৈহিক কাঠামো থেকে ভিন্নতর, আর এজন্যে গোশত ও রক্তের পরিণতি থেকে তার পরিণতি আলাদা হয়ে থাকে। আল্লাহর কাছ থেকে আগত রূহ আল্লাহর কাছেই ফিরে যায় এবং সেখানেই শুরু হয় তার দ্বিতীয় জীবন।

এরশাদ হচ্ছে, 'এরপর তোমরা হয়ে যাবে মৃত এবং অবশেষে কেয়ামতের দিনে তোমাদেরকে পুনরায় তোলা হবে।'

অর্থাৎ, পৃথিবীর জীবন শেষে (দ্বিতীয় জীবনের শুরুতে) এই মৃত্যু আসবে। আর এই দুই জীবন দুনিয়া এবং আখেরাতের মাঝখানের এই সময়টির নাম হচ্ছে বরযখ, মানুষের জীবন পরিসমাপ্তকারী স্তর নয়, বরং এটা হচ্ছে তার জীবনের স্তরসমূহের মধ্যে একটি বিশেষ স্তর।

তারপর আসবে শেষ স্তর এবং এটা শুরু হবে সেই দিন থেকে যেদিন তাকে পুনরায় এ ধরার বুক থেকে উঠানো হবে। প্রকৃতপক্ষে এসময় থেকেই শুরু হবে তার পূর্ণাংগ জীবনের আসল অধ্যায়, যা পাপ পংকিলময় পার্থিব জীবনের আবিলতা থেকে ভিন্ন হবে অথবা গোশত ও রক্তের চাহিদাসমূহ থেকে পবিত্র হবে, ভয় ও পেরেশানী থেকে, যে কোনো পরিবর্তন ও পরিবর্ধন থেকে মুক্ত হবে, কারণ এ অধ্যায়টি হচ্ছে মানব জীবনের জন্যে পূর্ব নির্ধারিত চূড়ান্ত অধ্যায়। তার যে পথ চলার বর্ণনা সূরাটির প্রথম অধ্যায়ে শুরু হয়েছিলো এখানে এসে তার জীবন সফরের পরিসমাপ্তি ঘটে। এটাই হচ্ছে মোমেনদের পথ, কিন্তু পার্থিব জীবনে যে ব্যক্তি নিজেকে পশুত্বের স্তরে নামিয়ে দিয়ে এ পথকে কন্টকাকীর্ণ করে এবং প্রথম জীবনের পরিসমাপ্তিতে আখেরাতের জীবনকে চরম বিপর্যস্ত করে ফেলে। প্রকৃতপক্ষে সে অবস্থায় সে মানবতার প্রাসাদকে ভেংগে চুরমার করে দেয় এবং নিজের জন্যে জাহান্নামের আগুনকে হালাল করে নিয়ে আগুনের ইন্ধনে পরিণত হয়। সেদিনে জাহান্নামের জ্বালানী হবে পাথর ও মানুষ। একারণেই পাথর ও পাপাচারী মানুষ উভয়ে সে দিনই একই সমান হয়ে যাবে।

প্রকৃতির মাঝে বিরাজমান আল্লাহর কিছু অকাট্য নিদর্শন

আবার দেখুন, ঈমানের প্রমাণাদি মানুষের নিজেদের মধ্যে যেমন বিরাজ করছে, তেমনি দিগন্ত ব্যাপী প্রকৃতির বুকে ছড়িয়ে থাকা সকল বস্তু ও বিষয়াদির মধ্যেও তা পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে, যা মানুষ প্রতিদিন দেখছে ও বুঝছে, কিন্তু তারা এসবের পাশ দিয়ে অবহেলা করে চলে যাচ্ছে। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'অবশ্যই আমি, তোমাদের ওপর সাতটি পথকে সৃষ্টি করেছি .... এর ওপর তোমরা (চলা-ফেরা কর) আর নৌযানগুলোতেও তোমরা আরোহণ করো।' (আয়াত ১৭-২২)

আলোচ্য প্রসংগে ঈমান আনার জন্যে প্রয়োজনীয় প্রমাণাদি হাযির করা হয়েছে এবং সমগ্র আলোচনার মধ্যে আল্লাহর অস্তিত্বের লক্ষণসমূহ, তাঁর রহমতের চিহ্নসমূহ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তাঁর শক্তি ক্ষমতার নিদর্শনের বর্ণনা সূরাটিকে মহীয়ান করেছে। এখানে আরো উল্লেখিত হয়েছে মানুষের চেষ্টা তদ্বীরের তাৎপর্য এবং চেষ্টা তদ্বীর ও তাকদীরকে সমন্বিত করা হয়েছে, তাকদীরের কার্যক্রম ও লক্ষ্যকে নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে যে সকল কিছু আল্লাহ রব্বুল আলামীনের দেয়া একই নিয়মে বাঁধা এবং সৃষ্টির সব কিছু তাদের গতি প্রকৃতি ও কার্য নির্বাহ কালে একটি আর একটির সহযোগিতায় নিয়োজিত একথা জানানো হয়েছে, সব কিছু দিবা-নিশি সৃষ্টির সেরা এই মানুষেরই জন্যেই কাজ করে চলেছে যাকে স্বয়ং সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালা মর্যাদাবান বানিয়েছেন।

এখানে এ সূরাটির বর্ণনার মধ্যে আরেকটি কথা খেয়াল করুন, দেখবেন প্রাকৃতিক এসব দৃশ্যাবলী ও মানব জীবনের উন্নতি ও অগ্রগতির মধ্যে চমৎকার সমন্বয় ও পারস্পরিক অবিচ্ছেদ্য বন্ধন রয়েছে।

এরশাদ হচ্ছে,

'তোমাদের ওপর আমি সাতটি পথ সৃষ্টি করেছি এবং মোটেই আমি (সৃষ্টির) কোনো কিছু থেকে গাফেল নই।'

ওপরের আয়াতটিতে উল্লেখিত পথসমূহ বলতে বিভিন্ন স্তর বুঝায় যা একটি আর একটির ওপর অবস্থিত অথবা একটি আর একটির উর্ধে একটি আর একটি থেকে অনেক অনেক দূরে একথা দ্বারা উর্ধাকাশে অবস্থিত সাতটি ছায়াপথ বা কক্ষপথও বুঝানো হতে পারে, অথবা হতে পারে সাত তারকারাজির সমষ্টি, যেমন রয়েছে সাতটি সৌরমন্ডল, অথবা সাতটি ছায়াপথের সমাহার, এই ধরনের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে জ্যোতির্বিদরা বলেন, এসব হচ্ছে তারকারাজির সমষ্টি। যে যাই বলুক না কেন, সংক্ষিপ্ত কথা হচ্ছে, মানবমন্ডলী যে পৃথিবীতে বাস করে তার ওপরে সৃষ্ট সাতটি আকাশ, অর্থাৎ উর্ধাকাশে রয়েছে সাতটি স্তর, যার রহস্য ভেদ করা কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। মানুষ এ পর্যন্ত জ্ঞান গবেষণা করে যা জানতে পেরেছে তা নিশ্চিত কিছু নয়, অনেকটা আন্দায অনুমান করেই এসব হিসাব নিকাশ করা হয়েছে। তবে যে জিনিসটি আমরা আমাদের চর্ম চোখে দেখতে পাচ্ছি তা হচ্ছে, এসব কিছু মহা শক্তিশালী এক নিয়ামকের হাতে সুরক্ষিত ও নিয়ন্ত্রিত রয়েছে। একথাটাই বর্ণিত হয়েছে কোরআনের আয়াতে,

আমি এ বিশাল সৃষ্টির কোনো কিছু থেকেই বে-খবর নই'

এর কোনোটি সম্পর্কে এবং কোনো অবস্থার ব্যাপারে আমার অজানা কোনো কিছুই নেই আরো এরশাদ হচ্ছে,

'আমি আকাশ থেকে নির্দিষ্ট পরিমাপ মতো পানি পাঠিয়েছি অতপর তার দ্বারা আমি পৃথিবীকে সিঞ্চিত করেছি আর এই পানিকে ফিরিয়ে নেয়ার ব্যাপারেও আমি সম্পূর্ণ সক্ষম।'.......

দেখা যায়, এভাবে পৃথিবীকে সে সাতটি (ছায়া) পথের সাথে সংযুক্ত করে দেয়া হয়েছে। অতপর আরো খেয়াল করুন, এই বৃষ্টিধারার সাথে মহাকাশ ও তার স্তরগুলো যুক্ত রয়েছে, কারণ

সে বৃষ্টিধারা ছাড়া পৃথিবীতে জীবন একেবারেই অসম্ভব। এতে বুঝা যায় যে, সৃষ্টির সব কিছুকে পরস্পর এক অদেখা ও অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখা হয়েছে, একটি আর এর একটির ওপর নির্ভরশীল। আকাশের যোগ ছাড়া এ ধরণীর জীবন কল্পনা করা যায় না এবং এ পৃথিবীবাসী বাঁচতেও পারে না।

এ ব্যাপারে সাধারণভাবে যে মতবাদ চালু রয়েছে তা হচ্ছে, এই যে পৃথিবীর পেটের মধ্যে যে পানি মজুদ রয়েছে তা ওপরের সেই পানির সাথে সংযুক্ত রয়েছে– যা আবার পরে আকাশ থেকে বর্ষিত হয়। এই উভয়ের পানির সম্মিলনে পৃথিবীর যাবতীয় প্রাণীর প্রয়োজন পূরণ হয়। এটা যতোটুকু সত্য তা নীচের আলোচনা থেকে বুঝা যাবে। বলা হয়েছে,

'আমি, আকাশ থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণে পানি বর্ষণ করিয়েছি'

এ বর্ষণ সম্পূর্ণ পরিসীমিত ও হিসাব করা। এই নির্ধারিত পরিমাপের মধ্যে যে জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও নিখুঁত ব্যবস্থাপনা বিরাজ করছে তাতে বুঝা যায় এর পেছনে এমন এক মহা-শক্তিমান হাত রয়েছে, যার মধ্যে কোনো দুর্বলতা নেই, নেই অজানার কোনো সংশয়। সে মহাশক্তিমান তাঁর অফুরন্ত ও অসীম ক্ষমতা বলে সুনির্দিষ্ট পন্থায় সব কিছুকে ত্রুটিহীনভাবে নিয়ন্ত্রণ করছেন। মানুষ এ পর্যন্ত জেনে এসেছে যে পথিবীর মধ্যে সঞ্চিত যে পানি তা আকাশ থেকে বর্ষিত পানি থেকেই জমা হয়েছে এবং আকাশ থেকে বর্ষিত পানি মানুষ জীব জন্তু ও গাছ-পালা তরুলতা সব কিছুর প্রয়োজন মেটানোর পরই গিয়ে পৃথিবীর পেটের মধ্যে জমা হয়। এ পর্যন্তকার মানুষের জানাকে নাকচ করে দিয়ে সম্প্রতি আবিষ্কার হয়েছে যে, না পৃথিবীর পেটের মধ্যে যে পানি আছে তার সাথে পৃথিবীর উপরিভাগে থাকা অর্থাৎ আকাশ থেকে বর্ষিত পানির কোনো সম্পর্ক নেই। অথচ এই সত্যটিকেই আল কোরআন চৌদ্দশত বছর পূর্বে জানিয়েছে। দেখুন আল কোরআনে বলা হয়েছে,

'আমি পাঠিয়েছি আকাশ থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ পানি।'

পুরোপুরি বুদ্ধিমত্তা সহকারে এবং সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পাঠিয়েছি। প্রয়োজনের থেকে এমন বেশী নয় যে সবকে ডুবিয়ে দেবে, আবার এতো কমও নয় যে পানির অভাবে ফসল হবে না ও চরম দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে, আবার বে-মওসুম পানিও বর্ষিত হয় না। কারণ তাতে পানির কোনো সদ্ব্যবহার হয় না এবং বেকার পানিটা নষ্ট হয়ে যায়। কারো কোনো কাজেই লাগে না। তাই আল্লাহ তায়ালা জানাচ্ছেন,

'আমি আকাশ থেকে পানি এক নির্দিষ্ট পরিমাণে বর্ষণ করেছি, অতপর এ পানিকে আমি (মজুদ করে রেখেছি) পৃথিবীর বুকে'

ধরে রেখেছি এভাবে পানিকে ধরে রাখার সাথে সে শুক্রবিন্দুর পানির সাথেও তুলনা করা যায়, যা মাতৃগর্ভের মধ্যে ধরে রাখা হয়।

'এক সুরক্ষিত স্থানে'......... উভয় পানিই আল্লাহর মেহেরবানী ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সুরক্ষিত হয় যাতে তার দ্বারা জীবন প্রতিপালিত হয়......... কোরআনের এক বিশেষ বর্ণনা ভংগীর মাধ্যমে সত্যকে ছবির মতো চোখের সামনে তুলে ধরে এ কথাগুলোকে তুলে ধরা হয়েছে।

'আমি এ পানিকে ফিরিয়ে নিতেও পুরোপুরিই সক্ষম'

অর্থাৎ যদি এভাবে পানিকে ফেরত নিয়ে যাই তাহলে এ পানি চলে যাবে পৃথিবীর গভীরে দূরবর্তী স্তরসমূহের মধ্যে, কঠিন শিলাসমূহ ভেদ করে এ পানি চলে যেতে পারে নীচে বহু দূরে; কিন্তু সেভাবে পানিকে নীচে নেমে যাওয়া থেকে আমিই হেফাযত করেছি অথবা এসব উপায় ছাড়াই আমি প্রয়োজনীয় পানিকে হেফাযত করেছি। অতএব, যিনি তাঁর ক্ষমতা বলে এ পানিকে ধরে রাখেন তিনি একে অপচয় ও নিঃশেষ হয়ে যাওয়া থেকেও রক্ষা করতে সম্পূর্ণ সক্ষম। অবশ্যই এই সব কিছুই মানুষের জন্যে আল্লাহর মেহেরবানীর দান।

পানি থেকেই সকল জীবনের জন্ম হয়: এরশাদ হচ্ছে,

'অতপর আমি তোমাদের জন্যে খেজুর ও আংগুরের বাগিচাসমূহ পয়দা করেছি। এগুলোর মধ্যে তোমাদের প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম বহু ফলমূল রয়েছে, এগুলো খাদ্য হিসাবে তোমরা ব্যবহার করো।'

খেজুর ও আংগুর দুটি অতি উৎকৃষ্ট ফল। উদ্ভিদ জগতে পানি দ্বারা উদগত বৃক্ষসমূহের মধ্যে এ দুটি চমৎকার উদাহরণ, যেমন মানব জগতে শুক্র বিন্দুর মাধ্যমে মনুষ্য সৃষ্টি অস্তিত্বে এসেছে। এ হচ্ছে আল কোরআনে বর্ণিত উদাহরণ পদ্ধতি যাতে করে মানুষ অতি সহজেই কথাগুলো বুঝতে পারে। এ দুটি উদাহরণ সেসব দৃষ্টান্তের দিকেও ইংগিত করছে, যা পানি দ্বারা জীবন লাভ করেছে।

এরপর বিশেষভাবে যায়তুন নামক বৃক্ষের কথা উল্লেখিত হয়েছে, এরশাদ হচ্ছে,

'একটি বৃক্ষ যা তূরপর্বত ও তার পাশের উপত্যকা ভূমিতে উৎপন্ন হয়, যা তেল সমৃদ্ধ এবং খানেওয়ালাদের জন্যে তরকারির কাজও করে।'

এই উপত্যকায় উৎপন্ন অধিকাংশ যায়তুন বৃক্ষ থেকে তেল, খাদ্য ও কাঠ পাওয়া যায়, আর আরব দেশের বেশী পাশের দেশ হচ্ছে এই সিনাই উপত্যকা– এই এলাকা সে পবিত্র ভূমিরও কাছে যার উল্লেখ আল কোরআনে এসেছে। এক বিশেষ কারণেই আল কোরআনে এই এলাকার কথা উল্লেখিত হয়েছে, আর তা হচ্ছে, সে এলাকার এই যায়তুন বৃক্ষও সেই পানির সিঞ্চনে উৎপন্ন হয় যা সেখানে সর্বক্ষণ মজুদ থাকে এবং সেখানে এই পানির কারণে বিশাল জনবসতিও গড়ে উঠেছে। সেখানকার মাটি বৃষ্টি থেকে সঞ্চিত এ পানি সুষে নেয় না। সে এলাকার ভূমির এই বৈশিষ্ট্য থাকায় সেখানে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে যায়তুন বনাঞ্চল এবং তৈলসমৃদ্ধ এই গাছের বাগান গড়ে উঠেছে। এর থেকে যেমন ফলের প্রয়োজন মেটে, তেমনি এর প্রক্রিয়াজাত যে তেল পাওয়া যায় তা ঘি-এর মতোই খাবারের তরকারির মতো ব্যবহার করা হয়। এ তেল যেমন সুস্বাদু তেমনি পুষ্টিকর, আর এই কারণে এই এলাকার বিস্তীর্ণ বনাঞ্চল ঘিরে বিশাল জনবসতি গড়ে উঠেছে। আল কোরআন জানাচ্ছে,

'অবশ্যই তোমাদের জন্যে গৃহপালিত এসব পশুর মধ্যে বহু শিক্ষার বিষয় রয়েছে, এগুলোর পেটের মধ্যে যা আছে তা থেকে আমি তোমাদের দুধ পান করাই। এর মধ্যে তোমাদের আরো বহু উপকারীতা রয়েছে, সেগুলো থেকে তোমরা (তাদের গোশত) ভক্ষণ করো আবার তাদের পিঠে তোমরা আরোহণও করো এবং আরোহণ করো বিভিন্ন নৌযানেও।'

সৃষ্টির মধ্যে এসব জীব-জানোয়ারকে আল্লাহর ক্ষমতা ও তাঁরই ব্যবস্থাপনায় মানুষের নিয়ন্ত্রণাধীনে এনে দেয়া হয়েছে। কর্মসমূহকে বিভক্ত করে এদের দ্বারা এদের উপযোগী কাজ নেয়া হয়। আল্লাহ তায়ালা, তাঁর নিজ ক্ষমতা বলে ও তাঁর ব্যস্থাপনার অধীনে এগুলোকে মানুষের নিয়ন্ত্রণাধীন বানিয়েছেন, যার কারণে মানুষ তাদের দ্বারা বিভিন্ন প্রকার কাজ নিয়ে থাকে– এজন্যেই এগুলো থেকে মানুষের বহু কিছু শিক্ষা নেয়ার বিষয় রয়েছে, বিশেষ করে যারা খোলা মন ও উন্মুক্ত চোখে এগুলোর দিকে তাকায়, এ সবের দিকে অন্তরের চোখ দিয়ে দেখে, এর চতুর্দিকের পরিবেশ থেকে আল্লাহর বিস্তর হেকমত ও তাঁর ক্ষমতার বহু নিদর্শন তারা দেখতে পায়। এগুলোর পেট থেকে যে দুধ পাওয়া যায় তার থেকে তারা সুপেয় পানীয় সংগ্রহ করে, অতি উত্তম পানীয় হিসাবে এ দুধ তারা পান করে, যা সহজে হজম হয় এবং পুষ্টির প্রয়োজনও মেটায়। এরশাদ হচ্ছে,

'এদের মধ্যে তোমাদের জন্যে রয়েছে আরো বহু উপকার' ....

অর্থাৎ, প্রথমত সংক্ষেপে এদের সাধারণ উপকারের কথা বলা হয়েছে। তারপর খাস করে এদের আরো দুটি উপকারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে,

'এগুলো থেকে তোমরা খাও এবং এদের ওপর আরোহণও করো এবং আরো আরোহণ করো নৌযান সমূহে।

আল্লাহ রব্বুল আলামীন মানুষের জন্যে যেসব পশুর গোশত হালাল করেছেন তার মধ্যে রয়েছে উট, গরু, ছাগল, ভেড়া, দুম্বা ইত্যাদি; কিন্তু তাদেরকে কষ্ট দিয়ে যবাই করাকে বা তাদের শরীরের অংশ বিশেষকে কেটে নেয়াকে হালাল বানাননি, কারণ জীবনের জন্যেই খাদ্যের প্রয়োজন। কষ্ট দিয়ে হত্যা করা বা তাদের শরীরের অংশ বিশেষ কেটে নেয়ায় যেমন নিষ্ঠুরতা করা হয়, তেমনি খাদ্য হিসাবে সেটা উপকারীও হয় না, এতে বরং মানুষের অপকারই হয়। এখানে নৌযান ও স্থল যান হিসাবে যে দুটি বস্তুর উল্লেখ করা হয়েছে, তাদের মধ্যে সাধারণত যে সুবিধা পাওয়া যায় তা হচ্ছে যে, এ উভয় প্রকার বাহন দ্বারা দেশ-বিদেশে সফর করা যায় এবং বিপুল মালের বহর দেশ থেকে দেশ-দেশান্তরে নিয়ে যাওয়া যায়। এদের একটি হচ্ছে স্থল যান আর একটি নৌযান। এ দুটি যানই প্রাচীন কাল থেকে মানুষের সমাজে যানবাহন হিসাবে পরিচিত হয়ে এসেছে এবং ভবিষ্যতেও এ দুই শ্রেণীর বাহনই প্রধানত ব্যবহৃত হতে থাকবে। পানির ওপরের বাহনের বিকল্প আরো অনেক কিছু আবিষ্কৃত হলেও মরু অঞ্চলে উট বহরের বৈশিষ্ট্যসমূহ আজও পরিলক্ষিত হয়। মরু যাত্রীরা তাদের দুরন্ত সফরে অন্তরের গভীরে এমনটিই আল্লাহর অস্তিত্ব অনুভব করে এবং নিজেদের অজান্তেই তারা নিজেদেরকে তাঁর কাছে সোপর্দ করে দেয়।

অপরদিকে নূহ (আ.)-এর আমল থেকে, অথবা আরো পূর্ব থেকে মানব সমাজে নৌযান এর ব্যবহার চালু রয়েছে, বিপুল পরিমাণ মাল বহন করে যাত্রীরা যখন বিশাল সমুদ্রে পাড়ি জমায়, অকল্পনীয় ঝড় ঝঞ্ঝার সম্মুখীন হয় তখন কায়মনোবাক্যে তারা সর্বশক্তিমান আল্লাহকে স্মরণ করে– তখন তারা গভীরভাবে অনুভব করে, সে অকূল সাগর বক্ষে তাদের সাহায্য করার মতো একমাত্র আল্লাহ তায়ালা ছাড়া কেউ নেই। যখন উত্তাল তরংগভিঘাতে জাহাজ শোলার মত প্রচন্ড বেগে দুলতে থাকে। আকাশচুম্বী ও পাহাড় সম ঢেউ যখন জাহাজটিকে ওপরের দিকে নিয়ে যায় আবার পরক্ষণে যখন অকুল পাথারে ছুঁড়ে ফেলে দেয় তখন আরোহীদের ধড়ে যেন আর প্রাণ থাকে না। সেই মুহূর্তে এমন কোনো নাস্তিক নেই যে, সব ক্ষমতার মালিক ত্রাণকর্তা আল্লাহকে স্মরণ না করে, কায়মনোবাক্যে রব্বুল আলামীনকে ডাকে না। সুতরাং, উভয় প্রকার যান বাহনের যাত্রীদের অন্তরে ঈমানের অনুভূতি ও আল্লাহর ক্ষমতার চেতনা জাগানোর জন্যে এবং যারা এসব দুরন্ত সফরের অভিজ্ঞতা লাভ করেনি, তাদের কল্পনা চোখে তা তুলে ধরার জন্যে এই দুই বা ততোধিক প্রকারের যান বাহনের ছবি উল্লেখিত হয়েছে, যেন তারা বিশ্ব সম্রাটের কাছে আত্মসমর্পণ করে এবং সময় থাকতেই তাঁর হুকুম মেনে নিজেদের জীবনকে ধন্য করে।

প্রকৃতপক্ষে এখানে সর্বশক্তিমান আল্লাহর ক্ষমতার প্রমাণ হিসেবে এই দুই প্রকার যানবাহনের কথা উল্লেখিত হয়েছে এবং এই লক্ষ্যে উত্থাপিত প্রমাণাদি দ্বারা সূরাটি তার শুরু ও শেষকে পরস্পর সংগবদ্ধ করেছে।

কেন আল্লাহকে সকল ক্ষমতার মালিক বলে মানতে হবে, তাঁর অস্তিত্বে কেন বিশ্বাস করতে হবে এবং কেনই বা তাঁর হুকুম মতো চলতে হবে তার জওয়াব স্বরূপ আল্লাহ রব্বুল আলামীন নূহ (আ.)-এর কাহিনীটি এ প্রসংগে তুলে ধরেছেন। দেখুন এরশাদ হচ্ছে,

'অবশ্যই আমি নূহকে তার জাতির কাছে পাঠিয়েছি........হে রসূলরা, তোমরা পবিত্র (খাদ্য) বস্তুসমূহ থেকে খাও এবং তোমরা নেক কাজ করতে থাকো, অবশ্যই সে সব বিষয়ে আমি জ্ঞাত আছি যা তোমরা করে চলেছো। ....অতএব তোমরা ভয় করো 'বাছ বিচার করে চলো।'

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ
غَيْرُهٗ ط اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿٢٣﴾ فَقَالَ الْمَلَؤُا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ مَا هٰذَآ اِلَّا
بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ لا يُرِيْدُ اَنْ يَّتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ ط وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَاَنْزَلَ مَلٰٓئِكَةً ج مَّا
سَمِعْنَا بِهٰذَا فِيْٓ اٰبَآئِنَا الْاَوَّلِيْنَ ﴿٢٤﴾ اِنْ هُوَ اِلَّا رَجُلٌۢ بِهٖ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوْا
بِهٖ حَتّٰى حِيْنٍ ﴿٢٥﴾ قَالَ رَبِّ انْصُرْنِيْ بِمَا كَذَّبُوْنِ ﴿٢٦﴾ فَاَوْحَيْنَآ اِلَيْهِ اَنِ
اصْنَعِ الْفُلْكَ بِاَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَاِذَا جَآءَ اَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّوْرُ لا فَاسْلُكْ
فِيْهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَاَهْلَكَ اِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ ج
وَلَا تُخَاطِبْنِيْ فِي الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ج اِنَّهُمْ مُّغْرَقُوْنَ ﴿٢٧﴾

রুকু ২

২৩. অবশ্যই আমি নূহকে তার জাতির কাছে (হেদায়াত নিয়ে) পাঠিয়েছিলাম, সে (তার জাতিকে) বলেছিলো, হে আমার জাতি, তোমরা এবাদাত করো একমাত্র আল্লাহ তায়ালার, তিনি ছাড়া তোমাদের অন্য কোনো মাবুদ নেই; তোমরা কি (তাঁকে) ভয় করবে না? ২৪. তখন তার জাতির মোড়লরা, যারা (আগে থেকেই) কুফরী করছিলো- (একথা শুনে অন্যদের) বললো, এ (ব্যক্তি) তো তোমাদের মতোই একজন মানুষ, (আসলে) এ ব্যক্তি তোমাদের ওপর নেতৃত্ব করতে চায়; আল্লাহ তায়ালা যদি (নবী পাঠাতেই) চাইতেন' তাহলে ফেরেশতাদেরই (নবী করে) পাঠাতেন, আমরা তো এমন কোনো কথা আমাদের পূর্বপুরুষদের যমানায়ও (ঘটেছে বলে) শুনিনি। ২৫. (মূলত) এ (মানুষটি) এমন, যার মধ্যে (মনে হয় কিছু) পাগলামী এসে গেছে, অতএব তোমরা (তার কোনো কথায়ই কান দিয়ো না), বরং এর ব্যাপারে কয়টা নির্দিষ্ট দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করো (হয়তো তার পাগলামী এমনিই সেরে যাবে)। ২৬. (এ কথা শুনে) নূহ দোয়া করলো, হে আমার মালিক, এরা যেভাবে আমাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করলো, তুমি (সেভাবেই তাদের মোকাবেলায়) আমাকে সাহায্য করো। ২৭. অতপর আমি তার কাছে ওহী পাঠালাম, তুমি আমার তত্ত্বাবধানে আমারই ওহী অনুযায়ী একটি নৌকা প্রস্তুত করো, তারপর যখন আমার (আযাবের) আদেশ আসবে এবং (যমীনের) চুল্লি প্লাবিত হয়ে যাবে, তখন (সব কিছু থেকে) এক এক জোড়া নৌকায় উঠিয়ে নেবে, তোমার পরিবার পরিজনদেরও (ওঠিয়ে নেবে, তবে) তাদের মধ্যে যার ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালার সিদ্ধান্ত এসে গেছে সে ছাড়া, (দেখো,) যারা যুলুম করেছে তাদের ব্যাপারে আমার কাছে কোনো আরযী পেশ করো না, কেননা (মহাপ্লাবনে আজ) তারা নিমজ্জিত হবেই।

فَاِذَا اسْتَوَيْتَ اَنْتَ وَمَنْ مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ
نَجّٰنَا مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٢٨﴾ وَقُلْ رَّبِّ اَنْزِلْنِيْ مُنْزَلًا مُّبٰرَكًا وَّاَنْتَ
خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ ﴿٢٩﴾ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ وَّاِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِيْنَ ﴿٣٠﴾ ثُمَّ اَنْشَاْنَا
مِنْۢ بَعْدِهِمْ قَرْنًا اٰخَرِيْنَ ﴿٣١﴾ فَاَرْسَلْنَا فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ
مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿٣٢﴾ وَقَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِيْنَ
كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِلِقَآءِ الْاٰخِرَةِ وَاَتْرَفْنٰهُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۙ مَا هٰذَاۤ
اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ۙ يَاْكُلُ مِمَّا تَاْكُلُوْنَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُوْنَ ﴿٣٣﴾ وَلَئِنْ
اَطَعْتُمْ بَشَرًا مِّثْلَكُمْ اِنَّكُمْ اِذًا لَّخٰسِرُوْنَ ﴿٣٤﴾ اَيَعِدُكُمْ اَنَّكُمْ اِذَا مِتُّمْ
وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَّعِظَامًا اَنَّكُمْ مُّخْرَجُوْنَ ﴿٣٥﴾

২৮. তারপর যখন তুমি এবং তোমার সাথীরা (নৌকায়) আরোহণ করবে তখন (শুধু) বলবে, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্যে, যিনি আমাদের (একটি) অত্যাচারী জাতি থেকে উদ্ধার করেছেন। ২৯. তুমি (নৌকায় ওঠে) বলো, হে আমার মালিক, তুমি আমাকে (যমীনের কোথাও) বরকতের সাথে নামিয়ে দাও, একমাত্র তুমিই আমাকে শান্তির সাথে (কোথাও) নামিয়ে দিতে পারো। ৩০. নিসন্দেহে এ (কাহিনীর) মধ্যে আমার (কুদরতের) নিদর্শন রয়েছে, (তা ছাড়া মানুষদের) পরীক্ষা তো আমি (সব সময়ই) নিয়ে থাকি। ৩১. এদের পরে আমি আরেক জাতিকে পয়দা করেছিলাম, ৩২. অতপর তাদেরই একজনকে তাদের কাছে নবী করে পাঠিয়েছি (যার দাওয়াত ছিলো, হে আমার জাতি), তোমরা এক আল্লাহ তায়ালারই এবাদাত করো, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনো মাবুদ নেই; তোমরা (নূহের জাতির ভয়াবহ আযাব দেখেও) কি সাবধান হবে না?

রুকু ৩

৩৩. (নবীর কথা শুনে) তার জাতির নেতৃস্থানীয় লোকজন, যারা আল্লাহকে অস্বীকার করেছে, মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে পরকালে আল্লাহ তায়ালার সাথে সাক্ষাতের বিষয়টিকে, (সর্বোপরি) যাদের আমি দুনিয়ার জীবনে প্রচুর ভোগ সামগ্রী দিয়ে রেখেছিলাম– তারা (অন্যদের) বললো, এ ব্যক্তিটি তোমাদের মতো মানুষ ছাড়া অন্য কিছু নয়, তোমরা যা খাও সেও তা খায়, তোমরা যা কিছু পান করো সেও তা পান করে, ৩৪. (এমতাবস্থায়) তোমরা যদি তোমাদেরই মতো একজন মানুষকে (নবী মনে করে তার কথা) মেনে চলো; তাহলে তোমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে, ৩৫. (এ) ব্যক্তিটি কি তোমাদের সাথে এই ওয়াদা করছে যে, তোমরা যখন মরে যাবে, যখন তোমরা মাটি ও হাড্ডিতে পরিণত হয়ে যাবে, তখন তোমাদের সবাইকে (কবর থেকে আবার) উঠিয়ে আনা হবে?

هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ۝٣٦ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ
وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ۝٣٧ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ
كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ ۝٣٨ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ ۝٣٩ قَالَ
عَمَّا قَلِيلٍ لَّيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ ۝٤٠ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ
غُثَاءً ۚ فَبُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝٤١ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ ۝٤٢
مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ۝٤٣ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَا ۖ كُلَّمَا
جَاءَ أُمَّةً رَّسُولُهَا كَذَّبُوهُ ۚ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُم بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ ۚ
فَبُعْدًا لِّقَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ ۝٤٤

৩৬. (আসলে) এ যে বিষয়টি-(যা) দিয়ে তোমাদের সাথে এ ওয়াদা করা হচ্ছে, এটা (মানুষের বৈষয়িক বুদ্ধি থেকে) অনেক দূরে (এবং ধরা ছোঁয়ার) ও অনেক বাইরে, ৩৭. (তারা বললো, কিসের আবার পুনরুত্থান?) দুনিয়ার জীবনই তো হচ্ছে আমাদের একমাত্র জীবন, আমরা (এখানে) মরবো, (এখানেই) বাঁচবো, আমাদের কখনোই পুনরুত্থিত করা হবে না। ৩৮. (নবুওতের দাবীদার) এ ব্যক্তিটি হচ্ছে (এমন) এক মানুষ, যে (এসব কথা দ্বারা) আল্লাহর ওপর মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছে, আমরা তার ওপর ঈমান আনবো না। ৩৯. (এদের মিথ্যাচার দেখে সে নবী আল্লাহ তায়ালার কাছে দোয়া চাইলো এবং) বললো, হে আমার মালিক, তুমি এদের মিথ্যার মোকাবেলায় আমাকে সাহায্য করো। ৪০. আল্লাহ তায়ালা বললেন, হাঁ (তুমি ভেবো না), অচিরেই এরা (নিজেদের কর্মকান্ডের জন্যে) অনুতপ্ত হবে। ৪১. অতপর (সত্যি সত্যিই একদিন) আমার এক মহাতান্ডব এসে তাদের ওপর (মরণ) আঘাত হানলো এবং আমি (মুহূর্তের মধ্যে) তাদের সবাইকে তরঙ্গতাড়িত আবর্জনার স্তূপ সদৃশ (বস্তুতে) পরিণত করে দিলাম, অতপর (সবাই বলে ওঠলো, আল্লাহর) গযব নাযিল হোক যালেম সম্প্রদায়ের ওপর। ৪২. আমি তাদের (ধ্বংসের) পর (আরো) অনেক জাতিকেই সৃষ্টি করেছি; ৪৩. কোনো জাতিই তার (দুনিয়ায় বাঁচার) নির্দিষ্ট কাল (যেমন) ত্বরান্বিত করতে পারেনি, (তেমনি সময় এসে গেলে) তা কেউ বিলম্বিতও করতে পারেনি; ৪৪. অতপর (দুনিয়ার জাতিসমূহের কাছে) আমি একের পর এক রসূল পাঠিয়েছি, যখনি কোনো জাতির কাছে তার (প্রতি পাঠানো আমার) রসূল এসেছে, তখনই তাকে তারা মিথ্যাবাদী বলেছে, অতপর আমিও ধ্বংস করার জন্যে তাদের এক এক জনকে একেক জনের পেছনে (ক্রমিক নম্বর) লাগিয়ে দিয়েছি, (এভাবেই) আমি তাদের (একদিন ইতিহাসের) কাহিনী বানিয়ে দিয়েছি, বিধ্বংস হোক সে জাতি, যারা আল্লাহ তায়ালার ওপর ঈমান আনেনি।

ثُمَّ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى وَاَخَاهُ هٰرُوْنَ ۙ بِاٰيٰتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ﴿٤٥﴾ اِلٰى فِرْعَوْنَ
وَمَلَاۡئِهٖ فَاسْتَكْبَرُوْا وَكَانُوْا قَوْمًا عَالِيْنَ ﴿٤٦﴾ فَقَالُوْٓا اَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا
وَقَوْمُهُمَا لَنَا عٰبِدُوْنَ ﴿٤٧﴾ فَكَذَّبُوْهُمَا فَكَانُوْا مِنَ الْمُهْلَكِيْنَ ﴿٤٨﴾ وَلَقَدْ
اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ ﴿٤٩﴾ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَاُمَّهٗٓ اٰيَةً
وَّاٰوَيْنٰهُمَآ اِلٰى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَّمَعِيْنٍ ﴿٥٠﴾ يٰٓاَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ
الطَّيِّبٰتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا ۭ اِنِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ﴿٥١﴾ وَاِنَّ هٰذِهٖٓ اُمَّتُكُمْ
اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّاَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُوْنِ ﴿٥٢﴾

৪৫. তারপর আমি (এক সময়ে) আমার আয়াতসমূহ ও সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণ দিয়ে মূসা এবং তার ভাই হারুনকে পাঠিয়েছি, ৪৬. (তাদের আমি পাঠিয়েছি) ফেরাউন ও তার পারিষদদের কাছে, কিন্তু তারা (তাদের মেনে নেয়ার বদলে) অহংকার করলো, তারা ছিলো (স্পষ্টত) একটি না-ফরমান জাতি, ৪৭. তারা বলতে লাগলো, আমরা কি আমাদের মতোই দু'জন মানুষের ওপর ঈমান আনবো, (তাছাড়া) তাদের জাতিও হচ্ছে (বংশানুক্রমে) আমাদের সেবাদাস, ৪৮. তারা তাদের উভয়কেই মিথ্যাবাদী বললো, ফলে তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত মানুষদের দলভুক্ত হয়ে গেলো। ৪৯. (অথচ) আমি মূসাকে (আমার) কেতাব দান করেছিলাম, যেন লোকেরা (তা থেকে) হেদায়াত লাভ করতে পারে। ৫০. (এভাবেই) আমি মারইয়াম পুত্র (ঈসা) ও তার মাকে (আমার কুদরতের) নিদর্শন বানিয়েছি এবং তাদের এক নিরাপদ ও প্রস্রবণবিশিষ্ট উচ্চ ভূমিতে আমি আশ্রয় দিয়েছি।

রুকু ৪

৫১. হে রসূলরা, তোমরা পাক পবিত্র জিনিসসমূহ খাও, (হামেশা) নেক আমল করো, (কেননা) তোমরা যা কিছু করো সে সম্পর্কে আমি সবিশেষ অবহিত আছি। ৫২. এই (যে) তোমাদের জাতি– তা (কিন্তু দ্বীনের বন্ধনে) একই জাতি, আর আমি হচ্ছি তোমাদের একমাত্র মালিক, অতএব তোমরা আমাকেই ভয় করো।

তাফসীর

আয়াত-২৩-৫২

বর্তমান এই পাঠ-এর আলোচনায় দেখা যাচ্ছে, সকল মানবগোষ্ঠীর নিজেদের মধ্যে এবং প্রাকৃতিক বস্তু নিচয়ের মধ্যে ঈমানের যেসব উপাদান ও প্রমাণাদি রয়েছে, সেগুলো থেকে তার দৃষ্টিকে সরিয়ে নিয়ে ঈমানের সে শিক্ষা ও তাৎপর্যের দিকে ধাবিত করা হচ্ছে, যা নিয়ে রসূলরা আগমন করেছেন। এখানে দেখানো হয়েছে, কেমন করে যুগ যুগ ধরে মানুষ অপরিবর্তনীয় এই ঈমানী দাওয়াতে সাড়া দিয়েছে, কিভাবে তারা রসূলদের আহ্বানকে গ্রহণ করেছে এবং তারা নূহ (আ.)-এর যামানা থেকে নিয়ে অগনিত রসূলদের উদাত্ত দাওয়াতের প্রতি কি প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে, অতপর আমরা রসূলদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে দেখতে পাচ্ছি, দেখছি রসূলদের উম্মতদেরকে, দেখতে পাচ্ছি তাদের সবাইকে সময়ান্তরে একই কথা পেশ করতে, একই যুক্তি একই দলীল একই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের কথা বলতে। অবশেষে দেখতে পাচ্ছি মোহাম্মদ রসূলুল্লাহ (স.)-এর যবানীতে আরবী ভাষায় সেই একই কথার দাওয়াত। দুনিয়ার বুকে যতো রসূলই এসেছেন তারা নিজ নিজ জাতির কাছে পেশ করেছেন এই একই কথা। নূহ (আ.) তাঁর জাতির কাছেও তা পেশ করেছিলেন এবং পরবর্তী রসূলরাও তাদের জাতির কাছে তাই তুলে ধরেছেন। এই দাওয়াতের জওয়াবে যুগ যুগান্তর ধরে সকল মানব গোষ্ঠী একই কথা বলেছে, তাদের প্রতিক্রিয়া প্রায় একই শব্দ সমষ্টি দ্বারা ব্যক্ত করেছে।

আবার তাকিয়ে দেখুন আল্লাহর কথার দিকে, অবশ্যই আমি মহান নূহকে তার জাতির কাছে পাঠিয়েছি ......এ লোকটিকে তো এক পাগলামীতে পেয়ে বসেছে; ঠিক আছে, তাহলে তোমরা একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে থাকো।' (আয়াত ২৩-২৫)

নূহ (আ.)-এর অক্লান্ত পরিশ্রম ও তার জাতির প্রতিক্রিয়া

'হে আমার জাতি, আল্লাহর দাসত্ব করো। তিনিই তোমাদের ইলাহ, তিনি ছাড়া.......... ।

এ হচ্ছে এমন এক সত্য কথা যা কোনো দিন বদলায় না, যার ওপর সকল কিছুর অস্তিত্ব টিকে আছে এবং গোটা সৃষ্টি জগত যার সাক্ষ্য দান করছে।

'তোমরা কি ভয় করো না?'

এই অস্বীকৃতির পরিণতি কী হতে পারে তা চিন্তা করে কি তোমাদের একটুও ভয় লাগে না? যে সত্যের পক্ষে গোটা সৃষ্টি জগত সাক্ষ্য দিচ্ছে সেই চূড়ান্ত ও মহাসত্যকে তোমরা যখন অস্বীকার করছো, তখন তোমাদের অন্তরে কি একটুও ভয় জাগে না? তোমরা তো পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারছো যে, এই সরল সমুজ্জ্বল সত্যকে তোমরা অস্বীকার করছো এবং এতদসত্ত্বেও কি সেই চরম ও পরম সত্যকে অস্বীকার করার পাগলামীতে তোমাদেরকে পেয়ে বসেছে? এই পাগলামীর পরিণতিতে যে ভীষণ বেদনাদায়ক আযাব রয়েছে তা কি তোমরা একবারও ভেবে দেখেছো?

কিন্তু, হায়! এসব যুক্তিপূর্ণ কথা, আবেগময় আহ্বান এবং প্রাণস্পর্শী মর্মবাণী সে বলদর্পী, জ্ঞানপাপী, নেতৃত্বলোভী ও সুবিধাভোগী কাফের সরদারদের পাথর কঠিন হৃদয় দুয়ার থেকে ফিরে আসে। এসব কথা নিয়ে কোনো আলোচনা করতে বা সেসব যুক্তি প্রমাণ নিয়ে কোনো চিন্তা ভাবনা করতেও তারা রাযি নয়, একবার ভেবে দেখতেও তারা প্রস্তুত নয় যে তাদের সে বিশাল বিশাল ব্যক্তিদের সামনে তুচ্ছ এই আহ্বানকারী ব্যক্তিটির আহ্বান আদৌ কোনো চিন্তার বিষয় কিনা! তারা এ মহা সত্যকে বুঝার জন্যে, কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের দিকে না তাকিয়ে যদি উন্মুক্ত দিগন্তের দিকে তাকাতো তাহলেও তারা বুঝতে পারতো, কে আসল মালিক মনিব ও জীবনদাতা ও মৃত্যুদাতা। কিন্তু সত্যকে জানার ইচ্ছা নিয়ে কোনো দিকেই তারা তাকাতে প্রস্তুত নয়......

গোটা সৃষ্টি যে বাস্তবতার ওপর দাঁড়িয়ে আছে এবং নূহ (আ.)-এর সাথে কথা বলার সময় যা তারা নিজেরাও দেখছে, তাকেই তারা পরিত্যাগ করছে, এরশাদ হচ্ছে,

'তার জাতির কাফের সরদাররা বললো, এ ব্যক্তি তো তোমাদের মতোই একজন মানুষ, সে তোমাদের মধ্যে সব থেকে মর্যাদাবান হতে চায়।'

এই সংকীর্ণ দৃষ্টিকোণ থেকেই তারা নূহ (আ.)-এর মহান দাওয়াতের দিকে তাকাচ্ছিলো, যার কারণে তারা এ দাওয়াতের মহিমা ও মর্যাদা বুঝতে সক্ষম হয়নি। তাদের হৃদয়ের এ দৃষ্টির সংকীর্ণতাই তাদের সে মহান সত্যকে দেখতে দেয়নি, তাদের চোখের ওপর তা পর্দা ফেলে রেখেছে, যার কারণে তারা দেখেও দেখেনি, শুনেও শোনেনি এবং এতো দীর্ঘকাল ধরে উপস্থাপিত সত্যের প্রতি কোনো সম্মানও তারা প্রদর্শন করেনি, তাদের ইন্দ্রিয়গুলো এমনভাবে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলো যে, তাদের বিবেকের কাছে সত্যকে ধরা পড়তে দেয়নি। তাদের সামনে ছিলো মাত্র একটি বিষয় এবং তা ছিলো এই যে, তাদের মধ্য থেকেই একজন ব্যক্তির কাছে কেমন করে আসমানী কথা আসতে পারে! এজন্যেই তাদের ধারণা গড়ে উঠেছিলো যে আসমানী বাণীর ব্যাপারটি আসলে বাজে কথা। সে লোকটি এসব চটকদার কথা বলে নিজেকে বড় বানাতে চায় এবং তাদের সবার ওপর সে একচ্ছত্র কর্তৃত্ব করার নেশায় মেতে উঠেছে। তাদের এই কু-ধারণাই তাদেরকে নূহ (আ.)-এর সকল ইচ্ছা ও চেষ্টাকে প্রতিরোধ করতে উদ্বুদ্ধ করেছিলো, এভাবে তারা শুধু তাকেই প্রতিরোধ করছিলো না, প্রকারান্তরে তারা প্রতিরোধ করছিলো সেই দাওয়াতকে যা নিয়ে তিনি তাদের কাছে হাযির হয়েছিলেন, তাদের এই অপচেষ্টায় তার প্রতি অশ্রদ্ধা পোষণের সাথে সাথে তার আনীত দ্বীনের দাওয়াতকেও অমর্যাদা করা হচ্ছিলো, আর তাদের এই হঠকারিতা ও যুক্তি বিরোধী কাজের জন্যে গোটা মানব জাতির প্রতিও তারা অমর্যাদা দেখাচ্ছিলো। এর মাধ্যমে তারা একথাই জানাচ্ছিলো যে এ জাতিকে আল্লাহ তায়ালা সম্মান দিতে পারেন না এবং তাদের মধ্যে কেউ রসূল হওয়ার যোগ্যই নয়। রসূলের আগমন যদি প্রয়োজনই হয় তাহলে ফেরেশতাদের মধ্য থেকেই তো আসবে। তাদের কথার উদ্ধৃতি দেখুন,

'আল্লাহ তায়ালা রসূল পাঠাতে চাইলে অবশ্যই ফেরেশতাদেরকে এ কাজের দায়িত্ব দিতেন।'

সে হতভাগা জাতির মুখ দিয়ে এসব কথা এজন্যেই বের হতো যে, তাদের আত্মার মধ্যে সে মহান মর্যাদাপূর্ণ রূহ প্রবেশ করেনি, যা মানুষকে তার আসল স্থানে পৌঁছে দিতে পারে এবং মানুষকে সৃষ্টির সেরা জীবে পরিণত করতে পারে এবং পারে সব থেকে বড় মর্যাদার অধিকারী বানাতে। অতপর এক পর্যায়ে অপর মানুষের কাছে আল্লাহর বাণী পৌঁছে দেয়ার যোগ্যও তারা হতে পারে, পারে মানুষকে তাদের শুভ্র সমুজ্জ্বল মূল উৎসের দিকে নিয়ে যেতে।

এসব কূট কথা দ্বারা তারা সকল বিষয়কে বাঁকা নযরে দেখছিলো এবং সকল মানুষকে অতীতের খারাপ মানুষের নিরীখে বিচার করছিলো। তারা ধারণাই করতে পারছিলো না যে, মানুষ ভালো হতে পারে এবং এই মানুষ গঠনমূলক কাজের যোগ্যও হতে পারে। তাই তাদের কথাকে উদ্ধৃত করতে গিয়ে বলা হচ্ছে,

'কই এসব কথা তো আমরা আমাদের পূর্ব-পুরুষদের কাছে কখনো শুনিনি'

এভাবে যখনই মানুষের মধ্যে আল্লাহর আনুগত্যবোধ লোপ পায়, তখন তার সামনে বাস্তবে যেসব জিনিস ঘটছে সেগুলো নিয়ে তারা আর চিন্তা ভাবনা করতে পারে না, পারে না প্রকৃতির বুকে অবস্থিত বাস্তব ঘটনাবলী থেকে কোনো শিক্ষা নিতে। ওরাই হচ্ছে সেসব মানুষ যারা অতীতের আবর্জনার স্তূপ নিয়ে ঘাঁটাঘাটি করে এবং তার ওপরেই নির্ভর করে। অতপর, তারা যদি

অতীতের সে আবর্জনার কুঠরির মধ্যে তাদের মনমতো জিনিস না পায়, তখন সে বিষয়টিকেই তারা অস্বীকার করে এবং হঠকারিতার সাথে সে সত্য বিষয়টিকে ডাষ্টবিনে ছুঁড়ে ফেলে দেয়!

এই সকল অস্বীকারকারী, যারা আজ নীরব হয়ে গেছে, তারা মনে করে যে, একবার যা ঘটেছে তা দ্বিতীয় বারও ঘটতে পারে, আর যা ঘটেনি তা আর কখনো ঘটা সম্ভব নয়! এভাবে তাদের বিবেচনায় জীবন স্থবির হয়ে যায়, তার স্পন্দন থেমে যায়, অতি সংগোপনে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তার পদচারণা, চলতে থাকে ওরা 'পূর্ব-পুরুষদের' কথা বলছে, হায় ওরা যদি বুঝতো যে আসলে তারা জড় ইট পাথরে পরিণত হয়ে গেছে! যারা মানুষের গোলামী থেকে তাদেরকে মুক্ত করতে এসেছে তাদেরকেই ওরা পাগল বলছে? অথচ তারা তো ওরেদকে সত্য পথ দেখাতেই চেষ্টা করছে এবং এজন্যে চিন্তা ভাবনা করতে আহ্বান জানাচ্ছে, তাদেরকে পারস্পরিক সম্পর্কের উন্নয়ন লক্ষ্যে? অন্তরকে পরিষ্কার করতে আহ্বান জানাচ্ছে, পেশ করছে তাদের সামনে গোটা সৃষ্টি জগতে ছড়িয়ে থাকা ঈমান আনার জন্যে এমন অসংখ্য যুক্তি-প্রমাণ, যা তাদের সাথে যেন কথা বলছে; কিন্তু হায়, এ দাওয়াতকে নিছক আত্মম্ভরিতা ও দোষারোপের মনোবৃত্তি নিয়ে তারা প্রত্যাখ্যান করছে। তাদের কথাকে উদ্ধৃত করতে গিয়ে এরশাদ হচ্ছে,

'এ লোকটাকে তো এক পাগলামীতে পেয়ে বসেছে। অতএব, তোমরা কিছুদিন অপেক্ষা করে দেখো!

অর্থাৎ, পাগল যখন হয়েই গেছে অচিরেই সে মরে যাবে, তোমরা তার এসব পাগলামী থেকে রেহাই পাবে, রেহাই পাবে তার এই দাওয়াত থেকে; রেহাই পাবে নতুন যে কথাটা এনে তোমাদের পেরেশান করছে তার থেকেও।

মানব ইতিহাসের প্রথম ধ্বংসলীলা

এতো দীর্ঘকাল ধরে সত্যের দিকে দাওয়াত দেয়া সত্তেও সে হতভাগ্য জনপদের কঠিন হৃদয়ের মধ্যে নূহ (আ.) কোনো প্রবেশ পথ বের করতে সক্ষম হননি, আর তিনি বুঝতে পারছিলেন না তাদের এই উপহাস বিদ্রূপ ও তার প্রতি ওদের কষ্টদায়ক ব্যবহারের ইতি কোথায়! তবে তাঁর সান্ত্বনা যে তিনি সর্বাবস্থায় একমাত্র আল্লাহর দিকে রুজু থাকতে পেরেছেন, তাই ওদের প্রত্যাখ্যানজনিত জ্বালা নিবারণের জন্যে তিনি তাঁর কাছেই অভিযোগ করছেন, আর এ উপর্যুপরি অস্বীকৃতির কষ্ট লাঘবের জন্যে নূহ (আ.) তাঁরই সাহায্য প্রার্থনা করছেন। বলছেন,

'হে মালিক আমার, ওরা আমাকে মিথ্যাবাদী বানালো, এ জন্যে তুমিই আমাকে সাহায্য করো।'

এভাবে কোনো জাতির জীবন স্পন্দন যখন স্থবির হয়ে যায়, তাদের মন পাথর হয়ে যায় তারপরও হে আলোর পথের দাওয়াতদানকারী, হে সত্য পথের দিকে আহবানকারী আল্লাহর পথে জীবনের সাড়া জাগানোর জন্যে তোমাকে অগ্রসর হতেই হবে, অগ্রসর হতে হবে স্থিরীকৃত লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্যে। তখনই তুমি তাদের চূড়ান্ত পরিণতি সমাগত দেখতে পাবে..... সে সময় তোমাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, সত্য পথের অভিযাত্রী তুমি, যাত্রা পথে আড় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা সে জগদ্দল পাথরগুলোকে হয় তুমি ভেংগে চুরমার করে দিয়ে বীর বিক্রমে সম্মুখ পানে এগিয়ে যাবে, আর না হয় স্পন্দনহীন সে জীবনগুলোকে পেছনে পথের ওপর ফেলে রেখে তোমার গন্তব্য পথে তুমি অগ্রসর হবে। ..... তাই দেখা যায়, নূহ (আ.) সাড়ে নয় শত বছর ধরে চেষ্টা করেও যখন সে জীবনমৃত জাতির বুকে সাড়া জাগাতে পারলেন না তখন তিনি ওপরে বর্ণিত প্রথম পথটিই অবলম্বন করলেন। তিনি বুঝলেন, পাপ পঙ্কিলতায় নিমজ্জিত সে কলুষ সমাজ সংশোধনের সকল

পথ হারিয়ে ফেলেছে, সর্বনাশের যে সীমায় তারা পৌঁছে গেছে সেখান থেকে তাদেরকে ফেরানোর আর কোনো উপায় নেই, তখন বিশ্ব সম্রাটের দরবারে তিনি তাদেরকে পরিপূর্ণভাবে ধ্বংস করে দেয়ার জন্যে আবেদন জানালেন। আল্লাহ রব্বুল আলামীন তো দেখছিলেনই কি পর্বত পরিমাণ ধৈর্য নিয়ে কতো দীর্ঘকাল ধরে তাঁর এই নেক বান্দা তার জাতির সংশোধনের জন্যে চেষ্টা চালিয়েছে, তাই সাথে সাথে তিনি তার ডাকে সাড়া দিলেন, নূহ (আ.)-এর জাতির ভাগ্যে চরম বিপর্যয় নেমে এলো। যেহেতু এরাই মানব জাতির অধ্যায়ে প্রথম মানব গোষ্ঠী, এরা যখন সত্য পথের ওপর আড় হয়ে দাঁড়িয়ে সত্য পথের যাত্রাকে নির্মমভাবে রুদ্ধ করে দিতে বদ্ধপরিকর হলো, তখন তারা আল্লাহর আক্রোশকে তাদেরকে ধরাপৃষ্ঠ থেকে সরিয়ে দেয়ার জন্যে আহ্বান জানালো। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'আমি তার কাছে ওহী পাঠিয়ে হুকুম দিলাম, আমারই সাহায্যক্রমে এবং আমারই পরিকল্পনা মাফিক ....আর, যারা যুলুম করেছে, তাদের পক্ষে খবরদার আমার কাছে কোনো আবেদন করো না, অবশ্যই তারা আজ নিমজ্জিত হবে।' (আয়াত ২৭)

এভাবেই চলে আসছে আবহমানকাল ধরে আল্লাহর সৃষ্টিজগত পরিচালনার রীতি। এভাবেই তিনি চিরকাল মানব জাতির জীবন যাপনের নির্দিষ্ট পথকে নিষ্কন্টক ও বাধামুক্ত করে চলেছেন। হযরত নূহ (আ.)-এর আমলে মানব জাতি পচন ও দূষণে জর্জরিত হয়ে যখন সেই চারাগাছের দশায় উপনীত হলো, যার বিকাশ ও বৃদ্ধি প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে পড়ে বাধাগ্রস্ত হয় এবং শুকিয়ে জীর্ণশীর্ণ হয়ে যায়, তখন বন্যাই হয়ে দাঁড়ালো তার একমাত্র ঔষুধ। কেননা বন্যা সমস্ত মলিনতা ও আবর্জনাকে ধুয়ে মুছে সাফ করে দেয় এবং নতুন করে সুস্থ জীবনের বীজ বপনের পথ সুগম করে। বন্যার পর পরিচ্ছন্ন ভূমিতে নতুন করে জীবনের উন্মেষ ঘটে এবং নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তার বিকাশ বৃদ্ধি ও প্রসার অব্যাহত থাকে-

'আমি তাকে ওহী যোগে আদেশ দিলাম যে, আমার চোখের সামনে ও আমার ওহীর নির্দেশনার ভিত্তিতে নৌকা তৈরী করো।'

নৌকা বন্যা থেকে আত্মরক্ষা এবং নিরাপদ জীবনের বীজ রক্ষায় ও তার পুনর্বপণে সাহায্য করে। আল্লাহর সিদ্ধান্ত ছিলো এই যে, হযরত নূহ (আ.) নিজ হাতে নৌকা তৈরী করবেন। কেননা আল্লাহর সাহায্য পাওয়ার জন্যে মানুষের পার্থিব উপায় উপকরণকে অবলম্বন করে সাধ্যমতো সর্বোচ্চ চেষ্টা সাধনা করা অপরিহার্য। আল্লাহর সাহায্য অলস ও নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকা লোকদের কপালে জোটে না। যারা কোনো কাজ না করে কেবল আল্লাহর সাহায্যের অপেক্ষায় থাকে, তাদের জন্যে সাহায্য বরাদ্দ করা আল্লাহর রীতি নয়। যেহেতু হযরত নূহ (আ.)-কে আল্লাহ তায়ালা মানব জাতির দ্বিতীয় পিতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে মনস্থ করেছিলেন, তাই তাকে প্রাকৃতিক উপায় উপকরণ অবলম্বন করতে বাধ্য করেন, সেই কাজে তাকে সাহায্য সহযোগিতাও করেন এবং নৌকা নির্মাণের কৌশলও শিক্ষা দেন, যাতে আল্লাহর পরিকল্পনা সফল ও তাঁর ইচ্ছা বাস্তবায়িত হয়।

কলুষিত পৃথিবীকে পরিচ্ছন্ন করার অভিযানটা কখন শুরু হবে, তার একটা আলামতও আল্লাহ তায়ালা নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন,

'অবশেষে যখন আমার আদেশ এসে পড়বে এবং উনুন উথলে পানি উঠবে, অর্থাৎ উনুনের তলা থেকে পানি ছিটকে বেরুবে।

এটাই ছিলো সেই সংকেত, যা দেখে হযরত নূহ (আ.)-কে নৌকায় জীবনের বীজগুলো বোঝাই করার ত্বরিত উদ্যোগ নিতে হয়েছিলো।

'তখন প্রত্যেক শ্রেণীর প্রাণী থেকে এক এক জোড়া করে নৌকায় তুলে নিয়ো।'

অর্থাৎ তৎকালে যে সমস্ত শ্রেণীর পশু, পাখি ও উদ্ভিদ হযরত নূহের কাছে পরিচিত ছিলো এবং যা সংগ্রহ করা মানুষের পক্ষে সম্ভব ছিলো।

'এবং তোমার পরিবার পরিজনকেও, তবে যাদের সম্পর্কে ইতিপূর্বেই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে তারা ছাড়া।'

তারা হচ্ছে আল্লাহর বিধান প্রত্যাখ্যানকারীরা ও আল্লাহর রসূলকে মিথ্যুক সাব্যস্তকারীরা। আগে থেকে ঘোষিত আল্লাহর সিদ্ধান্ত ও আল্লাহর চিরাচরিত নিয়ম তাদের ওপর প্রযোজ্য। এই সিদ্ধান্ত ও নিয়ম হলো, আল্লাহর নিদর্শন ও বিধানকে প্রত্যাখ্যানকারীদের ধ্বংস অনিবার্য।

হযরত নূহ (আ.)-এর ওপর সর্বশেষ যে আদেশ জারী হলো তা এই যে, তিনি যেন এমন কারো সম্পর্কে কোন অনুরোধ না করেন, যাদের ওপর আল্লাহর সিদ্ধান্ত প্রযোজ্য,

'যারা অত্যাচারী, তাদের সম্পর্কে তুমি আমাকে কিছু বলো না। কারণ তারা তো ডুববেই।'

কেননা আল্লাহর নিয়ম কাউকে খাতির করে না এবং কোনো প্রিয়জনের মন রক্ষার জন্যে তার সঠিক ও স্থায়ী পথ থেকে একবিন্দুও বিচ্যুত হয় না।

আল্লাহর এই আদেশ এসে যাবার পর সে জাতির ভাগ্যে কী ঘটেছিলো, সে বিবরণ এখানে দেয়া হয়নি। যাই হোক, সিদ্ধান্ত হয়ে গিয়েছিলো যে, তারা সবাই ডুববেই। অবশ্য তাদের বিপর্যয়ের বিবরণ না দিলেও হযরত নূহকে আল্লাহর শোকর করা, প্রশংসা করা ও তার কাছে সৎ পথের সন্ধান চাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'অতপর যখন তুমি ও তোমার অন্যান্য সাথীরা নৌকায় সঠিকভাবে বসবে, তখন বলবে, সকল প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমাদেরকে অত্যাচারী জাতির কবল থেকে উদ্ধার করেছেন। .....(আয়াত ২৮ ও ২৯)

এখানে শিক্ষা দেয়া হলো যে, এভাবেই আল্লাহর প্রশংসা করতে হয়, তাঁর কাছে ধর্ণা দিতে হয়, তাঁর গুণাবলী বর্ণনা করতে হয়, তাঁর নিদর্শনাবলীর স্বীকৃতি দিতে হয়। এভাবেই তাঁর বান্দারা বিশেষত নবীরা তাঁর কাছে পরম ভক্তি ও বিনয় সহকারে দোয়া করে থাকেন, যাতে পরবর্তীকালের লোকেরাও তাঁদের অনুসরণ করতে পারে।

এরপর এই কাহিনীর ওপর সামগ্রিকভাবে এতে আল্লাহর অসীম ক্ষমতা ও প্রজ্ঞার নিদর্শনাবলী প্রতিফলিত হয়েছে।

পরীক্ষা অনেক রকমের হয়ে থাকে যেমন, ধৈর্যের পরীক্ষা, কৃতজ্ঞতার পরীক্ষা, পুণ্য সঞ্চয়ের পরীক্ষা, মনোযোগ আকর্ষণের জন্যে পরীক্ষা, শাস্তি দেয়ার জন্যে পরীক্ষা, সৎ লোক ও অসৎ লোক বাছাই করার জন্যে পরীক্ষা, মূল্যায়নের জন্যে পরীক্ষা ইত্যাদি। নূহ (আ.)-এর কাহিনীতেও হযরত নূহ (আ.)-এর জন্যে, তার জাতির জন্যে ও তার ভবিষ্যত বংশধরদের জন্যে অনেক শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে।

এরপর রসূলদের একই ধরনের তৎপরতা ও একইভাবে স্ব স্ব জাতি কর্তৃক প্রত্যাখ্যানের পুনরাবৃত্তির দৃশ্য এখানে তুলে ধরা হয়েছে। (আয়াত ৩১-৪১)

স্বার্থবাদীদের মর্মান্তিক পরিণতি

উল্লেখ্য যে, এ সূরায় নবীদের কেচ্ছাকাহিনীর যা কিছু আলোচিত হয়েছে, তার উদ্দেশ্য বিস্তারিত ও পূর্ণাংগ ঘটনা তুলে ধরা নয়। এগুলোর উদ্দেশ্য শুধু এটা প্রমাণ করা যে, সকল নবী একই বার্তা নিয়ে এসেছেন এবং সকলে প্রায় একই ধরনের অভ্যর্থনা জনগণের কাছ থেকে লাভ করেছেন। এ কারণেই হযরত নূহ (আ.)-কে দিয়ে শুরু করা হয়েছে যাতে এর সূচনা কোথা থেকে ও কিভাবে হয়েছে তা চিহ্নিত করা যায়। আর সর্বশেষ রসূলের আগমনের পূর্বে এ কাজের সমাপ্তি

কিভাবে ঘটেছে, তাও যাতে চিহ্নিত করা যায়, সে জন্যে সর্বশেষ হযরত ঈসা ও মূসার ঘটনা তুলে ধরা হয়েছে। নবীদের এই সুদীর্ঘ ধারাবাহিকতার মাঝখানের কারো নাম উল্লেখ করা হয়নি, যাতে শুরু ও শেষের মধ্যবর্তী স্তরগুলোর সাদৃশ্য প্রমাণিত হয়। বরঞ্চ প্রত্যেক পর্যায়ে যে একই দাওয়াত দেয়া হয়েছে ও একই ধরনের জবাব পাওয়া গেছে, সেটাই উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা এটা বলাই এখানে মুখ্য উদ্দেশ্য। আল্লাহ বলেছেন,

'অতপর তাদের পরে আমি আরো একটা জাতি সৃষ্টি করেছিলাম।'

তারা কারা, সেটা সুনির্দিষ্টভাবে বলা হয়নি। তবে খুব সম্ভবত তারা হযরত হুদের জাতি আদ।

'অতপর আমি তাদের কাছে তাদেরই মধ্য থেকে একজন রসূল পাঠালাম। সে বলেছিলো, 'তোমরা শুধু আল্লাহর এবাদাত কর, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনো মাবুদ নেই। তবুও কি তোমরা সংযত হবে না?'

এও সেই একই দাওয়াত, যা ইতিপূর্বে হযরত নূহ (আ.) দিয়েছিলেন। সে জাতিগুলোর ভাষা যদিও ভিন্ন ছিলো, কিন্তু তাদের কাছে একই দাওয়াত দেয়া হয়েছিলো এবং কোরআন সেই দাওয়াত হুবহু উদ্ধৃত করেছে।

এর কী জবাব ছিলো? জবাবটা ছিলো প্রায় হুবহু নূহের জাতির জবাবের অনুরূপ,

'তার জাতির নেতারা, যারা কুফরী করতো, আখেরাতের সাক্ষাতকে মিথ্যা সাব্যস্ত করতো এবং যাদেরকে আমি দুনিয়ার জীবনে সুখ-সমৃদ্ধি দিয়েছিলাম, তারা বলেছিলো, এ ব্যক্তি তো তোমাদের মত একজন মানুষ ছাড়া কিছু নয়। তোমরা যা আহার করো, সেও তো তাই আহার করে থাকে এবং তোমরা যা পান করো, সেও তো তাই পান করে থাকে। তোমরা যদি তোমাদেরই মতো একজন মানুষের কথা মতো চলো, তাহলে তোমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।'

এ আয়াতের বক্তব্য থেকে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, বারংবার যে আপত্তিটা তোলা হয়েছে, সেটা ফেরেশতার মধ্য থেকে না হয়ে মানুষের মধ্য থেকে নবী ও রসূলের আবির্ভূত হওয়া নিয়েই তোলা হয়েছে। আসলে এসব ভোগবাদী ও বিলাসী ধনিক শ্রেণীর মানসিকতা ও সৎ চরিত্রের অধিকারী মানুষের আত্মমর্যাদাবোধের মাঝে সম্পর্কচ্ছেদ থেকেই এই আপত্তিটার উৎপত্তি হয়েছে।

কারণ বিলাসিতা, ভোগবাদ ও পুঁজিবাদ মানুষের স্বভাব-প্রকৃতিকে এতোটা বিকৃত এবং অনুভূতি শক্তিকে এতটা অকর্মণ্য করে ফেলে যে, পারিপার্শিক ঘটনাবলীর প্রতি সে কোনো প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে না এবং তা থেকে কোনো শিক্ষাও সে গ্রহণ করে না। এ কারণেই ইসলাম বিলাসিতা, ভোগবাদ ও পুঁজিবাদের বিরোধিতা করে এবং তার সামাজিক বিধিব্যবস্থা ও অবকাঠামোকে এমনভাবে গড়ে তোলে যে মুসলিম সমাজে কোনো পুঁজিবাদী, ভোগবাদী ও বিলাসী শ্রেণীর অস্তিত্ব বরদাশত করে না। কেননা এই শ্রেণীটা দূষিত বর্জ্য পদার্থের মতো, যা গোটা পরিবেশকে এমনভাবে নষ্ট করে ফেলে যে, সর্বত্র নোংরা কীট গিজ গিজ করতে থাকে।

পরবর্তী কয়েকটি আয়াতে বলা হচ্ছে যে, এসব ভোগবাদী পুঁজিপতি শ্রেণী মৃত্যুর পরের পুর্নজন্মকে অস্বীকার করে এবং এই আজব সংবাদ প্রচারকারী রসূলের ওপর বিস্ময় প্রকাশ করে বলে,

'এই ব্যক্তি কি তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে যে, তোমরা মরে গিয়ে মাটি ও হাড্ডিতে পরিণত হবার পর পুনরায় তোমাদেরকে সেখান থেকে জীবিত করে বের করে আনা হবে? ....(আয়াত ৩৫, ৩৬, ৩৭)

এ ধরনের লোকেরা বৃহত্তর জীবনের আবশ্যকতা ও তাৎপর্য উপলব্ধি করে না এবং বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে তার শেষ গন্তব্যে উপনীত হওয়ার সুক্ষ্ম বিষয়টা অনুধাবন করে না। যেহেতু

পৃথিবীর জীবন পূর্ণাংগ নয়, তাই পৃথিবীতে তার শেষ গন্তব্যে পৌঁছাও সম্ভব নয়। কেননা কাজ ভালোই হোক বা মন্দই হোক, তার পূর্ণাংগ ফল লাভ করা ইহকালে অসম্ভব। এই পূর্ণাংগ ফল কেবল আখেরাতেই লাভ করা যায়। সৎ কর্মশীল ঈমানদার লোকেরা সেখানে সর্বোত্তম জীবনের সর্বোচ্চ মার্গে উপনীত হবে। সেখানে না থাকবে কোনো ভয় ভীতি ও ক্লান্তি অবসাদ, আর না থাকবে কোনো উন্নতি অবনতি। পক্ষান্তরে অসৎ কর্মশীল ও পাপাচারীরা সেখানে নিকৃষ্টতম জীবনের সেই সর্বনিম্ন ধাপে উপনীত হবে, যেখানে তাদের মানবত্ব নিরর্থক প্রমাণিত হবে এবং তারা পাথরে বা পাথরের পর্যায়ে পর্যবসিত হবে।

এ ধরনের লোকেরা এসব নিগূঢ় তত্ত্ব বোঝে না। তারা জীবনের ইহকালীন স্তরকে পরকালীন স্তরের প্রমাণ বলে গণ্য করে না। তারা এ কথা অনুধাবন করে না যে, যে শক্তি জীবনের এই প্রাথমিক স্তরটার পরিকল্পনা ও ব্যবস্থা করেছেন, তিনি মৃত্যুর পর্যায়ে এসে জীবনের গতি স্তব্ধ করেন না, যেমনটি তারা মনে করে থাকে। এ জন্যে তারা এ কথা শুনে অবাক হয়ে যায় যে, মৃত্যুর পর তাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করা হবে। অজ্ঞতার কারণে তারা এটাকে অসম্ভব মনে করে। তারা বরঞ্চ জোর দিয়েই বলে যে, এটা কখনো হবে না। তাদের মতে জীবনও একটা এবং মৃত্যুও একটা। একবার একটা প্রজন্ম মারা যায় এবং তারপর আর একটা প্রজন্ম জীবন ধারণ করে। যারা মারা যায় এবং মাটি ও হাড়ে রূপান্তরিত হয়ে যায়, তাদের পুনরুজ্জীবিত হওয়া একেবারেই সুদূর পরাহত, যেমন এই আজব ও লোকটা [রসূল (স.)] বলে থাকে।

তারা এতোটুকু অজ্ঞতা প্রকাশ করেই ক্ষ্যান্ত থাকে না, বরং তাদের রসূলকে আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে মনগড়া খবর পরিবেশনের দায়েও অভিযুক্ত করে থাকে। যারা আল্লাহকে জানেও না, চিনেও না, তারা কিনা এই মুহূর্তে হঠাৎ করেই আল্লাহকে চিনে ফেললো। কেননা রসূলের ওপর অপবাদ আরোপ করার জন্যে আল্লাহকে জানার দরকার হয়ে পড়েছে।

'এই ব্যক্তি আল্লাহর ওপর অপবাদ আরোপকারী ছাড়া আর কিছু নন। আমরা তা ওপর ঈমান আনতে প্রস্তুত নই।' (আয়াত ৩৮)

এই পর্যায়ে এসে রসূলের আল্লাহর সাহায্য চাওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না, যেমন ইতিপূর্বে হযরত নূহেরও তা ছাড়া গত্যন্তর ছিলো না। এমনকি হুবহু হযরত নূহের ভাষায়ই আল্লাহর সাহায্য চাইলেন। আর সংগে সংগেই আল্লাহ তায়ালা এই প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন। কেননা সে জাতির মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছিলো এবং তাদের শোধরানোর আর কোনো আশা অবশিষ্ট ছিলো না।

'আল্লাহ তায়ালা বলেন, ওরা অচিরেই অনুতপ্ত হবে।'

কিন্তু সেই অনুতাপ ও তাওবায় কোনো লাভ হবে না।

'ন্যায় সংগতভাবেই তাদেরকে পাকড়াও করলো এক বিকট চিৎকার ....ফলে আমি তাদেরকে আবর্জনায় পরিণত করলাম।' (আয়াত ৪০)

'গুসা' বলা হয় স্রোতের পানিতে ভেসে আসা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত মূল্যহীন ঘাসপাতা খড়কুটো ইত্যাকার আবর্জনাকে। মোশরেকরা মানুষ হিসাবে আল্লাহর তরফ থেকে যেসব সদগুণ পেয়েছিলো, নবীর দাওয়াত প্রত্যাখ্যানের মাধ্যমে যখন সেই সদগুণগুলো হারিয়ে বসলো, পৃথিবীতে তাদের অস্তিত্ব লাভের পেছনে যে মহৎ উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে, সে সম্পর্কে উদাসীন হলো এবং আল্লাহর নিকটতম ফেরেশতাদের সাথে তাদের সংযোগ ও সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেলো, তখন আর তাদের ভেতরে সম্মান পাওয়ার যোগ্য কোনো উপাদান অবশিষ্ট রইলো না। ফলে তারা স্রোতে ভেসে আসা খড়কুটোর মতো হয়ে গেলো, বস্তুত এ উপমাটা পবিত্র কোরআনের একটা বিশেষ ও বিরল বাচনভংগির অন্যতম। তাদের এই নিকৃষ্টতার সাথে যুক্ত হয়েছে আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হওয়া এবং মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণে ব্যর্থতা,

'অতএব যালেমদের ওপর অভিসম্পাত।'

এ অভিসম্পাত বিবেকের জগতে যেমন, সামাজিক জগতেও তেমনি। এ অভিসম্পাত তাদের জীবদ্দশায় যেমন কার্যকর মৃত্যুর পরের স্মৃতিতেও তেমনি কার্যকর।

নবীদের ইতিহাস পর্যালোচনা

পরবর্তী ক'টা আয়াতে যুগ যুগ কালের ইতিহাস পর্যালোচনা করা হয়েছে। এভাবে,

'অতপর আমি তাদের পরে অন্যান্য অনেক জাতি সৃষ্টি করেছি।' (আয়াত ৪২ থেকে ৪৪)

এভাবে সংক্ষেপে হযরত নূহ ও হুদের মধ্যবর্তী ধারা এবং হযরত মূসা ও ঈসা (আ.)-এর মধ্যবর্তী ধারার দীর্ঘস্থায়ী ইসলামী দাওয়াতের ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে। তুলে ধরা হয়েছে আল্লাহর প্রচলিত শাশ্বত প্রাকৃতিক বিধানও। প্রত্যেকটা জাতি তার নির্দিষ্ট মেয়াদ পূর্ণ করেছে এবং ইতিহাস নিজস্ব গতিতে চলেছে,

'কোনো জাতি তার মেয়াদকে ত্বরান্বিতও করতে পারে না, বিলম্বিতও করতে পারে না। যখনই কোনো জাতির কাছে তার (প্রতি পাঠানো) আমার রসূল আসতো, তারা তাকে মিথ্যুক সাব্যস্ত করতো। আর যখনই বিপথগামীরা নবীদেরকে মিথ্যুক সাব্যস্ত করতো, তখনই আমি এক জাতির পর আর এক জাতি ধ্বংস করেছি। তাদের ধ্বংসের মধ্যে শিক্ষা গ্রহণকারীদের জন্যে শিক্ষা নিহিত রয়েছে। তাদেরকে কাহিনীর বিষয়ে পরিণত করেছি।

অর্থাৎ এমন শিক্ষণীয় বিষয়ে পরিণত করেছি, যা যুগ যুগ ধরে জনশ্রুতির আকারে এক প্রজন্ম থেকে আর এক প্রজন্মের কাছে হস্তান্তরিত হবে।

অতপর এই আকস্মিক ও সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনার সমাপ্তি টানা হয়েছে অভিশাপ বাণী উচ্চারণের মধ্য দিয়ে, 'সুতরাং যারা ঈমান আনে না তাদের ওপর অভিসম্পাত।'

এরপর মূসা (আ.)-এর নবী রূপে প্রেরিত হওয়া ও মিথ্যুক সাব্যস্ত হওয়ার কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে, যাতে আলোচনার ধারাবাহিকতা রক্ষা পায় এবং এর উদ্দেশ্য সফল হয়। 'তারপর আমি প্রেরণ করলাম মূসা ও হারুনকে .... তারা উভয়কে মিথ্যুক সাব্যস্ত করলো, ফলে তারা ধ্বংস হয়ে গেলো।' (আয়াত ৪৫-৪৮)

এখানেও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, কাফেররা একজন মানুষের নবী হওয়ার ওপরই আপত্তি তুলেছে।

'তারা বললো আমাদেরই মতো দু'জন মানুষের ওপর আমরা ঈমান আনবো নাকি?' এই সাথে তৎকালীন মিসরে বনী ইসরাঈলের সামাজিক অবস্থার কথাও উত্থাপন করা হয়েছে যে,

'অথচ মূসা ও হারুনের গোত্র তো আমাদের দাসত্ব করছে।'

অর্থাৎ আমাদের অনুগত ও পদানত। বনী ইসরাঈলের এই সামাজিক অবস্থাই মূসা ও হারুন (আ.)-কে হেয় করা ও অপমাণিত করার প্রতি ফেরাউন ও তার দল বলকে অধিকতর প্ররোচিত করেছিলো।

এ ক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠতে পারে যে নবী ভ্রাতৃদ্বয়ের কাছে যে অলৌকিক নিদর্শন বা মোজেযা ছিলো এবং সেই সুবাদে তাদের হাতে যেটুকু প্রভাব ছিলো, তা কি ফেরাউনকে কিছুমাত্র প্রভাবিত করতে পারেনি? এর জবাব এই যে, তাদের মন পার্থিব জাঁকজমক ও শান শওকত, প্রচলিত সামাজিক ধ্যান ধারণা, মানসিকতা ও সস্তা মূল্যবোধের বৃত্তে আটকা পড়ে এতোই বিকৃত হয়ে গিয়েছিলো যে, সে মোজেযা তাদেরকে মোটেই প্রভাবিত করতে পারেনি।

এরপর সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে হযরত ঈসা ও তাঁর মা মারিয়াম (আ.)-এর প্রসংগ এবং ঈসার অলৌকিক জন্মের বিষয়টা। হযরত মূসা (আ.)-এর মোজেযার ন্যায় এটাকেও অবিশ্বাসীরা মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিলো। (আয়াত ৪৯-৫০)

৫০ নং আয়াতে যে 'রাবওয়া' অর্থাৎ 'সুউচ্চ জলাশয় বিশিষ্ট নিরাপদ আশ্রয়স্থলে' হযরত ঈসা ও তার মা মরিয়মকে আশ্রয় দেয়ার কথা বলা হয়েছে, সেই স্থানটা নিয়ে মতভেদ রয়েছে যে, ওটা কি মিশরে, দামেস্কে না বাইতুল মাকদেসে অবস্থিত? হযরত মারিয়াম, হযরত ঈসা (আ.)-কে তার শৈশরে ও কৈশবে এসব জায়গায় নিয়ে গিয়েছিলেন বলে খৃষ্টানদের ধর্মগ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে। আসলে এখানে তাদের আশ্রয় স্থলের অবস্থান নির্ণয় করা উদ্দেশ্য নয়। বরঞ্চ আল্লাহ তায়ালা তাদের উভয়কে একটা সুজলা, সুফলা ও সুরক্ষিত চমৎকার জায়গায় আশ্রয় দিয়েছিলেন, এ কথা জানানোই এর উদ্দেশ্য।

রেসালাতের ধারাবাহিক বিবরণ দিতে দিতে এই পর্যায়ে এসে নবী ও রসূলদেরকে সামষ্টিকভাবে সম্বোধন করা হয়েছে। আর এই সম্বোধন করার সময়ে তাদের স্থান ও কালের ব্যবধানের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে তাদের সবাইকে একই জায়গায় সমবেত ধরে নেয়া হয়েছে এবং যে অভিন্ন আদর্শ তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করে, সেই অভিন্ন আদর্শকে আঁকড়ে ধরতে বলা হয়েছে,

হে রসূলরা, তোমরা পবিত্র খাবার খাও ও সৎ কাজ করো।' (আয়াত ৫১-৫২)

নবীদেরকে সম্বোধন করে এই ভাষণ এ জন্যেই দেয়া হয়েছে, যাতে তারা তাদের মানবীয় স্বভাব প্রকৃতি বজায় রেখে নবুওতের দায়িত্ব পালন করেন এবং এই স্বভাব প্রকৃতির স্বীকৃতি দিতে যারা নারায, তাদের ভ্রান্তি দূর করতে পারেন। বলা হয়েছে, 'পবিত্র খাবার খাও।' খাওয়া দাওয়া একটা সাধারণ স্বভাবসুলভ মানবিক দাবী। কিন্তু বিশেষভাবে পবিত্র ও হালাল খাদ্য খাওয়া এমন একটা মহৎ কাজ যা মানুষের মর্যাদাকে আরো সুসংহত করে, তাকে বিশুদ্ধ করে এবং ফেরেশতাদের পর্যায়ভুক্ত করে।

আর পৃথিবীতে সৎভাবে জীবন যাপনের আদেশ দেয়াও এই ভাষণের উদ্দেশ্য। বলা হয়েছে, 'এবং সৎ কাজ করো।' বস্তুত কাজ করা মানুষ মাত্রেরই স্বভাব। কিন্তু সৎ কাজ মানুষের মধ্য থেকে সৎ ও ন্যায় পরায়ন মানুষকে বাছাই করে আলাদা করে, এতে তার কাজের একটা নিয়ম ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে, যা তাকে সৃষ্টির সর্বোচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করে।

রসূল তার মানবীয় স্বভাব বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলুন এটা কাম্য নয়। বরং স্বাভাবিক মানবিক স্বভাব বৈশিষ্ট্য নিয়ে তাঁর সম্ভাব্য সেই সর্বোচ্চমানে উন্নীত করাটাই কাম্য, যা আল্লাহ তায়ালা মানুষের জন্যে নির্ধারণ করে দিয়েছেন এবং নবীদেরকে যার সর্বোত্তম নমুনা বানিয়েছেন। আর আল্লাহ তায়ালাই তাঁর সূক্ষ্ম মানদন্ডে তাদের কর্মকান্ডকে যাচাই ও মূল্যায়ন করবেন। এ জন্যেই বলেছেন,

'তোমরা যা করো তা আমি জানি।'

যে একমাত্র ও অভিন্ন আদর্শ রসূলরা সাথে করে এনেছেন, যে অভিন্ন স্বভাব ও চরিত্র তাদেরকে সাধারণ মানুষ থেকে পৃথক ও অসাধারণ মানুষে পরিণত করেছে, যে একমাত্র স্রষ্টা তাদেরকে প্রেরণ করেছেন, তার সামনে তাদের স্থান ও কালের সকল পার্থক্য দূরীভূত হয়ে গেছে। এ কথাই বলা হয়েছে ৫২ নং আয়াতে,

'তোমাদের এই যে জাতি, তা তো একই জাতি এবং আমিই তোমাদের মনিব, সুতরাং আমাকেই তোমরা ভয় করো।'

فَتَقَطَّعُوٓا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا ۖ كُلُّ حِزْبٍۭ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿٥٣﴾ فَذَرْهُمْ

فِى غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٥٤﴾ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِۦ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ ﴿٥٥﴾

نُسَارِعُ لَهُمْ فِى ٱلْخَيْرَٰتِ ۚ بَل لَّا يَشْعُرُونَ ﴿٥٦﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ هُم مِّنْ

خَشْيَةِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ ﴿٥٧﴾ وَٱلَّذِينَ هُم بِـَٔايَٰتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٨﴾ وَٱلَّذِينَ

هُم بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴿٥٩﴾ وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَآ ءَاتَوا۟ وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ

أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَٰجِعُونَ ﴿٦٠﴾ أُو۟لَٰٓئِكَ يُسَٰرِعُونَ فِى ٱلْخَيْرَٰتِ وَهُمْ لَهَا

سَٰبِقُونَ ﴿٦١﴾ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ وَلَدَيْنَا كِتَٰبٌ يَنطِقُ بِٱلْحَقِّ ۚ وَهُمْ

لَا يُظْلَمُونَ ﴿٦٢﴾ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِى غَمْرَةٍ مِّنْ هَٰذَا وَلَهُمْ أَعْمَٰلٌ مِّن دُونِ

ذَٰلِكَ هُمْ لَهَا عَٰمِلُونَ ﴿٦٣﴾ حَتَّىٰٓ إِذَآ أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِم بِٱلْعَذَابِ إِذَا هُمْ

৫৩. কিন্তু লোকেরা নিজেদের মাঝে (এ মৌলিক) বিষয়টাকে বহুধাবিভক্ত করে দিয়েছে; আর প্রত্যেক দলের কাছে যা কিছু আছে তা নিয়েই তারা পরিতুষ্ট। ৫৪. অতএব (হে নবী), তুমি তাদের একটা সুনির্দিষ্ট সময়ের জন্যে (নিজ নিজ) বিভ্রান্তিতে (পড়ে থাকার জন্যে) ছেড়ে দাও, ৫৫. তারা কি এটা ধরে নিয়েছে, আমি তাদের যে ধন সম্পদ ও সন্তান সন্ততি দিয়ে সাহায্য করছি ৫৬. এবং আমি সব সময়ই তাদের জন্যে সকল প্রকার কল্যাণ ত্বরান্বিত করে যাবো? (না, আসলে তা নয়-) কিন্তু এরা (সে সম্পর্কে) কিছুই বোঝে না। ৫৭. যারা নিজেদের মালিকের ভয়ে সদা ভীত সন্ত্রস্ত থাকে, ৫৮. যারা তাদের মালিকের (নাযিল করা) আয়াতসমূহের ওপর ঈমান আনে, ৫৯. যারা তাদের মালিকের (মালিকানার) সাথে অন্য কাউকে শরীক করে না, ৬০. যারা (তাঁর পথে) যা কিছু দিতে পারে (মুক্তহস্তে) দান করে, (তারপরও) তাদের মন ভীত কম্পিত থাকে, তাদের একদিন তাদের মালিকের কাছে ফিরে যেতে হবে, ৬১. (সত্যিকার অর্থে) এরাই হচ্ছে সেসব মানুষ, যারা নেকীর কাজে সদা তৎপর, (উপরন্তু) তারা (সবার চাইতে) অগ্রগামীও। ৬২. আমি কারো ওপরই তার সাধ্যাতীত বোঝা চাপাই না, (প্রত্যেক মানুষের আমল সংক্রান্ত) একটি গ্রন্থ আমার কাছে (সংরক্ষিত) আছে, যা (তাদের অবস্থার কথা একদিন ঠিক) ঠিক বলে দেবে, তাদের ওপর কোনো যুলুম করা হবে না। ৬৩. বরং তাদের অন্তর এ বিষয়ে আঁধারে আচ্ছন্ন হয়ে আছে, এ ছাড়াও তাদের (জীবনে) আরো বহুতরো (খারাপ) কাজ আছে যা তারা সব সময়ই করে থাকে। ৬৪. (এরা এসব কাজ থেকে কখনো ফিরে আসে না,) যতোক্ষণ না আমি তাদের ঐশ্বর্যশালী লোকদের শাস্তি দ্বারা

يَجْـَٔرُوْنَ ﴿٦٤﴾ لَا تَجْـَٔرُوا الْيَوْمَ ۖ اِنَّكُمْ مِّنَّا لَا تُنْصَرُوْنَ ﴿٦٥﴾ قَدْ كَانَتْ
اٰيٰتِيْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلٰٓى اَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُوْنَ ﴿٦٦﴾ مُسْتَكْبِرِيْنَ ۖ بِهٖ
سٰمِرًا تَهْجُرُوْنَ ﴿٦٧﴾ اَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ اَمْ جَآءَهُمْ مَّا لَمْ يَاْتِ اٰبَآءَهُمُ
الْاَوَّلِيْنَ ﴿٦٨﴾ اَمْ لَمْ يَعْرِفُوْا رَسُوْلَهُمْ فَهُمْ لَهٗ مُنْكِرُوْنَ ﴿٦٩﴾ اَمْ يَقُوْلُوْنَ بِهٖ
جِنَّةٌ ۭ بَلْ جَآءَهُمْ بِالْحَقِّ وَاَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كٰرِهُوْنَ ﴿٧٠﴾ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ
اَهْوَآءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ ۭ بَلْ اَتَيْنٰهُمْ
بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿٧١﴾ اَمْ تَسْـَٔلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ
خَيْرٌ ۖ وَّهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ﴿٧٢﴾ وَاِنَّكَ لَتَدْعُوْهُمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٧٣﴾

আঘাত করি, তখন তারা সাথে সাথেই আর্তনাদ করে ওঠে; ৬৫. (তখন বলা হবে,) আজ আর আর্তনাদ করো না, আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কোনো সাহায্য করা হবে না। ৬৬. যখন আমার আয়াতসমূহ তোমাদের সামনে পড়ে পড়ে শোনানো হতো, তখন (তা শোনামাত্রই) তোমরা উল্টো দিকে সরে পড়তে, ৬৭. (সরে পড়তে) নেহায়াত দম্ভভরে, (পরে নিজেদের মজলিসে গিয়ে) অর্থহীন গল্প গুজব জুড়ে দিতে। ৬৮. এরা কি (কোরআন)-এর কথার ওপর চিন্তা ভাবনা করে না, কিংবা তাদের কাছে (নতুন কিছু একটা) এসেছে যা তাদের বাপ দাদাদের কাছে আসেনি, ৬৯. অথবা তারা কি তাদের রসূলকে চিনতে পারেনি– যে জন্যে তারা তাকে অস্বীকার করছে? ৭০. কিংবা তারা কি একথা বলে, তার সাথে (কোনো রকম) পাগলামী রয়েছে; বরং (আসল কথা হচ্ছে,) রসূল তাদের কাছে সত্য নিয়ে হাযির হয়েছে এবং তাদের অধিকাংশ লোকই এ সত্যকে অপছন্দ করে। ৭১. যদি 'সত্য' তাদের ইচ্ছা আকাংখার অনুগামী হয়ে যেতো, তাহলে আসমানসমূহ ও যমীন এবং আরো যা কিছু এ উভয়ের মাঝে আছে, অবশ্যই তা বিপর্যস্ত হয়ে পড়তো; পক্ষান্তরে আমি তাদের কাছে তাদের (নিজেদের) কাহিনীই নিয়ে এসেছি, কিন্তু (আশ্চর্য), তারা (এখন) তাদের নিজেদের কথাবার্তা থেকেই মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। ৭২. (হে নবী,) তবে কি (এরা মনে করে) তুমি এদের কাছে (দ্বীন পৌঁছানোর জন্যে) কোনো রকম পারিশ্রমিক দাবী করছো, (অথচ) তোমার মালিকের দেয়া পারিশ্রমিক (এদের পার্থিব পারিশ্রমিকের তুলনায়) অনেক উৎকৃষ্ট, আর তিনি তো হচ্ছেন সর্বোত্তম রেযেকদাতা। ৭৩. তুমি তো তাদের সঠিক পথের দিকেই আহ্বান করছো।

وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ ﴿٧٤﴾ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ
وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرٍّ لَّلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿٧٥﴾ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُم
بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ﴿٧٦﴾ حَتَّىٰ إِذَا فَتَحْنَا
عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿٧٧﴾ وَهُوَ الَّذِي
أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۚ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿٧٨﴾ وَهُوَ
الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٧٩﴾ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي
وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٨٠﴾ بَلْ قَالُوا مِثْلَ
مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ ﴿٨١﴾ قَالُوا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿٨٢﴾
لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَٰذَا مِن قَبْلُ إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٨٣﴾

৭৪. অবশ্য যারা আখেরাতের ওপর ঈমান আনে না তারা (হেদায়াতের) সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যাচ্ছে। ৭৫. (আজ) যদি আমি এদের ওপর দয়া করি এবং যে বিপদ মসিবত তাদের ওপর আপতিত হয়েছে তা যদি দূর করে দেই, তাহলেও এরা নিজেদের না-ফরমানীতে শক্তভাবে বিভ্রান্ত হয়ে যাবে। ৭৬. (এক পর্যায়ে) আমি এদের কঠোর আযাব দ্বারা পাকড়াও করলাম, তারপরও এরা নিজেদের মালিকের প্রতি নত হলো না এবং কখনো এরা কাতর প্রার্থনাটুকু পর্যন্ত (আমার কাছে) পেশ করলো না। ৭৭. অতপর যখন (সত্যিই) আমি এদের ওপর কঠোর আযাবের দুয়ার খুলে দেবো তখন তুমি দেখবে, এরা (কতো) হতাশ হয়ে পড়ছে।

রুকু ৫

৭৮. (হে মানুষ,) তিনিই আল্লাহ তায়ালা, যিনি তোমাদের (শোনার জন্যে) কান, (দেখার জন্যে) চোখ (ও চিন্তা গবেষণার জন্যে) মন দিয়েছেন, কিন্তু তারা খুব অল্পই (এসব দানের) শোকর আদায় করে। ৭৯. তিনি তোমাদের সৃষ্টি করে যমীনে (তোমাদের) বংশ বিস্তার করে (চারদিকে ছড়িয়ে) রেখেছেন, (একদিন) তোমাদের সবাইকে (আবার) তাঁর কাছেই একত্রিত করা হবে। ৮০. তিনিই তোমাদের জীবন দান করেন, তিনিই তোমাদের মৃত্যু ঘটান, রাতদিনের আবর্তনও তাঁর (ইচ্ছায় সংঘটিত হয়, এতো সব কিছু দেখেও) তোমরা কি (সত্য) অনুধাবন করবে না? ৮১. (নবীদের সামনে) এরাও কিন্তু সে ধরনের অর্থহীন কথাই বলে, যেমনি করে তাদের আগের লোকেরা বলেছে। ৮২. তারা বলেছিলো, আমরা যখন মরে যাবো, আমরা যখন মাটি ও হাড্ডিতে পরিণত হয়ে যাবো, তখনও কি আমরা পুনরুত্থিত হবো? ৮৩. (তারা বলে, আসলে এভাবেই) আমাদের ও আমাদের পূর্ববর্তী লোকদের (পুনরুত্থানের) ওয়াদা দিয়ে আসা হচ্ছে, (মৃত্যুর পর আবার জীবনলাভের) এ কথাগুলো অতীত দিনের উপকথা ব্যতীত আর কিছুই নয়।

قُلْ لِّمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَآ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٨٤﴾ سَيَقُولُونَ لِلّٰهِ ۚ قُلْ أَفَلَا
تَذَكَّرُونَ ﴿٨٥﴾ قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿٨٦﴾
سَيَقُولُونَ لِلّٰهِ ۚ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٨٧﴾ قُلْ مَنْ بِيَدِهٖ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُوَ
يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٨٨﴾ سَيَقُولُونَ لِلّٰهِ ۚ قُلْ فَأَنّٰى
تُسْحَرُونَ ﴿٨٩﴾ بَلْ أَتَيْنٰهُمْ بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكٰذِبُونَ ﴿٩٠﴾ مَا اتَّخَذَ اللّٰهُ مِنْ
وَّلَدٍ وَّمَا كَانَ مَعَهٗ مِنْ إِلٰهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلٰهٍۢ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ
عَلٰى بَعْضٍ ۚ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿٩١﴾ عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعٰلٰى
عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٩٢﴾ قُلْ رَّبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ ﴿٩٣﴾

৮৪. (হে নবী, এদের) জিজ্ঞেস করো, এ যমীনে এবং এখানে যা (কিছু সৃষ্টি) আছে তা কার (মালিকানাধীন)? ৮৫. ওরা বলবে (হাঁ), সব কিছুই আল্লাহর; (তুমি) বলো, এরপরও তোমরা কি চিন্তা ভাবনা করবে না? ৮৬. তুমি (এদের আরো) জিজ্ঞেস করো, এ সাত আসমান ও মহান আরশের অধিপতি কে ? ৮৭. ওরা জবাব দেবে, (এসব কিছুই) আল্লাহর; তুমি বলো, তারপরও তোমরা কি (আল্লাহকে) ভয় করবে না? ৮৮. তুমি (আবারও) জিজ্ঞেস করো, যদি তোমরা (সত্যি সত্যিই) জানো তাহলে বলো, কার হাতে রয়েছে (আসমান যমীন) সবকিছুর একক কর্তৃত্ব? (হাঁ,) তিনি (যাকে ইচ্ছা তাকেই) পানাহ দেন, কিন্তু তাঁর ওপর কাউকে পানাহ দেয়া যায়না। ৮৯. ওরা (আবারও) সাথে সাথে বলবে, (হ্যাঁ) মহান আল্লাহ তায়ালার; তুমি বলো, এ সত্ত্বেও তোমরা কেমন করে বিভ্রান্ত হচ্ছো? ৯০. আমি তো বরং সত্য কথাই এদের কাছে পৌঁছে দিয়েছিলাম, কিন্তু এরাই মিথ্যাবাদী! ৯১. আল্লাহ তায়ালা (কাউকেই) সন্তান হিসেবে গ্রহণ করেননি– না তাঁর সাথে অন্য কোনো মাবুদ রয়েছে, যদি (তাঁর সাথে অন্য কোনো মাবুদ) থাকতো তাহলে প্রত্যেক মাবুদ নিজ নিজ সৃষ্টি নিয়ে চলে যেতো এবং (এ মাবুদরা) একে অন্যের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করতে চাইতো, এরা যা কিছু আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে বলে তিনি তা থেকে অনেক পবিত্র ও মহান। ৯২. দৃশ্য অদৃশ্য সবকিছুর সম্যক ওয়াকেফহাল তিনি, সুতরাং এরা আল্লাহ তায়ালার সাথে অন্যদের যেভাবে শরীক করে তিনি তার চাইতে (অনেক) পবিত্র।

রুকু ৬

৯৩. (হে নবী,) তুমি বলো, হে আমার মালিক, যে (আযাবের) ওয়াদা এ (কাফেরদের) সাথে করা হচ্ছে, তা যদি তুমি আমাকে দেখাতেই চাও,

رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٩٤﴾ وَإِنَّا عَلٰٓى أَنْ نُّرِيَكَ مَا

نَعِدُهُمْ لَقٰدِرُوْنَ ﴿٩٥﴾ اِدْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ ؕ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا

يَصِفُوْنَ ﴿٩٦﴾ وَقُلْ رَّبِّ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزٰتِ الشَّيٰطِيْنِ ﴿٩٧﴾ وَأَعُوْذُ بِكَ رَبِّ

أَنْ يَّحْضُرُوْنِ ﴿٩٨﴾

৯৪. (তাহলে) হে আমার মালিক, তুমি আমাকে যালেম সম্প্রদায়ের মধ্যে শামিল (করে এ আযাব প্রত্যক্ষ) করায়ো না। ৯৫. (হে নবী,) আমি তাদের কাছে যে (আযাবের) ওয়াদা করেছি তা অবশ্যই তোমাকে দেখাতে সক্ষম। ৯৬. (হে নবী, তারা তোমার সাথে) কোনো খারাপ ব্যবহার করলে তুমি এমন পন্থায় তা দূর করার চেষ্টা করো, যা হবে নিতান্ত উত্তম (পন্থা); আমি তো ভালো করেই জানি ওরা তোমার ব্যাপারে কি বলে। ৯৭. (হে নবী) তুমি (বরং) বলো, হে আমার মালিক, শয়তানদের যাবতীয় ওয়াসওয়াসা থেকে আমি তোমার পানাহ চাই। ৯৮. (আরো বলো, হে আমার মালিক,) আমি এ থেকেও তোমার পানাহ চাই যে, শয়তান আমার (ধারে) কাছে ঘেঁষবে।

তাফসীর

আয়াত ৫৩-৯৮

এ অংশটা সূরার তৃতীয় পাঠ বা তৃতীয় অধ্যায়। পূর্ববর্তী নবীদের অনুসারীদের পরের যে মানব সমাজকে শেষ নবী এসে পেয়েছেন, তাদের চিত্র এ অংশে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এতে দেখানো হয়েছে যে, যে অভিন্ন মতাদর্শ নিয়ে নবীরা এসেছিলেন, সে বিষয়ে তারা বিরোধ ও বিতর্কে লিপ্ত ছিলো।

এ অংশে এটাও দেখানো হয়েছে যে, এই প্রজন্মের মানব গোষ্ঠী নবীদের প্রচারিত আদর্শ তথা ইসলাম সম্পর্কে উদাসীন এবং তাদের সে উদাসীনতার পরিণতি সম্পর্কে তারা অচেতন ছিলো। অথচ যারা ঈমান এনেছিলো, তারা আল্লাহর এবাদাত করতো ও সৎকাজ করতো। আর এই এবাদাত ও সৎকাজ সত্তেও তারা তাদের পরিণতি সম্পর্কে শংকিত এবং আপন মনিবের কাছে ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে ভীত সন্ত্রস্ত থাকতো। এভাবে একদিকে মোমেনের অন্তরের সতর্কতা ও সচেতনতাকে এবং অপরদিকে কাফেরের মনের অসতর্কতা ও অচৈতন্যকে পাশাপাশি তুলে ধরা হয়েছে। অতপর এই অবস্থাগুলো নিয়ে বারবার পর্যালোচনা করা হয়েছে। কখনো তাদের চিন্তাধারা ও সন্দেহ সংশয়কে ঘোরতর নিন্দা সমালোচনার মাধ্যমে এবং কখনো মানব মনের অভ্যন্তরে ও প্রকৃতির বিশাল প্রান্তরে বিরাজমান নিদর্শনাবলীকে সাক্ষ্য প্রমাণ হিসেবে তুলে ধরার মাধ্যমে অপনোদনের চেষ্টা করা হয়েছে।

এই বিস্তারিত আলোচনার পর জনগণকে তাদের অবধারিত পরিণতির হাতে সমর্পণ করা হয়েছে এবং রসূল (স.)-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, তিনি যেন তার কাজ চালিয়ে যান,

কাফেরদের শত্রুতা ও গোয়ার্তুমিতে রেগে না যান, তাদের অপতৎপরতাকে তিনি যেন যথাসম্ভব সৌজন্যেপূর্ণ আচরণের মাধ্যমে প্রতিরোধ করেন এবং যে শয়তান কাফেরদেরকে বিপথগামী করেছে, সেই শয়তান থেকে তিনি যেন আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করেন।

'তারা তাদের (মৌলিক) বিষয়টিকে বহু খন্ডে বিভক্ত করে ফেললো ....। (আয়াত ৫৩, ৫৪, ৫৫ ও ৫৬)

নবীরা তো ছিলেন পরিপূর্ণ ঐক্যমত পোষণকারী একটা সুসংহত মানব গোষ্ঠী, তাদের দাওয়াত, মতামত, এবাদাত, দৃষ্টিভংগি সবই ছিলো এক ও অভিন্ন। অথচ তাদের তিরোধানের পর মানব জাতি হয়ে পড়ে নানা মতের নানা গোষ্ঠীতে বিভক্ত। কোনো ব্যাপারেই তারা ঐক্যমত পোষণ করতো না।

কোরআনের বর্ণনাভংগি তাদের এই মতভেদকে অত্যন্ত স্বচ্ছ, সুস্পষ্ট ও বস্তুনিষ্ঠভাবে উপস্থাপন করেছে। এতে বলা হয়েছে যে, তারা নবীদের প্রচারিত দ্বীন সম্পর্কে এতো বিতর্কে লিপ্ত হলো যে, এ ব্যাপারে তাদের অভিমতকে তারা বহু খন্ডে বিভক্ত করলো। অতপর প্রত্যেকটা গোষ্ঠী তার ভাগে যে খন্ডটা পড়েছে, তা নিয়ে আনন্দে বিভোর হয়ে পড়লো। এই আনন্দে তারা এতোই দিশেহারা হয়ে পড়লো যে, আর কোনো দিকে তাদের কোনো হুঁশ থাকলো না। তারা একেবারেই অচেতন ও উদাসীন হয়ে পড়লো ভিন্ন মতামতের ব্যাপারে।

তাদের এই চিত্র তুলে ধরার সাথে সাথে রসূল (স.)-কে সম্বোধন করা বলা হয়েছে যে,

'ওদেরকে ওদের সে দিশেহারা অবস্থায় মত্ত থাকতে দাও।'

অর্থাৎ ওরা নিজেদের মতামত ও তৎপরতায় ডুবে থাকুক। একদিন যখন সহসা তারা অবধারিত পরিণতির সম্মুখীন হবে, তখন মজাটা টের পাবে।

পরবর্তী আয়াতে তাদের উদাসীনতার প্রতি উপহাস ও বিদ্রূপ করে বলা হয়েছে, তারা ভেবেছে যে, তাদেরকে যে কিছু কাল যা ইচ্ছে তাই করে বেড়ানোর অবাধ সুযোগ দেয়া হয়েছে এবং পরীক্ষার মেয়াদকালে অর্থ সম্পদ ও জন সম্পদ দিয়ে যে তাদেরকে ভূষিত করা হয়েছে, সেটা তাদের দ্রুত কল্যাণ সাধন ও তাদেরকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে অনুগৃহীত করার উদ্দেশ্যেই করা হয়েছে, কিন্তু আসলে তা নয়। এই প্রাচুর্য ও সমৃদ্ধি তাদেরকে পরীক্ষা স্বরূপই দেয়া হয়েছে। এর পশ্চাতে তাদের জন্যে যে মহা অকল্যাণ ও শোচনীয় পরিণতি অপেক্ষা করছে, সেটা তারা বুঝতেই পারছে না। (আয়াত ৫৫-৫৬)

মানব চরিত্রে ঈমানের প্রভাব

বিপথগামী জনগোষ্ঠীর এই উদাসীনতার পাশাপাশি মোমেনদের সতর্কতা ও সচেতনতাকেও তুলে ধরা হয়েছে,

'নিশ্চয় যারা তাদের মনিবের ভয়ে ভীত, যারা তাদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলীতে বিশ্বাস করে...... তারাই কল্যাণধর্মী কাজে দ্রুতগামী এবং অগ্রণী।' (আয়াত ৫৭-৬১)

এ আয়াতগুলো থেকে জানা যায়, ঈমান মানুষের মনের ওপর কেমন তীব্র প্রভাব বিস্তার করে, মনকে কত সংবেদনশীল, স্পর্শকাতর, সচেতন ও সচকিত করে, যাবতীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করার পরও তাকে কতো পরিণামদর্শী সাবধানী ও সংযমী রূপে গড়ে তোলে।

মোমেনরা আল্লাহর ভয়ে সর্বদা ও সংযত থাকে। তারা তার নিদর্শনাবলীতে বিশ্বাস রাখে এবং তার সাথে কাউকে শরীক করে না। তারা তাদের যাবতীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করে। যতোদূর সাধ্যে কুলায়, আল্লাহর আনুগত্য করে ও আল্লাহর পথে অর্থ সম্পদ দান করে।

কিন্তু তারপরও তৃপ্তি পায় না, স্বস্তি বোধ করে না, বরং আল্লাহর কাছে ফিরে যাওয়ার ভয়ে তাদের মন দুরু দুরু করে কাঁপতে থাকে। কেননা সব সময় তারা মনে করে, আল্লাহর প্রতি দায়িত্ব পালনে তাদের ক্রটি বিচ্যুতি ও কমতি থেকেই যাচ্ছে। যা কিছু দান করে তা তাদের দৃষ্টিতে নগণ্য ও অপর্যাপ্ত মনে হয়।

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে রসূল, এই আয়াতে 'আল্লাহর পথে দান করার সময়ও যাদের মন ভয়ে কাঁপে' কথাটা দ্বারা কি এ কথাই বুঝানো হয়েছে যে, চোর মদ খোর ও ব্যাভিচারীরা আল্লাহর ভয়ে ভীত থাকে? রসূল (স.) বললেন, ওহে সিদ্দীকের মেয়ে, তা নয়। বরঞ্চ এখানে নামাযী, রোযাদার ও সদকাকারী সম্পর্কেই বলা হয়েছে যে, সে এসব সৎকাজ করেও আল্লাহর ভয়ে ভীত থাকে।' (তিরমিযী)

আসলে মোমেনের অন্তর এতো সংবেদনশীল হয়ে থাকে যে, সে জানে যে, অনবরতভাবে তার ঘাড়ের ওপর আল্লাহর হাত রয়েছে। সে প্রতিটা শ্বাস প্রশ্বাসে অনুভব করে যে, আল্লাহর অশেষ নেয়ামত সে ভোগ করছে। তাই সে যতো এবাদাতই করে, তাকে সে যথেষ্ট মনে করে না। আল্লাহর নেয়ামতের তুলনায় তার করা যাবতীয় সৎকাজই তার কাছে অতি ক্ষুদ্র ও নগণ্য বলে মনে হয়। অনুরূপভাবে, তার আশাপাশের প্রতিটা অণুপরমাণুকে আল্লাহর বিরাট শক্তি ও প্রতাপের প্রতীক বলে সে মনে করে এবং তার আশপাশের প্রতিটা গন্ডিতে সে আল্লাহর হাত সক্রিয় দেখতে পায়। এ জন্যে সে সর্বদা এই ভয়ে জড় সড় থাকে যে, আল্লাহর দায়িত্ব পালনে বহু ক্রটি-বিচ্যুতি ও অসম্পূর্ণতা নিয়েই কখন না জানি তাঁর দরবারে উপস্থিত হতে হয়।

এ ধরনের লোকেরাই নিজেদের কল্যাণ সাধনে দ্রুতগামী ও অগ্রণী। তারা তাদের সদা জাগৃতি, সদা সচেতনতা, সার্বক্ষণিক ব্যস্ততা, তৎপরতা ও আনুগত্য দিয়েই নিজেদের কল্যাণ সাধন করে থাকে। পক্ষান্তরে উদাসীন ও নিরুদ্বেগ জীবন-যাপনকারীরা, যারা মনে করে যে, তারা তো কল্যাণের জন্যেই দুনিয়ায় এসেছে এবং যাবতীয় সুখ ও সমৃদ্ধি তাদের জন্যেই তৈরী হয়েছে, তারা প্রকৃতপক্ষে অকল্যাণের পথের যাত্রী, তারা সেই পাখির মতো, যাকে মজার মজার খাবারের লোভ দেখিয়ে যবাই করার জন্যে ডাকা হয়। মানুষের মধ্যে এ ধরনের 'পাখির' সংখ্যা নেহাৎ কম নয়। পার্থিব সুখ সমৃদ্ধি তাদেরকে এতোই মাতোয়ারা করে রাখে যে, তারা পরিণাম সম্পর্কে একেবারেই নিশ্চিন্ত ও উদাসীন হয়ে যায়। অবশেষে এই উদাসীনতার মধ্য দিয়েই এক সময় আকস্মিকভাবে আপন শোচনীয় পরিণতির সম্মুখীন হয়।

পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন যে, মুসলমানের মনে ইসলামের সৃষ্টি করা এই জাগৃতি ও সচেতনতা কোনো অসাধ্য ব্যাপার নয়। হৃদয়ে ঈমানের স্থীতিশীল ও অবিচল অবস্থান থেকেই তা জন্ম নেয়। আল্লাহর সার্বভৌমত্ব, তার কাছে প্রত্যাবর্তনের অনিবার্যতা এবং গোপন ও প্রকাশ্যে তার সার্বক্ষণিক ও সর্বত্র উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতনতাই এই জাগৃতি ও সংবেদনশীলতা জমানোর জন্যে যথেষ্ট।

'আমি কাউকে তার ক্ষমতাবহির্ভূত কোনো কাজের দায়িত্ব অর্পণ করি না। আমার কাছে এমন এক দফতর রয়েছে যা সত্য সম্পর্কে সোচ্চার। তাদের ওপর কোনো যুলুম করা হয় না।'

বস্তুত আল্লাহ তায়ালা যাকে যেমন যোগ্যতা ও ক্ষমতা দিয়েছেন, তাকে সেই যোগ্যতা ও ক্ষমতা অনুপাতে তদ্রূপ দায়িত্ব দিয়েছেন। এই দায়িত্ব নিজ নিজ ক্ষমতা অনুসারে কে কতোটা পালন করে, সে ব্যাপারে তিনিই হিসাব নেবেন। কারো ওপর ক্ষমতা বহির্ভূত কাজের দায়িত্ব চাপালে বা যা করেছে তার উপযুক্ত প্রতিদান দিতে কসূর করলে অবশ্যই যুলুম করা হয়। আল্লাহ তায়ালা কারো ওপর যুলুম করেন না। মানুষ যা কিছু করে, তার সঠিক বিবরণ আল্লাহর সেই

দফতরে সুরক্ষিত থাকে, যা একেবারে সত্য বিবরণ লিপিবদ্ধ করে থাকে, কিছু মাত্র কম লিপিবদ্ধ করে না। বস্তুত আল্লাহ তায়ালা সবচেয়ে নিখুঁত হিসাবে গ্রহণকারী।

দ্বীন সম্পর্কে উদাসীনতা ও তার কারণ

উদাসীন লোকেরা উদাসীন হয়ই শুধু এই কারণে যে, তারা প্রকৃত সত্য সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে এবং এ ব্যাপারে জ্ঞান অর্জনে বিরত থাকার কারণে এ সংক্রান্ত জ্ঞানের আলো তাদেরকে স্পর্শ করে না। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'বরং এই সত্য সম্পর্কে তাদের মন অচেতন।...........' (আয়াত ৬৩, ৬৪, ৬৬ ও ৬৭)

অর্থাৎ তাদের বর্তমান নিষ্ক্রিয়তার কারণ এটা নয় যে, তাদের ওপর তাদের ক্ষমতা বহির্ভূত কোনো দায়িত্ব চাপানো হয়েছে বরং এর কারণ হলো তাদের মনের অচেতনতা ও অজ্ঞতা। কোরআন যে সত্য ও সঠিক বার্তা এনেছে, তা তারা জানতে সচেষ্ট নয়। তারা বরং অন্যান্য কাজে ব্যস্ত থাকে।

'এ ছাড়া তারা অন্যান্য বহু কাজে ব্যস্ত থাকে।'

এরপর আকস্মিকভাবে যখন কোনো দুর্যোগ তাদের ওপর এসে পড়ে তখন তাদের কী দশা হয়ে থাকে, তার বিবরণ দেয়া হয়েছে,

'অবশেষে যখন তাদের মধ্যকার ধনাঢ্যদেরকে আমি আযাব দিয়ে পাকড়াও করি, তখন তারা বিলাপ করতে থাকে।'

আসলে ধনাঢ্য লোকেরাই অধিকতর ভোগবিলাসে ও দুষ্কর্মে লিপ্ত থাকে এবং পরিণাম সম্পর্কে অচেতন থাকে। এদের ওপর আকস্মিক আযাবও এসে থাকে এবং আযাব এলেই তারা দিশেহারা হয়ে বিলাপ ও চিৎকার করে সাহায্য ও করুণা ভিক্ষা করে থাকে। ভোগ বিলাস, উদাসীনতা, অহংকার ও দাম্ভিকতার বিপরীতে এই সময়ে তারা নিম্নরূপ ধমক খায়,

'আজ তোমরা বিলাপ করো না। তোমরা আমার পক্ষ থেকে কোনো সাহায্য পাবে না।'

এরপরই সেই দৃশ্যটা তুলে ধরা হয়েছে, যেখানে তারা সর্বদিক থেকে শুধু ধমক খাবে এবং সকল সহায়তাকারীর কাছ থেকে নৈরাশ্যজনক জবাব পাবে। আর তাদেরকে তাদের সেই উদাসীনতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হবে, যখন তারা আখেরাতের কথা ভুলে কেবল দুনিয়ার ভোগবিলাসে মত্ত ছিলো। তোমাদেরকে আমার আয়াতগুলো পড়ে শোনানো হতো, কিন্তু তোমরা পেছনের দিকে সরে যেতে।' (আয়াত ৬৬-৬৭)

অর্থাৎ তোমরা এমনভাবে পেছনে সরে যেতে, যেন তোমাদের সামনে যে ওহী পড়িয়ে শোনানো হয়েছে, তা কোনো ভয়ংকর বিপজ্জনক জিনিস, যা থেকে তোমরা আত্মরক্ষার চেষ্টা করছো। অথচ তোমরা অহংকারের সাথে সত্যকে অস্বীকার করে চলেছো। সেই সাথে গল্প গুজবের আড্ডায় তোমরা রসূল (স.) ও ওহী সম্পর্কে নানা রকমের কটূক্তিও করে থাকো। রসূল (স.) ও কোরআনের বিরুদ্ধে তারা এই কটূক্তি ও অশালীন উক্তি নিজেদের বৈঠকাদিতেও করতো, আবার পবিত্র কাবার চত্বরে মূর্তিগুলোর পাশে বসে আড্ডা দেয়ার সময়ও করতো। তাদের এই আচরণের বদলা কিভাবে নেয়া হবে, কোরআন এখানে সেই দৃশ্যের ছবি তুলে ধরেছে। সেদিন তারা বিলাপ করবে এবং সাহায্য চাইবে। কোরআন তাদের সেই অশালীন আড্ডাবাজি ও কুরুচিপূর্ণ কটূক্তিগুলোর কথা এমনভাবে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যেন সব ঘটনা এই মুহূর্তেই ঘটছে এবং সেগুলো তারা দেখছে ও উপভোগ করছে! এভাবে কেয়ামতের দৃশ্যগুলোকে জ্বলজ্যান্ত চলতি ঘটনার আকারে অংকিত করে দেখানো কোরআনের কুশলী বর্ণনা ভংগিরই বৈশিষ্ট্য ও কৃতিত্ব।

মোশরেকদের নিজস্ব বৈঠকাদিতে ও আড্ডাখানাগুলোতে রসূল (স.) ও কোরআনের বিরুদ্ধে কুৎসিত আক্রমণ পরিচালনার উদ্দেশ্য ছিলো তাদের জাহেলিয়াতসুলভ দাম্ভিকতার প্রকাশ ঘটানো। এই দাম্ভিকতা তাদের বোধশক্তিকে বিকৃত ও অন্তর চক্ষুকে অন্ধ করে দিয়েছিলো বিধায় তারা সত্যের মূল্য মর্যাদা উপলব্ধি করতে পারতো না। তাই তারা সত্যের বিরুদ্ধে উপহাস ও ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে ও নানা রকমের অভিযোগ তুলে মনের ঝাল ঝাড়তো। সকল যুগেই এ ধরনের লোকের সাক্ষাত পাওয়া যায়। আরবের জাহেলিয়াত অতীতের অন্যান্য জহেলিয়াতের নমুনা ছিলো মাত্র। এখানে মাঝে মাঝে এর আত্মপ্রকাশ ঘটে।

এরপর তাদেরকে আখেরাতের হুমকি ও ধমকের দৃশপট থেকে সরিয়ে নিয়ে পুনরায় দুনিয়ার দৃশ্যপটে হাযির করা হয়েছে। তারপর তাদের সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা হয়েছে ও তাদের আচরণে বিস্ময় প্রকাশ করা হয়েছে,

'তারা কি এই বাণী সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে না? না তাদের কাছে এমন অভিনব কিছু এসেছে, যা তাদের পূর্ব পুরুষদের কাজে আসেনি? ...... (আয়াত ৬৮-৭৪)

বস্তুত রসূল (স.)-এর কাছে যে বাণী এসেছে, তা নিয়ে যে ব্যক্তি চিন্তা ভাবনা করে তার পক্ষে সে বাণীকে প্রত্যাখ্যান করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। কেননা এ বানীতে যে পূর্ণতা সমন্বয়, আকর্ষণ, মানবীয় স্বভাব প্রকৃতির সাথে সংগতি, মানবীয় বিবেকের স্বাভাবিক ও স্বতস্ফূর্ত মতের প্রতিফলন, মনের খোরাক, চিন্তা গবেষণার উপাদান, উচ্চতর ও মহৎ দৃষ্টিভংগি এবং সুষ্ঠু ও নিখুঁত আইন ও বিধান রয়েছে, তা মানবীয় স্বভাব প্রকৃতির প্রতিটি উপাদানকে উদ্দীপিত ও পরিপুষ্ট করার নিশ্চয়তা দান করে। সুতরাং আল্লাহর এ বাণীকে প্রত্যাখ্যান করার একমাত্র কারণ ও এর অন্তর্নিহিত একমাত্র রহস্য এই যে, তারা এ বাণী নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে না এবং একে হৃদয়ংগম করার চেষ্টা করে না।

'না কি তাদের কাছে এমন কিছু এসেছে, যা তাদের পূর্ব-পুরুষদের কাছে আসেনি?'

অর্থাৎ তাদের কাছে একজন রসূলের আগমন বা তাওহীদের বার্তা নিয়ে কারো আগমন কি তাদের ও তাদের পূর্ব-পুরুষদের জন্যে একেবারেই অভিনব, অনাকাংখিত ও অপ্রত্যাশিত? সমগ্র ইতিহাসই তো সাক্ষী যে, প্রতিটা মানব গোষ্ঠীর কাছে অনবরতই কোনো না কোনো রসূল এসেছেন এবং প্রত্যেকে একই বার্তা বহন করে এনেছেন।

'না কি তারা তাদের রসূলকে চিনতেই পারেনি ......?' আর এই চিনতে না পারাই কি তাদের প্রত্যাখ্যানের আসল কারণ? কিন্তু তা নয়। তারা তাদের রসূলকে সঠিকভাবেই চেনে ও জানে। তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয় ও তাঁর বংশীয় পরিচয় উভয়ই তাদের জানা। তাঁর গুণাবলী তারাই সবচেয়ে ভালো জানে। তাঁর সততা, সত্যবাদিতা ও বিশ্বস্ততা সম্পর্কে তারা এতো ওয়াকিফহাল যে রসূল হিসাবে আবির্ভূত হওয়ার পূর্বেই তারা তাঁকে 'আল আমীন' উপাধিতে ভূষিত করেছিলো।

'না কি তারা বলে সে উম্মাদ?'

তাদের মধ্যকার কিছু কিছু নির্বোধ ব্যক্তি একথা বলতো। অথচ তারা নিশ্চিতভাবেই বিশ্বাস করতো যে, তাদের মধ্যে তিনিই একমাত্র পরিপক্ক ও পূর্ণাংগ বুদ্ধিমান। কেননা তাঁর সুদীর্ঘ জীবনেতিহাসে তাঁর কোনো পদস্খলন ঘটতে তারা দেখেওনি, শোনেওনি।

সত্য কারো যুক্তি বা খেয়াল খুশীর ধার ধারে না

এসব সন্দেহ সংশয়ের একটারও কোনো ভিত্তি নেই। এসবের আসল কারণ হলো, এই অকাট্য সত্য বিধানের প্রতি তাদের অধিকাংশের বিরাগ বা অপছন্দ। কেননা যে বাতিল চিন্তাধারা

ও ধ্যান ধারণা নিয়ে তারা বেঁচে আছে ও গর্ব বোধ করে, এই অকাট্য সত্য বাণী তার বিরোধী ও তাকে উৎখাত করতে চায়।

'বরঞ্চ এই রসূল সত্য বাণী নিয়ে এসেছে এবং তাদের অধিকাংশই সত্যকে অপছন্দ করে।'

সত্য কখনো মানুষের খেয়াল-খুশীর অনুসারী হতে পারে না। এই সত্যের ওপরই আকাশ ও পৃথিবী টিকে আছে, এই সত্য বিধান অনুসারেই গোটা সৃষ্টি জগত নির্ভুলভাবে চলছে এবং বিশ্বজগতের যেখানে যা কিছু আছে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় এই সত্য বিধানই মেনে চলছে।

'সত্য যদি তাদের কামনা-বাসনা অনুসারে চলতো, তাহলে আকাশ, পৃথিবী ও তার অভ্যন্তরে যা কিছু আছে, সব ধ্বংস হয়ে যেতো।'

কেননা সত্য এক ও চিরস্থায়ী। কিন্তু কামনা বাসনা বহু ও পরিবর্তনশীল। চিরন্তন ও শাশ্বত সত্যের ভিত্তিতেই বিশ্বজগত পরিচালিত। সুতরাং জগত পরিচালনার নীতি নিত্য পরিবর্তনশীল কামনা বাসনার দাবী অনুসারে বিকৃত হতে পারে না। প্রকৃতির বিধান ক্ষণস্থায়ী আবেগ দ্বারা চালিত হতে পারে না। প্রকৃতির রাজ্য যদি মানুষের ক্ষণস্থায়ী ও নিত্য পরিবর্তনশীল ভাবাবেগের অনুসারী হতো, তা হলে তা ধ্বংস হয়ে যেতো এবং সেই সাথে লন্ড ভন্ড হয়ে যেতো গোটা মানব জাতি, সমাজ ব্যবস্থা ও মূল্যবোধ, মানদন্ড ও মাপ কাঠি। আর তাহলে এই মূল্যবোধ ও মানদন্ড ক্রোধ ও সন্তোষের ক্ষেত্রে, অনুরাগ ও বিরাগের ক্ষেত্রে, ভয় ও ভালোবাসার ক্ষেত্রে, সক্রিয়তা ও নিস্ক্রিয়তার ক্ষেত্রে এবং সকল ধরনের ভাবাবেগের ক্ষেত্রে দোদুল্যমান থাকতো এবং একবার এদিকে আর একবার ওদিকে যেতো। বস্তু জগতের নির্মাণ ও সে লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্যে তার একটা স্থীতিশীল ভিত্তির ওপর চলে সুনির্দিষ্ট নিয়ম অনুসরণ করে ক্রমাগত সামনের দিকেই পরিচালিত হওয়া আবশ্যক। ডানে বামে ঝোঁক, পশ্চাৎপদতা ও দোদুল্যমানতা এড়িয়ে পূর্ণ ভারসাম্য সহকারে অবিচল গতিতে লক্ষ্য পানে অগ্রসর হওয়া সৃষ্টি জগতের পক্ষে অপরিহার্য।

বিশ্ব জগতের গঠন ও পরিচালনা সংক্রান্ত এই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতির আলোকেই ইসলাম মানব জীবনের জন্যে আইন প্রণয়নকে প্রাকৃতিক বিধানেরই একটা অংশে পরিণত করেছে। যে মহাশক্তিধর হাত ও এ বিশ্বজগতের পরিচালনা ও এর সকল অংশের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেন, তিনিই মানব জীবনের জন্যে প্রয়োজনীয় আইন রচনা করেন। যেহেতু মানুষ এই মহাবিশ্বেরই অংশ এবং মহাবিশ্বকে নিয়ন্ত্রণকারী সর্বব্যাপী প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন, তাই যে সত্ত্বা গোটা বিশ্ব প্রকৃতির নিয়ম-বিধি রচনা করেছেন, মহাবিশ্বের এই অংশ মানুষের জন্যে আইন ও বিধান রচনা করাও তাঁর পক্ষেই শোভন ও সমীচীন। এ বিশ্বজগতকে তিনি এক বিস্ময়কর ভারসাম্য সহকারে পরিচালনা করছেন। ফলে প্রাকৃতিক ও পরিবেশগত ব্যবস্থা কারো ভাবাবেগ বা খেয়াল খুশী মোতাবেক চলে না এবং চলে না বলেই তার শৃংখলা ব্যাহত হয় না ও অরাজকতার কবলে পড়ে না। বরঞ্চ তা সর্বাত্মক সত্য বিধানের তথা আল্লাহর বিধানের অনুসারী এবং আল্লাহর পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার অধীন।

যে জাতির মধ্যে ইসলামের অভ্যুদয় ঘটেছে, সত্যের অনুসরণ ও আনুগত্যের যোগ্যতা এই জাতির মধ্যেই সর্বাধিক। আর এই সত্য ইসলাম ছাড়া আর কিছু নয়। ইসলাম শুধু যে একমাত্র সত্য ও নির্ভুল বিধান তা নয়, বরং এটা মুসলিম জাতির জন্যে সম্মান ও মর্যাদার বাহনও। পৃথিবীতে ইসলাম না এলে এই জাতির নামও কেউ জানতো না।

'বরঞ্চ আমি তাদের খ্যাতি এনে দিয়েছি। তখন তারা তাদের খ্যাতি থেকেই মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে।'

বস্তুত ইসলামের অভ্যুদয়ের পূর্বে বিশ্ব ইতিহাসে আরব জাতির কোনো খ্যাতি ছিলো না। পরে যতোদিন তারা ইসলামকে আঁকড়ে ধরে রেখেছে, ততোদিন তাদের নাম বিশ্ববাসীর কর্ণগোচর হয়েছে। কিন্তু যখনই তারা ইসলাম থেকে দূরে সরে গিয়েছে, তখন থেকে তাদের খ্যাতি ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হতে আরম্ভ করেছে। তারা পুনরায় তাদের এই বৃহৎ ঠিকানায় ফিরে না আসা পর্যন্ত তাদের খ্যাতি আর কিছুতেই পুনর্বহাল হবে না।

সত্যের দাওয়াত আরবদের কাছে আসার পর তারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে নিজেদের পৌত্তলিক মতাদর্শকেই সত্য বলে দাবী করেছিলো। এই প্রসংগেই এই আনুষংগিক মন্তব্যটি করা হয়েছে যে, সত্য যদি তাদের খেয়ালখুশী ও ধ্যান-ধারণার অনুসারীই হতো, তাহলে আকাশ ও পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যেতো।........ এই আনুষংগিক মন্তব্যের পর পুনরায় তাদের মতাদর্শের নিন্দা সমালোচনা ও তাদের সেসব সন্দেহ-সংশয় দূর করা হচ্ছে, যা তাদেরকে এই সৎ ও বিশ্বাসভাজন নবীর দাওয়াত প্রত্যাখ্যানের প্ররোচনা দিচ্ছিলো।

'তবে কি তুমি তাদের কাছে কোনো পারিশ্রমিক চাইছো?'

অর্থাৎ ইসলামের শিক্ষা ও পথনির্দেশ দানের পারিশ্রমিক চেয়েছে বলেই কি তারা তোমার কাছ থেকে পালাচ্ছে? আসলে তুমি তো তাদের কাছে কিছুই চাওনি। কেননা তোমার প্রভুর কাছে তোমার জন্যে যে প্রতিদান ও পুরস্কার রয়েছে, সেটাই উত্তম প্রতিদান।

'তোমার প্রভুর প্রতিদানই উত্তম এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ দাতা।'

বস্তুত আল্লাহর অফুরন্ত নেয়ামতের হকদার একজন নবীর জন্যে দুনিয়ার দরিদ্র, পরমুখাপেক্ষী ও দুর্বল মানুষের কাছে চাওয়ার ও পাওয়ার কী ইচ্ছা থাকতে পারে? নবী তো দূরের কথা, নবীর অনুসারীদের জন্যেই বা এসব নগণ্য পার্থিব সম্পদের মধ্যে এমন কী লোভনীয় সামগ্রী আছে, যার জন্যে তারা লালায়িত হতে পারে? তাদের মন ও দৃষ্টি তো নিবদ্ধ থাকার কথা আল্লাহর কাছে সঞ্চিত পুরস্কারের দিকে, যিনি অল্প বা বেশী শ্রমের বিনিময়েও জীবিকা দিয়ে থাকেন। প্রকৃত পক্ষে যখন কারো মন আল্লাহর সাথে মিলিত হয়, তখন তার দৃষ্টিতে গোটা পৃথিবী ও তার সমস্ত-সহায়-সম্পদ হেয় মনে হয়।

বস্তুত আল্লাহর রসূল মানুষের কাছ থেকে সত্য ও সঠিক পথে পরিচালিত হওয়া ও সৎ কাজ করা ছাড়া আর কিছুই কামনা করেন না।

'তুমি তো তাদেরকে সঠিক পথের দিকেই আহ্বান কর।'

যে পথ মানুষকে আল্লাহর সাথে মিলিত করে এবং আল্লাহর অনুগত বিশ্ব-প্রকৃতির সাথে এক কাতারে শামিল করে। ফলে তার গোটা জীবন সঠিকভাবে পরিচালিত হয় এবং কখনো বিপথগামী হয় না।

পক্ষান্তরে মোশরেকেরা পরকালে অবিশ্বাসী অন্যান্যদের মতই বিপথগামী,

'আর যারা আখেরাতে বিশ্বাস করে না, তারা সঠিক ও সত্য পথ থেকে বিচ্যুত।'

তারা যদি সুপথগামী হতো, তাহলে তাদের বিবেক ও মন আখেরাতে বিশ্বাসের পথই অনুসরণ করতো। কেননা আখেরাতই হচ্ছে সর্বাত্মক পূর্ণতা পরিপক্কতা ও ন্যায় বিচার বাস্তবায়নের সুনিশ্চিত স্থান। আখেরাত হচ্ছে ইহকালীন জীবনের সুষ্ঠু পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার নিমিত্তে আল্লাহর মনোনীত প্রাকৃতিক বিধানেরই অংশ বিশেষ।

পরবর্তী আয়াতগুলোতে আল্লাহ বলছেন যে, যারা আখেরাতে বিশ্বাস করে না এবং যারা সত্য পথ থেকে বিচ্যুত, তাদেরকে বিপদ-মুসিবত, দুঃখ ও দারিদ্র অথবা সুখ, শান্তি ও প্রাচুর্য যেটা

দিয়েই পরীক্ষা করা হোক না কেন, তা সুফল বয়ে আনে না। তাদেরকে যদি সম্পদ ও প্রাচূর্য দান করা হয়, তাহলে তারা মনে করে যে, তাদের জন্যে আমি ত্বরিত কল্যাণ কামনা করি বলেই তাদেরকে মানব সম্পদ ও অর্থ সম্পদে প্রাচূর্য দান করে থাকি। আর যদি তাদের ওপর বিপদ-মুসিবত আসে তাহলেও তাদের মন নরম হয় না, তাদের বিবেক জাগ্রত হয় না এবং তারা বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্যে আল্লাহর কাছে কাকুতি মিনতি করে না। এভাবে অনমনীয় ও হঠকারী মানসিকতা নিয়েই তারা শেষ পর্যন্ত মারা যায় এবং কেয়ামতের দিন কঠিন আযাবের সম্মুখীন হয়ে চরম হতাশায় দিশেহারা হয়ে পড়ে।

'আর যদি আমি তাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করি ও তারা যে বিপদে আছে তা থেকে উদ্ধার করি, তাহলে তারা তাদের হঠকারিতা অব্যাহত রাখে আর আমি তাদেরকে আযাব দিয়েও পাকড়াও করেছি। তাতেও তারা তাদের প্রতিপালকের সামনে কিছুমাত্র নতি স্বীকার ও কাকুতি মিনতি করে না। অবশেষে আমি যখন তাদের ওপর কঠিন আযাবের দ্বারোদঘাটন করেছি, অমনি তারা হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে।'

এটা এমন একশ্রেণীর মানুষের চরিত্রের সাধারণ বিশ্লেষণ যাদের হৃদয় পাষাণ হয়ে গেছে, যারা আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে উদাসীন এবং যারা আখেরাতকে মিথ্যা মনে করে। রসূল (স.)-এর সময়কার পৌত্তলিকরা এই শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত ছিলো।

বিপদে আপদে আল্লাহর কাছে কাকুতি মিনতি করে ও অনুতপ্ত হয়ে দোয়া করা ও উদ্ধার চাওয়া আল্লাহর না-ফরমানী পরিত্যাগ করে তাঁর আনুগত্যের দিকে ফিরে যাওয়ার প্রমাণ বহন করে। এ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আক্রান্ত মানুষটা আল্লাহকেই একমাত্র আশ্রয়স্থল ও একমাত্র ত্রাণকর্তা বলে মনে করে। যখন কারো মন এভাবে আল্লাহর কাছে নত হয়, তখন তা অবশ্যই নরম হয়ে যায়, জাগ্রত ও সচেতন হয়ে যায়। একমাত্র এই জাগৃতি ও সচেতনতা এবং এই সংবেদনশীলতা ও স্পর্শকাতরতাই মানুষকে উদাসীনতা, পদস্খলন ও গোমরাহী থেকে রক্ষার নিশ্চয়তা দেয়। এই জাগরণও অনুশোচনা থাকলে মানুষ বিপদ মুসিবত দ্বারা উপকৃত হয়। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি বিপদ মুসিবতে পড়েও গোমরাহী ও বিকৃতি অব্যাহত রাখে, তার আর সংশোধনের আশা করা যায় না। আখেরাতের আযাব তার জন্যে অবধারিত হয়ে যায় এবং সে আকস্মিকভাবেই তার শিকার হয়ে যায়। যখন সে এই আযাবের সম্মুখীন হয়, তখন তার আর মুক্তির কোনো আশা থাকে না।

প্রতি মুহূর্তেই আমরা নিদর্শনের মুখোমুখি হচ্ছি

এর পরের তিনটে আয়াতে মানুষের মনমগযকে তাদের নিজ নিজ সত্ত্বার অভ্যন্তরে ও আশপাশের প্রকৃতিতে বিরাজমান ঈমানের উপকরণগুলো সম্পর্কে সচেতন করার প্রয়াস চালানো হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'তিনিই সেই আল্লাহ, যিনি তোমাদের কান চোখ ও হৃদয় সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু তোমরা খুব কমই শোকর আদায় করে থাক। তিনিই পৃথিবীতে তোমাদেরকে ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং তাঁর কাছেই তোমাদেরকে ফিরে যেতে হবে। তিনিই জীবন ও মৃত্যু দিয়ে থাকেন এবং রাত ও দিনের আবর্তন তাঁর জন্যেই হয়ে থাকে। তবুও কি তোমরা বুঝবে না?'

মানুষ যদি তার সৃষ্টি তত্ত্ব ও গঠন প্রণালী সম্পর্কে চিন্তা করে, তার ইন্দ্রিয় শক্তি ও অংগ-প্রত্যংগ সম্পর্কে চিন্তা করে এবং তার মধ্যকার শক্তি সামর্থ্য ও জ্ঞান বুদ্ধির কথা চিন্তা করে তাহলে সে অবশ্যই আল্লাহর সন্ধান পেয়ে যাবে। এ সকল বিস্ময়কর সৃষ্টি রহস্যই তাকে আল্লাহর

সন্ধান দিয়ে দেবে। কারণ, এগুলো একক ও অভিন্ন সৃষ্টিকর্তারই পরিচয় বহন করে। এর দ্বারা এটাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, এ সকল বিস্ময়কর সৃষ্টির মধ্য থেকে ছোট বড় কোনো একটিও সৃষ্টি করার মতো ক্ষমতা আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত আর অন্য কারো নেই।

এই একটি মাত্র শ্রবণ শক্তির কথাই ধরুন। ভেবে দেখেছেন কি এটা কি ভাবে কাজ করে? কিভাবে বিভিন্ন শব্দ তরংগ থেকে একটা নির্দিষ্ট শব্দকে ধারণ করে নিয়ে সেটাকে নিজের সাথে খাপ খাইয়ে নেয়? এই দৃষ্টি শক্তির ব্যাপারটাই ধরুন। ভেবে দেখেছেন কি এটা কি ভাবে কাজ করে? কি ভাবে বিভিন্ন আলো ও চিত্র ধারণ করে? এই অন্তরটার কথা কি কোনোদিন ভেবে দেখেছেন, সেটা কি এবং কি ভাবে অনুভব করে? কি ভাবে বিভিন্ন বস্তু, বিভিন্ন আকৃতি, বিভিন্ন অর্থ, বিভিন্ন মান, বিভিন্ন অনুভূতি এবং বিভিন্ন অনুভূত বস্তুর মূল্যায়ন করে?

আসলে কেউ যদি শুধু এই ইন্দ্রিয় শক্তি ও বিভিন্ন অংগ-প্রতংগের প্রকৃতি এবং এগুলোর কর্ম প্রণালী সম্পর্কেই জ্ঞান লাভ করতে পারে, তাহলে এর মাধ্যমেই সে মানব জগতের একটা বিস্ময়কর রহস্য উদঘাটন করতে সক্ষম হবে। আর যদি এগুলোর সৃষ্টি ও গঠন প্রণালীর রহস্য উদঘাটন করে, তবে তো কথাই নেই। কারণ, মানুষ যে জগতে বাস করছে, সে জগতের প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে তার সকল অংগ-প্রত্যংগ ও ইন্দ্রিয় শক্তিকে সৃষ্টি করা হয়েছে। এতো নিখুঁতভাবে এই সামঞ্জস্য রক্ষা করা হয়েছে যে, এর মাঝে সামান্যতম তারতম্য ঘটলে মানুষের জীবনে বিপর্যয় নেমে আসবে। তখন তার কানে কোনো শব্দই তরংগায়িত হবে না, তার চোখে কোনো আলোই ধরা পড়বে না। কিন্তু এই মহা জাগতিক কর্মকান্ডের পেছনে যার শক্তি ও কুদরত কাজ করছে তিনি মানুষের প্রকৃতি এবং যে জগতে সে বাস করছে সে জগতের প্রকৃতির মাঝে পূর্ণ সামঞ্জস্য রক্ষা করেছেন বলেই উভয়ের মাঝে যোগসূত্র অক্ষুণ্ণ রয়েছে। তা সত্তেও মানুষ এই নেয়ামতের শোকর আদায় করে না। তাই বলা হয়েছে,

'তোমরা খুব কমই শোকর আদায় করে থাকো'

বলা বাহুল্য, শোকরের প্রথম স্তরই হচ্ছে দাতার পরিচয় লাভ করা, তাঁর বিভিন্ন গুণাবলীর প্রশংসা করা। এরপর একমাত্র তাঁরই এবাদাত বন্দেগী করা। কারণ, তিনি একক ও অভিন্ন। তাঁর একত্ব ও অভিন্নতার প্রধান সাক্ষীই হচ্ছে তাঁর সৃষ্টি নৈপুণ্যের অসংখ্য নিদর্শনাবলী। সব শেষে জীবন ও জীবনের সুখ শান্তি ভোগ করার জন্যে এসব ইন্দ্রিয় শক্তি ও অংগ-প্রত্যংগ ব্যবহার করার সময় আল্লাহকে স্মরণ করা, প্রতিটি কাজ ও প্রতিটি উপভোগের মুহূর্তে হৃদয় দিয়ে আল্লাহকে অনুভব করা।

'তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে ছড়িয়ে রেখেছেন'

তোমাদেরকে পৃথিবীর কর্তৃত্ব দান করেছেন, খেলাফতের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। এই দায়িত্ব পালনের জন্যে তোমাদের শ্রবণ শক্তি, দৃষ্টি শক্তি, মনন শক্তিসহ বিভিন্ন প্রয়োজনীয় শক্তি সামর্থ্য ও যোগ্যতা অভিজ্ঞতা দান করেছেন। এরপর তোমাদেরকে তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে। তখন তোমাদের বিচার হবে। পার্থিব জীবনের ভাল মন্দ, ন্যায় অন্যায় এবং ত্রুটি বিচ্যুতি যা কিছু করেছে সে সবের বিচার হবে। কারণ, তোমাদেরকে অহেতুক সৃষ্টি করা হয়নি। তোমাদেরকে লাগামহীন ছেড়ে দেয়া হয়নি। বরং তোমাদের সৃষ্টির পেছনে বিশেষ উদ্দেশ্য রয়েছে, বিশেষ রহস্য রয়েছে এবং একটা বিশেষ নিয়ম নীতি রয়েছে।

'তিনিই জীবন দেন এবং মৃত্যু ঘটান' ....

আসলে জীবন ও মৃত্যু হচ্ছে এমন দুটো ঘটনা যা প্রতি মুহূর্তে ঘটে চলেছে। তবে আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত অন্য কেউ হায়াত মউতের মালিক নয়। মানুষ যদিও উন্নততর একটা প্রাণী, কিন্তু সে একটি কোষেও জীবন সঞ্চার করতে সক্ষম নয়। তেমনিভাবে সত্যিকার অর্থে কোনো প্রাণীর

প্রাণও সংহার করতে সক্ষম নয়। কারণ জীবনের রহস্য তিনিই জানেন, যিনি জীবন দান করেন। ফলে জীবন দান করার ক্ষমতা ও জীবন অবসানের ক্ষমতা একমাত্র তাঁর হাতেই রয়েছে। এটা ঠিক যে, মানুষ কখনো কখনো জীবন নাশের কারণ ও হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে থাকে। কিন্তু, তাই বলে সত্যিকার অর্থে তারা কোনো জীবন্ত প্রাণীকে জীবন মুক্ত করতে পারে না। এ কাজ একমাত্র আল্লাহর। তিনিই জীবন দান করেন এবং তিনিই জীবন ছিনিয়ে নেন, অন্য কেউ নয়।

'এবং দিবা-রাত্রির বিবর্তন তাঁরই কাজ'........

অর্থাৎ দিবা-রাত্রির পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ তাঁর হাতেই। জীবন ও মৃত্যুর পরিবর্তনের ন্যায় দিন ও রাতের পরিবর্তনও একটি নির্দিষ্ট জাগতিক নিয়মের অধীনেই ঘটে। জীবন ও মৃত্যুর ব্যাপারটি আত্মা ও দেহের সাথে, আর দিন ও রাতের ব্যাপারটি জগত ও সৌরমন্ডলীর সাথে সম্পৃক্ত। জীবন্ত প্রাণীর প্রাণ সংহার করলে তার দেহ যেমন নিস্তেজ ও নিষ্ক্রীয় হয়ে পড়ে, তেমনিভাবে পৃথিবী থেকে আলো ছিনিয়ে নিলে পৃথিবীর বুকে অন্ধকার নেমে আসে, নিস্তব্ধতা ছেয়ে যায়। এরপর পুনরায় জীবন ফিরে আসলে আলোও ফিরে আসে। এই পরিবর্তন ও বিবর্তন অবিরাম ও নিরবিচ্ছিন্নভাবে ঘটে চলছে ও চলবে যতো দিন পর্যন্ত না আল্লাহর পক্ষ থেকে ভিন্ন কোনো নির্দেশ জারি হয়।

'তোমরা কি বুঝো না?'

এর মাঝে মহান আল্লাহর অসীম কুদরতের কি নিদর্শন ও প্রমাণ রয়েছে? তোমরা কি উপলব্ধি করতে পারনা যে, এই জীবন ও জগতের যিনি একচ্ছত্র মালিক, সৃষ্টিকর্তা ও ব্যবস্থাপক তিনিই এ সবের পরিচালনায় নিয়োজিত?

কাফের ও মোশরেকদের হঠকারিতা

কাফের মোশরেকদেরকে লক্ষ্য করে দেয়া বক্তব্য থেকে ওদের তর্ক-বিতর্কের বিষয় থেকে সরে গিয়ে একটি ভিন্ন প্রসংগ অবতারণা করা হচ্ছে। সেটা হলো, বিভিন্ন দলীল-প্রমাণাদি ও নিদর্শনাদি স্বচক্ষে দেখার পরও ওরা পরকালীন জীবন বিশেষ করে পুনরুত্থান ও হিসাব নিকাশ সম্পর্কে কি মতামত পোষণ করে। ওদের বক্তব্য হচ্ছে নিম্নরূপ,

'বরং তারা বলে যেমন তাদের পূর্ববর্তীরা বলতো.........। (আয়াত ৮১-৮৩)

আল্লাহর কুদরতের শত শত আলামত ও নিদর্শন দেখার পরও এ জাতীয় বক্তব্য নিতান্তই অবান্তর ও আজগুবী। আল্লাহ তায়ালা তো মানুষকে শ্রবণ শক্তি, দৃষ্টি শক্তি ও মননশীলতা দান করেছেন যেন সে তার ক্রিয়া কর্ম ও আচার-আচরণের জন্যে দায়ী হয় এবং তার ভাল মন্দের ফলাফল নিজেই ভোগ করে। আর এটা স্বতঃসিদ্ধ কথা যে, সর্বশেষ হিসাব নিকাশ ও প্রতিদানের স্থান হচ্ছে পরকালীন জীবন। পার্থিব জীবনে তা হবার নয়। কারণ, এর জন্যে নির্দিষ্ট স্থান ও সময় রয়েছে। আর তা হচ্ছে মৃত্যুর পর ও কেয়ামতের ময়দানে। আল্লাহ তায়ালাই তো জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান কাজেই পুনরুত্থানের ব্যাপারটি তাঁর জন্যে মোটেও কোনো কঠিন ব্যাপার নয়। কারণ, জীবনের বিচরণ প্রতি মুহূর্তে ঘটছে এবং এর উৎপত্তিও প্রতি মুহূর্তে ঘটছে। কিভাবে ঘটছে এবং কোথা থেকে ঘটছে তা একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই জানেন।

আল্লাহর বিজ্ঞানময়তা, তাঁর পুনরায় জীবনদানের ক্ষমতা উপলব্ধি করতেই কেবল ওরা ব্যর্থ হয়নি বরং পরকালের হিসাব-নিকাশ ও পুনরুত্থানের ব্যাপার নিয়ে ওরা হাসি-তামাশা করে এবং বলাবলি করে যে, সে জাতীয় ওয়াদা তাদের বাপ-দাদাদের সাথেও করা হয়েছে যা এখনও বাস্তবায়িত হয়নি। ওরা বলে,

'অতীতে আমাদেরকে এবং আমাদের পিতৃ পুরুষদেরকে এই ওয়াদাই দেয়া হয়েছে। এটা তো পূর্ববর্তীদের কল্প কথা বৈ কিছু নয়।'

আল্লাহর নির্ধারিত সময়ে এবং আল্লাহর নিজস্ব পরিকল্পনা ও দূরদৃষ্টি অনুযায়ী পুনরুত্থান ঘটবে। এটা কারো আবেদনের কারণে নির্ধারিত সময়ের পূর্বেও ঘটবে না বা কোনো অজ্ঞ, মূর্খ ও অচেতন গোষ্ঠীর হাসি-ঠাট্টার কারণে বিলম্বেও ঘটবে না।

আরব দেশের মোশরেকেরা আদর্শিক বিভ্রান্তিতে ভুগছিলো। তারা আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার করতো না। তারা এ বাস্তব সত্যকেও অস্বীকার করতো না যে, আল্লাহই হচ্ছেন যমীন ও আসমানের মালিক, যমীন ও আসমানের পরিচালক এবং যমীন ও আসমানের নিয়ন্ত্রক। কিন্তু তা সত্তেও ওরা আল্লাহর সাথে কিছু কল্পিত দেব-দেবীদেরকেও শরীক করতো। ওদের বক্তব্য হলো, আল্লাহর সান্নিধ্য লাভে সহায়ক হবে বলে ওরা এসব দেব-দেবীর পূজা-অর্চনা করে। ওদের আর একটি দোষ হলো, ওরা আল্লাহর সাথে কিছু কন্যাকেও সম্পর্কযুক্ত করতো। অথচ আল্লাহ তায়ালা এসব থেকে সম্পূর্ণ রূপে পবিত্র ও মুক্ত।

নির্ভেজাল তাওহীদের দাওয়াত

এখানে আল্লাহ তায়ালা অবিশ্বাসীদের স্বীকৃত ও ঘোষিত সত্যগুলোকেই ওদের সামনে তুলে ধরছেন। ওদের আদর্শিক দ্বন্দ্ব ও বিভ্রান্তির অবসান ঘটানোর জন্যে এবং এর মাধ্যমে ওদেরকে নির্ভেজাল তাওহীদের দিকে ফিরিয়ে নেয়ার জন্যে। অবশ্য ওরা যদি স্বভাব ধর্মের ওপর টিকে থাকে এবং এ থেকে বিচ্যুত না হয়ে থাকে। অন্যথায় হেদায়াত ওদের ভাগ্যে জুটবে না। তাই বলা হচ্ছে,

'বলো পৃথিবী এবং পৃথিবীতে যারা আছে, তারা কার? যদি তোমরা জান, তবে বলো ....(আয়াত ৮৪-৮৯)

যুক্তি তর্কের ধরন দেখেই বুঝা যায় ওদের বিভ্রান্তি কোন পর্যায়ের। এটা এমন পর্যায়ের বিভ্রান্তি যার সাথে যুক্তির তো দূরের কথা, সাধারণ বিবেক-বুদ্ধিরও সম্পর্ক নেই। এই যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে ইসলামের সূচনালগ্নে আরব উপ-দ্বীপের মোশরেক সম্প্রদায়ের আকীদা-বিশ্বাসে কতোটুকু পচন ধরেছিলো সেটা প্রকাশ পায়।

তাদেরকে যদি পৃথিবী এবং পৃথিবীর মধ্যকার যাবতীয় প্রাণী ও বস্তুর মালিক সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয় তাহলে তারা উত্তরে বলবে, আল্লাহ তায়ালা। কিন্তু ওরা যখন গায়রুল্লাহর উপাসনা করতে যায় তখন এই বাস্তব সত্যটিকে বে-মালুম ভুলে যায়। তাই নবীকে বলা হচ্ছে,

'বলো, তবুও কি তোমরা স্মরণ করবে না?'

এরপর তাদেরকে সপ্ত আকাশ এবং মহান আরশের মালিক, পরিচালক ও নিয়ন্ত্রক সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে। উল্লেখ্য যে, এখানে সপ্ত আকাশ বলতে সাতটি কক্ষপথ, অথবা সাতটি নক্ষত্রপুঞ্জ অথবা সাতটি নীহারিকা অথবা সাতটি জগত অথবা যে কোনো সাতটি মহাকাশীয় জাতীয় সৃষ্টি জগত। আর 'মহা আরশ' গোটা সৃষ্টি জগতের ওপর আল্লাহর কর্তৃত্ব ও প্রভুত্বের প্রতীক হিসেবে এসেছে। মোট কথা, যখন তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হয় যে, সপ্ত আকাশ এবং মহান আরশের প্রভু কে? তখন তারা বলে, আল্লাহ তায়ালা! মাটিতে পড়ে থাকা নিথর ও মর্যাদাহীন প্রস্তর মূর্তিগুলোকে আল্লাহর শরীক ঠাওরাতে গিয়ে ওরা মহান আরশের মালিককে ভয় করে না, সপ্ত আকাশের প্রভুকে ভয় করে না! তাই নবীকে বলতে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে,

'বলো, তবুও কি তোমরা ভয় করো না?'

এরপর তাদেরকে গোটা জগতের কর্তৃত্ব, ক্ষমতা ও শাসনের মালিক সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে, অর্থাৎ কোন সেই মহান সত্ত্বা যিনি গোটা বিশ্ব জগতকে নিয়ন্ত্রণ করেন, পরিচালনা করেন, শাসন করেন। কোন সেই মহান সত্ত্বা যিনি নিজের শক্তি বলে যাকে ইচ্ছা রক্ষা করতে পারেন, কেউ তাতে বাধ সাধতে পারে না এবং কেউ তাঁর কাছ থেকে কাউকে রক্ষা করতে পারে না? এই

মহান সত্ত্বা কে? তারা উত্তরে বলবে, আল্লাহ তায়ালা। কিন্তু এর পরেও তারা কি ভাবে আল্লাহর এবাদাত থেকে দূরে সরে যায়? তাদের বিবেক-বুদ্ধি সঠিকভাবে কাজ করছে না কেন? কেন ওরা বিভ্রান্তির মাঝে হাবুডুবু খাচ্ছে? ওরা কি যাদুগ্রস্ত হয়ে পড়েছে?

'বলো, তাহলে কোথা থেকে তোমাদেরকে যাদু করা হচ্ছে?'

এই অস্থিরতা, এই বিভ্রান্তি আর এই লক্ষ্যহীনতা যাদুর প্রভাবেই হয়ে থাকে!

এই মোক্ষম সুযোগে কাফের মোশরেকদের মাঝে রসূলুল্লাহ (স.) যে তাওহীদের বিশ্বাস ও মতবাদ প্রচার করেছেন তার সত্যতা ও বাস্তবতা প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে এবং আল্লাহর সন্তান ও শরীক সম্পর্কিত ওদের দাবীর অসারতা প্রমাণের উদ্দেশ্যে পূর্বের যুক্তিতর্কের পর নিচের বক্তব্যটি আসছে,

'কিছুই নয়, আমি তাদের কাছে সত্য পৌছিয়েছি ....। (আয়াত ৯১-৯২)

আলোচ্য আয়াতে উপরের বিষয়গুলো প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে কয়েকটি পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। প্রথমত, মোশরেকদের সাথে যুক্তি তর্কের পথ পরিহার করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, ওদের মিথ্যাবাদিতা সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণ করা হয়েছে। যেমন আয়াতে বলা হয়েছে,

'কিছুই নয়, আমি তাদের কাছে সত্য পৌছিয়েছি এবং তারাই মিথ্যাবাদী'

এরপর ওদের মিথ্যাবাদিতার দিকগুলো চিহ্নিত করে বলা হচ্ছে,

'আল্লাহ কোনো সন্তান গ্রহণ করেননি এবং তাঁর সাথে অন্য কোনো মাবুদ নেই'

এরপর ওদের মিথ্যা দাবীর অসারতা প্রমাণ করতে গিয়ে বলা হচ্ছে,

'যদি থাকত তাহলে প্রত্যেক মাবুদ নিজ নিজ সৃষ্টি নিয়ে চলে যেতো'

অর্থাৎ প্রত্যেক স্রষ্টা তার সৃষ্টি নিয়ে পৃথক হয়ে যেতো এবং নিজস্ব নিয়ম-নীতি অনুযায়ী তা পরিচালিত করতো। ফলে জগতের প্রতিটি অংশের জন্যে অথবা প্রাণী জগতের প্রতিটি দলের জন্যে বিশেষ বিশেষ নিয়ম-নীতি সৃষ্টি হয়ে যেতো যা গোটা বিশ্ব জগত পরিচালনায় সাধারণ নিয়ম-নীতির সম্পূর্ণ বিপরীত হতো। শুধু তাই নয়, বরং প্রত্যেক স্রষ্টা অন্য স্রষ্টার ওপর প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তারের উদ্দেশ্যে স্বতন্ত্র পদ্ধতিতে জগত পরিচালনায় মত্ত হয়ে পড়তো। অথচ এই জগতের অস্তিত্ব ও শৃংখলা নির্ভর করে একক নিয়ম-নীতির ওপর একক পরিচালনার ওপর এবং একক ব্যবস্থাপনার ওপর।

বলা বাহুল্য যে, গোটা জগতে এ জাতীয় কোনো অব্যবস্থা ও অনিয়মের কোনো অস্তিত্ব নেই। বরং এই জগতের একক গঠন প্রণালী একক স্রষ্টারই পরিচয় বহন করে। এর একক নিয়ম-নীতি একক পরিচালক ও নিয়ন্ত্রকেরই সাক্ষ্য বহন করে। এই জগতের প্রতিটি অংশ ও প্রতিটি বস্তুর সাথে অন্যান্য অংশের ও অন্যান্য বস্তুর একটা সামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যায়, একটা শৃংখলা লক্ষ্য করা যায়। পরস্পরের মাঝে কোনো সংঘর্ষ নেই, কোনো বিরোধ নেই এবং কোনো গোলযোগ নেই। তাই বলা হচ্ছে,

'তারা যা বলে, তা থেকে আল্লাহ পবিত্র।'

দৃশ্য ও অদৃশ্য বিষয় একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই জানেন। এসব বিষয়ের পূর্ণাংগ জ্ঞান কোনো মখলুকের নেই। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ এসব বিষয় জানতে পারে না। তাই বলা হচ্ছে,

'তারা যা শরীক করে, তা থেকে তিনি উর্ধ্বে।'

দ্বীনের দায়ীদের প্রতি কোরআনের কিছু নির্দেশনা

মোশরেকদের প্রসঙ্গ রেখে এখন রসূল (স.)-এর প্রতি নির্দেশ দান করা হচ্ছে। তাঁকে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে, তিনি যেন নিজ প্রতিপালকের প্রতি মনোনিবেশ করেন, তাঁর আশ্রয় কামনা করেন এবং কাফের মোশরেকদের শাস্তি তাঁর জীবদ্দশায়ই ঘটলে তা থেকে নিরাপদ থাকার দোয়া

করেন। এছাড়া তিনি যেন শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকেও আশ্রয় কামনা করেন। তাঁর হৃদয় মনে আক্রোশের সৃষ্টি যাতে না হয়, কাফের মোশরেকদের কথাবার্তায় তিনি যাতে মনক্ষুণ্ন না হন সে দোয়াও তাঁকে করতে বলা হয়েছে নিচের আয়াতে।

'তুমি বলো, হে আমার পালনকর্তা! যে বিষয়ে তাদেরকে ওয়াদা দেয়া হয়েছে তা যদি আমাকে দেখান......(আয়াত ৯৩-৯৮)

খোদাদ্রোহী লোকদের ওপর আল্লাহর মর্মান্তিক আযাব ও গযব পতিত হওয়ার মুহূর্তে এবং ওদের সম্পর্কিত খোদায়ী ওয়াদা বাস্তবায়িত হওয়ার সময় নিজেকে নিরাপদে রাখার জন্যে আল্লাহর রসূল দোয়া করছেন। কিন্তু এই দোয়া অধিক সতর্কতার উদ্দেশ্যে করা হয়েছে। এর মাঝে পরবর্তী লোকদের জন্যে শিক্ষাও রয়েছে, তারা যেন আল্লাহর মার ও কৌশলের ব্যাপারে নিরুদ্বিগ্ন না থাকে, সব সময়ই সজাগ থাকে এবং সদা তাঁর আশ্রয় কামনা করে।

রসূলুল্লাহ (স.)-এর জীবদ্দশায়ই যে আল্লাহ তায়ালা বিদ্রোহী লোকদের ব্যাপারে তাঁর কৃত ওয়াদা বাস্তবায়িত করতে সক্ষম, তা ঘোষণা দিয়ে জানিয়ে দিচ্ছেন,

'আমি তাদেরকে যে বিষয়ের ওয়াদা দিয়েছি, তা তোমাকে দেখাতে অবশ্যই সক্ষম'.......

উল্লেখ্য যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর করা ওয়াদার কিছু কিছু অংশ বদর যুদ্ধে ও মক্কা বিজয়ের সময় রসূল (স.)-কে দেখিয়ে দিয়েছেন।

যেহেতু আলোচ্য সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে এবং তখন দাওয়াত ও তাবলীগের অন্যতম পদ্ধতি ছিলো অন্যায় অবিচারের জবাব সৎ ব্যবহারের মাধ্যমে দেয়া, ধৈর্যধারণ করা এবং গোটা বিষয় আল্লাহর হাতে ছেড়ে দেয়া। তাই নির্দেশ দেয়া হচ্ছে,

'মন্দের জওয়াবে তাই বলুন, যা উত্তম। তারা যা বলে, আমি সে বিষয়ে সবিশেষ অবগত।'

সব ধরনের শয়তানী কুমন্ত্রণা ও প্রবঞ্চনা থেকে মুক্ত হওয়া সত্তেও তা থেকে রসূলের পক্ষ থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় কামনার মাঝে অতিরিক্ত সাবধানতা, আল্লাহর কাছে অতিরিক্ত সহায়তা কামনা এবং উম্মতকে শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যগুলো নিহিত রয়েছে। তিনিই হচ্ছেন উম্মতের জন্যে আদর্শ ও অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব। তাই তিনি নিজ উম্মতকে সর্ব অবস্থায় শয়তানী কুমন্ত্রণা থেকে আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা কামনার শিক্ষা দিচ্ছেন। অন্যথায় রসূলকে শয়তানদের কুমন্ত্রণা ও প্রবঞ্চনাই নয়, বরং এরা যেন তাঁর ধারে কাছেও ঘেঁষতে না পারে সে দোয়া করার জন্যে তাঁকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যেমন,

'হে আমার পালনকর্তা! শয়তানের যাবতীয় ওয়াসওয়াসা থেকে আমি তোমাদের কাছে পাহান চাই এবং সে যেন আমার ধারে কাছেও ঘেষতে না পারে এ ব্যাপারেও আমি তোমার তোমার আশ্রয় চাই।'.....

জীবনের শেষ মুহূর্তে এবং মৃত্যুর সময় যাতে শয়তানের উপস্থিতি না ঘটে সে ব্যাপারেই সম্ভবত, রসূল (স.) আল্লাহর আশ্রয় কামনা করেছেন। পরবর্তী আয়াতে এর প্রতি প্রচ্ছন্ন ইংগিত রয়েছে। যেমন বলা হয়েছে, 'যখন তাদের কারো কাছে মৃত্যু আসে'......পবিত্র কোরআনের সুসাম স্যশীল ও অর্থবহ বর্ণনাভংগিই এই ইংগিত বহন করে। (আয়াত ৯৯-১১৮)

حَتّٰىٓ إِذَا جَآءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُوْنِ ﴿٩٩﴾ لَعَلِّىْٓ أَعْمَلُ
صَالِحًا فِيْمَا تَرَكْتُ كَلَّا ؕ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَآئِلُهَا ؕ وَمِنْ وَّرَآئِهِمْ بَرْزَخٌ
إِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ﴿١٠٠﴾ فَإِذَا نُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَلَآ أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ
يَوْمَئِذٍ وَّلَا يَتَسَآءَلُوْنَ ﴿١٠١﴾ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ فَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿١٠٢﴾
وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ فَأُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا أَنْفُسَهُمْ فِىْ جَهَنَّمَ
خٰلِدُوْنَ ﴿١٠٣﴾ تَلْفَحُ وُجُوْهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيْهَا كٰلِحُوْنَ ﴿١٠٤﴾ أَلَمْ تَكُنْ اٰيٰتِىْ
تُتْلٰى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُوْنَ ﴿١٠٥﴾ قَالُوْا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا
وَكُنَّا قَوْمًا ضَآلِّيْنَ ﴿١٠٦﴾ رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظٰلِمُوْنَ ﴿١٠٧﴾

৯৯. এমনকি (এ অবস্থায় যখন) এদের কারো মৃত্যু এসে হাযির হবে, তখন সে বলবে, হে আমার মালিক, তুমি আমাকে (আরেকবার পৃথিবীতে) ফেরত পাঠাও, ১০০. যাতে করে (সেখানে গিয়ে) এমন কিছু নেক কাজ আমি করে আসতে পারি, যা আমি (আগে) ছেড়ে এসেছি (তখন বলা হবে), না, তা আর কখনো হবার নয়; (মূলত) সেটা হচ্ছে এক (অসম্ভব) কথা, যা সে শুধু বলার জন্যেই বলবে, এ (মৃত) ব্যক্তিদের সামনে একটি যবনিকা (তাদের আড়াল করে রাখবে) সে দিন পর্যন্ত, যেদিন তারা (কবর থেকে) পুনরুত্থিত হবে! ১০১. অতপর যেদিন শিংগায় ফুঁ দেয়া হবে, সেদিন (মানুষ এমনি দিশেহারা হয়ে পড়বে যে,) তাদের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন (বলতে কিছুই) অবশিষ্ট থাকবে না, না তারা একজন আরেকজনকে কিছু জিজ্ঞেস করতে যাবে! ১০২. অতএব (সেদিন) যাদের (নেকীর) পাল্লা ভারী হবে তারাই হবে সেসব মানুষ যারা মুক্তিপ্রাপ্ত। ১০৩. আর যাদের (নেকীর) পাল্লা হালকা হবে তারা হবে সেসব (ব্যর্থ) মানুষ– যারা নিজেদের জীবন (মিথ্যার পেছনে) বিনষ্ট করে দিয়েছে, তারা জাহান্নামে থাকবে চিরকাল। ১০৪. (জাহান্নামের) আগুন তাদের মুখমন্ডল জ্বালিয়ে দেবে, তাতে (তাদের) চেহারা (জ্বলে) বীভৎস হয়ে যাবে। ১০৫. (তাদের তখন জিজ্ঞেস করা হবে,) এমন অবস্থা কি হয়নি যে, আমার আয়াতসমূহ তোমাদের সামনে পড়ে শোনানো হয়েছিলো এবং তোমরা তা অস্বীকার করেছিলে! ১০৬. তারা বলবে, হে আমাদের মালিক, আমাদের দুর্ভাগ্য (সেদিন চারদিক থেকে) আমাদের ঘিরে ধরেছিলো এবং নিশ্চয়ই আমরা ছিলাম গোমরাহ সম্প্রদায়। ১০৭. হে আমাদের মালিক, তুমি আজ আমাদের এ (আগুন) থেকে বের করে নাও, আমরা যদি দ্বিতীয় বারও (দুনিয়ায়) ফিরে গিয়ে সীমালংঘন করি, তাহলে অবশ্যই আমরা যালেম হিসেবে পরিগণিত হবো।

قَالَ اخْسَئُوْا فِيْهَا وَلَا تُكَلِّمُوْنِ ﴿١٠٨﴾ إِنَّهُ كَانَ فَرِيْقٌ مِّنْ عِبَادِيْ يَقُوْلُوْنَ
رَبَّنَآ اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ ﴿١٠٩﴾ فَاتَّخَذْتُمُوْهُمْ
سِخْرِيًّا حَتّٰٓى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِيْ وَكُنْتُمْ مِّنْهُمْ تَضْحَكُوْنَ ﴿١١٠﴾ إِنِّيْ جَزَيْتُهُمُ
الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوْٓا لا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ ﴿١١١﴾ قٰلَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي
الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِيْنَ ﴿١١٢﴾ قَالُوْا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَسْئَلِ الْعَآدِّيْنَ ﴿١١٣﴾
قٰلَ إِنْ لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيْلًا لَّوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿١١٤﴾ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا
خَلَقْنٰكُمْ عَبَثًا وَّأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُوْنَ ﴿١١٥﴾ فَتَعٰلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ج
لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ج رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ ﴿١١٦﴾

১০৮. আল্লাহ তায়ালা বলবেন, তোমরা অপমানিত হয়ে সেখানে পড়ে থাকো, (আজ) কোনো কথাই আমাকে বলো না। ১০৯. অবশ্যই আমার বান্দাদের মধ্যে একদল এমনও আছে, যারা বলতো, হে আমাদের মালিক, আমরা তোমার ওপর ঈমান এনেছি, অতএব তুমি আমাদের (দোষক্রটিসমূহ) মাফ করে দাও, তুমি আমাদের ওপর দয়া করো, তুমি হচ্ছো (দয়ালুদের মধ্যে) সর্বোৎকৃষ্ট দয়ালু। ১১০. অতপর তোমরা তাদের উপহাসের বস্তু বানিয়ে রেখেছিলে, এমনকি তা তোমাদের আমার স্মরণ পর্যন্ত ভুলিয়ে দিয়েছে, আর তোমরা তো তাদের নিয়ে হাসি তামাশাই করতে। ১১১. তাদের সে ধৈর্যের কারণেই আজ আমি তাদের (এই) প্রতিফল দিলাম, (মূলত) তারাই হচ্ছে (সত্যিকার অর্থে) সফল মানুষ। ১১২. আল্লাহ তায়ালা বলবেন (বলো তো), তোমরা পৃথিবীতে কতো বছর কাটিয়ে এসেছো? ১১৩. তারা বলবে, আমরা (সেখানে) অবস্থান করেছিলাম একদিন কিংবা একদিনের কিছু অংশ, তুমি (না হয়) তাদের কাছে জিজ্ঞেস করো যারা হিসাব রেখেছে। ১১৪. আল্লাহ তায়ালা বলবেন, (আসলে) তোমরা পৃথিবীতে খুব সামান্য সময়ই কাটিয়ে এসেছো, কতো ভালো হতো যদি তোমরা (এ কথাটা) ভালো করে জানতে। ১১৫. তোমরা কি (সত্যি সত্যিই) এটা ধরে নিয়েছো, আমি তোমাদের এমনিই অনর্থক পয়দা করেছি এবং তোমাদের (কখনোই) আমার কাছে একত্রিত করা হবে না, ১১৬. (না, তা কখনো নয়,) মহিমান্বিত আল্লাহ তায়ালা, তিনিই সব কিছুর যথার্থ মালিক, তিনি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই, সম্মানিত আরশের একক অধিপতিও তিনি।

وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللّٰهِ إِلٰهًا اٰخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ ﴿١١٧﴾ وَقُلْ رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ ﴿١١٨﴾

১১৭. অতএব, যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে অন্য কোনো মাবুদকে ডাকে, তার কাছে যার (জন্যে) কোনো রকম সনদ নেই, (সে যেন জেনে রাখে), তার হিসাব তার মালিকের কাছে (যথার্থই মজুদ) আছে; সেদিন তারা কোনো অবস্থায়ই সফলকাম হবে না যারা তাঁকে অস্বীকার করেছে। ১১৮. (হে নবী,) তুমি বলো, হে আমার মালিক, তুমি (আমায়) ক্ষমা করো, কেননা তুমি হচ্ছো দয়ালুদের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট।

তাফসীর

আয়াত ৯৯-১১৮

আলোচ্য সূরার শেষ পর্বে মোশরেকদের চরম পরিণতির বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এই পরিণতি কেয়ামতের একটা দৃশ্যের আকারে উত্থাপন করা হচ্ছে। প্রথমেই আসছে মুমূর্ষু অবস্থার দৃশ্য। এটা পার্থিব জীবনের শেষ দৃশ্য। এরপর সর্বশেষ দৃশ্য আসবে শিংগা ফুৎকারের পর। সূরার সমাপ্তিতে একক উপাস্য ও একক মাবুদের বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে, যারা আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত অন্য কোনো উপাস্যকে ডাকে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে এবং তাদের অশুভ পরিণতি সম্পর্কে ভয় দেখানো হয়েছে। সাথে সাথে রসূলকে নিজ প্রভু ও মালিকের নিকট দয়া ও ক্ষমা প্রার্থনার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কারণ, আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন সর্বোত্তম দয়ালু।

তাওবার দরজা যখন বন্ধ হয়ে যাবে....

'যখন তাদের কারো কাছে মৃত্যু আসে, তখন সে বলে, 'হে আমার পালনকর্তা আমাকে পুনরায় (দুনিয়াতে) প্রেরণ করো যাতে আমি সৎ কাজ করতে পারি, যা আমি করিনি।'

এটা হচ্ছে মুমূর্ষুকালীন অবস্থার চিত্র, মৃত্যুর মুখোমুখি হওয়ার মুহূর্তে তাওবার ঘোষণার দৃশ্য, জীবন ফিরিয়ে দেয়ার কাকুতির দৃশ্য, যাতে অতীতের ত্রুটি বিচ্যুতির সংশোধন করা যায় এবং ছেড়ে আসা ছেলে সন্তান ও ধন সম্পদের খেয়াল রাখতে পারে।....... জীবনের এই চরম মুহূর্তের দৃশ্যটি যেন চাক্ষুষ ও দৃশ্যমান সে ভাবেই উপস্থাপন করা হয়েছে। শেষ মুহূর্তের এই আরযি, এই আকুতির জবাব জনসমক্ষে ঘোষণা দিয়ে এই ভাষায় জানিয়ে দেয়া হচ্ছে,

'অবশ্যই না, এ তো তার একটি কথার কথা।'

অর্থাৎ এ জাতীয় কথার কোনো অর্থ নেই, কোনো মর্ম নেই। যারা এ ধরনের কথা বলে তাদের প্রতি তেমন কোনো গুরুত্ব দেয়া হয় না, ভ্রুক্ষেপ করা হয় না। ভয়ঙ্কর ও সংকটময় মুহূর্তে এ জাতীয় কথা মানুষের মুখ দিয়ে বের হয়ে থাকে। এর পেছনে কোনো সদিচ্ছা থাকে না, কোনো আন্তরিকতা থাকে না। এগুলো নিছক কথার কথা।

এরই সাথে মুমূর্ষুকালীন অবস্থার দৃশ্যের সমাপ্তি ঘটে। মৃত্যুর মাধ্যমে গোটা পৃথিবী থেকে সকল সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে পড়ে, সকল দ্বার রুদ্ধ হয়ে পড়ে এবং সামনে পর্দা নেমে আসে। এরপর ঘোষণা করা হয়,

'তাদের সামনে পর্দা আছে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত।'

অর্থাৎ মৃত্যুর পর মানুষ যে জগতে পা রাখবে তা জাগতিক জীবনও নয় এবং পরকালীন জীবনও নয়, বরং মাঝামাঝি একটি জগত। এই জগতকেই বলা হয়, 'বারযাখ' এর জগত। এই জগতে বাস করতে হবে পুনরুত্থান এর দিন পর্যন্ত।

কেয়ামতের দৃশ্য

পুনরুত্থানের দিনটির দৃশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে এখানে বলা হয়েছে,

'অতপর যখন শিংগার ফুৎকার দেয়া হবে, সেদিন তাদের পারস্পরিক আত্মীয়তার বন্ধন থাকবে না এবং একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে না।'

অর্থাৎ এই ভয়াবহ মুহূর্তটিতে সকল প্রকারের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে পড়বে, পৃথিবীর পরিচিত সকল মূল্যবোধ বিলুপ্ত হয়ে যাবে। আত্মীয়তার বন্ধন থাকবে না, রক্তের বন্ধন থাকবে না। এক ভয়াবহ পরিস্থিতি বিরাজ করবে। আতংকে কারো মুখ দিয়ে একটি কথাও বের হবে না। নীরব ও নিথর হয়ে সকলেই দাঁড়িয়ে। কেউ কাউকে কোনো প্রশ্ন করবে না, কুশল বিনিময় করবে না।

এরপর দ্রুত হিসাব নিকাশের কাজ সমাধা করা হবে। এ সম্পর্কে বলা হচ্ছে,

'যাদের পাল্লা ভারী হবে, তারাই হবে সফলকাম এবং যাদের পাল্লা হাল্কা হবে ....। (আয়াত ১০২-১০৩)

আমলের ওযন পাল্লার মাধ্যমে করার বক্তব্যটি পবিত্র কোরআনের নিজস্ব বর্ণনা ভংগির অন্যতম বৈশিষ্ট। এই বর্ণনা ভংগির মাধ্যমে কোনো অদৃশ্য বিষয় বা বস্তুকে দৃশ্যমান করে প্রকাশ করা হয়। এর ফলে বিষয়টি উপলব্ধি করা সহজ হয়।

আগুনে পুড়ে চেহারা কালো হয়ে যাওয়া, বিকৃত হয়ে যাওয়া এবং বিবর্ণ হয়ে যাওয়া অত্যন্ত মর্মান্তিক ও বেদনাদায়ক দৃশ্য।

যাদের আমলের পাল্লা হাল্কা হবে তারা সব কিছুই হারাবে এমনকি নিজেকেও হারাবে। মানুষ নিজেকে হারালে তার আর কী বাকী থাকে? নিজেকে হারিয়ে এবং সর্বস্বান্ত হয়ে সে তখন হয়ে পড়বে অস্তিত্বহীন।

এরপর সরাসরি কথোপকথনের মাধ্যমে কঠিন শাস্তির চিত্রটি দৃশ্যমান করে ফুটিয়ে তোলা হচ্ছে। বলা হচ্ছে,

'তোমাদের সামনে কি আমার আয়াতসমূহ পঠিত হতো না? তোমরা তো সেগুলোকে মিথ্যা বলতে।'

এই প্রশ্ন শোনার পর পাপীরা মনে করবে যে, তাদের এখন কথা বলার অনুমতি দেয়া হয়েছে, তাদেরকে আবেদন করার সুযোগ দেয়া হয়েছে। তাই নিজেদের অপরাধ স্বীকার করে এবং আল্লাহর করুণা ভিক্ষা করে তারা বলে উঠবে,

'হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা দুর্ভাগ্যের হাতে পরাভূত ছিলাম এবং আমরা ছিলাম বিভ্রান্ত জাতি ....। (আয়াত ১০৬-১০৭)

তাদের এই স্বীকৃতির মাঝেই তাদের দুর্ভাগ্য ও দুর্দশার চিত্র ফুটে উঠেছে। কিন্তু এর দ্বারা আদব-কায়দা এবং শিষ্টাচারের সীমালংঘন হবে বলে তাদেরকে আর একটা কথাও বলার সুযোগ দেয়া হবে না। বরং তাদেরকে প্রচন্ড ধমক দিয়ে বলা হবে,

'তোমরা ধিকৃত অবস্থায় এখানেই পড়ে থাকো এবং আমার সাথে কোনো কথা বলো না।'

অর্থাৎ ধিকৃত ও লাঞ্ছিত ব্যক্তিদের মত চুপ মেরে বসে থাকো, কোনো টু শব্দ করবে না। কারণ এই মর্মান্তিক ও লজ্জাকর শাস্তিই তোমাদের প্রাপ্য। তোমাদের ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণই এর জন্যে দায়ী। আমার নেক বান্দাদের সাথে তোমরা হাসি ঠাট্টা করতে। তারা আমার রহমত ও মাগফেরাত কামনা করতো বলে তাদেরকে নিয়ে তোমরা মশকরা করতে। এর ফলে তোমরা আমার স্মরণ থেকে গাফেল হয়ে পড়েছিলে। আমার বিভিন্ন নিদর্শনাদির ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা থেকে বিরত হয়ে পড়েছিলে। কাজেই আজ স্বচক্ষে দেখে নাও, তোমাদের স্থান কোথায় আর ওদের স্থান কোথায়।

'আজ আমি তাদেরকে তাদের সবরের কারণে এমন প্রতিদান দিয়েছি যে, তারাই সফলকাম।'

এই কড়া উত্তর দেয়ার পর, আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে জেরা করতে গিয়ে বলবেন,

'তোমরা পৃথিবীতে কতো দিন অবস্থান করলে বছরের গণনায়?' উত্তরে তারা বলবে,

'আমরা একদিন অথবা দিনের কিছু অংশ অবস্থান করেছি। তুমি গণনাকারীদেরকে জিজ্ঞেস করো।'

........এই উত্তরের ভাষায় গ্লানী, হতাশা, নিরাশা ও বেদনার চিত্র ফুটে উঠেছে।

উত্তরে আল্লাহ তায়ালা বলবেন,

'তোমরা তাতে অল্প দিনই অবস্থান করেছো, যদি তোমরা জানতে?'

অর্থাৎ পরকালীন জীবনের তুলনায় তোমাদের পার্থিব জীবনের স্থায়িত্বকাল খুবই নগণ্য। কিন্তু তোমরা এই সত্যটিকে বেমালুম ভুলে গিয়েছিলে।

এরপর তাদেরকে পরকালীন জীবনের হিসাব নিকাশের বাস্তবতার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করার জন্যে কড়া ভাষায় বলা হচ্ছে, তোমরা কি ধারণা করো যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার কাছে ফিরে আসবে না?'

অর্থাৎ তোমাদের সৃষ্টিই প্রমাণ করে যে, তোমাদেরকে হিসাব নিকাশের জন্যে নির্দিষ্ট একটি দিনে পুনরুজ্জীবিত করা হবে। বস্তুত পুনরুত্থান হচ্ছে উৎপত্তিরই একটা ধাপ। এর মাধ্যমে উৎপত্তি তার চূড়ান্ত সীমায় গিয়ে উপনীত হয়। এর মাধ্যমে তা পরিপূর্ণতা লাভ করে। এই বাস্তব ও নিরেট সত্যটি কেবল তারাই উপলব্ধি করতে পারে না যারা বিকারগ্রস্ত ও চিন্তা চেতনায় বৈকল্যের শিকার। কারণ, এদের পক্ষে সৃষ্টি তত্ত্বের নিগূঢ় রহস্য উদঘাটন করা সম্ভব নয়। এমনকি গোটা জগতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অসংখ্য খোদায়ী নিদর্শনগুলো প্রত্যক্ষ ও অনুধাবন করার সামর্থ্যও এদের নেই।

ঈমানের প্রথম ও প্রধান স্তম্ভ

আলোচ্য সূরাটি হচ্ছে মূলত ঈমান ও বিশ্বাস সংক্রান্ত। তাই সূরাটি শেষ করতে গিয়ে ঈমানের প্রথম ও প্রধান স্তম্ভ তাওহীদের বিষয়টি উত্থাপন করা হয়েছে। সাথে সাথে কাফের-মোশরেকদের চরম ব্যর্থতা ও দুর্গতির ঘোষণাও দেয়া হয়েছে, যেমন সূরার প্রথমে মোমেন বান্দাদের সফলতা ও মংগলের ঘোষণা দেয়া হয়েছে। পরিশেষে পরম দয়ালু ও পরম করুণাময়ের কাছে ক্ষমা ও দয়া প্রার্থনা করার জন্যে মানব জাতিকে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। বলা হয়েছে,

'অতপর শীর্ষ মহিমায় আল্লাহ তায়ালা, তিনিই সত্যিকার মালিক, তিনি ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই। তিনি সম্মানিত আরশের মালিক।......... (আয়াত ১১৬-১১৮)

এই চূড়ান্ত বক্তব্যটি এসেছে কেয়ামতের দৃশ্য অবতারণা করার পর, বিভিন্ন, যুক্তি-তর্ক ও দলীল প্রমাণ পেশ করার পর। এ সবের পর স্বাভাবিকভাবেই এবং যৌক্তিক উপায়েই আল্লাহর শরীকবিহীন সত্ত্বার ঘোষণাটি দেয়া হচ্ছে। এই ঘোষণায় বলা হচ্ছে যে, মোশরেকদের সব ধরনের অলীক বিশ্বাস ও ধারণা থেকে আল্লাহর মহান সত্ত্বা পাক ও পবিত্র। তিনিই হচ্ছেন গোটা বিশ্বের প্রকৃত মালিক, তিনিই গোটা বিশ্বের নিয়ন্ত্রক। তিনিই একমাত্র মাবুদ। তিনি ব্যতীত অন্য কোনো মাবুদ নেই, কোনো উপাস্য নেই। যাবতীয় ক্ষমতা, প্রভাব প্রতিপত্তি ও শাসনের মালিক একমাত্র তিনিই। তিনি মহান আরশের অধিপতি।

এবাদাত বন্দেগী ও আনুগত্য দাসত্বের ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে অন্য কারো শরীকানার দাবী করা হলে তা হবে সম্পূর্ণ অযৌক্তিক দাবী। এ জাতীয় দাবীর পেছনে জাগতিক কোনো দলীল প্রমাণ নেই, স্বভাবজাত কোনো দলীল প্রমাণ নেই, এমন কি বুদ্ধি বৃত্তিক কোনো যুক্তি প্রমাণও নেই। কাজেই যারা ওই জাতীয় ভ্রান্ত দাবীর ধারক ও বাহক, তাদের বিচার আল্লাহ তায়ালাই করবেন এবং তাদের শেষ পরিণতিও আল্লাহ তায়ালা নির্ধারণ করে রেখেছেন। তিনি নিজেই সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা দিয়ে জানিয়ে দিয়েছেন যে,

'কাফেররা সফলকাম হবে না।'

এটাই হচ্ছে আল্লাহর চিরন্তন বিধান। এই বিধানের কোনো পরিবর্তন নেই, কোনো ব্যতিক্রম নেই। অপরদিকে কামিয়ামী ও সফলতা মোমেন বান্দাদের জন্যেই অবধারিত। এটাও একটা চিরন্তন বিধান।

পার্থিব জীবনে দেখা যায় যে, অনেক ক্ষেত্রে আল্লাহবিদ্রোহী লোকেরাই ক্ষমতার শীর্ষে অবস্থান করছে, সুযোগ সুবিধা ভোগ করছে, অঢেল সম্পত্তির মালিক বনে আছে এবং প্রভাব প্রতিপত্তির সাথে জীবন যাপন করছে। এগুলো বাহ্যিক দৃষ্টিতে সফলতা ও কামিয়াবী মনে হলেও চূড়ান্ত বিচারে তা আদৌ কোনো সফলতা নয়। বরং এক ধরনের পরীক্ষা, এক ধরনের ছাড়। এর পরিণতি শুভ নয়। তাই পৃথিবীর বুকেই তাদেরকে এই অশুভ পরিণতির সম্মুখীন হতে হয়। আর যদি কেউ এ থেকে পৃথিবীতে রেহাই পেয়ে যায়, তাকে পরকালে অবশ্যই সে পরিণতি ভোগ করতে হবে। পরকালই হচ্ছে জীবনের শেষ অধ্যায়। কাজেই তা অবধারিত ও চূড়ান্ত। এই জীবনের কোনো কিছুই বিচ্ছিন্ন নয়, অসংলগ্ন নয়। বরং এক চিরন্তন নীতি ও শৃংখলায় তা আবদ্ধ।

আলোচ্য সূরার শেষ ভাগে আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ করতে বলা হয়েছে, তাঁর রহমত ও মাগফেরাত কামনা করতে বলা হয়েছে। যেমন,

'বলো, হে আমার পালনকর্তা, ক্ষমা করো ও রহম করো। রহমকারীদের মধ্যে তুমি শ্রেষ্ঠ রহমকারী।'

এখানেই আমরা সূরার সূচনা ও এর সমাপ্তির মাঝে একটা সঙ্গতি লক্ষ্য করি। যেমন সূরার সূচনায় মোমেনদের কামিয়াবী ও সফলতার কথা বলা হয়েছে। তেমনি সমাপ্তিতে বলা হয়েছে কাফের তথা আল্লাহদ্রোহী লোকদের ব্যর্থতার কথা। ঠিক তেমনিভাবে সূরার সূচনায় সমাজে একাগ্রতা ও নিবিষ্টতার কথা বলা হয়েছে, আর সমাপ্তিতে বলা হয়েছে আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশের কথা, তাঁর রহমত কামনার কথা। ফলে সূরার সূচনা ও সমাপ্তি এক অভিন্ন ঈমানী চেতনার মোহনায় এসে মিলিত হয়েছে।

সূরা আন নূর

আয়াত ৬৪ রুকু ৯

মদীনায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

سُوْرَةٌ اَنْزَلْنٰهَا وَفَرَضْنٰهَا وَاَنْزَلْنَا فِيْهَآ اٰيٰتٍۢ بَيِّنٰتٍ لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ①

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۪ وَّلَا تَاْخُذْكُمْ

بِهِمَا رَاْفَةٌ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۚ وَلْيَشْهَدْ

عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ② اَلزَّانِيْ لَا يَنْكِحُ اِلَّا زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَةً ۫

وَّالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَآ اِلَّا زَانٍ اَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ ③

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَاْتُوْا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوْهُمْ

ثَمٰنِيْنَ جَلْدَةً وَّلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ④

রুকু ১

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে–

১. (এটি একটি) সূরা, আমিই নাযিল করেছি এবং আমিই (এতে বর্ণিত বিধানসমূহ) ফরয করেছি, আমিই এতে (পরিষ্কার করে আমার) আয়াতসমূহ নাযিল করেছি, যাতে করে তোমরা (এর থেকে) শিক্ষা গ্রহণ করতে পারো। ২. (এ বিধানসমূহের একটি হচ্ছে) ব্যভিচারিণী নারী ও ব্যভিচারী পুরুষ (সংক্রান্ত বিধানটি। এদের ব্যাপারে আদেশ হচ্ছে), তাদের প্রত্যেককে তোমরা একশ'টি করে বেত্রাঘাত করবে, আল্লাহর দ্বীনের (আদেশ প্রয়োগের) ব্যাপারে ওদের প্রতি কোনো রকম দয়া যেন তোমাদের পেয়ে না বসে, যদি তোমরা আল্লাহ তায়ালা ও পরকালের ওপর ঈমান এনে থাকো, (তাহলে) মোমেনদের একটি দল যেন তাদের এ শাস্তি প্রত্যক্ষ করার জন্যে (সেখানে মজুদ) থাকে। ৩. (আল্লাহর হুকুম হচ্ছে) একজন ব্যভিচারী পুরুষ কোনো ব্যভিচারিণী মহিলা কিংবা কোনো মোশরেক নারী ছাড়া অন্য কোনো ভালো নারীকে বিয়ে করবে না। অপরদিকে একজন ব্যভিচারিণী মহিলা কোনো ব্যভিচারী পুরুষ কিংবা কোনো মোশরেক পুরুষ ছাড়া অন্য কোনো ভালো পুরুষকে বিয়ে করবে না, সাধারণ মোমেনদের জন্যে এ (বিয়ে)-কে হারাম করা হয়েছে। ৪. (অপরদিকে) যারা (খামাখা) সতী সাধ্বী নারীদের ওপর (ব্যভিচারের) অপবাদ আরোপ করবে এবং এর সপক্ষে চার জন সাক্ষী হাযির করতে পারবে না, তাদের আশিটি বেত্রাঘাত করবে এবং (ভবিষ্যতে) আর কখনো তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না, কেননা এরা হচ্ছে (নিকৃষ্ট) গুনাহগার,

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝٥

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ

أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ ۙ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ۝٦ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ

لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ۝٧ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ

تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ ۙ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ۝٨ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ

اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۝٩ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ

وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ ۝١٠ إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ ۚ لَا

تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ ۖ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ۚ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ

الْإِثْمِ ۚ وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝١١ لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ

৫. অবশ্য যেসব ব্যক্তি এ (অন্যায়ের) পর তাওবা করে এবং (নিজেদের) শুধরে নেয় (তাদের কথা আলাদা, আল্লাহ তায়ালা তাদের মাফ করে দেবেন), আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই ক্ষমাশীল ও বড়ো দয়ালু। ৬. আর যারা নিজেদের স্ত্রীদের ওপর (ব্যভিচারের) অপবাদ আরোপ করে, অথচ নিজেরা ছাড়া তাদের কাছে (অপবাদের পক্ষে) অন্য কোনো সাক্ষীও মজুদ থাকে না, সে অবস্থায় এটাই হবে তাদের সাক্ষ্য যে, তারা আল্লাহর নামে চার বার শপথ করে বলবে, অবশ্যই (এ অভিযোগের ব্যাপারে) সে সত্যবাদী। ৭. (এরপর) পঞ্চম বার (শপথ করার সময়) বলবে, মিথ্যাবাদীর ওপর যেন আল্লাহ তায়ালার লানত (নাযিল) হয়। ৮. কোনো স্ত্রীর ওপর থেকেও (এভাবে আনীত অভিযোগের) শাস্তি রহিত করা হবে–যদি সেও চার বার আল্লাহর নামে কসম করে বলে যে, এ (পুরুষ) ব্যক্তিটি হচ্ছে আসলেই মিথ্যাবাদী, ৯. (অতপর সেও) পঞ্চম বার (শপথ করার সময়) বলবে, সে (অভিযোগকারী ব্যক্তিটি) সত্যবাদী হলে তার (অভিযুক্তের) ওপরও আল্লাহর অভিশাপ নেমে আসুক! ১০. (হে মোমেনরা,) যদি তোমাদের ওপর আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ ও তাঁর দয়া না থাকতো (তাহলে তোমরা এসব কিছু থেকে মাহরুম থেকে যেতে), অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা হচ্ছেন মহান তাওবা গ্রহণকারী এবং প্রবল প্রজ্ঞাময়!

রুকু ২

১১. যারা এ (নবী পরিবার সম্পর্কে) মিথ্যা অপবাদ নিয়ে এসেছে, তারা তো (ছিলো) তোমাদের একটি (ক্ষুদ্র) দল; এ বিষয়টি তোমরা তোমাদের জন্য খারাপ ভেবো না; বরং (তা হচ্ছে) তোমাদের জন্যে (একান্ত) কল্যাণকর, এদের মধ্যে প্রতিটি ব্যক্তি যে যতোটুকু গুনাহ করেছে (সে ততোটুকুই তার ফল পাবে), আর তাদের মধ্যে যে সবচাইতে বেশী (এ কাজে) অংশ গ্রহণ করেছে, তার জন্যে আযাবও রয়েছে অনেক বড়ো। ১২. যদি এ (মিথ্যা

ظَنَّ الْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بِاَنْفُسِهِمْ خَيْرًا ۙ وَّقَالُوْا هٰذَآ اِفْكٌ مُّبِيْنٌ ﴿١٢﴾
لَوْلَا جَآءُوْ عَلَيْهِ بِاَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ ۚ فَاِذْ لَمْ يَاْتُوْا بِالشُّهَدَآءِ فَاُولٰٓئِكَ عِنْدَ
اللّٰهِ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ ﴿١٣﴾ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ فِى الدُّنْيَا
وَالْاٰخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِىْ مَآ اَفَضْتُمْ فِيْهِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿١٤﴾ اِذْ تَلَقَّوْنَهٗ بِاَلْسِنَتِكُمْ
وَتَقُوْلُوْنَ بِاَفْوَاهِكُمْ مَّا لَيْسَ لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ وَّتَحْسَبُوْنَهٗ هَيِّنًا ۖ وَّهُوَ عِنْدَ
اللّٰهِ عَظِيْمٌ ﴿١٥﴾ وَلَوْلَآ اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ قُلْتُمْ مَّا يَكُوْنُ لَنَآ اَنْ نَّتَكَلَّمَ بِهٰذَا ۖ
سُبْحٰنَكَ هٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيْمٌ ﴿١٦﴾ يَعِظُكُمُ اللّٰهُ اَنْ تَعُوْدُوْا لِمِثْلِهٖٓ اَبَدًا اِنْ
كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٧﴾ وَيُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ ۚ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿١٨﴾ اِنَّ
الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ اَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۙ

ঘটনা)-টি শোনার পর মোমেন পুরুষ ও মোমেন নারীরা নিজেদের ব্যাপারে একটা ভালো ধারণা পোষণ করতো! কতো ভালো হতো যদি (তারা একথা) বলতো, এটা হচ্ছে এক নির্জলা অপবাদ মাত্র! ১৩. (যারা অপবাদ রটালো) তারাই বা কেন এ ব্যাপারে চার জন সাক্ষী হাযির করলো না, যেহেতু তারা (প্রয়োজনীয় চার জন) সাক্ষী হাযির করতে পারেনি, তাই আল্লাহ তায়ালার কাছে তারাই হচ্ছে মিথ্যাবাদী। ১৪. (হে মোমেনরা,) যদি দুনিয়া ও আখেরাতে তোমাদের ওপর আল্লাহ তায়ালার দয়া অনুগ্রহ না থাকতো, তাহলে (একজন নবীপত্নীর) যে বিষয়টির তোমরা চর্চা করছিলে, তার জন্যে এক বড়ো ধরনের আযাব এসে তোমাদের স্পর্শ করতো, ১৫. তোমরা এ (মিথ্যা)-কে নিজেদের মুখে মুখে প্রচার করছিলে, নিজেদের মুখ দিয়ে এমন সব কথা বলে যাচ্ছিলে যে ব্যাপারে তোমাদের কোনো কিছুই জানা ছিলো না, তোমরা একে একটি তুচ্ছ বিষয় মনে করছিলে, কিন্তু তা ছিলো আল্লাহ তায়ালার কাছে একটি গুরুতর বিষয়। ১৬. তোমরা যখন ব্যাপারটা শুনলে তখন সাথে সাথেই কেন বললে না যে, আমাদের এটা মোটেই সাজে না যে, আমরা এ ব্যাপারে কোনো কথা বলবো, আল্লাহ তায়ালা অনেক পবিত্র, অনেক মহান। সত্যিই (এ ছিলো) এক গুরুতর অপবাদ! ১৭. আল্লাহ তায়ালা তোমাদের উপদেশ দিচ্ছেন, তোমরা যদি (সত্যিই) মোমেন হও তাহলে কখনো এরূপ আচরণের পুনরাবৃত্তি করো না। ১৮. আল্লাহ তায়ালা (তাঁর) আয়াতসমূহ স্পষ্ট করে তোমাদের সামনে বিবৃত করেন এবং আল্লাহ তায়ালা (সবকিছু) জানেন, তিনি বিজ্ঞ, কুশলী। ১৯. যারা মোমেনদের মাঝে (মিছে অপবাদ রটনা করে) অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে, তাদের জন্যে রয়েছে দুনিয়া ও আখেরাতে মর্মন্তুদ শাস্তি; আল্লাহ

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٩﴾ وَلَوْلَا فَضْلُ
اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿٢٠﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا
تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ
بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۚ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ
أَحَدٍ أَبَدًا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢١﴾ وَلَا
يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ
وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا ۗ أَلَا
تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٢﴾ إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ
الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ

তায়ালা (সব কিছু) জানেন, আর তোমরা (কিছুই) জানো না। ২০. (হে মোমেনরা,) যদি তোমাদের ওপর আল্লাহ তায়ালার দয়া ও অনুগ্রহ না থাকতো (তাহলে একটা বড়ো ধরনের বিপর্যয় ঘটে যেতো), অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা বড়োই দয়ালু ও স্নেহপ্রবণ!

রুকু ৩

২১. হে মানুষ, তোমরা যারা ঈমান এনেছো, কখনো শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না; তোমাদের মধ্যে যে কেউই শয়তানের পদাংক অনুসরণ করে (সে যেন জেনে রাখে), সে (অভিশপ্ত শয়তান) তো তাকে অশ্লীলতা ও মন্দ কাজেরই আদেশ দেবে; যদি তোমাদের ওপর আল্লাহ তায়ালার দয়া ও অনুগ্রহ না থাকতো, তাহলে তোমাদের মধ্যে কেউই কখনো পাক পবিত্র হতে পারতো না, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা যাকে চান তাকে পবিত্র করেন এবং আল্লাহ তায়ালা (সব কিছু) শোনেন, তিনি (সব কিছু) জানেন। ২২. তোমাদের মধ্যে যারা (দ্বীনী) মর্যাদা ও (পার্থিব) ঐশ্বর্যের অধিকারী, তারা যেন (কখনো এ মর্মে) শপথ না করে যে, তারা (তাদের গরীব) আত্মীয় স্বজন, অভাবগ্রস্ত এবং যারা আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় হিজরত করেছে– তাদের কোনোরকম সাহায্য করবে না, বরং তাদের উচিত তারা যেন তাদের ক্ষমা করে দেয় এবং তাদের দোষত্রুটি উপেক্ষা করে; তোমরা কি এটা চাও না যে, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের গুনাহ মাফ করে দিন; আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। ২৩. যারা সতী-সাধ্বী নারীদের প্রতি (ব্যভিচারের) অপবাদ আরোপ করে, যারা (এ অপবাদের ব্যাপারে) কোনো খবরই রাখে না, (সর্বোপরি) যারা ঈমানদার, (তাদের প্রতি অপবাদ আরোপকারী) এসব মানুষদের জন্যে দুনিয়া ও

عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٢٣﴾ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا

كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٤﴾ يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ

هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ ﴿٢٥﴾ الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ ۖ

وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ ۚ أُولَٰئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ ۖ

لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٢٦﴾

আখেরাতের উভয় স্থানেই অভিশাপ দেয়া হয়েছে, (উপরন্তু) তাদের জন্যে রয়েছে কঠোর আযাব, ২৪. সেদিন তাদের ওপর (স্বয়ং) তাদের জিহ্বাসমূহ, তাদের হাতগুলো ও তাদের পাগুলো তাদের কর্মকান্ড সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে। ২৫. সেদিন আল্লাহ তায়ালা তাদের যথার্থ প্রাপ্য পুরোপুরি আদায় করে দেবেন এবং তারা জেনে নেবে যে, আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন সুস্পষ্ট সত্য। ২৬. (জেনে রেখো,) নষ্ট নারীরা হচ্ছে নষ্ট পুরুষদের জন্যে, নষ্ট পুরুষরা হচ্ছে নষ্ট নারীদের জন্যে, (আবার) ভালো নারীরা হচ্ছে ভালো পুরুষদের জন্যে, ভালো পুরুষরা হচ্ছে ভালো নারীদের জন্যে, (মোনাফেক) লোকেরা (এদের সম্পর্কে) যা কিছু বলে তারা তা থেকে পাক পবিত্র; (আখেরাতে) এদের জন্যেই রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক রেযেক।

সংক্ষিপ্ত আলোচনা

এটি পঞ্চম ও ষষ্ঠ হিজরীর মধ্যে অবতীর্ণ সূরা।

'এক এমন সূরা যা আমিই নাযিল করেছি এবং এর মধ্যে বর্ণিত সুস্পষ্ট আয়াতগুলোর মাধ্যমে আমার বিধানগুলোকে বাধ্যতামূলক বলে ঘোষণা করেছি, যাতে করে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারো ....তাদের জন্যে রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবন ধারণ সামগ্রী। (আয়াত ১-২৬)

এ সূরাটির নাম রাখা হয়েছে নূর- আলো বা আলোকবর্তিকা.......এখানে শুভ্র সমুজ্জ্বল, আলোক বর্তিকা সম্পর্কে কথা বলা হয়েছে, যার সম্পর্ক রয়েছে স্বয়ং আল্লাহর নিজ অস্তিত্বের সাথে, এই সূরারই এক আয়াতে যেমন রয়েছে 'আল্লাহ তায়ালাই আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর 'নূর'। এ আলোর প্রভা ও প্রকাশ অবশ্যই আলোকিত অন্তর ও আত্মাগুলোকে প্রভাবিত করে, এ প্রভাবসমূহ অতপর মানুষের মধ্যে আদব শৃংখলা ও বৈশিষ্ট্যমন্ডিত চরিত্র আকারে ছড়িয়ে পড়ে। এই কথাগুলোই হচ্ছে এ সূরাটির মূল আলোচ্য বিষয়। তাই দেখা যায়, সমগ্র সূরাটি জুড়ে রয়েছে সেই সব শিক্ষা, যা ব্যক্তি থেকে নিয়ে পরিবার পর্যন্ত একটা সমাজ গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই শিক্ষার আলোকেই অন্তর আলোকিত হয়, জীবন সমুজ্জ্বল হয়। গোটা বিশ্ব

প্রকৃতির মধ্যে যে আলোকমালা রয়েছে তার সাথে একাত্ম হয়ে গিয়ে মানবাত্মাগুলোকে স্নিগ্ধ পবিত্র আলো দান করে, এ আলোই মানুষের অন্তরসমূহে প্রবিষ্ট হয় এবং এটা বিবেকের মধ্যেও প্রতিফলিত হয় । এসব কিছুই মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীনের সুবিশাল আলোক বর্তিকা থেকে শক্তি সঞ্চয় করে।

সূরাটি শুরু হয়েছে অত্যন্ত শক্তিশালী ও অকাট্য এক ঘোষণার সাথে, যার মধ্যে সূরার মধ্যে বর্ণিত আলোচ্য বিষয়সমূহের পূর্বাভাস এবং আল্লাহ রব্বুল আলামীনের নির্দেশাবলী, তাঁর দেয়া সীমারেখাগুলো ও বাধ্যতামূলক কাজগুলোর বর্ণনা-সবই স্থান পেয়েছে। আরো বর্ণিত হয়েছে জীবনের নিয়ম-শৃংখলা ও চারিত্রিক মূলনীতিগুলো।

এরশাদ হচ্ছে,

'এটি এমন এক সূরা যা আমি নাযিল করেছি এবং এর মধ্যে বর্ণিত বিধানগুলোকে ফরয করে দিয়েছি। আরো আমি নাযিল করেছি এর মধ্যে সুস্পষ্ট আয়াতগুলোকে, যাতে করে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারো।' .....

অতপর এ সূরাটির প্রারম্ভিক কথাতে কিছু চারিত্রিক বলিষ্ঠতা গড়ে তোলার জন্যে অত্যন্ত জোরালো ভাষায় আল কোরআনের দৃষ্টিভংগি ব্যক্ত হয়েছে, মানুষের জীবনে শান্তি সমৃদ্ধি ও অগ্রগতির জন্যে চরিত্র বল কত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে তাও জানিয়েছে। ইসলামী আকীদাকে অক্ষুণ্ন রাখার জন্যে এর প্রয়োজন কত বেশী এবং মানব জীবনের জন্যে যে চিন্তাধারা ইসলাম দিয়েছে তার মধ্যে এর স্থান কতো উঁচু তাও বলা হয়েছে।

মূল যে বিষয়টিকে ঘিরে সূরাটির আলোচ্য বিষয়গুলো আবর্তিত হয়েছে তা হচ্ছে মানুষকে সত্যিকারে ভালো মানুষরূপে গড়ে তোলার জন্যে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ। এর জন্যে এর উপায় উপাদানকে নির্ধারিত করে দেয়া হয়েছে এবং এর সীমানাগুলোকে চিহ্নিত করে দেয়া হয়েছে। মানুষের আবেগ অনুভূতি ও মনুষ্য হৃদয়ের মধ্যে আল্লাহ তায়ালা যে প্রেম প্রণয়ের বীজ নিহিত রেখেছেন তারও যথাযথ মূল্যায়ন করা হয়েছে, এসব সুচারু বৃত্তিগুলোও জানানো হয়েছে। এগুলো যে আল্লাহর আলো ও তাঁর নিদর্শনসমূহের দান এবং এগুলোর সাথেই যে রয়েছে এসব হৃদয়াবেগের নিবিড় সম্পর্ক তাও বলা হয়েছে। আল্লাহর এসব নিদর্শন সারা বিশ্বব্যাপী এবং মানুষের গোটা জীবন জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে। এ আয়াতগুলোতে কঠোরতা ও শিথিলতা যাই প্রদর্শন করা হয়েছে, সে সবের লক্ষ্য একটিই, আর তা হচ্ছে মানুষের শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্যে তাদেরকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দান করা, তাদের চেতনা ও আবেগ-অনুভূতিকে সন্নিহিত করা, জীবনকে সুন্দর করার লক্ষ্যে চারিত্রিক মাপকাঠির এতোটা উন্নয়ন করা যেন জীবনের সব কিছুর ওপর এর প্রভাব পড়ে ও আল্লাহ রব্বুল আলামীনের নূরের সাথে এর একটা সংযোগ সাধিত হয়। ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে এক নিয়ম শৃংখলা গড়ে ওঠে, বাড়ীঘর ও পরিবারের মধ্যে সুস্থ ও সুন্দর ব্যবস্থা রক্ষিত হয়, দল ও দলীয় নেতৃত্ব সবাই যেন আল্লাহর ওপর ঈমানের মূল উৎস থেকে জীবনের সুমধুর রস গ্রহণ করতে পারে, সবশেষে সেই কেন্দ্রীয় নূরের সাথে সবাই গিয়ে মিলিত হয়, এটা মূলত আল্লাহ রব্বুল ইযযতেরই নূর। এই নূরই সব কিছুর মধ্যে প্রতিফলিত হয়ে সব কিছুকে আলোকিত করে, সমুজ্জ্বল করে ও পবিত্র বানায়। মানব জীবনের সকল দিক ও বিভাগের জন্যে প্রয়োজনীয় সকল প্রশিক্ষণ আসে সেই প্রথম এবং সেই একই নূর থেকে, যা গোটা ভুবন, আকাশ, ভূমন্ডল ও বিশ্ব প্রকৃতির সব কিছুকে আলোকিত করে রেখেছে, সকল অন্ধকার অপসারিত করেছে, অন্তর ও বিবেকের মধ্যস্থিত পুঞ্জীভূত আবর্জনা থেকে মানুষকে ও সকল প্রাণকে পবিত্র করেছে।

সূরাটির মূল আলোচ্য বিষয় হচ্ছে, মানুষ গড়ার প্রোগ্রাম। তার আলোচনাকে মোট পাঁচটি অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে,

এক. এ অধ্যায়ে যেনার ওপর প্রথম ও চূড়ান্ত নিষেধাজ্ঞার ঘোষণা দেয়া হয়েছে এবং এ বিষয়ক শাস্তির বিধান সম্পর্কেও ঘোষণা দেয়া হয়েছে। চরম ঘৃণা প্রদর্শন করা হয়েছে এ জঘন্য অপরাধের প্রতি এবং মুসলিম জামায়াত থেকে যেনাকারীদেরকে একঘরে করে দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। মুসলিম জামায়াতের সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক রাখা হয়নি, ওরাও মুসলিম জামায়াতের কেউ নয় বলে জানিয়ে দেয়া হয়েছে। এরপর সূরাটিতে পাথর মেরে হত্যা করার হুকুম জারি করা হয়েছে এবং এই কঠোরতার কারণও জানানো হয়েছে। তারপর স্বামী-স্ত্রী পরস্পর মিথ্যা বলার ক্ষেত্রে লানত পাঠানোর অবস্থায় তাদেরকে পৃথক হওয়া থেকে ব্যতিক্রম রাখা হয়েছে। এরপর মিথ্যা দোষারোপ (ইফক)-এর ঘটনা বিবৃত হয়েছে.....আর এ অধ্যায়ের শেষ পর্যায়ে বলা হয়েছে যে, নষ্ট পুরুষ নষ্ট মেয়ের জন্যে এবং নষ্ট মেয়ে নষ্ট পুরুষের জন্যে, অপরদিকে চরিত্রবান পুরুষ এর উপযোগী চরিত্রবতী স্ত্রী লোক এবং চরিত্রবতী স্ত্রী লোক চরিত্রবান পুরুষের জন্যে উপযোগী, অর্থাৎ যারা যেমন তাদের সম্পর্কও তাদের মতন মানুষের সাথেই হতে পারে।

দুই. এ পর্যায়ে এসব অপরাধজনক কাজ ও ব্যবহার থেকে বাঁচার উপায়গুলো বিবৃত হয়েছে, এখানে সে সব লোকদেরকেও সমাজচ্যুত করতে বলা হয়েছে, যারা মানুষকে অন্যায় কাজে প্ররোচিত করে বা কাউকে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে বদনাম করে। তারপর ভদ্রজনদের বসতবাড়ীতে যেসব নিয়ম শৃংখলা মেনে চলা প্রয়োজন সেগুলো বলতে গিয়ে প্রথমে গৃহবাসীকে সালাম দানের অভ্যাস গড়ে তোলার শিক্ষা দেয়া হয়েছে। তারপর হুকুম দেয়া হয়েছে দৃষ্টিকে নিম্নগামী রাখার জন্যে এবং নিষেধ করা হয়েছে মোহাররম পুরুষদের সামনে সৌন্দর্য প্রকাশ করতে। এরপর বালেগ বালেগা ছেলেমেয়েদের যথাশীঘ্র পাত্রস্থ করার জন্যে উৎসাহিত করা হয়েছে এবং সতর্ক করা হয়েছে যুবতী মেয়েদেরকে দেহপসরিনী হওয়ার কাজে এগিয়ে দেয়া থেকে। এ সবই হচ্ছে মনে মগযে ও দৈহিক দিক দিয়ে সচ্চরিত্রের অধিকারী থাকার জন্যে রক্ষাকবচ। এসব উপায় অবলম্বন করার মাধ্যমে পশু প্রবণতা থেকে রক্ষা পেতে পারে, অর্থাৎ মানুষের মধ্যে আর একটি দিক পাশব প্রবৃত্তি ঘুমন্ত অবস্থায় সব সময়েই থাকে। একটু সুযোগ বা উস্কানি পেলেই সেটা জেগে উঠে। এই পশু-বৃত্তিকে দাবিয়ে রাখার জন্যে এবং সকল উস্কানির মোকাবেলা করার জন্যে প্রয়োজনীয় সকল সতকর্তা অবলম্বন করার শিক্ষা আলোচ্য অধ্যায়ে পাওয়া যায়।

তিন. সকল নিয়ম শৃংখলার মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ স্থাপন করা হয়েছে, অতপর এ সবকে আল্লাহর নূরের সাথে সম্পর্কিত বলে জানানো হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, যে ঘরে এসব নিয়ম শৃংখলা বর্তমান আছে সে ঘর আল্লাহর ঘর হিসাবেই আল্লাহর কাছে গৃহীত হবে। অপরদিকে যারা কুফরী করবে, মানবে না আল্লাহর দেয়া নিয়ম শৃংখলা তাদের সৎকাজগুলো মিথ্যা মায়া-মরীচিকার মতো চাকচিক্যময় হবে, অথবা সেগুলো এমন অন্ধকারাচ্ছন্ন, যেন মনে হয় অন্ধকারের স্তরগুলো একের পর আর একটি পরতে পরতে সাজানো। এরপর, দেখানো হয়েছে কিভাবে দিগন্তব্যাপী ছড়ানো রয়েছে আল্লাহর নূর। সকল সৃষ্টির মধ্যে আনুগত্য পাওয়া যায়, সব কিছুকে আল্লাহর দেয়া নিয়ম অনুযায়ী চলতে দেখা যায়, আসলে এ সব কিছুই হচ্ছে আল্লাহর নূরের বহিপ্রকাশ। সে সুদূর নীল আকাশে মৃদুমন্দ গতিতে মেঘমালার সন্তরণ, রাত্রি দিনের আনাগোনা এবং সকল জীবজন্তু পানি থেকে পয়দা হওয়ার বাস্তবতা, তারপর একই পানি থেকে পয়দা হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্নরূপ ও কর্মক্ষমতার অধিকারী হওয়া, বিভিন্ন পেশায় বিভক্ত হওয়া, বিভিন্ন শ্রেণীতে ও দলে নিয়োজিত

হওয়া, যা নিয়ত প্রত্যেক দর্শক ও সকল দৃষ্টির সামনে ভাসছে– এসব কিছুও মূলত সে মহান আল্লাহরই নূরের বহিপ্রকাশ।

চার. এখানে আলোচনা হয়েছে মোনাফেকদের সম্পর্কে। রসূল (স.)-এর সাথে আদব রক্ষা করে চলাকে সবার জন্যে ওয়াজেব করে দেয়া সত্ত্বেও মোনাফেকরা একথা মানতো না– যদিও তারা মুসলমানদের মধ্যে মিলে মিশে থাকতো ও নিজেদেরকে মুসলমান বলে পরিচয় দিতো। বাহ্যিক কাজ কর্ম ও আনুষ্ঠানিক এবাদাত (যেমন নামায রোযা ইত্যাদি) দ্বারা নিজেদেরকে মুসলমান সমাজের লোক বলে বুঝানোর চেষ্টা করতো। তাদের সামনে খাঁটি মোমেনদের আদব কায়দা ও সঠিক আনুগত্যের চিত্র তুলে তাদেরকে এসব শৃংখলা মেনে চলতে আহ্বান জানানো হচ্ছে। তাদেরকে আল্লাহর এ ওয়াদাও শোনানো হচ্ছে যে, যদি খাঁটিভাবে তারা আল্লাহ তায়ালা ও রসূলের আনুগত্য করে তাহলে তারা আল্লাহর খলীফা হিসাবে দুনিয়ায় বাস করবে এবং আল্লাহর ইচ্ছায় দুনিয়ায় বিভিন্ন ক্ষমতার আসনে তাদেরকে সমাসীন করা হবে, কাফেরদের ওপরও তাদেরকে বিজয়ী করা হবে।

এরপর আসছে পঞ্চম পর্যায়, এর মধ্যে নিজেদের বাড়ীর বাইরে, আত্মীয়স্বজন ও বন্ধু বান্ধবদের বাড়ীতে প্রবেশের জন্যে অনুমতি চাওয়া ও মেহমানদারী করার আদব শেখানো হয়েছে। মুসলিম জামায়াতের লোকেরা সবাই এক পরিবারের লোক এই হিসাবে তাদের বাড়ীতে প্রবেশের নিয়ম শৃংখলার তালীমও দেয়া হয়েছে।

এরপর একথার ঘোষণার সাথে সূরাটি শেষ করা হচ্ছে যে, আকাশ মন্ডলী এবং পৃথিবীর একচ্ছত্র অধিকারী ও মালিক আল্লাহ রব্বুল আলামীন, তাঁর জ্ঞান সবাইকে ঘিরে রেখেছে। তার জানা আছে , ওদের মধ্যে কে ধ্বংস হবে আর কে নিষ্ঠার সাথে তাঁর দিকে রুজু করবে, তাদের সকল ব্যাপারের জ্ঞানই তাঁর কাছে আছে– তিনিই সব কিছু সম্পর্কে ওয়াকেফহাল। আসুন, এবারে আমরা বিস্তারিত আলোচনার দিকে এগিয়ে যাই।

তাফসীর

আয়াত ১-২৬

'এ এমন একটি সূরা যার মধ্যে ইসলামের বিধি বিধানকে ফরয বলে ঘোষণা করে দিয়েছি, আর আমি এর মধ্যে সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ নাযিল করেছি যাতে করে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারো।'

অন্য সূরার তুলনায় সমগ্র কোরআনের মধ্যে এ হচ্ছে এক অতুলনীয় ভূমিকা সম্বলিত সূরা। এখানে নতুন একটি কথা দেখতে পাচ্ছি 'ফারাদ্বনাহা' অর্থাৎ আমি একে বাধ্যতামূলক করে দিয়েছি। এ কথার যে অর্থ আমরা বুঝেছি তা হচ্ছে, সূরাটির মধ্যে বর্ণিত কথাগুলোকে একইভাবে গুরুত্বপূর্ণ মনে করা, এর দ্বারা পরিষ্কারভাবে বুঝা যাচ্ছে, বাড়ী ঘরের নিয়ম শৃংখলা মেনে চলা এবং পরস্পরের সাথে ব্যবহারের আদব কায়দা রক্ষা করা তেমনই ফরয, যেমন অন্যান্য শাস্তিযোগ্য আইন মানা ফরয। মানুষের স্বভাব প্রকৃতির মধ্যেই এই আদব রক্ষা করার প্রবণতা বর্তমান রয়েছে; অবশ্যই প্রবৃত্তির তাড়নে অথবা মানবিক দুর্বলতার কারণে মানুষ এসব আদব কায়দা অনেক সময় ভুলে যায়, সেজন্যেই আলোচ্য সূরার মধ্যে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে আল্লাহ রব্বুল আলামীন সেসব বিষয়ের নির্দেশ দিয়েছেন। সুস্পষ্ট যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন মানব সমাজে শান্তি রক্ষায় এসব আদব-কায়দার গুরুত্ব কত বেশী।

ইসলামে ব্যভিচারের শাস্তি

এ ভূমিকার পরেই শক্তিশালী এক যুক্তি সহকারে যেনাকারীর প্রতি শাস্তির ঘোষণা শোনানো হয়েছে, এসব আচরণ কতো জঘন্য তা জানানো হয়েছে। এসব অসদাচরণ মুসলিম সমাজের শান্তি শৃংখলা বিঘ্নিত করার সাথে সাথে দাম্পত্য জীবনকে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে দেয়, পারস্পরিক আত্মীয়তা ও সামাজিক বন্ধনকে নষ্ট করে। দেখুন আল্লাহর আয়াত,

'যেনাকারী পুরুষ ও নারীর প্রত্যেককে একশত চাবুক মারো ...... আর যেনাকারী নারীকে যেনাকারী পুরুষ বা কোনো মোশরেক ছাড়া অন্য কেউ বিয়ে করবে না। মোমেনদের জন্যে এ কাজ (বিয়ে) কে হারাম করে দেয়া হয়েছে।'

এটা ছিলো ইসলামের প্রথম যুগে ব্যভিচারকারী পুরুষ ও নারীর শাস্তি এবং সূরায়ে 'নেসা'তে এ শাস্তির ঘোষণা দেয়া হয়েছে, বলা হয়েছে।

'আর তোমাদের মধ্যে যেসব নারী এসব লজ্জাকর কাজে লিপ্ত হবে তাদের বিরুদ্ধে (হে মোমেনরা) তোমাদের মধ্য থেকে চারজন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করো। তারা সাক্ষ্য দিলে সে মহিলাদেরকে বাড়ীতে আমৃত্যু আবদ্ধ করে রাখো, অথবা আল্লাহ তায়ালা তাদের জন্যে অন্য কোনো পথ বের না করা পর্যন্ত অপেক্ষা করো।'

এক্ষেত্রে বুঝা যাচ্ছে বাড়ীতে আবদ্ধ করে রাখা দ্বারা তাদেরকে কষ্ট দাও, অর্থাৎ বাড়ীর পরিবেষ্টনীতে রেখে তাদেরকে কর্মব্যস্ত রাখো যেন তারা পুনরায় অনুরূপ অপরাধ করতে না পারে এবং অনুতপ্ত হওয়ার (তাওবা করার) সুযোগ পায়। অনুরূপ অপরাধে জড়িত পুরুষের জন্যেও (গৃহে আবদ্ধ রাখা ছাড়া) এধরনের শাস্তি রয়েছে।

এরপর সূরায়ে নূরের মধ্যে যেনার শাস্তি সম্পর্কিত আয়াত নাযিল হয়েছে। সূরায়ে 'নেসা'তেও ইতিমধ্যে এভাবে শাস্তির কথা বলা হয়েছে।

আমাদের মনে রাখতে হবে যে, চাবুক মারার এ শাস্তি হচ্ছে অবিবাহিত পুরুষ ও নারীর জন্যে অর্থাৎ, বিয়ের মাধ্যমে যারা নিরাপত্তা বেষ্টনীতে থাকার সুযোগ পায়নি তাদের জন্যেই এ হালকা শাস্তি। এ শাস্তি মুসলিম, বালেগ, সুস্থ মস্তিষ্ক ও স্বাধীন ব্যক্তির জন্যে। অতপর যে ব্যক্তি বিবাহিত জীবনে পদার্পণ করার চারিত্রিক নিরাপত্তা লাভে ধন্য হতে পেরেছে, সে যদি অনুরূপ পাপাচারে লিপ্ত হয়, তাহলে তার জন্যেই রয়েছে পাথর নিক্ষেপের মাধ্যমে হত্যা করার শাস্তি। পাথর নিক্ষেপে হত্যা করার শাস্তির বিধান রসূল (স.)-এর সুন্নত থেকে জানা যায়, আর আল কোরআন থেকে প্রমাণিত হয়েছে চাবুক মারার শাস্তি। প্রথম দিকে অবতীর্ণ আল কোরআনের আয়াত দ্বারা সংক্ষেপে ও সাধারণভাবে যে শাস্তি দেয়া যায়, তারই ব্যবস্থা আগে দেয়া হয়েছে। কিন্তু পরবর্তীতে রসূল (স.) বিবাহিত পুরুষ ও নারীর জন্যে প্রস্তরাঘাতে হত্যার শাস্তি দিয়েছেন। এতে বুঝা গেলো, বিবাহের মাধ্যমে নিরাপদ জীবন লাভে ধন্য ব্যক্তি ছাড়া অন্যদের জন্যে এক শত চাবুক মারাই তাদের উপযুক্ত শাস্তি।

এখন বিবাহিত পুরুষ নারীদেরকে চাবুক মারা ও প্রস্তরাঘাতে হত্যা করার এ উভয়ই শাস্তি দেয়া হবে কিনা এ বিষয়ে ফেকহবিদদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। অধিকাংশ ফকীহরা একই ব্যক্তিকে দুটি শাস্তি এক সাথে দেয়ার বিপক্ষে রায় দিয়েছেন। আবার অবিবাহিতদের জন্যে চাবুক মারা এবং দেশান্তর করার উভয় শাস্তি একই সাথে দেয়া হবে কিনা সে বিষয়েও মতভেদ পাওয়া যায়, যারা স্বাধীন নয় তাদের ওপর যেনার শাস্তি আরোপিত হবে কিনা– সে বিষয়েও ফকীহরা দ্বিধা বিভক্ত। এসব মতভেদ অনেক দীর্ঘ, যার বিস্তারিত বিবরণে আমরা যেতে চাই না। এসবের

ওপর ব্যাপক আলোচনা ফেকাহর পুস্তকাদিতে রয়েছে। আমরা শুধু শরীয়াতের এই বিধানের তাৎপর্য বুঝতে চাই, এজন্যে আলোচনাকে এ বিধানের মৌলিক বিষয়গুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছি। এ আলোচনায় আমরা সুস্পষ্ট যে বিষয়টি দেখতে পাচ্ছি, তা হচ্ছে অবিবাহিতদের জন্যে চাবুক মারার শাস্তি এবং বিবাহিতদের জন্যে প্রস্তরাঘাতে হত্যার শাস্তি– এ শাস্তি সেসব স্বাধীন বয়প্রাপ্ত বিবাহিতদের জন্যে, যারা বিবাহ বন্ধনের মাধ্যমে প্রাকৃতিক প্রয়োজন মেটানোর সঠিক উপায় লাভ করেছে, এসব সরল সহজ উপায় লাভ করার পরও যদি তারা বাঁকা পথ অবলম্বন করে এবং সমাজকে কলুষিত করার দুঃসাহস করে তাহলে বুঝতে হবে, তারা স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে চায় না, সমাজের শান্তি রক্ষার ব্যাপারে তাদের কোনো পরওয়া নেই, এজন্যেই তাদের জন্যে কঠোরতম শাস্তির বিধান দেয়া হয়েছে, এটাই তাদের জন্যে উপযুক্ত শাস্তি।

এই কঠোরতার কারণ হচ্ছে, কোনো ব্যক্তি বিশেষের জন্যে গোটা সমাজকে ধ্বংস হতে দেয়া যায় না, অপরদিকে অবিবাহিত মানুষ, যার প্রাকৃতিক চাহিদা মেটানোর কোনো উপায় নেই, সে যদি উত্তেজনা বা কুপ্রবৃত্তির তাড়নে পড়ে বিপথগামী হয়, সে অবস্থায় মেহেরবান মালিক হালকা শাস্তি দান করে তাকে শোধরানোর সুযোগ দিয়েছেন। সে যদি তাওবা করে তাহলে আবার স্বাভাবিক ও সম্মানের জীবনে ফিরে আসার সুযোগ পাবে। বিবাহিত মানুষ দাম্পত্য জীবনের অভিজ্ঞতা থাকায় সেই সব বিষয় বুঝতে পারে এবং অবিবাহিত মানুষের তুলনায় এমন গভীরভাবে সেই সব স্বাদ পায় যা অবিবাহিত মানুষ কল্পনাও করতে পারে না, ফলে তারা রিপুর ডাকে সাড়া দেয়– যদি তাদের মধ্যে আল্লাহর ভয় না থাকে। এজন্যে তাদের শাস্তিও অধিক কঠিন। আল কোরআন এখানে শুধুমাত্র অবিবাহিত মানুষের শাস্তির কথা উল্লেখ করেছে, যার বর্ণনা ইতিপূর্বে এসে গেছে। সুতরাং যে বিষয়ে তাকে পাকড়াও করা হবে কড়াকড়িভাবেই এবং এ ক্ষেত্রে কোনো ক্ষমা বা শিথিলতা প্রদর্শন করা হবে না। এরশাদ হচ্ছে,

‘ যেনাকারী নারী ও যেনাকারী পুরুষ, ওদের প্রত্যেককে একশত চাবুক মারবে .... আর তাদেরকে দেয়া এ শাস্তি মোমেনদের একটি দল যেন দেখে।’

‘হদ’ (শাস্তির আইন প্রয়োগ) সম্পর্কে এটা অকাট্য ও চূড়ান্ত নির্দেশ। যারা এ অপরাধ করবে তাদের প্রতি যেন কোনো শিথিলতা প্রদর্শন করা না হয়, দন্ড জারি করা যেন বন্ধ না হয় এবং আল্লাহর আইনের প্রতি শিথিলতা প্রদর্শন, অথবা দন্ড কায়েম করার ব্যাপারে কোনো প্রকার নরম ভাবও যেন দেখানো না হয়, আর এই শাস্তিটা প্রকাশ্যে এবং মোমেনদের একটি দলের উপস্থিতিতে দিতে হবে যেন এই কঠিন শাস্তির দৃশ্য তাদের অন্তরে এক প্রচন্ড ভীতির সঞ্চার করে এবং যারা এসব অন্যায় কাজে প্রবৃত্ত হওয়ার চিন্তা করে এবং উপস্থিত জনতা– সবার মনে এটি ভীষণভাবে দাগ কাটে।

ব্যভিচারী নারী পুরুষের সামাজিক অবস্থান

এরপর এই আচরণের কদর্যতা এবং এই ন্যককারজনক কাজের প্রতি আরো অধিক ঘৃণা সৃষ্টির জন্যে নীচের আয়াতটিতে কিছু মানসিক শাস্তির কথা বলা হয়েছে যেন মুসলিম জামায়াতের সদস্যদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা আসতে না পারে।

যেনাকারী কোনো পুরুষ কোনো যেনাকারী মেয়েকেই বিয়ে করবে, অথবা বিয়ে করবে কোনো মোশরেক মেয়েকে, অনুরূপভাবে যেনাকারী (কোনো) মেয়েকে কোনো যেনাকারী পুরুষ বা কোনো মোশরেকই বিয়ে করবে। মোমেনদের জন্যে এসব (মেয়েদের) বিয়ে করাকে হারাম করা হয়েছে।’

এতে বুঝা যাচ্ছে, মোমেন থাকা অবস্থায় এসব কদর্য কাজে কেউ লিপ্ত হতে পারে না। আল্লাহর এই নিষিদ্ধ কাজে যখনই কেউ লিপ্ত হয়ে যায় তখন সে ঈমান ও ঈমানের চেতনা থেকে অনেক দূরে সরে যায়। আর এই ধরনের জঘন্য কাজে লিপ্ত হয়ে গেলে কোনো মোমেন ব্যক্তি তাকে এই জন্যে বিয়ে করতে পছন্দ করবে না যেহেতু সে ঘৃণ্য কাজের দরুণ সে ঈমান থেকে দূরে সরে গেছে, কেননা এমন সম্বন্ধকে সে ঘৃণা করবে এবং তার মনটা উক্ত ব্যক্তির কাছ থেকে সরে আসতে চাইবে। ইমাম আহমাদ তো একজন যেনার অপরাধে অপরাধী ব্যক্তির সাথে একজন পবিত্র ব্যক্তির বিবাহ বন্ধনকে হারাম বলেছেন, তবে তাওবা করলে স্বতন্ত্র কথা।

যাই হোক আলোচ্য আয়াতটিতে বুঝা যাচ্ছে যে কোনো মোমেন ব্যক্তি প্রকৃতিগতভাবে কোনো যেনাকারিনীকে বিয়ে করা পছন্দ করে না। আর কোনো মোমেন নারীও স্বভাবতই কোনো যেনাকার ব্যক্তির সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া পছন্দ করবে না (এখানে একথা পরিষ্কার হওয়া দরকার যে সর্বান্তকরণে তাওবা করলে পূর্বেকার সকল পাপ মুছে যায় এবং আল্লাহ রব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে ক্ষমা প্রাপ্তিতে সে নবজাত শিশুর মতো নিষ্পাপ হয়ে নতুন জীবন শুরু করে। সুতরাং এরপর পাক ছাফ থাকলে পূর্বেকার অপরাধের জন্যে দায়ী করা তো দূরের কথা পূর্বের কোনো কথা উল্লেখও জায়েয নয়)। আলোচ্য আয়াতে 'হুররেমা' শব্দটিতে যদিও 'হারাম করে দেয়া হয়েছে' অর্থ বুঝায়, কিন্তু ভাষাবিদদের মতে বাক্য বিন্যাসে একথার তাৎপর্য বুঝায় 'পবিত্র ব্যক্তিরা' উক্ত অপরাধের কারণে ('অপবিত্র' বিধায়) যেনার অপরাধে অপরাধীদের থেকে স্বাভাবিকভাবেই ভীষণভাবে দূরত্ব বজিয়ে রাখতে চায়। বলা হয়েছে,

'আর হারাম করে দেয়া হয়েছে সেটাকে মোমেনদের জন্যে'.......

এভাবে এই ঘৃণ্য অপরাধে লিপ্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের থেকে পরিষ্কার ও পবিত্র মুসলিম জামায়াতের সেই সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়, যা ইতিপূর্বে তাদেরকে ঈমানের বন্ধনে বেঁধে রেখেছিলো।

এ আয়াতটির শানে নুযুল জানাতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, মারসাদ ইবনে আবি মারসাদ নামক এক ব্যক্তি মক্কা থেকে দুর্বল ও পথ না জানা মোমেনদেরকে (১) মদীনায় পৌঁছে দেয়ার খেদমত আনজাম দিতো। এনাক নামক একজন চরিত্রহীনা মহিলা ছিলো সে লোকটির বান্ধবী। এ লোকটি কোরায়শদের হাতে আবদ্ধ এক ব্যক্তিকে মক্কায় পৌঁছে দেবে বলে কথা দিয়েছিলো। লোকটি (মারসাদ) বলছে, আমি এক চাঁদনী রাতে রওয়ানা হয়ে এসে একটি প্রাচীরের কাছে পৌঁছুলাম। এ সময় হঠাৎ করে এনাক সেখানে হাযির হলো। দেখলাম প্রাচীরের পাদদেশে একটি তৃণভূমি। মহিলাটি একেবারে কাছাকাছি যখন এসে গেলো তখন আমাকে চিনে ফেললো, বললো, কে মারসাদ? আমি বললাম, হাঁ, আমি মারসাদ! তখন সে আমন্ত্রণ জানিয়ে বললো, স্বাগত বন্ধু, এসো, এসো না আমরা এক সাথে রাতটি কাটাই। মারসাদ বললেন, শোনো এনাক, আল্লাহ রব্বুল আলামীন ব্যাভিচারকে হারাম ঘোষণা করেছেন। তখন মহিলাটি আমার ওপর ক্ষেপে গেলো এবং আমাকে ধরিয়ে দেয়ার জন্যে চীৎকার করে মক্কাবাসীদেরকে ডাকাডাকি শুরু করলো। বলতে লাগলো, কে কোথায় আছো দেখে যাও, এ লোকটা তোমাদের আশ্রিতদেরকে পার করে দিচ্ছে, এর ফলে আট জন ব্যক্তি আমার দিকে ধেয়ে এলো। অবস্থা বে-গতিক দেখে আমি দেয়াল ঘেরা বাগিচার মধ্যে ঢুকে পড়লাম, দেখলাম একটি গর্ত বা গুহা, জান বাঁচানোর জন্যে তার মধ্যেই আমি ঢুকে পড়লাম। লোকগুলো আমার পিছু পিছু এলো এবং আমাকে খুঁজে না পেয়ে সে গর্তের

(১) মক্কায় যে সকল দুর্বল বা পথ-না-জানা মোমেন মোশরেকদের হাতে নযরবন্দী ছিলেন, 'উসারা' শব্দটি দ্বারা সম্ভবত তাদেরকই বুঝানো হয়েছে– সম্পাদক

মুখে এসে একের পর এক পেশাব করলো। কি করবো, পেশাব আমার ওপর পড়লেও আমি চুপ করে পড়ে রইলাম। আল্লাহ তায়ালা আমাকে দেখার ব্যাপারে ওদেরকে অন্ধ করে দিলেন। যাই হোক আমাকে ধরতে ব্যর্থ হয়ে লোকগুলো যখন চলে গেলো তখন ওয়াদা অনুযায়ী সে লোকটিকে নিয়ে আমি মদীনার পথে রওয়ানা হয়ে গেলাম। ইতিমধ্যে এযখার নামক এক প্রকার ঘাসে ভরা এক প্রান্তরে আমরা পৌঁছুলাম ও সেখানে গিয়ে আমার উঁটটিকে আমি ছেড়ে দিলাম। উঁটটি তৃপ্তির সাথে ঘাস পাতা খেয়ে নেয়ার পর পুনরায় সফর শুরু করলাম, অবশেষে মদীনায় নবী (স.)-এর কাছে পৌঁছে গেলাম। অতপর সমস্ত ঘটনা জানিয়ে তাঁকে আমি পরপর দু'বার জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ এনাককে আমি বিয়ে করে নেই? রসূল (স.) নীরব হয়ে রইলেন, কোনো জওয়াবই দিলেন না, অবশেষে নাযিল হলো, 'আয যানী.......যেনাকারী যেনাকারিনীকে ছাড়া বিয়ে করবে না.....মোমেনদের জন্যে তা হারাম তখন রসূল (স.) বললেন, হে মারসাদ, যেনাকারী যেনাকারিণী বা মোশরেক নারীকেই বিয়ে করবে। সুতরাং, তুমি ওকে বিয়ে করো না।(২)

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, এ রেওয়ায়াতটি তাওবা না করা পর্যন্ত কোনো মোমেনের জন্যে ব্যাভিচারকারিনীকে বিয়ে না করার পক্ষেই রায় দিয়েছে। অনুরূপভাবে কোনো মোমেন নারীরও কোনো ব্যাভিচারীর সাথে (তাওবা না করা পর্যন্ত) বিয়ে হতে পারে না। ইমাম আহমদ এই হাদীসটিকেই দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন এবং তিনি অন্যদের সাথে দ্বিমত পোষণ করে এ সকল অসম বিবাহকে হারাম ঘোষণা করেছেন। অবশ্য একেবারে হারাম মনে করার ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মধ্যে মতপার্থক্য আছে। (বিস্তারিত বিবরণের জন্যে ফেকার কেতাবসমূহ দেখুন) তবে সর্বাবস্থায় পাপাচারটি এমন জঘন্য কাজ যে, এতে লিপ্ত অপরাধী ব্যক্তি মুসলিম জামায়াত থেকে বহিষ্কৃত হতে বাধ্য এবং ওদের সাথে মুসলিম জামায়াতের সকল সম্পর্ক ছিন্ন করতেই হবে, আর এটা চাবুক মারা বা তার থেকেও কঠিন একটি সামাজিক শাস্তি!

দেখুন, ইসলাম এই জঘন্য অপরাধের জন্যে এই কঠিন চূড়ান্ত ও অকাট্য শাস্তি দানের ব্যবস্থা তখনই করেছে যখন মানুষের স্বাভাবিক প্রয়োজন মেটানোর পথকে ইসলাম সুগম ও সহজ করেছে। ইসলাম মানুষের প্রকৃতিক প্রয়োজন ও স্বাভাবিক ঝোঁক প্রবণতাকে অস্বীকার করেনি, বরং মানব জীবনের প্রসার ও শান্তি সমৃদ্ধির জন্যে নারী পুরুষের সম্পর্ক ও মিলনকে পবিত্র বলে জানিয়েছে। যিনি তাদের মধ্যে সেসব প্রবণতা ও শক্তি দিয়েছেন, সেই মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাদের জন্যে সুনির্দিষ্ট এক বিধান দিয়েছেন। তাঁর দেয়া সেই সীমারেখার মধ্যে থেকে তারা পারস্পরিক যে সম্পর্ক সম্বন্ধ স্থাপন করবে, তারই মধ্যে তাদের শান্তি সমৃদ্ধি তৃপ্তি ও পারস্পরিক দরদ মহব্বত বিরাজ করছে। এজন্যে মানুষের স্বাভাবিক চাহিদা দমন করা নয়, বরং প্রয়োজন সেগুলোকে নিয়ন্ত্রিত করাই ইসলামের কাম্য। লাগামহীন অবস্থায় জীবন যাপন সম্ভব নয়, বরং সুনিয়ন্ত্রিত ও সুশৃংখলভাবে নিজেদের সম্বন্ধকে সুসংবদ্ধ করা জরুরী। কারো হক নষ্ট না করে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের সাথে আল্লাহর বন্দেগী করা– তাঁরই হুকুম মতো এবং তাঁরই বিধান মতো সব কিছু ভোগ ব্যবহার করাই ইসলামের কামনা। একমাত্র এভাবেই শান্তি ও সভ্যতার সুদৃঢ় ইমারত গড়ে উঠবে।

---

(২) এ হাদীসটি রেওয়ায়াত করেছেন আবূ দাউদ, তিরমিযী ও নাসাঈ

অবাধ যৌনতা প্রতিরোধ করার ব্যাপারে ইসলামের নীতি

ইসলাম সেই ঘৃণ্য পশুত্বের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে যা শরীরে শরীরে পার্থক্য করে না অথবা যা পরিবারের সংহতি রক্ষা করতে চায় না, পারিবারিক বন্ধনসমূহ গড়ে তুলতে চায় না। এখানে ইসলাম শুধুমাত্র মানুষের শরীর স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধনা করেই থেমে যায় না! আধুনিক পৃথিবীর উন্নয়নশীল মানুষের অনুকরণে মানুষের যৌন সম্পর্ক স্থাপন করতে চায় না। ইসলাম চায় এমন সমাজ ব্যবস্থা গড়তে, যার মধ্যে ব্যক্তিতে ব্যক্তিত্বে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার সাথে সাথে অন্তর ও আত্মার সম্পর্কও গড়ে উঠবে, দুটি জীবনের সম্মিলনে একটি যৌথ জীবন গড়ে উঠবে, যৌথ আশা-আকাংখা, ব্যথা-বেদনা পরস্পর সহমর্মিতা এবং স্বামী-স্ত্রী উভয়ের স্বপ্নসাধের মধ্য দিয়ে এক উন্নত ভবিষ্যত গড়ার কাজ চলবে, যার প্রভাব পড়বে তাদের সন্তানদের ওপর। তারা স্বপ্ন দেখবে নতুন পৃথিবী গড়ার এবং এসব পরিকল্পনা তাদের যৌথ সংসারের আবেষ্টনীতে রচিত হবে, এমন সংসারে সন্তানদের সামনে তাদের উচ্চাভিলাষী এমন পিতা মাতা থাকবে যারা একে অপরকে কখনো ছাড়তে পারে না।

এই লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যেই ইসলাম ব্যাভিচারের দন্ডকে এতো কঠিন বানিয়েছে, কারণ তার মধ্যে কোনো মানবতা বোধ নেই, নেই কোনো সৌহার্দ সম্প্রীতি, নেই কোনো শান্তিপূর্ণ সমাজ গড়ার লক্ষ্য, বরং আছে পশুর হিংস্রতা, দানবীয় তান্ডব, হিংসার দাবানল ও হৃদয়হীনতার গ্লানি— যা মানুষের জীবন লক্ষ্যকে মাটিতে মিশিয়ে দেয় এবং গোটা মানব সমাজকে হিংস্র পশুত্বের স্তরে নামিয়ে দেয়। এই মানব সমাজে তথাকথিত উন্নত মানুষের কাছে থাকে না নারীতে নারীতে কোনো পার্থক্য, থাকে না পুরুষে পুরুষে কোনো ব্যবধান। সেখানে সকল কিছু বিসর্জন দিয়ে তারা ক্ষণিকের জন্যে শুধু রক্ত-মাংসেরই ক্ষুধা মেটায়। তারপর তারা পরস্পর থেকে পরক্ষণেই যখন বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এই সাময়িক স্বাদ গ্রহণ শেষে জীবনের মধ্যে ভালো কোনো কিছুর ভিত্তি তারা দেখতে পায় না, না পৃথিবীতে তারা রেখে যায় স্থায়ী কোনো নীড়, যা পরবর্তীদের জন্যে কোনো আশ্রয়স্থানে পরিণত হতে পারে। জীবনের কোনো পরিণতিও তাদের থাকে না, আর এটা সে তাদের আকাংখার বিষয় বলেও তারা মনে করে না। এভাবে অনিয়ন্ত্রিত এই মিলনের মাধ্যমে সত্যিকারে কোনো হৃদয়াবেগ বা আন্তরিক কোনো প্রেম প্রীতিও গড়ে ওঠে না, কেননা প্রেমাস্পদের সাথে স্থায়ীভাবে থাকার কামনা বাসনাই তো পরস্পরের গভীর ভালবাসা ও হৃদয়াবেগ সৃষ্টি করে, যার কারণে তাদের মানষিক অস্থিরতা দূর হয় এবং একাকীত্বের বিরহ নিবারণ হয়। এই বন্ধনকেই অনেকে বলে প্রেম প্রণয়, যা নিয়ে রচিত কত গান কবিতা! কিন্তু নিয়ন্ত্রণবিহীন এই প্রেম প্রীতি পশুদের মতো অনিশ্চয়তা ও অস্থিরতা আনে, কারণ প্রেমের মাঝে বিনোদনের পোষাক পরে এসব পশুত্ব ও পাশব মনোবৃত্তি সমাজকে গ্রাস করে ফেলে।

ইসলাম মানবতা প্রতিষ্ঠা ও তা বৃদ্ধির একমাত্র পূর্ণাংগ ব্যবস্থা। এজন্যে এ ব্যবস্থা মানুষের প্রকৃতিগত যে কোনো প্রয়োজন মেটানোর নিশ্চয়তা দিয়েছে এবং কোনো স্বাভাবিক চাহিদাকেই অস্বীকার করেনি— একে নিয়ন্ত্রণ করেছে মাত্র এবং এসব চাহিদাকে পবিত্র বলে ঘোষণা করেছে। একে পাশব বৃত্তির উর্ধ্বে উন্নীত করেছে; এমনকি যেসব স্থানের চতুর্দিকে বহু ব্যক্তি মনস্তাত্তিক শান্তি ও সামাজিক শৃংখলার ওজুহাতে ঘোরাফেরা করে সেসব স্থানগুলোকেও ইসলামের সম্মোহনী ব্যবস্থা পরিবর্তন করে তাকে মর্যাদার স্তরে টেনে তুলেছে। ব্যাভিচার, বিশেষ করে পতিতাবৃত্তি মানুষের স্বভাবগত পারস্পরিক পবিত্র আকর্ষণ থেকে এবং তার আত্মার স্বাভাবিক গতি থেকে দূরে সরিয়ে দেয়, সরিয়ে দেয় তাকে তার উঁচু আশা-আকাংখা থেকে, সরিয়ে দেয় তাকে সর্বপ্রকার

নিয়ম-শৃংখলা সামাজিক মর্যাদাবোধ গুণাবলী থেকে, যা সুদীর্ঘ মানবেতিহাসে বরাবরই সমাদৃত হয়ে এসেছে। অপরদিকে এর মাধ্যমে তার মধ্যে জীব জানোয়ারের মতো উলংগপনা ও নির্লজ্জতা জন্ম দিয়েছে বরং পশুদের থেকেও তারা নির্লজ্জতার দিকে নীচে নেমে গেছে। পশু পাখীর মধ্যেও অনেকগুলো এমন আছে, যারা জোড়া জোড়া থাকা শুধু যে পছন্দ করে– তাই নয়, বরং একে অপরকে কখনো ছেড়ে যায় না, দেখে মনে হয় তারা যেন এক সংগঠিত বিবাহিত জীবন যাপন করছে। ব্যভিচারের কারণে দায়িত্বমুক্ত এক জীবন গড়ে ওঠে, সম্পর্ক স্থাপিত হয় সাময়িক ইন্দ্রিয়-ক্ষুধা মেটাবার প্রয়োজনে, সমাজের অনেক জায়গায় পতিতাদের অস্তিত্ব স্বীকৃতাবস্থায় থাকলেও কোনো সমাজেই তাদের স্বীকৃত মর্যাদা নেই। সুস্থ অবস্থায় কেউই তাদের মর্যাদা দেয় না, তাদেরকে ব্যবহার করা হয় শুধু পাশবিক প্রয়োজন মেটানোর জন্যে।

যেসব প্রাকৃতিক কারণে মানুষের মধ্যে এসব প্রবণতা গড়ে ওঠেছে এবং যে সব বস্তুভিত্তিক প্রয়োজন মেটানোর জন্যে আধুনিক সমাজে এবং প্রাচীনকালের অনেক সমাজে এসব উচ্ছৃংখলতাকে লালন করা হয়– ইসলাম এগুলোর ব্যাপারে নিজস্ব নিয়ন্ত্রণ দিয়ে তাকে দমন করেনি, বরং এক সুশৃংখল নিয়মের অধীনে সেগুলো পূরণের ব্যবস্থা করেছে, যাতে মানুষে মানুষে সৌহার্দ সম্প্রীতি গড়ে ওঠে, একের প্রতি অপর মানুষ দরদ অনুভূতি অনুভব করে এবং দুর্দিনে অসুস্থায় একে অপরকে ছেড়ে না যায়। মানুষের স্বাভাবিক প্রয়োজনকে ইসলাম মোটেই অস্বীকার করে না, কোনো কৃত্রিম ব্যবস্থার আশ্রয়ও নেয় না, ইসলাম এগুলো দমনও করতে চায় না– এসবকে গলাটিপে হত্যাও করে দিতে চায় না এবং আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত মানুষের প্রকৃতির মধ্যে অবস্থিত নারী-পুরুষের পারস্পরিক আকর্ষণকে ইসলাম অবহেলাও করে না, বরং ইসলাম এটাকে মানুষের অন্যতম বড় প্রয়োজন বলে স্বীকৃতি দিয়ে তার জন্যে প্রয়োজনীয় এমন সব বিধান রচনা করে দেয় যে, তার অনুসরণেই মানুষ উন্নত জীবনের মর্যাদা খুঁজে পায়। মানুষের জীবনের অপরিহার্য এ বিষয়টিকে সুবিন্যস্ত করার জন্যে ইসলাম এ কাজকে রাষ্ট্রের এক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব বলে ঘোষণা করে।

ইসলামী দন্ডবিধির উদ্দেশ্য ঃ কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

এলোমেলো ও লাগামহীন ইন্দ্রিয় চর্চার মাধ্যমে মানুষ যে ধ্বংসের অতল তলে তলিয়ে যেতে শুরু করেছিলো সেখান থেকে ইসলামই তাকে টেনে তুলে সভ্য ও শান্তিপূর্ণ এক সমাজে পরিণত করলো, আর যেনার অপরাধ দমনে কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা করে নারী পুরষের মধ্যে সংহতি ও শান্তি আনলো, তাদেরকে সাময়িক শয্যা সংগী না বানিয়ে নিত্যদিনের সাথী বানালো, নারীকে অসহায় অংকশায়িনী অবস্থা থেকে উন্নীত করে নিরাপদ গৃহ বেষ্টনীর দায়িত্বশীল প্রহরী ও শান্তি সম্প্রীতির ধারক বাহক বানিয়ে দিলো। এভাবে সমাজের অপরাধ প্রবণতাকে নিয়ন্ত্রণ করলো, সন্তানের অনিশ্চিত বংশ পরিচয়ের গ্লানি থেকে রক্ষা করে তাকে মর্যাদাশীল নাগরিক হওয়ার সুযোগ করে দিলো, মানুষে মানুষে ঘৃণা ছড়ানো বন্ধ করলো এবং নিরাপদ বাড়ীগুলোতে বিরাজমান শান্তির হুমকিকে দূরীভূত করে সেখানে পারস্পরিক আস্থা ও মহব্বতের পরিমন্ডল গড়ে তুললো ....বলতে গেলে এসব কিছুরই মূলে রয়েছে এই কঠিন শাস্তির অপূর্ব অবদান, যা আপাত দৃষ্টিতে নিষ্ঠুর মনে হলেও তা সমাজের ধ্বংসস্তূপে জীবনের সজীবতা বয়ে আনে।

এ মহান খেদমত আঞ্জম দেয়ার ক্ষেত্রে প্রধান যে বিষয়টি কাজ করেছে তা হচ্ছে মানুষের মধ্যে বিরাজমান জৈবিক চাহিদাকে মেটানোর সহজ সরল পথ প্রদর্শন করা এবং নারী-পুরুষের সম্মিলনের জন্যে শৃংখলাপূর্ণ নিয়ম বিধান করা এবং স্থায়ীভাবে পারিবারিক জীবনের বুনিয়াদ গড়ে

তোলার লক্ষ্যে স্বামী স্ত্রীর জন্যে এমন কিছু মূলনীতি স্থাপন করা যাতে করে স্থায়ী ও প্রলম্বিত শান্তির জীবন গড়ে ওঠে .....অন্তরের মধ্যে অবশ্যই এ বিশ্বাসকে লালন করতে হবে যে মানুষের প্রয়োজন মেটানের এই সুব্যবস্থাই সকল সমস্যার প্রথম এবং আসল সমাধান। অন্য যতো সব ব্যবস্থা ও সতর্কতা সবই হচ্ছে এই ব্যবস্থার অধীন।

আমাদের এও বুঝতে হবে যে, ইসলাম এই কঠিন শাস্তি প্রয়োগের পূর্বে এমন পরিবেশ নিশ্চিত করেছে যেখানে সহজ সরলভাবে মানুষের প্রকৃতি প্রদত্ত প্রয়োজন মেটানোর নিশ্চিত ব্যবস্থা থাকবে, যার কারণে বাঁকা পথ ধরার সত্যিকারে কোনো প্রয়োজনই তাদের তাদের থাকে না। তারপর শাস্তি দানের পূর্বে ঘটনার পূর্ণ তদন্ত হতে হবে এবং যথাযোগ্য সাক্ষ্যের মাধ্যমে সন্দেহাতীতভাবে অপরাধ প্রমাণিত হতে হবে। অবশ্যই ইসলাম সারাবিশ্বের সকল মানুষের জন্যে এক পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থা শুধু যে কঠিন শাস্তি-বিধির ওপর দাঁড়িয়ে আছে- কিছুতেই তা নয়, বরং এ ব্যবস্থার মূলে রয়েছে যে আসল বিষয়, তা হচ্ছে মানুষের জীবনের শান্তি ও কল্যাণের জন্যে প্রয়োজনীয় সব কিছুর প্রতি প্রচুর বরাদ্দ দান। তার যা কিছু প্রয়োজন তা পাওয়ার সকল পথ তার জন্যে সুগম করে দেয়ার পরও যদি সে সীমালংঘন করে, দুর্গন্ধময় ও ক্লেদাক্ত ময়দানে যথেচ্ছ ভ্রমণে যদি তারপরও সে অভিলাষী হয়, একমাত্র তখনই তার জন্যে এই চরম ও চূড়ান্ত শাস্তি থাকবে। তবে হাঁ, যদি এমন কোনো বাধ্যবাধকতা দেখা দেয় যখন সে আল্লাহর দেয়া সীমা লংঘন করার উদ্দেশ্যে নয়- বরং বড়ই ঠেকায় পড়ে কোনো কর্দমাক্ত যমীনে অথবা কোনো মরু মরীচিকায় পা বাড়িয়ে দিয়েছে- সে অবস্থার কথা স্বতন্ত্র।

আলোচ্য এ সূরার মধ্যে মানুষকে অন্যায় থেকে বাঁচানোর জন্যে বহু উপায়ের উদাহরণ দেয়া হয়েছে যার বর্ণনা যথাস্থানে ইনশাআল্লাহ পাওয়া যাবে।

অতপর এসব কিছুর পরও যদি কোনো অপরাধজনক কাজ সংঘটিত হয়ে যায়, অর্থাৎ, সব রকমের সাবধানতা অবলম্বন করা সত্তেও কিংবা সীমালংঘন করার উদ্দেশ্যে নয়, পরিস্থিতি বাধ্য করার কারণে যদি কোনো অঘটন ঘটে যায়, সে অবস্থাতে তাদের থেকে হদ জারি করা থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করতে হবে এবং সে কঠিন শাস্তি থেকে বাঁচানোর জন্যে কোনো পথ থাকলে তা প্রয়োগের চেষ্টা করতে হবে, যেমন রসূল (স.) বলেছেন, 'মুসলমানদের থেকে শাস্তির ব্যবস্থাসমূহকে যথাসাধ্য দূরে রাখো। বাঁচার কোনো পথ বের করতে পারলে ওদের জন্যে পথ করে দাও। শোনো, কোনো নেতা ভুল করে যদি কাউকে ক্ষমা করে, সেটা অবশ্যই ভুল করে শাস্তি দেয়া থেকে উত্তম।'(৩) এই কারণেই তো 'চারজন বিশ্বস্ত চাক্ষুষ সাক্ষীর কথা বলা হয়েছে যারা নিজেদের চোখে বাস্তব ঘটনা সংঘটিত হতে দেখেছে বলে সাক্ষ্য দেবে'- শাস্তির জন্যে এ শর্তটি রাখা হয়েছে, অথবা এমনভাবে কেউ নিজে অপরাধ স্বীকার করবে যে তারপর সে অপরাধ সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকবে না, তবেই তার ওপর এ শাস্তি আরোপিত হবে।

ধারণা করা হয় যে, এ শাস্তি হচ্ছে কাল্পনিক, এজন্যে এটার প্রয়োগ মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। ইতিমধ্যে আমরা উল্লেখ করেছি যে, এ নির্দেশের ভিত্তি শাস্তি নয়, অর্থাৎ শাস্তি দান করাই এ আইনের উদ্দেশ্য নয়, বরং মানুষকে অন্যায় কাজ থেকে বাঁচানোই হচ্ছে এ আইনের লক্ষ্য। এজন্যে যেসব কারণে এ অপরাধ সংঘটিত হয় ইসলাম প্রথমত সেগুলোকে বন্ধ করতে চায়, চায় মানুষকে সভ্য-ভদ্র ও বিবেচক বানাতে, তাদের বিবেককে পরিচ্ছন্ন করতে এবং তাদের মধ্যে

(৩) হাদীসটি হযরত আয়েশা (রা.)-এর বরাত দিয়ে তিরমিযী শরীফে আনা হয়েছে।

আল্লাহভীতির এমন প্রেরণা সৃষ্টি করতে, যা তাদের অন্তরকে নিয়ন্ত্রিত করবে। এভাবে কোনো মোমেন ব্যক্তি এমন অপরাধ করা থেকে দূরে থাকবে, যা এসব অপরাধী ও মুসলিম জামায়াতের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটায় এবং মুসলমানদের মধ্যে সম্পর্ককে নষ্ট করে। ইসলাম শাস্তি দেয় তাদেরকে যারা বাধ্য হয়ে নয় বরং সখ মেটানোর জন্যে অপরাধ করে– এতে সমাজের ও বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কি ক্ষতি হয় তার কোনো পরওয়াই তাদের থাকে না যার কারণে এতোগুলোর সাক্ষীর পক্ষে স্বচক্ষে সে অপরাধ দেখার সুযোগ সৃষ্টি হয়ে যায়। অথবা ইসলাম শাস্তি দেয় এমন খাঁটি ঈমানদার ব্যক্তি বা ব্যক্তিদেরকে যারা আত্মশুদ্ধির জন্যে বা বিশেষ অবস্থার দরুণ অপরাধ করার পর একান্ত আত্ম শ্লাঘায় ভুগতে থাকে এবং আখেরাতের কঠিন শাস্তি থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে দুনিয়াতেই শাস্তি চেয়ে নেয়। তাদের কাছে আখেরাতের শাস্তির চাইতে দুনিয়ার শাস্তি অত্যন্ত তুচ্ছ মনে হয়, অর্থাৎ তারা আখেরাতের ওপর এত দৃঢ় বিশ্বাসী যে, অপরাধ করার পর আখেরাতের শাস্তি যেন নিজেদের চোখে প্রত্যক্ষ করতে থাকে এবং এজন্যে সে দীর্ঘস্থায়ী শাস্তি থেকে উদ্ধার পাওয়ার আশায় দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী শাস্তি নিজেরাই চেয়ে নেয়। এমনই এক অতি বিরল নযীর স্থাপিত হয়েছে সত্যিকারে আল্লাহর জান্নাতী বান্দা মায়েয ও গামেদী বংশীয়া তার সংগিনীর দ্বারা, তারা প্রত্যেকেই নবী (স.)-এর কাছে পৃথক পৃথকভাবে এসে 'হদ' জারি করে পবিত্র করে দেয়ার জন্যে আবেদন জানিয়েছেন চিন্তা করে দেখুন, কতো গভীর ছিলো তাদের ঈমান, কত তীব্রভাবে তারা আখেরাতের আযাবকে ভয় করেছেন! এই অপরাধ করার পর তাওবা করলে ক্ষমার দরজা খোলা রয়েছে একথা তারা জানতেন না তা নয়, তবু, তাদের মনে হয়েছে, মালিকের হুকুম অমান্য করা হয়েছে, শাস্তি চেয়ে নিলে হয়তো তিনি খুশী হয়ে যাবেন, হয়তো আদালতে আখেরাতে আর তাদের লজ্জিত হতে হবে না।

হাঁ, মায়েযের দ্বারা এই দৃষ্টান্তই স্থাপিত হয়েছে। হাদীসে এ ঘটনার বিবরণে আরো জানা যায়, নবী (স.) তার কথায় কান দিচ্ছিলেন না। যখনই মায়েয স্বীকারোক্তি করছিলেন, তখনই নবী (স.) অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছিলেন। এদিক থেকে ওদিকে মুখ নেয়ায় মায়েযও অন্য দিকে গিয়ে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে আবার তার ওপর হদ জারি করার আবেদন জানাচ্ছিলেন। নবী (স.) চাইছিলেন, সে থেমে যাক, কিন্তু উপর্যুপরি চার বার এভাবে স্বীকারোক্তি করে হদ জারি করার আবেদন করার পর চারজন সাক্ষীর সমান স্বীকারোক্তি যখন হয়ে গেলো তখন রসূল (স.) তার ওপর হদ জারি করার (অর্থাৎ পাথর মেরে হত্যা করার) হুকুম দিলেন। যেহেতু এ অপরাধের ব্যাপারে আর কোনো প্রকার সন্দেহ রইলো না, অতপর এ হুকুম তামিল করা হলো। আমার কাছে হদ জারি করার মকদ্দমা যেমন করে প্রমাণিত হয়ে গেলো তাতে হদ জারি (আমার জন্যে) ওয়াজেব হয়ে গেলো। (৪)

সুতরাং, যখন কোনো ঘটনা সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হবে এবং বিষয়টি বিচারকের কাছে পৌঁছুবে, তখন হদ জারি করা ওয়াজেব হয়ে যাবে, সে হদ জারি করতে আর কোনো প্রকার শৈথিল্য করা হবে না, আল্লাহ তায়ালার আইন প্রয়োগ করতে গিয়ে কোনো দয়া বা সহানুভূতি দেখানোর কোনো সুযোগ আর থাকবে না, কারণ এমন অবস্থায় যৌন উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে

(৪) হাদীসটি আবু দাউদে কেতাবুল হুদূদ 'আল্ আফউ আনিল হুদূদে মা-লাম তাবলুগুস সুলতানে' অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। প্রস্তরাঘাত যখন করা হচ্ছিলো, তখন নবী (স.) বলছিলেন, কেউ বেহেশতী দেখতে চাইলে তাকাও ওই ব্যক্তির দিকে। সে এমন তাওবা করেছে যা সমগ্র মদীনার লোকদের মধ্যে তোমরা বন্টন করে দিলেও তা সবার জন্যে যথেষ্ট হতো।

যারা ব্যাভিচারে লিপ্ত হবে তাদের প্রতি দরদ দেখানোর অর্থ হবে গোটা সমাজের ওপর যুলুম করা, মানবতাবোধ ও মানব শৃংখলাকে বিপর্যস্ত করা এবং মানুষের বিবেককে হত্যা করা। এই অপরাধীদের ওপর দরদ সহানুভূতি কৃত্রিম বা মেকী বলে গ্রহণ করা হবে। কারণ রহমানুর রহীম আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দার প্রতি সব থেকে বেশী দরদী। আল্লাহ তায়ালা নিজেই সে সব অপরাধীদের জন্যে যখন উক্ত শাস্তির ব্যবস্থা দিয়েছেন তখন বুঝতে হবে তাদের ও গোটা মানবতার কল্যাণের জন্যেই সে শাস্তির ব্যবস্থা তিনি দিয়েছেন। কেননা সূরা আল আহযাবে এ বিষয়ে দ্বার্থহীন ঘোষণা এসেছে,

'যখন আল্লাহ ও তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে কোনো বিষয়ের জন্যে চূড়ান্ত ফয়সালা এসে যাবে তখন কোনো মোমেন পুরুষ বা নারীর জন্যে সে বিষয়ে কিছু মাত্র মতামত প্রকাশের কোনো অধিকার থাকবে না।'

আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের কিসে ভালো তা তিনিই সবচেয়ে ভালো জানেন, তিনি জানেন তাদের প্রকৃতিসমূহকে। অতএব, চরম অহংকারী কোনো ব্যক্তির পক্ষে এই বাহ্যিক শাস্তির অবস্থা দেখে একে কঠিন শাস্তি বলে মন্তব্য করা শোভা পায় না, কারণ ওরা তো সেই সব মানুষ যাদের নিজেদের মধ্যেই ব্যাভিচারের ছড়াছড়ি চলছে এবং এর প্রসারের জন্যে তারা সামাজিকভাবে সব ধরনের ব্যবস্থা করে রেখেছে, তাদের মানব প্রকৃতি অধপতনের গহ্বরে পতিত হয়ে গেছে।

যেনাকারীর শাস্তির কড়াকড়িতে শুধুমাত্র যে দলীয় জীবনের সংহতি অক্ষুণ্ন রাখার লক্ষ্য অর্জিত হয় তাই নয়, এর দ্বারা পরিবেশের পবিত্রতাও অটুট থাকে। যেখানে মানুষ শান্তির সাথে বাস করতে পারে। তবে, এটা স্পষ্ট হওয়া দরকার যে, ব্যক্তি সমাজ ও সভ্যতাকে পরিচ্ছন্ন রাখার জন্যে ইসলাম যে একমাত্র এই কঠিন শাস্তির ওপরই নির্ভর করে তা নয়, আমরা ইতিমধ্যে আলোচনা করেছি যে ইসলাম এমন সমাজ ও পরিবেশ গড়তে চায় যেখানে মানুষ সহজে উক্ত অপরাধের সুযোগ পাবে না এবং এর প্রয়োজনও থাকবে না, মানুষের স্বাভাবিক চাহিদা মেটাবার জন্যে সেখানে সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা রয়েছে এবং সে ব্যবস্থাকে সহজও করে দেয়া হয়েছে, মুক্ত মেলামেশা ও ব্যাভিচারের দিকে আমন্ত্রণ জানানোর মতো উপায় উপাদানকে সেখানে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

আইনের সাক্ষ্য প্রয়োগের ব্যাপারে নযীরবিহীন কঠোরতা

কদর্য কাজে লিপ্ত এবং যাদের অপরাধ প্রমাণিত হয়ে যায় তাদেরকে একশত চাবুক মারার পর তাদেরকে সমাজচ্যুত ও দেশান্তর করার ব্যবস্থা রয়েছে, যাতে বিষাক্ত সামাজিক জীবানুর আক্রমণ থেকে গোটা সমাজকে রক্ষা করা যায়। হাঁ, এরপর খোলা রয়েছে তার জন্যে তাওবা করার অবারিত দ্বার, যার দ্বারা সে অনুতাপ করবে এবং সমাজের মধ্যে তার পরবর্তী পদচারণা আচার আচরণ সবার নযরে থাকবে। তার আচরণে তার আন্তরিক অনুশোচনার কথা প্রমাণ হবে। তারপর সামাজিক পরিমন্ডল থেকে অপরাধকে দূরীভূত করার জন্যে অন্য আর একটি পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে, তা হচ্ছে এই যে, চরিত্রবতী ও পর্দানশীল মহিলা এবং কোনো বিবাহিতার প্রতি কাদা ছোঁড়ার কাজটিকে এভাবে কঠোর হাতে দমন করা হয়েছে যে, কাউকে অভিযুক্ত করতে চাইলে সুস্পষ্ট ও যথেষ্ট সাক্ষ্য প্রমাণ হাযির আগে করতে হবে আল্লাহ রব্বুল আলামীন মানব প্রকৃতির মধ্যে লজ্জাশীলতার যে অনুভূতি রেখে দিয়েছেন তারই জন্যে সাধারণভাবে একবারে এমন প্রকাশ্যে এ কাজ কেউ করতে চায় না যাতে সহজে দৃষ্টিতে পড়ে। একেবারে বেপরওয়া ও চরম উচ্ছৃংখল পরিবেশেও মানুষ একটু আড়াল হতে চায়। কিন্তু উচ্ছৃংখলতা যদি এতোদূর গড়ায় এবং

কেউ যদি এতো নির্ভীক হয়ে যায় যে তার চরম অসতর্ক ও বেপরওয়া হওয়ার কারণে একজন নয়, দুজন নয় এবং তার মতো অপরাধ প্রবণ মানুষের নযরেও নয়, বরং শালীন সভ্য ও শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্বস্ত চার জন লোকের নযরে পড়ার সুযোগ হয়ে যায়, সেই অবস্থার জন্যে সে কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা। এই চূড়ান্ত প্রমাণ হিসাবে চারজন সাক্ষী হাযির করার ব্যাপারে দেখুন আল্লাহর নির্দেশ,

'যারা দোষারোপ করবে সে সব চরিত্রবতী (যারা পর্দানশীন এবং পিতা মাতা বা স্বামীর তত্ত্বাবধানে নিরাপত্তা বেষ্টনীতে থাকে– যত্রতত্র সৌন্দর্য বিকশিত করে ঘুরে বেড়ায় না এমন) মহিলাদেরকে এবং তারপর চার জন সাক্ষী (হাযির করবে না বা করতে পারবে না,) তাদেরকে আশিটি চাবুক মারো এবং ভবিষ্যতে তাদের সাক্ষ্য কখনো গ্রহণ করবে না (কারণ) তারা হচ্ছে প্রকৃত ফাসেক।'

প্রিয় পাঠক পাঠিকা, একবার খেয়াল করুন, যদি সে সকল পবিত্র স্বাধীন, সভ্য শালীন, পিতা মাতার তত্ত্বাবধানে বা স্বামীর সাথে জীবন যাপনকারিনী মহিলাদের বিরুদ্ধে রটনাকারীদেরকে বদনাম করার জন্যে অশালীন ব্যক্তিদের যবানকে মুক্ত ও নির্ভীক অবস্থায় ছেড়ে দেয়া হতো তাহলে মেয়েদের অবস্থা সমাজে কি দাঁড়াতো! সমাজের সে কুলাংগারদেরকে যদি দেখা যেতো তারা নিজেদের স্বার্থের কারণে অথবা অযথা কাউকে বদনাম করার মানসে এর ওর নামে দুর্নাম রটিয়ে নির্ভীক ও নির্বিকার চিত্তে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদের কোনো ধরপাকড় নেই বা তাদের কাছে কৈফিয়ত নেয়ারও কেউ নেই, তাহলে কি মেয়েদের মান-ইযযত কী অক্ষুন্ন থাকতো? তাদের জীবন কি দুর্বিষহ হয়ে যেতো না? তাদের বিয়ে শাদী হওয়া কি কঠিন হয়ে যেতো না? তাদের পিতামাতার কি আহার নিদ্রা হারাম হয়ে যেতো না? স্বামী-স্ত্রী কি পরস্পর একে অপরের বিরুদ্ধে সন্দেহের মধ্যে পতিত হতো না? পারস্পরিক অবিশ্বাস ও অনাস্থা সৃষ্টি হয়ে ঘরে ঘরে কি অশান্তির অনল জ্বলে উঠতো না? যত্রতত্র কি স্বামী স্ত্রীর বিচ্ছেদ ঘটতো না? পরিণত হতো না কি প্রতিটি সংসার অশান্তির অংগারে? মানুষের মধ্যে পেরেশানী ও সন্দেহ সংশয় কী বৃদ্ধি পেতো না? এভাবে গোটা সমাজ দেহে এই দুরন্ত অশান্তির অমানিশা কি ছড়িয়ে পড়তো না? (৫)

এজন্যে রব্বুল ইযযত ভূত ও ভবিষ্যত জাননেওয়ালা মেহেরবান মালিক মানুষের শান্তি ও কল্যাণের সুদূর প্রসারী লক্ষ্যে দায়িত্ব বিবর্জিত রটনাকারীদের জন্যে সে কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা দিয়েছেন, যাতে জেনে বুঝে এমন কঠিন পথে কেউ পা না বাড়ায়, সখ করে কেউ কাউকে বদনাম করার দুঃসাহস না করে। যদি কারো নযরে সত্যিকারে হঠাৎ করে কিছু পড়েও যায় এবং সেখানে আর কোনো বেশী মানুষ না থাকে, তাহলে সেখান থেকে (শাস্তির ভয়ে) দ্রুতগতিতে পালিয়ে যায় এবং একথা প্রকাশ করা থেকে নিজের জিহবাকে যেন সামলিয়ে নেয়, যেহেতু তার একার দেখা ঘটনা প্রমাণের জন্যে মোটেই যথেষ্ট নয়, বরং সে অপরাধে লিপ্ত ব্যক্তিদেরকে দুর্ঘটনায় পতিত মনে করে, সময়ান্তরে তাদেরকে যেন তাওবা করার সৎ পরামর্শ দেয় এবং জীবন ভর যেন কারো

(৫) এই কড়া বিধি-নিষেধের অভাবে আজ পশ্চিমী দুনিয়ায় ব্যভিচার ও ধর্ষণের কেইসগুলো অনেকটা তামাশায় পরিণত হয়ে গেছে, সাম্প্রতিক এক বৃটিশ জরীপে দেখানো হয়েছে যে, একমাত্র গ্রেট বৃটেনেই শতকরা ৬৯ ভাগ ধর্ষণ মামলা থাকে সাজানো। অধিকাংশ সময়ই দেখা যায়– ব্যক্তিগত প্রতিশোধ, আর্থিক ক্ষতিপূরণের লোভ ও সস্তা পাবলিসিটীর জন্যে-এরা একে অপরকে এভাবে অভিযুক্ত করতে থাকে, অথচ স্বাক্ষীদের ব্যাপারে যদি ইসলামের নির্ধারিত এই শক্ত ব্যবস্থা চালু থাকতো তাহলে এভাবে অর্থহীন মামলার পেছনে জাতীয় সম্পদের এই বিপুল পরিমান অংক ব্যয় হতো না।–সম্পাদক

কাছে এ কথা প্রকাশ না করে তাহলে [নবী (স.)-এর ভাষায়] আল্লাহ তায়ালাও তার অনেক অপরাধকে ঢেকে দেবেন। এসব ব্যবস্থা এজন্যে যে, অপরাধজনক এসব আচরণ দুর্গন্ধময় মল মূত্রের ন্যায়, এগুলো নাড়াচাড়া করলে এর থেকে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে সমাজ কলুষিত হয়, মানুষ কষ্ট পায়। এজন্যে একদিকে যথাযথ উপায়ে মানুষের প্রয়োজন মেটানোর পথ সুগম করা হয়েছে, বিদ্রোহী ও সমাজ বিধ্বংসীদেরকে উপযুক্ত সাক্ষ প্রমাণ সাপেক্ষে কঠোর শাস্তি দিয়ে এ মন্দ পথকে সুকঠিন করে দেয়া হয়েছে, অশান্তি ঘটানো লজ্জাকর এবং ন্যক্কারজনক ব্যবহার ও কথা ছড়ানোর দ্বারকে রুদ্ধ করে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা মানুষের সার্বিক মংগল চান।

এজন্যেই মানুষের মান সম্ভ্রম যাতে অক্ষুণ্ন থাকে, যেন মানুষ দুঃখ-বেদনা ও ঘৃণা ছড়ানোর কাজ থেকে দূরে থেকে পরস্পরের কল্যাণকামী হতে পারে তার জন্যেই এসব ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। শয়তানের ফেরেবে পড়ে মানুষের মধ্যে অপরাধ প্রবণতা আসে, দুর্বল কোনো সুযোগে অনেক সময়ে অপরাধ হয়ে যায়। আল্লাহ তায়ালা চান বান্দা যে অনুতপ্ত হোক, আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিক, আল্লাহর কাছে জওয়াবদিহির চিন্তায় পরবর্তীতে সে সতর্ক হয়ে চলুক এবং সে এমন বে-পরওয়া ও নির্ভীক যেন না হয়ে যায় যে তার আচরণ সংক্রামিত হয়ে গোটা সমাজ দেহকে কলুষিত করার অবস্থা সৃষ্টি হয়ে যায়। আল্লাহ তায়ালা আরো চান, যে মোমেন মোমেনের প্রতি দরদী হয়ে তাকে তাওবা করতে উদ্বুদ্ধ করুক সে, যেন বদনাম ও বে-ইযযত যাতে না হয়ে যায় তার জন্যে তার অপরাধ প্রচার না করুক, এজন্যেই চার জন বিশ্বস্ত দেখা সাক্ষী না হওয়া পর্যন্ত চুপ করে থাকতে বলা হয়েছে, নচেৎ তার শাস্তি ও অপরাধকারীর শাস্তি থেকে খুব একটা কম হবে না– আশিটি চাবুক, অর্থাৎ যার বিরুদ্ধে বলা হবে, যথেষ্ট প্রমাণের অভাবে সে বেঁচে যাবে, কিন্তু যে বলবে উল্টা সেই আশিটি চাবুক খাবে। চারজন সাক্ষী শুধু হলেই হবে না, শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে তাদেরকেও বিশ্বস্তও হতে হবে। এখন কোনো ব্যক্তি হয়তো কোনো ঘটনা দেখে ফেললো, তার আশেপাশে হয়তো আরো জন তিনেক এ ঘটনা দেখলো– এখন ওরা শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্বস্ত বলে গৃহীত হবে কিনা একথা তো সে জানে না, উপরন্তু ওরা যে সাক্ষ্য দেবে কি না তাও তো জানা নেই। এমতাবস্থায় কথাটা প্রকাশ করার পর যদি ওরা ওদের সমর্থন না পায় তাহলে তো মধ্যখান দিয়ে একাই তাকে শাস্তি খেতে হবে। অতএব, একবার চিন্তা করে দেখুন প্রকাশ করাটা এখানে কতো কঠিন কতো ঝুকিপূর্ণ! এসব বিবেচনায় বুঝা যাচ্ছে শাস্তি দানই আল্লাহর প্রধান উদ্দেশ্য নয়। তিনি সমাজের শান্তি শৃংখলা ও তার জন্যে উপযুক্ত সতর্কতা অবলম্বন টুকুই চান। তিনি চান পরিবারের নিরাপত্তা ও চারিত্রিক বলিষ্ঠতা গড়ে উঠুক ঘৃণা-বিদ্বেষ ও অশান্তি হোক– এজন্যে প্রয়োজন সাবধানতা, সতর্কতা ও নিরাপত্তার দূর্গ গড়ে তোলা হয়েছে।

আরো খেয়াল করার বিষয় হচ্ছে, যদি সে কিছু দেখা সত্তেও উপযুক্ত সাক্ষী দ্বারা প্রমাণিত হওয়ার সুযোগ নেই বুঝতে পেরে চুপ হয়ে যায়, তাহলে মুসলিম জামায়াতের কোনোই ক্ষতি হবে না। কিন্তু প্রকাশ করলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ছাড়াও আরো যারা শুনবে, তাদের মধ্যেও এর বিষাক্ত ক্রিয়া ছড়িয়ে পড়ে সমাজ দেহের ক্ষতি হবে– যারা এ কাজকে ঘৃণা করতো তাদের মধ্যেও এর উস্কানি দেখা দেবে, সমাজের শরীফ ঘরের মেয়েদের মান সম্ভ্রম ক্ষতিগ্রস্ত হবে, তারা দুঃখ অনুভব করবে এ ছাড়াও এর কুপ্রভাব অনেককে প্রভাবিত করবে।

এভাবে কারো দুর্বলতার কথা প্রকাশ করে দেয়ায় তা প্রমাণ না হওয়ার ক্ষেত্রে শাস্তি তো তাকে পেতেই হবে, তা ছাড়াও তাওবা না করা পর্যন্ত মানুষের অভিশাপের তরবারি তার মাথার ওপর ঝুলতেই থাকবে? তাই এরশাদ হচ্ছে,

'তবে, এরপর যারা তাওবা করবে এবং শুধরে যাবে, তাদের জন্যে আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল মেহেরবান।'

এ আয়াতের মধ্যে 'ইল্লা' দ্বারা এই ব্যতিক্রম করার ব্যাপারটি ফেকাহবিদরা বিভিন্নভাবে বুঝেছেন, সে কি শুধু শেষের শাস্তির দিকেই ফিরে যাবে, অর্থাৎ তার থেকে ফাসেক নামটা তুলে নেয়ার পর মানুষের দৃষ্টিতে শুধু বদনাম হয়ে থাকবে এবং তার কোনো সাক্ষ্য আর গ্রহণ করা হবে না? অথবা তাওবা করার পর তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে? এ ব্যাপারে ইমাম মালেক, আহমাদ ও শাফেয়ী এই মত পোষণ করেন যে, তাওবা করার পর তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে এবং ফাসেক নাম তার থেকে তুলে নেয়া হবে। ইমাম আবু হানিফার মতে ফাসেক তাকে আর বলা হবে না ঠিক, কিন্তু তার সাক্ষ্য কবুল করা হবে না।

শা'বী ও দহহাক বলেন, তাওবা করলেও মিথ্যা দোষারোপ করেছে বলে স্বীকার না করা পর্যন্ত তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না।

ব্যক্তিগতভাবে আমি, এই শেষের মতটাকেই পছন্দ করছি, কারণ তাওবার পর যখন যে মিথ্যা দোষারোপ করেছে বলে সরাসরি ঘোষণা দেবে তখনই যার বিরুদ্ধে মিথ্যা রটনা করা হয়েছে সেই ব্যক্তি মিথ্যা অপবাদের বদনাম থেকে রেহাই পাবে এবং তার হারানো সম্মান ফিরে আসবে, কখনো একথা বলা হবে না যে, প্রয়োজনীয় সংখ্যক সাক্ষী না পাওয়ার কারণে তাকে শাস্তি পেতে হয়েছে, আর এ ঘটনা যারা শুনেছে তাদের মনে একথা যেন কোনোভাবে না জাগে বা কোনোক্রমেই এ ধারণা যেন জাগানো না হয় যে 'হয়তো ঘটনা ঠিকই ছিলো, কিন্তু প্রমাণিত হয়নি।' ......এই পদ্ধতিতেই একমাত্র অপরাধের শিকার ব্যক্তির হৃত সম্মান সমাজের মানুষের কাছে পুরোপুরি পুনরুদ্ধার হতে পারে তাদের চেতনার মধ্যে যে কালো দাগ পড়েছিলো তা দূরীভূত হতে পারে, এভাবে তাওবার দ্বারা সে দোষারোপকারী সম্পর্কেও যে খারাপ ধারণা সৃষ্টি হতে পারে তা দূর হওয়া সম্ভব হবে।

মিথ্যা দোষারোপ করা সম্পর্কে এইটিই হচ্ছে সাধারণ আইন, কিন্তু এ আইন থেকে কিছু বিষয় আছে ব্যতিক্রম, আর তা হচ্ছে স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে দোষারোপ করা– সেখানে তার কাছে চারজন দেখা সাক্ষী হাযীর করার দাবী করলে তার ওপর যুলুম হয়ে যাবে এবং তাকে এক মহা পেরেশানীতে ফেলে দেয়া হবে। অবশ্য এটা ধরে নেয়া যায় যে, কোনো ব্যক্তি যাকে নিয়ে জীবন যাপন করছে তার বদনাম করার জন্যে তার ওপর যেনার মতো জঘন্য মিথ্যা দোষ চাপিয়ে দেবে এটা মোটেই স্বাভাবিক ব্যাপার নয়, যেহেতু তার নিজের সংসার, স্বার্থ ও সন্তানদের মান সম্ভ্রম এর সাথে জড়িত, এজন্যে তারপক্ষে অপ্রত্যাশিত এ ঘটনা কাউকে ডেকে দেখিয়ে সাক্ষী জোগাড়ের চিন্তাও অস্বাভাবিক ও অসম্ভব। আল্লাহ রব্বুল আলামীন এমন এক বিশেষ অবস্থার জন্যে ব্যতিক্রমধর্মী একটা ব্যবস্থা দিয়েছেন ও বলছেন।

'যারা তাদের স্ত্রীদের বিরুদ্ধে কোনো এমন অভিযোগে আনবে এবং নিজেদের সাক্ষ্য ছাড়া অন্য কোনো সাক্ষীকে হাযির করতে পারবে না...... আর আল্লাহর মেহেরবানী ও তাঁর রহমত যদি না থাকতো (তাহলে কত যে অশান্তি হতো তা চিন্তাও করা যায় না), আর আল্লাহ তায়ালা তাওবা কবুলকারী, মেহেরবান।'

আল্লাহর মেহেরবানী ও রহমত যদি না হতো তাহলে কী হতো তা স্পষ্ট করে বলা হয়নি, অপরাধসমূহ দূর হয়ে যাওয়ার পর তাওবার দ্বারা কী অর্জিত হতো তাও পরিষ্কার করে বলা হয়নি, বরং এটাকে একটি অস্পষ্ট অবস্থায় ছেড়ে দেয়া হয়েছে, যাতে মানুষের মনে একটা ভয় থাকে,

পরহেযগার ব্যক্তিরা বাছ বিচার করে চলতে পারে, তবে আল কোরআনের আয়াত ইংগিতে জানাচ্ছে যে, এ একটি বড় ক্ষতিকর বিষয়। এ বিষয়ের শানে নুযুল হিসাবে বহু হাদীস পাওয়া যায়।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে ইমাম আহমদ একটি হাদীস এনেছেন, তিনি বলেন, যখন নাযিল হলো, 'আর যারা চরিত্রবতী মেয়েদেরকে দোষারোপ করে এবং তারপর চার জন বিশ্বস্ত দেখা সাক্ষী হাযির করে না, তাদেরকে আশিটি চাবুক মারো এবং আর কখনো তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করো না' তখন আনসারদের নেতা সা'দ এবনে ওবাদা (রা.) বলে উঠলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ আয়াতটি কি এভাবেই নাযিল হয়েছে? তখন রসূল (স.) বললেন, 'হে আনসাররা, তোমরা শুনছো না তোমাদের নেতা কী বলছে?' অতপর আনসাররা বললো, তার দোষ ধরবেন না ইয়া রসূলাল্লাহ, তিনি বড়ই আত্ম মর্যাদান ব্যক্তি, তিনি বরাবরই কুমারী মেয়ে বিয়ে করেছেন। আর যাকে তিনি তালাক দিয়ে দিয়েছেন, তার সামাজিক মর্যাদার কারণে তাকে আমাদের মধ্যে আর কেউই বিয়ে করতে সাহস করেনি। তখন সা'দ বললেন, 'আল্লাহর কসম ইয়া রসূলাল্লাহ, আমি অবশ্যই জানি যে, এ আয়াতটি সত্য এবং আল্লাহর নিকট থেকেই এটা নাযিল হয়েছে, কিন্তু আমি আশ্চর্য হয়েই একথাটি বলে ফেলেছি। আমার কাছে মনে হয়, যদি আমি এরকম অন্যায়কারিনীকে দেখতে পেতাম যে, সে কারো সাথে মগ্ন হয়ে গেছে তখন সে ব্যক্তিকে বিরক্ত না করে বা সরিয়ে না দিয়ে চারজন সাক্ষী যোগাড় করে নিয়ে আসতাম, তবে আল্লাহর কসম ওর প্রয়োজন শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমি ওদেরকে আনতাম না ...... রেওয়ায়াতকারী বলছেন। ওরা ওখানে সামান্য কিছু সময় বসে থাকতে থাকতেই হেলাল এবনে উমাইয়া (৬) এসে হাযির হলো, বলতে শুরু করলো, একদিন রাত করে সে তার ক্ষেত থেকে বাড়ী ফিরে সে তার স্ত্রীর কাছে এক ব্যক্তিকে দেখলো, তার দু'চোখ দিয়ে দেখলো এবং দু'কান দিয়ে শুনলো, কিন্তু সকাল না হওয়া পর্যন্ত তাকে সে বিরক্ত করলো না, অতপর রাত শেষে সে রসূল (স.)-এর কাছে এলো। তারপর সে বললো, ইয়া রসূলাল্লাহ, আমি রাত করে আমার পরিবারের কাছে এসে দেখলাম তার কাছে এক ব্যক্তিকে দেখলাম, অতপর আমার নিজের দুটো চোখ দিয়ে দেখলাম এবং দুটো কান দিয়ে শুনলাম।

এই যে ঘটনাটা নিয়ে সে রসূল (স.)-এর কাছে এলো– এটা তাঁর কাছে খুবই খারাপ লাগলো এবং ব্যাপারটা তাঁর কাছে খুবই কঠিন ঠেকলো। এ সময় আনসারদের বেশ কিছু লোকজন সেখানে জুটে গেলো, তারা বললো, ইয়া রসূলাল্লাহ (স.) সা'দ এবনে ওবাদাহ যে কথাটা বলেছে, সে বিষয়টির কারণে আমাদেরকে এক কঠিন পরীক্ষার মধ্যে ফেলে দেয়া হয়েছে, আমরা যেন দেখতে পাচ্ছি মানুষের সামনে হেলাল ইবনে উমাইয়ার সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে এবং তাকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে। তখন হেলাল বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ, আল্লাহর কসম, অবশ্যই আমি আশা করছি আল্লাহ রব্বুল আলামীন আমার জন্যে এই কঠিন শাস্তি থেকে রেহাই পাওয়ার কোনো পথ বের করে দেবেন। হেলাল আরো বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ, যে বিষয়টা নিয়ে আমি আপনার দরবারে হাযির হয়েছি, আমি দেখতে পাচ্ছি তা আপনার কাছে কতো কঠিন লাগছে, আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন, আমি অবশ্যই সত্যবাদী। রেওয়ায়াতকারী বলছেন, আল্লাহর কসম, রসূল (স.) তাকে চাবুক মারার হুকুম দিতে যাচ্ছিলেন– এমন সময় আল্লাহ তায়ালা রসূল (স.)-এর কাছে ওহী পাঠালেন। আর যখনই তাঁর কাছে ওহী নাযিল হতো তখন সবাই দেখতে

---

(৬) এ হচ্ছেন সেই হেলাল বিন উমাইয়া যিনি ছিলেন তাবুক যুদ্ধে যাওয়া থেকে পিছিয়ে থাকা তিন ব্যক্তির অন্যতম।

পেতো তাঁর চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেছে (অর্থাৎ, ওহী নাযিল শেষ না হওয়া পর্যন্ত সবাই চুপ হয়ে যেতেন এবং তাঁর সাথে আর কেউ কথা বলতেন না।' অতপর নাযিল হলো,

'আর যারা তাদের স্ত্রীদেরকে দোষারোপ করে, কিন্তু ....'

৬নং আয়াতটির শেষ পর্যন্ত দেখুন তারপর রসূল (স.)-এর চেহারা থেকে কষ্টের চিহ্ন দূরীভূত হলো এবং তিনি বলে উঠলেন, ওহে হেলাল সুসংবাদ নাও, আল্লাহ তায়ালা তোমার পেরেশানী দূর করেছেন এবং তোমার জন্যে একটি পথ খুলে দিয়েছেন...... অতপর হেলাল (রা.)ও বললেন, আমার পাক পরওয়াদেগারের কাছ থেকে সর্বান্তকরণে এই আশাটাই আমি করছিলাম। তারপর রসূল (স.) বললেন, 'মহিলাটাকে ডেকে পাঠাও।' অতপর তাকে খবর দিলে সে আসলো। রসূল (স.) উপরোক্ত আয়াতটি তাদের উভয়ের সামনে পড়ে শোনালেন, তাদেরকে উপদেশ দিলেন এবং জানালেন যে দুনিয়ার আযাবের তুলনায় আখেরাতের আযাব অনেক বেশী কঠিন। এরপর হেলাল বললেন 'ইয়া রসূলাল্লাহ, আমি তার সম্পর্কে যা বলেছি সত্যই বলেছি। তখন মহিলাটি বললো, সে মিথ্যা বলেছে। অতপর রসূলুল্লাহ (স.) বললেন তাদের মধ্যে পরস্পর লা'নত পাঠানোর ব্যবস্থা করো .... এ সময়ে হেলালকে বলা হলো, সাক্ষ্য দাও। তখন তিনি চারবার সাক্ষ্য দিয়ে বললেন যে, তিনি সত্যবাদী। তারপর পঞ্চম বারে বলার সময় তাঁকে বলা হলো, ওহে হেলাল, আল্লাহকে ভয় করো, অবশ্যই আখেরাতের আযাবের তুলনায় দুনিয়ার শাস্তি তুচ্ছ, আর বর্তমানের এ বিষয়টি তোমার জন্যে নিশ্চিত আযাব ডেকে আনবে। তখন তিনি বললেন, আল্লাহর কসম, আল্লাহ তায়ালা কিছুতেই ওর জন্যে আমাকে আযাব দেবেন না, যেমন তিনি আমাকে চাবুক খাওয়া থেকে বাঁচিয়েছেন, তেমনি তিনি আমাকে আখেরাতের আযাব থেকেও বাঁচাবেন। এরপর তৃতীয়বার কসম খেয়ে বললেন, যদি তিনি মিথ্যা কথা বলে থাকেন তাহলে তাঁর ওর যেন লা'নত বর্ষিত হয়।........

এরপর মহিলাটিকেও অনুরূপভাবে বলা হলো, আল্লাহকে অবশ্যই হাযির নাযির জেনে তাঁর নাম নিয়ে চারবার সাক্ষ্য দিয়ে বলো যে সে অবশ্যই মিথ্যাবাদী, পঞ্চমবার সে সাক্ষ্য দিতে উদ্যত হলে তাকে বলা হলো, 'ভয় করো? আল্লাহ তায়ালা দুনিয়ার শাস্তির তুলনায় আখেরাতের আযাব অনেক কঠিন, আর বর্তমান মোকাদ্দামাটা তোমাকে আখেরাতের আযাবের ভাগী বানাচ্ছে। সে থমকে গিয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলো এবং স্বীকার করার কথা চিন্তা করলো, তারপর বলে উঠলো, আল্লাহর কসম, আমার জাতিকে আমি অপদস্থ করবো না। অতপর পঞ্চম বারের মতো সাক্ষ্য দিতে গিয়ে বললো, আল্লাহর গযব পড়ুক তার (নিজের) ওপর যদি সে ব্যক্তি (তার স্বামী) সত্যবাদী হয়ে থাকে। তখন রসূলুল্লাহ (স.) দু'জনকে আলাদা করে দিলেন এবং ফয়সালা করে দেয়া হলো, বাচ্চা হলে তাকে বাপের নামে ডাকা হবে না এবং বাচ্চাকে দোষও দেয়া হবে না। যে দোষারোপ করবে তার ওপর হদ (শাস্তির বিধান) জারি করা হবে। আরো ফয়সালা করে দেয়া হলো উক্ত ব্যক্তি (স্বামী)র সে মহিলার ভরন পোষণ ও ঘরে রাখার দায়িত্ব আর রইলো না। এটাও বলে দেয়া হলো যে তালাক ছাড়াই দু'জন পৃথক থাকবে এবং মহিলাটির মৃত্যুর পর তার ওয়ারিস কেউ হবে না। আরো বললেন, যদি তার বাচ্চার চুল লাল হয়, বাচ্চা হালকা পাছাওয়ালা হয় এবং শুকনা ঠ্যাং হয় তাহলে সে বাচ্চা হবে হেলালের। আর যদি বাচ্চার গায়ের রং হয় বাদামী, চুল হয় কোঁকড়ানো, মোটা মোটা ঠ্যাং আর মোটা পাছা হয় তাহলে বাচ্চাটি হবে তার– যার ব্যাপারে দোষারোপ করা হয়েছে। ....এরপর সময় কেটে গেলো বাচ্চা নিয়ে যখন মহিলাটি হাযির হলো দেখা গেলো বাচ্চাটির চুল কোঁকড়ানো, মোটা ঠ্যাং ও ভারী পাছা। তখন রসূল (স.) বললেন, যদি চুক্তি না থাকতো তাহলে আমার ও মহিলার মধ্যে একটা বোঝাপড়া হয়ে যেতো।

এভাবে বাস্তব অপরাধ মোকাবেলায় শরীয়াতের সুনির্দিষ্ট বিধান এসেছে এবং কোনো ব্যক্তির সংগী বা মুসলমানদের সমস্যার সমাধান দেয়া হয়েছে। এসব সমস্যার সমাধান দিতে যে সব কড়া পদক্ষেপ নিতে হয়েছে তাতে রসূল (স.)-এর কষ্ট হলেও কোনো উপায় ছিলো না। আল্লাহর বান্দা ও রসূল হিসাবে তাঁর বিধানকে বাস্তবায়িত করতে তিনি বাধ্য ছিলেন। আইন যেহেতু স্বয়ং বিশ্বের মালিকের– এজন্যে তাতে তাঁর বা অন্য কারো হস্তক্ষেপ করার বা রেয়ায়েত করার কোনো ক্ষমতা ছিলো না। এরপর দেখা হলে তিনি হেলাল ইবনে উমাইয়াকে বলেছেন। বোখারীর বর্ণনায় পাওয়া যায়, 'প্রমাণ সন্দেহাতীতভাবে সামনে আছে আর হেলাল বলতেন, ইয়া রসূলাল্লাহ তাহলে আমাদের মধ্যে কারো স্ত্রীর ওপর যদি কোনো লোক হামলা করে, তাহলে কি সাক্ষী খুঁজে বেড়াবে?'

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা! এ হাদীস দ্বারা কি একথা প্রমাণ হয় না যে, আল্লাহর আইনে নিষ্ঠুরভাবে কঠিন শাস্তি দেয়াটাই মুখ্য ব্যাপার ছিলো না? সমাজ ও সভ্যতাকে রক্ষা করার জন্যে অপারেশন এর মতো যথাসম্ভব কম অস্ত্র প্রয়োগ করা সম্ভব তাই করা হয়েছে এবং কঠিন শাস্তি থেকে বাঁচার মতো অনেক পথই খোলা রাখা হয়েছে।

এখন কেউ প্রশ্ন করতে পারে, আল্লাহ তায়ালা কি জানেন না যে এ আয়াতটি দোষারোপ করার শাস্তি স্বরূপ অবতীর্ণ সাধারণ আইনের পরিপন্থী হবে? তাহলে তিনি এই আইনের ফাঁক দিয়ে বেঁচে যাওয়ার ঘটনা ঘটার পরে কেন উক্ত ব্যতিক্রমী আয়াতটি নাযিল করলেন না?

এর জওয়াব হচ্ছে, অবশ্যই আল্লাহ রব্বুল আলামীন সব কিছু জানেন, তবু তাঁর হেকমত ও মহাবিবেচনার দাবী হচ্ছে যে, যখন মানুষের প্রয়োজন হবে তখনই তাকে আইন দিতে হবে। তা না হলে মানুষের জীবনে নেমে আসবে নানা প্রকার দুঃখ সংকট। আল্লাহ তায়ালা মানুষকে তাঁর আইনের যৌক্তিকতা ও তাঁর রহমতের চেতনা দান করতে চান। এজন্যেই তিনি নাযিল করেছেন,

'যদি তাঁর মেহেরবানী ও রহমত না থাকতো .... আল্লাহ তাওবা কবুলকারী প্রজ্ঞাময়।'

কোরআনের বিস্ময়কর প্রশিক্ষণ পদ্ধতি

আসুন, আমরা এঘটনাটি সামনে নিয়ে একটু চিন্তা করি, দেখি কেমন করে ইসলাম মানুষের জীবন সমস্যার সমাধান দিয়েছে, তাদের জীবনকে সুন্দর ও শান্তিপূর্ণ বানানোর উপযোগী আইন বানিয়েছে এবং তার ফলে কেমন সুখী সমৃদ্ধিশালী ও সৌহার্দপূর্ণ সমাজ গড়ে উঠেছে। এর জন্যে আল কোরআনের আলোকে রসূল (স.)-এর প্রশিক্ষণ পদ্ধতি কী ছিলো ....আর কিভাবেই বা সেই সব দুর্ধর্ষ আরব বেদুইনদেরকে ইসলাম বশীভূত করেছে, যারা ভীষণ উত্তেজনার বশে আগ-পিছ না ভেবেই চলতো ও পরিণামের কোনো পরওয়াই করতো না। দেখুন, এখানে দোষারোপের শাস্তি কী হবে সে বিষয়ে ফায়সালা নাযিল হচ্ছে– এ আইনটি তাদের কাছে এতোই কঠিন মনে হচ্ছে যে সা'দ এবনে ওবাদা জিজ্ঞাসা করে বসেছেন, এভাবেই কি নাযিল হয়েছে ইয়া রসূলাল্লাহ? তিনি নিশ্চিত জানেন যে এভাবেই আয়াতটি নাযিল হয়েছে, তাও মনের মধ্যে জেগে ওঠা প্রচন্ড বিস্ময়কে চেপে রাখতে না পেরে খোলাখুলিভাবে জিজ্ঞাসা করে বসেছেন। তার কাছে এটা অত্যন্ত কঠিন মনে হয়েছে যে তার জীবন সাথীর সাথে কাউকে এক বিশেষ অবস্থায় দেখার পর মানুষের 'হুশ কি করে ঠিক থাকতে পারে এবং কেমন করে মাথা ঠিক রেখে সে নিয়মতান্ত্রিক পদক্ষেপ নিতে পারে, কেমন করে দিকবিদিক জ্ঞানহারা হয়ে সে আরো বড় অপরাধ করা থেকে বিরত থাকতে পারে! এজন্যে তিনি তার এই বিদঘুটে প্রশ্নের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে নিজেই বলছেন, ইয়া রসালুল্লাহ, আমি জানি যে অবশ্য অবশ্যই এ আয়াত সত্য এবং এ আয়াত আল্লাহর কাছ

থেকেই এসেছে, কিন্তু বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে আমি এই কথাটাই ভেবেছি যে যদি আমার কোনো বদমায়েশ স্ত্রীকে কারো বাহু বন্ধনেও অংগাংগিভাবে একত্রিত দেখতে পাই, তাহলে সে ব্যক্তিকে আমি বিরক্ত করবো না, তাকে সরাবোও না? তখন কি (আমি নিজে দোষারোপের শাস্তি থেকে বাঁচার জন্যে) চাক্ষুষ সাক্ষী যোগাড়ের জন্যে ছুটোছুটি করতে থাকবো? আর যখন তাদেরকে নিয়ে আমি হাযির হবো তখন তো সে ব্যক্তি কাজ সেরে উঠে পড়বে। (সে অবস্থায় তারা চাক্ষুষ সাক্ষী কি করে হবে?)

ইবনে ওবাদার চিন্তায় একথাটা যখন আসল তখন কিছুতেই মন থেকে একথাটা তিনি মুছে ফেলতে পারছিলেন না ....তিনি ভাবছিলেন, তার চোখে দেখা ঘটনাটা তো তিনি কিছুতেই প্রমাণ করতে পারবেন না, মাঝখান থেকে, এটা প্রকাশ করার সাথে সাথে তিনি চাবুক খেয়ে মরবেন ....এখন এই যে ব্যক্তিটি নিজের চোখে দেখলো, নিজের কানে শুনলো, কিন্তু আল কোরআনে মানা থাকায় সে বলতেও পারবে না, এটা কিভাবে আল্লাহ তায়ালা চাইতে পারেন! এমতাবস্থায়, তার চেতনা উদ্দীপিত হলো, তার আরবীয় রক্ত গরম হয়ে উঠলো, মাংস পেশীগুলো উত্তেজনায় ফুলে উঠলো, তাই একটু বেসামাল হয়ে বেদুইনদের মতো গভীর উত্তেজনার সাথে এবং অত্যন্ত উলংগ ভাষায় কথাটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেলো। কিন্তু এতদসত্তেও মনকে বেঁধে রেখে আল্লাহ রসূলের ফয়সালার অপেক্ষা করতে লাগলেন। তিনি ছিলেন, বলিষ্ঠ, শক্তিশালী ও উৎসাহী মানুষ, কিন্তু ইসলামের সম্মোহনী প্রশিক্ষণ তাদেরকে এই নিশ্চিত বুঝ দিয়েছিলো যে তারা গভীরভাবে অনুভব করতেন যে, মানুষের নিজেদের জীবনে এবং জীবনের সকল ব্যাপারে আল্লাহর ফয়সালা ছাড়া কিছুই হয় না।

সা'দ এর মনে একথাটা কিছুতেই বুঝে আসছিলো না যে, চোখে দেখবো, কানে শুনবো কিন্তু বলতে পারবো না, বললে সাক্ষীর অভাবে দন্ড নিতে হবে, কি করে আল্লাহ তায়ালা একথাটা বললেন? আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই তাদের সাথে আছেন এবং তারা তো আল্লাহর সাহায্যের ছায়াতলেই রয়েছেন, তিনিই তাদের পরিচালনা করেছেন, অবশ্যই তাদেরকে তিনি পেরেশানীতে ফেলবেন না এবং তাদের ওপর কোনো যুলুম করবে না, তাদের শক্তির বাইরেও তাদেরকে তিনি কাজের হুকুম দেবেন না, রহমান রহীম পরওয়ারদেগারে হাকীম কিছুতেই তাদের ওপর সাধ্যাতীত কষ্ট দেবেন না- যেহেতু সদা সর্বদা তাদের জীবন আল্লাহর রহমতের ছায়ায় রয়েছে, আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত ক্ষমতা ও সজীবতায় তারা প্রতি মুহূর্তে নিশ্বাস নিচ্ছে; তারা তো আল্লাহর স্নেহের পরশ পাওয়ার জন্যে তেমনি উন্মুখ হয়ে থাকে ..... এখন কী হবে হেলাল ইবনে উমাইয়ার? সে তো নিজ চোখে সে ঘটনা দেখেছে ও নিজ কানে শুনেছে, কিন্তু সে যে একা, তাকে সমর্থন করার মতো কোনো সাক্ষী তো নেই, এজন্যে বুকভরা আশা নিয়ে নালিশ দিতে এসেছে আল্লাহর রসূল (স.)-এর দরবারে, কিন্তু রসূল (স.) নিজেও তো সাক্ষীর কমতির কারণে এক ব্যক্তির একথাকে 'দোষারোপ' বলে অভিহিত করছেন এবং আশি চাবুকের শাস্তি দিতে উদ্যত হচ্ছেন, তিনি বলছেন, 'হয় সাক্ষী নয় তো তোমার পিঠে চাবুকের কষাঘাত', কিন্তু তবু তবু হেলাল ইবনে উমাইয়ার ধারণায় কিছুতেই একথা আসছে না যে আল্লাহ তায়ালা তাকে এই শাস্তির মধ্যে অসহায় অবস্থায় ছেড়ে দেবেন। তিনি তার দাবীতে তো অবশ্যই সত্যবাদী, অতপর এমনই এক কঠিন ও নাযুক অবস্থা পরওয়ারদেগারে আলম রহমানুর রহীম আল্লাহ তায়ালা ব্যতিক্রমী আয়াত নাযিল করছেন। স্বামী-স্ত্রীদের জন্যে এ আয়াত স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিচ্ছে যে, অভিযোগকারীর সমর্থনে চারজন বিশ্বস্ত সাক্ষ্য দানকারী নিজেদের চোখে বাস্তব ঘটনা দেখেছে বলে সাক্ষ্য দেবে- একথা সর্বত্র সত্য হলেও স্বামী স্ত্রীর ব্যাপারে আলাদা। স্বামী বা স্ত্রীর একার চারবার (আল্লাহর নামে শপথ করে)

বলায় চারজন সাক্ষীর সাক্ষ্য হিসাবে কবুল করা হবে। ব্যস, এ আয়াত নাযিল হওয়ার সাথে সাথে মহব্বতের নবী, রহমাতুললিল আলামীন (স.) সহাস্য বদনে হেলালকে তাঁর শাস্তি মুক্তির সুসংবাদ দিচ্ছেন। এ মহাসংবাদ শুনে আল্লাহর আশাবাদী নেক বান্দা পরিপূর্ণ নিশ্চিন্ত ও পরিতৃপ্ত মানুষের মতই বলে উঠলেন, আমার পাক পরওয়ারদেগারের কাছ থেকে অবশ্যই আমি এমনটিই আশা করছিলাম, এই হচ্ছে আল্লাহ জাল্লা শানুহুর সেসব প্রশান্ত পরিতৃপ্ত ও নিশ্চিন্ত বান্দা যারা সদা সর্বদা আল্লাহর রহমতের প্রত্যাশী, তাঁর পরিচালনায়ই সদা সর্বদা তাদের জীবন চলছে বলে তারা বিশ্বাসী, তাঁর সুবিচারের ওপর সন্দেহাতীতভাবে আস্থাশীল। আর সর্বোপরি তাদের বুক এই বিশ্বাসে ভরপুর যে, আল্লাহ তায়ালা অনুক্ষণ তাদের সাথে রয়েছেন, কাজেই তাদের ইচ্ছামতো চলার জন্যে বা অন্য কারো মর্জির ওপর থাকার জন্যে অবশ্যই তিনি তাদেরকে ছেড়ে দেবেন না। সত্যিকারে নিরপরাধ থাকা সত্তেও তারা বে-কায়দায় পড়ুক, তিনি তা দেখবেন না এবং তার জন্যে কোনো ব্যবস্থা করবেন না– এটা কখনোই হতে পারে না। এইটিই হচ্ছে সত্যিকারে ঈমান, যা তাদেরকে পরিপূর্ণ আনুগত্য করতে এবং রাযি-খুশীর সাথে তাঁর যাবতীয় হুকুম পালন করতে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করবে।

ইতিহাসের জঘন্যতম একটি অপবাদ

কাউকে অপবাদ দেয়ার শাস্তির বর্ণনা শেষে এখন অপবাদের একটি উদাহরণ পেশ করা হচ্ছে, যার দ্বারা এ কদর্য কাজের ক্ষতি কতো বেশী তা স্পষ্ট হয়ে উঠবে, আর এ ঘটনাটি ঘটেছিলো খোদ রসূল (স.)-এর বাড়ীতেই এবং এর দ্বারা তাঁর মান সম্ভ্রমের ওপর প্রচন্ড আঘাত হানা হয়েছিলো, অথচ আল্লাহর নযরে তিনি হচ্ছেন সকল মানুষের সেরা মানুষ, বিশ্ব মানবতার শ্রেষ্ঠ আদর্শ। আল্লাহর রসূল (স.)-এর কাছে সব থেকে প্রিয় মানুষ সিদ্দীকে আকবার হযরত আবু বকর (রা.)-এর সম্মানের ওপর আঘাত হানা হয়েছিলো, আঘাত হানা হয়েছিলো এমন একজন সাহাবীর ওপর যার সম্পর্কে আল্লাহর রসূল (স.) নিজে সার্টিফিকেট দিচ্ছেন যে তাঁর সম্পর্কে ভাল ছাড়া মন্দ কিছু তিনি জানেন না এবং এক সময়ে পুরো একমাস ধরে রসূল (স.)-এর স্থলাভিষিক্ত করে মদীনার শাসনকর্তা হিসাবে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিলো। ......

দেখুন মানুষ কতোদূর নিষ্ঠুর হতে পারে এবং হিংসার বশবর্তী হয়ে কতো কঠিন কাজ করতে পারে। আরবের মধ্যে আগত মানবকুল শিরোমনি, শ্রেষ্ঠ নবী ও দয়ামায়ার প্রতিমূর্তি প্রাণপ্রিয় মোহাম্মদ (স.)-এর পরিবারের ওপর নিছক কল্পনার ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে যে কলংক লেপন করা হয়েছিলো তার বিষাক্ত ছোবলের বেদনা তৎকালীন গোটা মুসলিম সমাজকে জর্জরিত করেছিলো। এই কঠিন ঘটনাকে পূর্ণ দীর্ঘ একটি অধ্যায়ব্যাপী আল্লাহ রব্বুল আলামীন নিজেই বিবৃত করেছেন,

'যারা অপবাদ-এর ঘটনাটা তৈরী করে আনলো তারা তো ছিলো তোমাদের মধ্য থেকে ছোট্ট একটি দল .... ওরা যা কিছু বলছে তার থেকে খুব নিষ্ঠাবান মোমেন ব্যক্তিরা পবিত্র ও দায়িত্ব মুক্ত। (আয়াত ১১-২৬)

এ আয়াতসমূহে যে ঘটনাটার বিবরণ এসেছে তা হচ্ছে মিথ্যা এক রটনা। এ ঘটনা মানবেতিহাসের সব থেকে পবিত্র কিছু মানুষের জীবনকে কষ্টের মধ্যে ফেলে দিয়েছিলো, তাদের জীবনকে অসহনীয় বেদনায় ভরে দিয়েছিলো তাদের অন্তরগুলো অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করে উঠেছিলো, গোটা মুসলিম উম্মতকে তারা এমন এক অব্যক্ত কষ্টের মধ্যে ফেলে দিয়েছিলো যার নযির সুদীর্ঘ ইতিহাসের পাতায় আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না, ব্যথায় দরদের নবী আল্লাহর

প্রিয়তম হাবীবকে জর্জরিত করেছিলো, তাঁর পরম প্রিয় পত্মী মোমেন মাতা বিবি আয়শা (রা.)-এর হৃদয়কে ভেংগে চুরমার করে দিয়েছিলো, সিদ্দীকে আকবার ও তার মমতাময়ী পত্নীর অন্তরকে পেরেশান করে দিয়েছিলো, সরল সহজ নিরপরাধ ও রসূল (স.)-এর পরম আস্থাভাজন মোয়াত্তাল এবনে সাফওয়ান এর সম্ভ্রম ও ব্যক্তিত্বকে লজ্জা শরমে ও মর্মবেদনায় ধূলায় মিশিয়ে দিয়েছিলো, তার সম্পর্কে দুর্নাম ছড়িয়ে মানুষের মনে তার সম্পর্কে সন্দেহ সংশয় সৃষ্টি করা হয়েছে, আর মাসাধিককাল ধরে অনিশ্চয়তার কঠিন দুশ্চিন্তার মধ্যে রাখা হয়েছে, তার জীবনকে অসহ্য যন্ত্রণায় ভরে দেয়া হয়েছে।

সুতরাং আসুন, নিদারুণ সে ব্যথা-বেদনার করুণ কাহিনী মা আয়শার নিজের যবানীতেই আমরা শুনি, যা ওপরের আয়াতগুলোতে বিবৃত ঘটনাকে আমাদের সামনে একটি জীবন্ত ছবি ভাসিয়ে তুলবে, যুহরী, ওরওয়া এবং আরো অনেকে হযরত আয়শা (রা.) থেকে ঘটনাটি নিম্নরূপে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলছেন,

'রসূল (স.) যখনই কোনো সফরের এরাদা করতেন যে কোনো একজন স্ত্রীকে সাথে নিতেন, আর এজন্যে তাদের মধ্যে কখন কাকে নেবেন তা লটারী দ্বারা নির্ধারণ করে নিতেন, যার নাম লটারিতে উঠতো তাকেই সাথে নিতেন। পঞ্চম হিজরীতে অনুষ্ঠিত গাযওয়ায়ে বনী মোসতালিকের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার সময়ে লটারীতে আমার নাম উঠলো। অতপর, তাঁর সাথে আমি রওয়ানা হই, এ সময়ে হেজাব বা পর্দার আয়াত নাযিল হয়ে গিয়েছিলো। আর আমাকে উঁটের পিঠে রক্ষিত হাওদাজে তুলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিলো। এ হাওদাজে আমি নিজেই ওঠা-নামা করতাম। এভাবেই আমরা এগিয়ে গেলাম। অবশেষে রসূল (স.)ও যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে মদীনার পথে আমাদেরকে নিয়ে রওয়ানা হলেন। পথে এক জায়গায় কাফেলা যাত্রাবিরতি করলো, আমরা তখন মদীনার কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিলাম। এমন সময় রাত্রিতে কাফেলাকে রওয়ানা হওয়ার ঘোষণা শোনানো হলো। যখন এ ঘোষণা দেয়া হচ্ছিলো তখন আমি একটু প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বাইরে গিয়েছিলাম। কাজ সেরে আসার সময় বুকে হাত দিয়ে দেখলাম আমার হারটি নেই। বুঝলাম আমার নখে লেগে হারটি ছিঁড়ে পড়ে গেছে। ফিরে গেলাম হারটি খুঁজতে, খুঁজতে খুঁজতে বেশ কিছু সময় দেরী হয়ে গেলো। ইতিমধ্যে কাফেলার রওয়ানা হওয়ার সময় হয়ে গেছে ও যারা আমার হাওদাটি উঁটের পিঠে উঠানো নামানোর দায়িত্বে ছিলো, তারা হাওদাটির পর্দা পড়ে থাকার কারণে, হাওদাটি উঁটের পিঠে তুলে বেঁধে দিলো কিন্তু আমি ভেতরে নেই এটা টেরও পেলো না। এ সময়ে আমার বয়সও খুবই কম ছিলো (বছর চৌদ্দ হবে), শারীরিক দিক দিয়ে আমি খুব ক্ষীণ স্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলাম, কারণ আমরা কোনোরকমে এক-মুষ্টি খেয়ে উঠে যেতাম। এজন্যে তারা মনে করেছিলো আমি ভেতরেই আছি।

এভাবে তারা উঁটটিকে কাফেলার সাথে চালিয়ে দিলো। আমি হারটি খুঁজে পেয়ে ফিরে এসে দেখি, সবাই বেশ অগ্রসর হয়ে গেছে। কেউ নেই, সবাই চলে গেছে। এজন্যে যেখানে ছিলাম, সেখানেই বসে পড়লাম, আর আমি ভাবলাম, কিছু দূরে গিয়ে অবশ্যই তারা আমার অনুপস্থিতি টের পেয়ে আমার খোঁজে ফিরে আসবে। আমি বসে থাকতে থাকতে প্রবল ঘুম পেলো,

কাজেই আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। এসময় সাফওয়ান ইবনে মোয়াত্তাল, যাকে পেছনে রেখে যাওয়া কোনো জিনিস কুড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে নিযুক্ত করে রাখা হয়েছিলো·সেই ব্যক্তি সেই স্থানে এসে হাযির যেখানে আমি ছিলাম। সে দূর থেকে এক ব্যক্তিকে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখে আমার কাছে এলো এবং আমাকে দেখে চিনে ফেললো, আর সে ব্যক্তি আমাকে হেজাবের আয়াত নাযিল

হওয়ার পূর্বে দেখেছে, সে বুঝে গেলো কিছু একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে এজন্যে বলে উঠলো, 'ইন্না লিল্লাহে ওয়া-ইন্না ইলায়হি রাজেউন' এ আওয়ায শুনে আমি জেগে উঠলাম এবং চাদর দিয়ে আমার চেহারা ঢেকে ফেললাম। আল্লাহর কসম, সে আমার সাথে একটি কথাও বললো না এবং আমি তার বিপদকালীন দোয়া ইন্না লিল্লাহে .... রাজেউন পড়া ছাড়া আর কোনো আওয়াযই শুনিনি।

সে ব্যক্তি একটু চিন্তা করে তার বাহন উঁটনীটাকে বসতে বললো। উঁটনী তার সামনের দুই পা বাড়িয়ে বসে পড়লো, তারপর আমি তার ওপর সওয়ার হলাম। তখন সে এই বাহনটিকে এগিয়ে নিয়ে চললো। অবশেষে আমাদের বাহিনীর কাছে আমরা পৌঁছে গেলাম, যেখানে তারা পেছনে কিছু রয়ে গেলো কিনা খোঁজ করার জন্যে কিছুক্ষণের জন্যে যাত্রা বিরতি করেছিলো। রেওয়ায়াতকারী বলেন, আয়শা (রা.) বলেন, এ সময় আমার মান-সম্মান ধ্বংস করতে গিয়ে মূলত ধ্বংস হলো সেই ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ যার কিংবা যাদের এই ধ্বংস হওয়া পাওনা হয়ে গিয়েছিলো। এসময়ে এ গুনাহের কাজে এসব থেকে বড় অংশ নিয়েছিলো যে ব্যক্তি সে ছিলো আবদুল্লাহ ইবনে উবাই (মোনাফেক-সর্দার)। তারপর আমরা মদীনায় পৌঁছুলাম, এরপর আমি পুরো মাস খানেক ধরে অসুস্থ ছিলাম। এ সময়ের মধ্যে এ রটনা সম্পর্কিত ব্যক্তিদের সম্পর্কে মানুষ অনেক কিছু বলাবলি করেছে। কিন্তু আমি এর কিছুই জানতে পারিনি। তবে আমার অসুস্থাবস্থায় একটি জিনিস আমার মনে খটকা জাগাতো, তা হচ্ছে অন্য সময় অসুস্থ হলে রসূল (স.) যে হৃদয়াবেগ নিয়ে আমার কাছে আসতেন, বসতেন এবং দরদের সাথে আমার খোঁজ খবর নিতেন, এ সময়ে কিন্তু আমি সেই মমতাপূর্ণ ব্যবহারটা দেখছিলাম না। তিনি অবশ্য আসতেন, সালাম করতেন এবং শুধু জিজ্ঞাসা করতেন, কেমন আছো? ব্যস, এরপর চলে যেতেন। এই আচরণটাই তাঁর সম্পর্কে আমার মনে কিছু সংশয় সৃষ্টি করেছিলো, কিন্তু সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত আমি আসল ব্যাপারটার কিছুই বুঝতে পারিনি। এরপর এক রাত্রিতে আমি এবং মেসতাহের মা প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারার জন্যে জংগলের দিকে যাচ্ছিলাম, সেখানেই আমরা রাত্রিতে গিয়ে প্রয়োজন সারতাম– এ ঘটনা হচ্ছে সে সময়ের কথা যখন নিয়মিত কোনো শৌচাগার (টয়লেট) তৈরী হয়ে পারেনি, আর এজন্যে আমরা রাত ছাড়া বেরুতাম না। এক রাত থেকে আর এক রাত পর্যন্ত আমাদের ধৈর্য ধরে থাকতে হতো। আমরা পূর্বের আরবদের মতোই এভাবে মল ত্যাগ করতে অভ্যস্থ ছিলাম।

অতপর আমি এবং উম্মে মেসতাহ এগিয়ে যাচ্ছিলাম, এ মহিলাটি মা ও বাবা উভয়ের দিক দিয়ে মোত্তালেব বংশের মেয়ে, এজন্যে তার ছেলেও মোত্তালেব বংশীয়। আমরা প্রয়োজন সেরে ফিরে আসছিলাম, এমন সময় উম্মে মেসতাহ তার চাদরের আঁচলে বেধে পড়ে গেলো, আর অমনি বিরক্ত হয়ে সে বলে উঠলো, 'তায়েসা মেসতাহ (মরুক মেসতাহ)! একথা শুনে আমি বললাম, ছি: তুমি বড়ই নিকৃষ্ট কথা বললে উম্মে মেসতাহ, তুমি গালি দিলে এমন এক ব্যক্তিকে যে বদর যুদ্ধে যোগ দিয়েছে! তখন সে বললো, রাখো তার কথা, হায়, তুমি শোননি সে কী কথা বলেছে? জিজ্ঞাসা করলাম, কী বলেছে সে? তখন সে রটনার ঘটনাটি সবিস্তারে বললো।

এর ফলে আমার পূর্বের অসুস্থতার সাথে আমার অসুখ আরো বেড়ে গেলো। তারপর আমি বাড়ীতে ঢুকতেই রসূল (স.) ঘরে ঢুকলেন এবং বললেন, কেমন আছো? তখন আমি শুধু বললাম, আমাকে বাপের বাড়ী যাওয়ার অনুমতি দিন। সেখানে গিয়ে তাদের সামনেই ব্যাপারটা সম্পর্কে আমি নিশ্চিত হতে চাচ্ছিলাম। তখন তিনি আমাকে অনুমতি দিলেন এবং তারপর আমি বাপ-মার কাছে চলে এলাম। অতপর মাকে বললাম, মা, লোকেরা এসব কী বলাবলি করছে? তিনি বললেন,

তোর ওপর এই রটনার ব্যাপারটা আমাকে, আমার মান সম্ভ্রম শেষ করে দিয়েছে; এটাই দুনিয়ার রীতি; যখনই কোনো মেয়ে সৌভাগ্যবতী হয়ে যায়, স্বামী সোহাগিনী হয়, স্বামীও তাকে ভালোবাসেন, উপরন্তু যদি কয়েকজন সতীন থাকে, তাহলে তখনই তার বিরুদ্ধে হিংসুটে কিছু লোক এই ধরনের মিথ্যা রটনা করে তার মান-সম্ভ্রম নষ্ট করার অপপ্রয়াস চালায়, সতীনরাও এতে কিছু সুযোগ নেয়ার চেষ্টা করে।

এসব শুনে আমি বললাম, সোবহানাল্লাহ, আর এই নিয়ে লোকেরাও এমনভাবে বলাবলি করতে পারছে? রেওয়ায়াতকারী বলছেন, তিনি বললেন, অতপর, সারারাত ধরে আমি কাঁদলাম, সকাল হয়ে গেলো, এক মুহূর্তের জন্যেও আমার চোখের পানি থামেনি এবং সারা রাতের মধ্যে একটিবারের জন্যেও আমার চোখের পাতা বন্ধ হয়নি, তারপর ক্রন্দনরত অবস্থাতেই সকাল করেছি। এরপর (জানলাম) রসূল (স.) আলী ইবনে আবু তালেব এবং ওসামা ইবনে যায়েদ রাদিয়াল্লাহ আনহুমাকে ডাকলেন, এ সময়ের মধ্যে, অর্থাৎ এই যে রটনার কল্পিত কাহিনী যে সময়টাতে মুখে মুখে চালাচালি হচ্ছিলো এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে ওহী আসাও বন্ধ ছিলো। তাই, সে দু'জনের সাথে রসূল (স.) পৃথক পৃথকভাবে তাঁর পরিবার সম্পর্কে পরামর্শ করলেন। রেওয়ায়াতকারীরা বলছেন, আয়শা (রা.) বললেন, রসূল (স.) ওসামাকে তাঁর স্ত্রীর সতীত্ব ও রটনাকারীদের প্রতি তাঁর মমত্ববোধের প্রতি ইংগিতও করলেন। তখন ওসামা (রা.) পরামর্শ দান করতে গিয়ে বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ, এরা তো আপনার পরিবার, আল্লাহর কসম, আমরা ভালো ছাড়া মন্দ কিছু (এদের সম্পর্কে) জানিনা (অনুমানও করি না)। আর আলী ইবনে আবী তালেব এর কাছে পরামর্শ চাইলে সে বললো, 'ইয়া রসূলাল্লাহ, আল্লাহ তায়ালা আপনাকে সংকটের মধ্যে না রাখুন (অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা আপনাকে মানসিক ও যন্ত্রণা থেকে রেহাই দিন) তিনি ছাড়া আরো অনেকেই আছেন (এই একজনের বিষয় নিয়ে আপনি এতো বেশী মন খারাপ করবেন না। সে কাজের মেয়েটা রয়েছে, তাকে জিজ্ঞাসা করুন না, সে আপনাকে কিছু জানাতে পারবে। যাই হোক, রসূল (স.) বরীরা(৭) (কজের মেয়ে) কে ডাকলেন, বললেন,

'বারীরা, ওর (আয়শার) মধ্যে তুমি কি এমন কিছু দেখেছো যাতে তোমার মনে তার চরিত্র সম্পর্কে কোনো সন্দেহ জাগতে পারে? সে বললো, জ্বি না, যিনি আপনাকে সত্যের নবী বানিয়ে পাঠিয়েছেন, সেই মহান আল্লাহর কসম, আমি যেটুকু দেখেছি তাতে মাত্র এতোটুকু ব্যাপারে তাকে দোষ দিতে পারি অল্প বয়েসী মেয়ে তো (তার বয়স বড়জোর হয়তো এই বছর পনের হবে) কখনো কখনো আটা মাখতে মাখতে ঘুমিয়ে পড়ে, আর ছাগল এসে তা খেয়ে যায়, আয়শা (রা.) বলছেন, এরপর রসূল মুসলমানদের খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিছু বলার জন্যে সন্ধার পূর্বে মসজিদের মেম্বারের ওপর উঠলেন এবং চাইলেন যে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই-এর কাজের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে কেউ কিছু বলুক। তিনি এবারে সুস্পষ্টভাবে বললেন, কে আছে সে ব্যক্তির পক্ষে কথা বলার যে আমার পরিবার সম্পর্কে মিথ্যা রটনা করে আমাকে কষ্ট দিয়েছে? শোনো তোমরা, আমি আল্লাহর কসম খেয়ে বলছি, আমার পরিবার সম্পর্কে আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই, তার সম্পর্কে আমি ভাল ছাড়া আর কিছুই জানি না, আর ওরা এমন এক ব্যক্তির কথা বলাবলি করেছে, এ পর্যন্ত তার বিরুদ্ধে ভাল ছাড়া মন্দ বলার মতো আমি কিছু পাইনি, সে আমার সাথে ছাড়া আমার পরিবারের মধ্যে কখনো প্রবেশ করেনি। বর্ণনাকারীর মতে আয়শা (রা.) বলেন, এসময়ে সা'দ ইবনে মোয়ায

---

(৭) রেওয়ায়াতকারী হয়ত আন্দাযে বরীরার নাম বলেছেন, কারণ ইবনে কাইয়েম বিশ্বস্ত সূত্রের বরাত দিয়ে উল্লেখ করেছেন যে, বরীরা এর অনেক আগেই দাসত্ব থেকে মুক্তি লাভ করেছিলেন।

(রা.) উঠে দাঁড়ালেন(৮) এবং বললেন, আল্লাহর কসম, আমি তার পক্ষ থেকে কথা বলছি, যদি সে আওস গোত্রের লোক হয় তাহলে তার গর্দান মেরে দেবো, আর যদি সে লোক আমাদের ভাই খাযরাজ গোত্রের মধ্য থেকে হয়, তাহলে তার ব্যাপারে আমি আপনার হুকুম পালন করবো। তখন, খাযরাজ গোত্রের নেতা সা'দ এবনে ওবাদাহ উঠে বললেন, (এ ব্যক্তি মানুষ হিসাবে ভালো মানুষই ছিলেন কিন্তু তাঁকে বংশীয় মর্যাদাবোধ পেয়ে বসলো) তিনি সা'দ ইবনে মোয়াযকে বললেন, 'আল্লাহর স্থায়িত্বের কসম, তুমি মিথ্যা বলেছো, না কিছুতেই তুমি তাকে হত্যা করবে না, আর তুমি পারবেও না তাকে হত্যা করতে। তখন সা'দ ইবনে মোয়াযের চাচাত ভাই উসায়েদ এবনে হুযায়ের (রা.) ওঠে দাঁড়িয়ে সা'দ এবনে ওবাদাকে বললেন, চিরন্তন ও মহান আল্লাহর কসম, অবশ্যই আমরা তাকে কতল করবো। তুমি মোনাফেক, মোনাফেকের পক্ষে ওকালতি করছো। তখন আওস ও খাযরাযের বেওকুফ লোকেরা গরম হয়ে উঠলো এবং তারা পরস্পরে লড়াই করতে উদ্যত হয়ে গেলো, অথচ রসূল (স.) তখনও মেম্বারের ওপর বসে। তিনি বরাবর তাদেরকে থামানোর চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন, অবশেষে তারা চুপ করলো এবং রসূল (স.) মেম্বর থেকে নেমে পড়লেন।

সেদিন সারাটা দিন ধরে আমি কাঁদলাম, এক মুহূর্তের জন্যেও আমার অশ্রু থামেনি আর সারা রাত ধরে আমি চোখে একটুও ঘুমের সুরমা লাগাইনি। এর পরের রাত্রিতেও আমি ক্রন্দনরত অবস্থায় বিনিদ্র রজনী যাপন করলাম। তারপর সকালে আমার আব্বা আম্মা আমার কাছে এলেন। এসময়ে পুরো দুটো রাত ও এক দিন আমার কাঁদতে কাঁদতে কেটে গেছে, এমনকি আমার মনে হচ্ছিলো আমার কলিজা ফেটে যাবে। আব্বা আম্মা আমার কাছে বসে আর আমি কেঁদে চলেছি, এমন সময় আনসারদের মধ্য থেকে এক মহিলা ভেতরে আসার অনুমতি চাইছিলো, তাকে অনুমতি দেয়া হলো, সে ঢুকেই আমার সাথে বসে কাঁদতে শুরু করলো। আমাদের এই কান্নাকাটি চলছিলো, এমন সময় আমাদের কাছে রসূল (স.) এসে হাযির। তিনি বসলেন অথচ যখন থেকে এসব কথা বলাবলি শুরু হয়েছিলো তখন থেকে একটি দিনের সামান্য কিছু সময়ের জন্যেও তিনি আমার কাছে বসেননি, আর পুরো একটি মাস কেটে গেছে, এর মধ্যে আমার সম্পর্কে কোনো ওহীও আসেনি। তিনি বসে কালেমায়ে শাহাদাত পড়লেন, তারপর বললেন, 'শোনো, তোমার সম্পর্কে আমার কাছে এই কথা পৌঁছেছে, তুমি নির্দোষ থাকলে অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তোমাকে দোষমুক্ত করবেন, আর যদি তুমি কোনো দোষে জড়িত হয়ে থাকো তাহলে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও এবং তাঁর কাছে তাওবা করো, শোনো, বান্দা দোষ করে যখন দোষ স্বীকার করে এবং তাওবা করে তখন আল্লাহ তায়ালা তার তাওবা কবুল করেন।

রসূল (স.) যখন তাঁর কথা শেষ করলেন তখনও আমার অশ্রু ঝরছিলো, অবশেষে অশ্রু শেষ হয়ে গেলো চোখে এক ফোটা অশ্রুও আর রইলো না, তখন আমি আমার আব্বাকে বললাম। আব্বা রসূল (স.) যা বললেন, আপনিই আমার পক্ষ থেকে তার জওয়াব দিন। তিনি বললেন, 'আল্লাহর কসম, রসূল (স.)-কে আমি যে কী বলবো আমি তো তা জানিনা। তখন আমি মাকে

---

(৮) এখানেও কিছু অস্পষ্টতা রয়ে গেছে, ইবনে ইসহাক এর একটি রেওয়ায়েতে জানা যায়, যার কথা এখানে বলা হয়েছে তিনি সা'দ বিন মোয়ায নন, এ ঘটনার অনেক আগেই গাযওয়ায়ে বনী কুরায়যার সময়েই তাঁর ইন্তেকাল হয়েছিলো। ভুলক্রমে তার কথা এখানে বলা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে যে ব্যক্তির উল্লেখ এখানে এসেছে, তিনি ছিলেন উসায়েদ ইবনে হুযায়ের (ইবনে কাইয়েমও এভাবে বলেছেন) ইবনে হাযম এ ঘটনার যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতে সা'দ ইবনে মোয়ায এর উল্লেখ নেই।

বললাম, আম্মা রসূল (স.) যা বললেন আমার পক্ষ থেকে আপনি তার জওয়াব দিন না। তিনিও বললেন, আল্লাহর কসম, আমি জানিনা রসূল (স.)-কে আমি কী বলবো। বর্ণনাকারী বলছেন, আয়শা (রা.) বললেন, 'আমি অত্যন্ত কম বয়সী একটি মেয়ে, কোরআন থেকেও আমি বেশী কিছু পড়িনি। তখন আরো আমি বললাম, আল্লাহর কসম আমি জানি, মানুষ যা বলাবলি করেছে তা আপনারা শুনেছেন, কথাগুলো আপনাদের মনেও দাগ কেটেছে এবং আপনারা বিশ্বাসও করেছেন। এখন আমি যদি আপনাদেরকে বলি আমি দোষমুক্ত আপনারা তা বিশ্বাস করবেন না, আর যদি আমি আপনাদের কাছে কোনো অপরাধ স্বীকার করি, অথচ আল্লাহ তায়ালা জানেন আমি তার থেকে মুক্ত, তাহলে সেটাও আপনারা বিশ্বাস করবেন না। সুতরাং, আল্লাহর কসম, আমার ও আপনাদের জন্যে এ ছাড়া আর কোনো উদাহরণ পাই না, যা ইউসুফ (আ.)-এর বাপ বলেছিলেন, একবার সে ঘটনাটা স্মরণ করুন, তিনি বলেছিলেন,

'সুতরাং (আমি) সুন্দরভাবে সবর করছি, আর যা কিছু তোমরা বলছো, সে বিষয়ে আল্লাহ তায়ালাই আমার একমাত্র সাহয্যকারী।'

এর পর আমি ঘুরে বসলাম ও বিছানার ওপর শুয়ে পড়লাম। আল্লাহর কসম, এসময়ে আমি জানি যে আমি নিরপরাধ, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা আমার দোষমুক্তির কথা ঘোষণা করবেন। কিন্তু আমি আল্লাহর কসম ভাবতেও পারিনি যে তিনি আমার সম্পর্কে আল কোরআনের আয়াত নাযিল করবেন, আর মানুষ তা পড়তে থাকবে। আমি তো আমার মনের মধ্যে, নিজেকে এতো ছোটো মনে করতাম যে আমার সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা কথা বলবেন, আর তা পঠিত হবে– এটা কিছুতেই হতে পারে না, বরং আমি আশা করছিলাম যে রসূল (স.) ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখবেন যার দ্বারা আল্লাহ তায়ালা আমার দোষ মুক্তির ঘোষণা দেবেন। কিন্তু, কী আশ্চর্য, আল্লাহর কসম, সে বৈঠক শেষ হতে পারেনি, বাড়ীর কেউ বেরিয়েও যেতে পারেনি। এরই মধ্যে আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবী (স.)-এর কাছে (আয়াত) নাযিল করলেন।

অতপর দেখা গেলো তাঁর পবিত্র মুখমন্ডল হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে গেছে, দেখা যাচ্ছে খুশীতে তাঁর দাঁতের ফাঁকগুলো পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে, এসময় প্রথম যে কথাটা তিনি বললেন, তা ছিলো আমার প্রতি, তিনি আমাকে বললেন, ওহে আয়শা, আল্লাহর প্রশংসা করো তাঁর শোকর আদায় করো তিনি তোমাকে দোষ মুক্ত করেছেন, তিনি তোমার দোষ মুক্তির ঘোষণা দিয়েছেন।' তখন আমার মা আমাকে বললেন, ওঠো, রসূল (স.)-এর কাছে যাও। তখন আমি বললাম, 'আল্লাহর কসম, আমি তার কাছে যাবো না এবং আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কারো শোকর আদায় করবো, না যেহেতু একমাত্র তিনিই আমার দোষ মুক্তির কথা ঘোষণা করে আয়াত নাযিল করেছেন। অতপর, দেখুন আল্লাহ তায়ালা নাযিল করেছেন,

'নিশ্চয়ই যারা অপবাদ রটনা করেছে, তারা তোমাদের মধ্য থেকে অসদুদ্দেশ্যে গঠিত একটি দল মাত্র ......

এভাবে পুরো দশটি আয়াত নাযিল হলো মোমেন কুলের মা আয়শা (রা.) সম্পর্কে, তারপর আল্লাহ তায়ালা আমার দোষ মুক্তির কথা যখন নাযিল করলেন তখন আবু বকর সিদ্দীক (রা.) (যিনি মেসতাহের দৈন্য-দশা ও আত্মীয়তার কারণে তাকে নানাভাবে সাহায্য করতেন) বললেন, মেসতাহ আয়শা সম্পর্কে যা বলেছে, আল্লাহর কসম তাকে আর কোনো দিন আমি কিছু মাত্র সাহায্য করবো না। একথার পর আল্লাহ তায়ালা নাযিল করলেন,

'না, তোমাদের মধ্যে সম্মানী ও সচ্ছল লোক যারা আছে, তারা আর সাহায্য করবে না বলে যেন কসম না খায় .... আর আল্লাহ তায়ালা মাফ করনেওয়ালা মেহেরবান' পর্যন্ত নাযিল হলো। তখন আবু বকর (রা.) বললেন, আল্লাহর কসম, অবশ্যই আমি পছন্দ করি যে আল্লাহ তায়ালা আমাকে মাফ করে দিন। এরপর তিনি মেসতাহকে আগে যেভাবে খরচ পত্র দিতেন তা দেয়া আবার চালু করলেন এবং বললেন, না-না, আমি তাকে সাহায্য দেয়া আর কখনো বন্ধ করবো না। আয়শা (রা.) বলেন, রসূল (স.) যায়নাব বিনতে জাহসের কাছে আমার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলেন, বললেন, 'হে যয়নাব, তুমি কী জেনেছো, আর তুমি কী দেখেছো?' তখন সে বললো, 'ইয়া রসূলাল্লাহ, আমি আমার কান ও চোখকে সর্বদা বাঁচিয়ে চলি, আল্লাহর কসম, আমি তার সম্পর্কে ভালো ছাড়া মন্দ কিছুই জানি না (অথচ একমাত্র সে-ই রূপ সৌন্দর্যে, নবী (স.)-এর সকল স্ত্রীদের মধ্যেও আমার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলো)। অতপর আল্লাহভীতি ও পরহেযগারীর কারণে আল্লাহ তায়ালা তাকে বাঁচালেন। রেওয়ায়াতকারী বলছেন, অতপর আয়শা (রা.) বললেন, এরপর এ ব্যাপার নিয়ে যায়নাবের বোন তার সাথে ঝগড়া শুরু করে দিল, 'হতভাগা, আয়শার ওপরে ওঠার একটা মোক্ষম সুযোগ পেয়েছিলি, তুই এ সুযোগটা হেলায় হারালি।' যাই হোক মিথ্যা অপবাদ রটনাকারীদের মধ্যে যার ভাগ্য খারাপ ছিলো, সেই ক্ষতিগ্রস্ত হলো।(৯)

অপবাদের ঘটনাটির পর্যালোচনা

এভাবেই শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থায় দীর্ঘ একটি মাস ধরে রসূল (স.) ও তাঁর বাড়ীর লোকেরা জীবন যাপন করেছেন, জীবন যাপন করেছেন আবু বকর (রা.) এবং তাঁর গৃহবাসীরা, এই কঠিন অবস্থায় জীবন কাটিয়েছেন সাফাওয়ান এবনে মোয়াত্তাল ও তৎকালীন সকল মুসলমানেরা। সে মিথ্যা বানোয়াট ও সম্পূর্ণ কাল্পনিক এক ঘটনাকে কেন্দ্র করে তাদের জীবনে কী নিদারুণ ও দুঃসহ জ্বালা টেনে আনা হয়েছিলো আর মাসাধিককাল ধরে মা আয়শার বেদনা-বিধুর চেহারা যখন কেউ কল্পনা নেত্রে দেখতে থাকে তখন যে কোনো পাষাণ হৃদয়ও বিগলিত হয়ে হাহাকার করে ওঠে; প্রশ্ন জাগে কেন এমন হলো, কেন আল্লাহ সোবহানাহু তায়ালা তাঁর রসূলকে নিয়ে এমন করুণ নাটকের অবতারণা করলেন যে, তাঁর পনের ষোল বছর বয়সের এই প্রিয় স্ত্রীর কপালে এমন কলংক কালিমা অংকিত হলো! কেন এই ক্ষীণদেহী, আবেগময়ী, লাজুক অল্প বয়সী মেয়েটির ওপর এতো হৃদয়হীনভাবে, এমন কদর্য কাদা ছোড়া হলো কি বীভৎস আনন্দে মেতে উঠলো মোনাফেক নরপশুর দল যে নিছক মিথ্যা কল্পনার ওপর ভর করে তারা ফুলের মতো নির্মল কোমল শতদলের ওপর এমন নিষ্ঠুর কষাঘাত হানলো!

কে এই নমনীয় কমনীয়, নিষ্পাপ-নিরপরাধ নাযুক রমনী, যার ওপর এমন কঠিন অশনিপাত হলো? হাঁ, তিনি সেই মহীয়সী-পবিত্র পরিচ্ছন্ন নারী যার পবিত্রতা ঘোষণায় আল কোরআনের আয়াত নাযিল হয়েছে। যার দোষ মুক্তির কথা বলতে গিয়ে এবং নিষ্কলুষ অন্তরের কথা জানাতে গিয়ে এবং তার চিন্তাধারার পরিচ্ছন্নতার সাক্ষ্য দিতে আল্লাহ তায়ালা নিজেই তাঁর কালাম নাযিল করেছেন। এহেন সম্ভ্রমশীল মানুষের ইযযতের ওপর ইচ্ছাকৃতভাবে হামলা করা হয়েছিলো, তার সম্ভ্রমের ওপর কটাক্ষপাত করা হয়েছিলো, অথচ মোনাফেক দল চিন্তা করেনি যে, তিনি কার মেয়ে, কার স্ত্রী এবং কার আমানত। হতভাগারা একটুও হিসাব করলো না যে তিনি সিদ্দীকে

(৯) ইবনে শেহাব বলেন, সে রচনাকারী দলের খবর এতোটুকু পর্যন্ত আমাদের কাছে পৌছেছে, এ হাদীসটি যুহরীর উদ্ধৃতিসহ বোখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে। ইবনে এসহাকও যুহরী থেকে সামান্য শব্দের হেরফের সহ এভাবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন

আকবার তনয়া লালিত পালিত এমন এক পবিত্র পরিচ্ছন্ন মর্যাদাবান পরিবারের মেয়ে যার তুলনা বিরল। তিনি নবী (স.)-এর ঘরের বাতি হিসাবে যে আমানত রক্ষা করার দায়িত্ব পেয়েছিলেন তার ওপর হামলা করা হল। তিনি বনী হাশেম কুল শিরমনি মোহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ, শেষ নবী ও রসূল (স.)-এর স্ত্রী। তার গৌরব ও আত্মমর্যাদাবোধ কতো অধিক ছিলো তা দুনিয়ার সাধারণ কীটরা কি করে বুঝবে! তাঁর বিশ্বস্ততার ওপর এ হৃদয়হীন হামলা যারা করলো, তারা কি একটু হিসাব করলো না যে বিশ্বের সেরা মানুষ, সর্বাধিক গুণান্বিত মানুষ সব থেকে সুন্দর ও পবিত্র মানুষের হৃদয়ের রাণী, সরাসরি আল্লাহর ইশারায় যার বিয়ে হয়েছিলো– তার ওপর হামলা করা হয়েছে.........এরপর হামলা করা হয়েছে তার ঈমানের ওপর, তিনি পরিপূর্ণ এক মুসলমান পুরোপরিভাবে আল্লাহর আত্মসমর্পণকারিনী, যার লালন পালন হয়েছিলো ইসলামের সূতিকাগৃহে সেখানেই তার জীবনের প্রথম চোখ খোলে, আর সর্বোপরি তিনি রসূল (স.)-এর জীবন সংগিনী।

হাঁ, এই মহীয়সী মহিলার ওপর দুর্নামের তীক্ষ্ম তীর নিক্ষেপ করা হলো। তিনি পবিত্রতার তিলোত্তমা, তিনি সরলা বালিকা, কোনো ঝঞ্ঝাট ঝামেলা তাকে কখনো জড়াতে পারেনি, তার কোনো উচ্চাশাও ছিলো না, সুতরাং আল্লাহর কাছে চাওয়া পাওয়া ছাড়া তার জীবনের আর কোনো স্বপ্নই ছিলো না, আর এতদসত্ত্বেও অন্য কোনো বড় আশা না করে তিনি শুধু অপেক্ষায় ছিলেন যে অবশ্যই স্বপ্নের মধ্যে রসূল (স.) তার পবিত্রতা সম্পর্কে এমন কিছু দেখবেন, যার দ্বারা তার প্রতি যেসব কথা নিক্ষেপ করা হয়েছে তার থেকে তিনি মুক্তি পাবেন, কিন্তু এ সময়ে দীর্ঘ এক মাসব্যাপী ওহী আসা বন্ধ থাকা অবশ্যই ছিলো আল্লাহরই এক বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ পরিকল্পনা, যা তাঁর নিজেরই ইচ্ছায় তৈরী হয়েছিলো, অর্থাৎ আল্লাহর নিজস্ব অভিপ্রায়েই মাসাধিককাল পর্যন্ত ওহী পাঠানো হয়নি। আসলে এটাও ছিলো আর এক প্রকার কঠিন অবস্থা, যা সে বদনাম করার শাস্তি থেকে কোনো অংশে কম নয়।

কিন্তু হায় আল্লাহ তায়ালা, তিনি একি শুনলেন উম্মে মেসতাহের কাছে! এ যে এক বজ্রাঘাত সম বিঁধল তার বুকে। একে তো মাসাধিকাল ধরে অসুস্থ থাকায় দেহ মন তার অবসন্ন, জ্বরের উত্তাপে শরীর পুড়ে যাচ্ছে, মাথার যন্ত্রণায় তিনি অস্থিরভাবে কাতরাচ্ছেন তারপর এ দুঃসংবাদ এসে শেলের মতো বিঁধল তার কুসুম কোমল হৃদয়ে রোগক্লিষ্ট দেহে, ব্যথা জর্জরিত হৃদয়ে এবং অবর্ণনীয় কাতর কণ্ঠে চরম বিস্ময়ভরে তিনি মাকে বলছেন, সোবহানাল্লাহ! মানুষ সত্যই কি এসব কথা বলাবলি করছে? (আশ্চর্য হবার নয়? এরা তো সেই মানুষ যারা রসূল (স.)-এর জন্যে জীবন দিতে প্রস্তুত!) অপর এক বর্ণনায় বলা হয়েছে তিনি বলে উঠলেন, আমার আব্বা কি একথা জানতে পেরেছেন? (আহা, আমার আব্বা নিজেকে কতো বড় ভাগ্যবান ভাবেন, আল্লাহর রসূল (স.)-কে জামাই বানাতে পেরে, নিজের কলিজার টুকরা, আদরের দুলালী এই কচি মেয়েটাকে তাঁর হাতে তুলে দিতে পেরে কতো গৌরবান্বিত তিনি। তিনি কিভাবে সহ্য করবেন এ দুঃসহ জ্বালা তখন তার মা উত্তর দিচ্ছেন, হাঁ, মা। তারপর আবার মা আয়শা জিজ্ঞাসা করছেন, আর রসূল (স.)ও? (আল্লাহর রসূল, তিনি তো শুধু স্বামী নন; তিনি দুনিয়া জাহানের মালিক আল্লাহর পরম প্রিয় রসূল, সারা জাহানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মানুষ– কতো গভীরভাবে তিনি তাকে ভালোবাসেন! হায়, তিনি জেনে থাকলে তাঁর হৃদয়ে কী প্রতিক্রিয়া হয়েছে!) একথার জবাবেও অসহায়ভাবে মা বললেন, হাঁ হায় আল্লাহ! কি দুঃখ নেমে এলো তার ভাগ্যে, কি দুঃখ যাতনা নেমে এলো আল্লাহর রসূলের জীবনে!

এদিকে নবিজীর কথাটাই ভাবুন, তিনি তো সেই নবী, সেই মহা মানব, যাঁকে তিনি নবী বলে জেনেছেন, মেনেছেন, যার হাতে তার জান-মন-প্রাণ সবই অম্লান বদনে সঁপে দিয়েছেন, তিনি

তাকে সম্বোধন করছেন, ব্যথাহত হৃদয়ে ও ভাংগা গলায় তিনি তাকে বলছেন, 'তাহলে এখন শোনো, আমার কানে এই কথা পৌছেছে, এখন তুমি যদি নির্দোষ থেকে থাকো, শীঘ্রই আল্লাহ তায়ালা তোমার দোষ মুক্তির খবর জানাবেন, আর (মানবী তুমি, শয়তানের ষড়যন্ত্রে যদি কোনো দুর্ঘটনা ঘটে থাকে) যদি কোনো অপরাধে জড়িত হয়ে থাকো, ক্ষমা চাও মহান আল্লাহর দরবারে এবং তাঁর কাছেই তাওবা করো, যখন মানুষ দোষ ত্রুটি করে তা স্বীকার করে এবং আল্লাহ রব্বুল আলামীন-এর কাছে তাওবা করে (অনুতপ্ত হৃদয়ে তাঁর কাছেই ফিরে যায় এবং আর এ ধরনের অপরাধ করবে না বলে সর্বান্তকরণে ওয়াদা করে) তিনি অবশ্যই সে তাওবা কবুল করেন।' এতদশ্রবণে আয়শা সিদ্দীকা (রা.) বুঝলেন তিনি (নবী স.) ও এসব খবরে কিছু সন্দিহান হয়েছেন, (আল্লাহ তায়ালা তাঁকে, নবী বানানোর সাথে সাথে মানুষও তো বানিয়েছেন, সুতরাং এতোসব গুজবে তাঁর মনে কিছু সন্দেহ জাগাটা মোটেও অস্বাভাবিক কিছু নয়)। তার পবিত্র থাকার ব্যাপারে (এই মুহূর্তে) তিনি পুরোপুরি নিশ্চিন্ত নন, এবং তার ওপর অপবাদের জন্যে তিনি সে সংশ্লিষ্ট লোকদের জন্যে কোনো শাস্তিও ঘোষণা করেননি। তাঁর রবও এই রটনা চলাকালীন দীর্ঘ এতোটা সময়ের মধ্যে বা পরে তাঁকে কিছু জানালেন না, আর তিনি (রসূল স.) ও তার দোষ মুক্তির কথা খুলে বলেননি, অথচ আয়শা নিজে তো তার নিরপরাধ হওয়ার ব্যাপারে সম্যক অবগত, কিন্তু এটা প্রমাণ করার কোনো ক্ষমতাই তাঁর নেই, এজন্যে তিনি অপবাদের বোঝা ঘাড়ে হা হুতাশ করে সকাল সন্ধা কাটাচ্ছেন এবং হায়, সে মহান হৃদয়বান ব্যক্তি, যিনি তাকে কতো ভালোবাসেন, তাঁর কাছেও আজ এক অপবাদগ্রস্ত মানুষ বলে তিনি বিবেচিত! হায়, এমনই এক কঠিন মুহূর্তে দুঃখের সাগরে ভাসতে থাকাটাই তার জন্যে বরাদ্দ হয়ে গেছে।

এরপর, দেখুন কি অবস্থা সে মহান ব্যক্তি আবু বকর সিদ্দীকের তার ব্যক্তিত্ব, তার সামাজিক মর্যাদা, তার ব্যক্তিগত দৃষ্টান্তমূলক পরহেযগারী এসব সহ দুঃসহ ব্যথার দংশনে তিনি জর্জরিত, তার মান-সম্ভ্রমের ওপর এ যে এক প্রচন্ড আঘাত, মোহাম্মদ (স.)-এর স্ত্রী- তার কন্যার ওপর এই রটনা, জামাই, তিনি কি শুধু জামাই? তিনি তার পরম প্রিয় বন্ধু, যিনি তাকে কতো ভালোবাসেন, তিনিও হৃদয় মন দিয়ে সে মহামানবকে ভালবাসেন, এ পবিত্র ভালবাসার ওপর একি অশনিপাত! তিনি তো শুধু পরম প্রিয় বন্ধুই নন, তিনি যে আল্লাহর সেই মহান নবী, যাকে তিনি সর্বান্তকরণে বিশ্বাস করেছেন, যাকে তার হৃদয়ের সকল আবেগ দিয়ে সত্য বলে জেনেছেন, যার জন্যে তিনি বাইরের কোনো প্রমাণের অপেক্ষা করেননি....... হায়, তাঁর কথাতেও তাঁর মর্মব্যথা কী নিদারুণভাবে পরিস্ফুট এই প্রচন্ড ব্যথার দুঃসহ জ্বালায় কত ধৈর্যশীল তিনি কত কঠিনভাবে তিনি আত্ম সমালোচনায় ব্রতী। এমনই মানসিক পেরেশানীর মধ্যে তিনি স্বগতোক্তি করছেন, বলছেন, হায় আল্লাহর কসম জাহেলিয়াতের আমলেও তো কেউ এমন বদনাম দিতে পারেনি। আজ ইসলাম গ্রহণ করার পর নিছক কল্পনা করে আমার পরিবারের ওপর এমন দুর্ণাম রটানো হলো? এতো এমন এক কথা যা অনবরত যেন মাথার ওপর আঘাতের ওপর আঘাত হেনে চলেছে, এমনই এক কঠিন সময় তাঁর কলিজার টুকরা অসুস্থ রুগ্ন মেয়েটি, মর্মজ্বালায় দিবানিশি যার ঘুম হারাম হয়ে গেছে সে তাকে নবী (স.)-এর কথার উত্তর দিতে বলছে। কী বলবেন তিনি, হৃদয় তার শুকিয়ে গেছে, ভাষা তার গতিপথ হারিয়ে ফেলেছে, বুদ্ধি তার কাজ করছে না, ডুকরে কেঁদে উঠে তিনি শ্রান্তক্লান্তভাবে বারবার বলছেন, আল্লাহর কসম, আমি জানি না, রসূল (স.) কে আমি কী বলবো!

এরপর দেখুন সিদ্দীকে আকবারের স্ত্রী উম্মে রুমানের অবস্থা। তিনি এই দুঃখজর্জরিত অসুস্থ কন্যার সামনে সব কিছু ব্যাপারেই অত্যন্ত দৃঢ়তা দেখাচ্ছিলেন সত্য, কিন্তু যখন তার মনে হচ্ছিলো,

মেয়েটা যেভাবে অনবরত রাত দিন কেঁদে চলেছে তাতে যে কোনো সময় সে হার্ট ফেল করবে বা তার কলিজা ফেটে যাবে এমনই এক নাযুক মুহূর্তে তাকে তিনি বলছেন, 'মা- আমার ওপর একটু দয়া করো, ব্যাপারটাকে এভাবে সহজ করে দেখো, 'আল্লাহর কসম, পৃথিবীর এমন দৃষ্টান্ত বহু আছে, যখনই কোনো নারী তার স্বামীর কাছে বিশেষভাবে আদর মহব্বত পেয়েছে এবং তোমার মতো এমন সৌভাগ্যবতী হয়েছে, উপরন্তু যদি তার কয়েকজন সতীন থেকেছে, সে অবস্থায় তাদের পক্ষে সহ্য করা মুশকিল হয়ে গেছে, তারা অবশ্যই কিছু বাড়াবাড়ি করে বসেছে। কিন্তু এ দৃঢ়তা এবং এ ধৈর্য্য তিনি সেই মুহূর্তে আর ধরে রাখতে পারলেন না যখন আয়শা (রা.) বললেন, মা রসূল (স.)-এর কথার জওয়াব দিন না! তখন তিনি কাতর কণ্ঠে বললেন সেই একই কথা যা যা তার স্বামী একটু আগে বলেছিলেন, আল্লাহর কসম, আমি বুঝতে পারছি না, কি বলবো আমি রসূল (স.) কে কী বলবো।

অপরদিকে, আর এক ব্যক্তি, সাফওয়ান ইবনে মোয়াত্তাল– হায়, তাকে দোষ দেয়া হয়েছে তাঁর নবীর স্ত্রীরূপ আমানতের খেয়ানত করার, ইসলাম গ্রহণ করার পর, রব্বুল আলামীনের কাছে নিজেকে যখন পরিপূর্ণভাবে সোপর্দ করে দিয়েছেন, তারপর তাকে অপবাদ দেয়া হচ্ছে, তাঁর আমনতদারীর ওপর আঘাত হানা হচ্ছে, তার মর্যাদা, তার আভিজাত্য বোধ এবং যে সব মহৎ গুণের কারণে একজন সাহাবাকে সম্মানিত করা হয় সেসব কিছুর ওপর চরমভাবে আঘাত হানা হচ্ছে, অথচ এসব কিছুর উর্ধে ছিলো তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, তাকে জড়িয়ে এই মারাত্মক যে অপবাদ রটানো হয়েছিলো সে কথা হঠাৎ করে তিনি জানতে পারলেন, অথচ এমনই আল্লাহভীরু নির্মল চরিত্রের অধিকারী তিনি ছিলেন যে তার কল্পনাতেও এমন মারাত্মক কথা কখনো স্থান পায়নি (আচ্ছা, আমরা একটু চিন্তা করে দেখি, ওপরে যে পরিস্থিতিতে তিনি তার উঁটটি বসিয়ে আয়শা (রা.)-কে তার ওপরে বসালেন এবং নিজে রশি ধরে এগিয়ে গিয়ে মূল কাফেলার সাথে মিলিত হলেন, সে অবস্থায় তিনি এর বাইরে আর কী করতে পারতেন? তাছাড়া যে ইসলামী দলটা আল্লাহভীতির ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিলো, আল্লাহর ভয়ে নিয়ন্ত্রিত হতো যাদের গোটা জীবন, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যে যারা জীবন উৎসর্গ করার ভুরী ভুরী দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, যারা নবী (স.)-এর নিরাপত্তার জন্যে নিজেদের বুককে ঢাল বানিয়ে দিয়েছেন সেই মহা পুণ্যবান মানুষদের সম্পর্কে এমন জঘন্য চিন্তা করতে পারে একমাত্র তারা যাদের অন্তর চরমভাবে ব্যাধিগ্রস্ত। এ অপবাদের কথা কানে আসার সাথে সাথে তার (সাফওয়ানের) মুখ দিয়ে উচ্চারিত হলো, সোবহানাল্লাহ! 'কোনো মেয়ের রানের কাপড় আমি কোনোদিন সরাইনি।' এসময় যখন তিনি জানতে পারলেন যে তার সম্পর্কে হাসসান ইবনে সাবেত এই অপবাদ ছড়িয়েছে, তখন তিনি নিজেকে আর নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারছিলেন না এবং তরবারি দ্বারা তার গর্দান উড়িয়ে দেয়ার জন্যে এগিয়ে গিয়েছিলেন, এমন সময়, তার মনে পড়লো, একজন মুসলমানকে তরবারি দিয়ে আঘাত করা নিষিদ্ধ, এ চিন্তা তাকে থামিয়ে দিলো বটে, কিন্তু অপবাদের বেদনা তিনি সহ্য করতে পারছিলেন না, তার ধৈর্যের বাধ ভেংগে যাচ্ছিলো।

তারপর দেখুন আল্লাহর রসূল (স.)-এর দিকে। তিনি আল্লাহর রসূল, তিনি বনু হাশেম গোত্রের শিরমনি, আল আমীন, মক্কা মদীনার নয়নমনি, বিশ্বের সেরা মানুষ, মানব কুলের গৌরব, মানুষের ব্যথায় সদা উদ্বেলিত যার কুসুম কোমল হৃদয়, অবহেলিত, নিপীড়িত, দুঃখ-জর্জরিত মানবতার সমস্যা সমাধানে ও দুঃখ দুর্দশা দূরীকরণে এবং শত্রুতাকে বন্ধুতে রূপান্তরিত করার মানসে যিনি নিজ রূপ যৌবনের চাহিদা ভুলে গিয়ে অসম সকল বিবাহ বন্ধনে রাজি হয়েছেন, তাঁর ঘরেই প্রবেশ করলো এই নিষ্ঠুর অপবাদের দুঃখজনক তুফান! নবী হলেও তিনি তো মানুষ, মানুষের অনুভূতি ও দুঃখ বেদনা দিয়েই তো মানুষের মাঝে তাঁকে পাঠানো হয়েছে এবং এভাবে

মানুষের দরদ ব্যথা বুঝার ক্ষমতা তাঁকে দেয়া হয়েছে, কাজেই ওসামার কথাতেই সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে তাঁর কঠিন মানসিক পেরেশানী এবং ঘরের কাজের মেয়ের সাক্ষ্য দ্বারা আরো জোরালোভাবে বুঝা গেছে আল্লাহর পরম বন্ধুর উদ্বেগ উৎকণ্ঠা যা মসজিদে উপস্থিত গোটা মুসল্লিরা গভীরভাবে আঁচ করেছে, ফলে, যারা রসূল (স.)-এর অমর্যাদা করেছে, যারা তাঁর পরিবারের মর্যাদাবান সাহাবীদের অন্যতম যার চাল চলন সম্পর্কে কেউ কোনো দিন খারাপ কিছু দেখেনি ......তাদের গোত্রের লোকজন এবং তাদের আত্মীয় স্বজন তাদের জন্যে ওযরখাহী করেছে, রসূল (স.)-এর কাছে তাদের পক্ষে মাফ চেয়েছে এবং সে হতভাগাদের ভীষণভাবে নিন্দা করেছে, যার কিছু দৃশ্য ইতিমধ্যেই আমরা মসজিদে নববীতে এবং নবী (স.)-এর উপস্থিতিতে আওস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের রূখারুখির মধ্য দিয়ে দেখতে পেয়েছি। মুসলমানদের এই প্রধান মিলনকেন্দ্র সাহাবাদের সহযোগিতায় রসূল (স.)-এর নিজ হাতে তৈরী মসজিদে খুনোখুনী হয়ে যাওয়ার উপক্রম একথারই সাক্ষ্য বহন করে যে এ অপবাদ রটনার ব্যাপারটা গোটা মুসলিম সমাজকে কিভাবে ঝাঁকিয়ে তুলেছিলো, কতোবড় ফাটল ধরিয়েছিলো মুসলিম জামায়াতের নেতৃত্বের মধ্যে! বিশেষ করে জামায়াতের এই দ্বিধা-বিভক্তিই রসূল (স.)-এর হৃদয়কে বেশী বিদীর্ণ করেছিলো-আর সত্যর যে মহান বাতি প্রদীপ্ত হয়েছিলো মোমেনদের অন্তরসমূহের মধ্যে তার প্রভা যেন ম্লান হয়ে গেছে বলে মনে হচ্ছিল, মনে হচ্ছিলো সে সমুজ্জ্বল আলো মানুষকে আর পথ দেখাতে পারছে না। জলদিই এর অবসান হওয়া দরকার এ জটিল সমস্যার আশু সমাধান নিতান্ত প্রয়োজন। সুতরাং আর কালবিলম্ব না করে তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন আয়শার কাছে যেতে হবে এবং ছাফ ছাফ আলাপ-আলোচনা করে শীঘ্রই একটা সমাধানে পৌঁছুতে হবে (যারা আমরা এ অধ্যায়টি পড়ছি তারা অবশ্যই বুঝতে পারছি আল্লাহর রসূল (স.) যে সব প্রস্তাব করলেন তার মধ্যে ভাংগন-বিপর্যয়কে রোধ করার সকল মাল-মশলা ও প্রস্তুতি বর্তমান ছিলো, ভাংগন কোনো অবস্থাতেই নয়, যা শয়তানের প্রধান কাম্য।)

আল্লাহর রাজ্যে সকল সমস্যারই সংশোধনী আছে যদি তাতে ভুল স্বীকার, অনুতাপ ও সংশোধনী মনোবৃত্তি, থাকে হতাশার ইন্ধন না থাকে। দেখুন নবী করীম (স.) আবার ওই কথাটি সুস্পষ্ট করতে বুঝতে যাচ্ছেন যা মানুষ বলছে। আর তিনি তাঁর (আয়শার) কাছ থেকেই তৃপ্তিজনক কথা, চাইছেন যা তাঁর নিদারুণ দুঃখজ্বালা নিবারণ করতে পারে, মানষিক প্রশান্তি ফিরিয়ে আনতে পারে!

আর এমনই এক পর্যায়ে, যখন ব্যথা বেদনা, দুঃখ-জ্বালা, মানসিক যন্ত্রণা সকল ধরনের পেরেশানী চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গেলো এবং তাতে অত্যন্ত মর্মান্তিকভাবে জড়িত হয়ে পড়লো ব্যক্তি, পরিবার ও গোটা মুসলিম সমাজ তখনই আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাঁর নবীর ওপর মহব্বতের দৃষ্টি দান করলেন এবং সকল অস্পষ্টতার অবসান ঘটিয়ে তাঁর অমিয়বাণী নাযিল করলেন, দুঃখের ঘনঘটা দূরীভূত হলো আয়শা সিদ্দিকা তাহেরা (রা.)-এর পবিত্রতা ঘোষণা করে আল কোরআন নাযিল হলো, নবী (স.)-এর মহান পবিত্র মর্যাদা ঘোষিত হলো, সেসব মোনাফেকদের খোলস খুলে দেয়া হলো যারা অপবাদের এই নাটক রচনা করেছিলো এবং এই মহাসম্মানিত নবী (স.)-এর পক্ষে মুসলমানদের জন্যে সরল সুন্দর ও বলিষ্ঠভাবে মোকাবেলার পথ খুলে দেয়া হলো।

এই আয়াত যখন নাযিল হল তখন আয়শা (রা.) বলে উঠেছিলেন, 'আল্লাহর কসম, আমি তো তখনই জানতাম (যে যা-ই বলুক না কেন), আমি অবশ্যই দোষমুক্ত এবং আল্লাহ সোবহানাহু তায়ালা অবশ্যই আমার দোষমুক্তির ঘোষণা দেবেন, কিন্তু আল্লাহর কসম এটাও সত্য, আমি কস্মিনকালেও ধারণা করতে পারিনি যে, আল্লাহ তায়ালা আমার জন্যে ওহী নাযিল করবেন এবং

তা মানুষের মুখে মুখে পঠিত হতে থাকবে। আর আমি তো নিজেকে আমার কাছে এতোই তুচ্ছ মনে করি যে আমার যে, কল্পনাতেও আসে না যে আমার সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা কথা বলবেন এবং তা মানুষ পড়বে, বরং আমি এতোটুকু মাত্র আশা করছিলাম যে রসূলুল্লাহ ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখবেন যে, আমাকে দোষমুক্ত করা হচ্ছে।

কিন্তু ঘটনার অবতারণা যেভাবে হয়েছে, তাতে ঘটনাটা শুধু ব্যক্তি আয়শা (রা.)-কে নিয়েই সীমাবদ্ধ থাকেনি, ব্যাপারটা তো রসূলুল্লাহ (স.)-এর ব্যক্তিত্বকে জড়িয়ে মুসলিম দলের মধ্যে তাঁর কর্তব্য পালনের দায়িত্বকে চ্যালেঞ্জ করা নিয়ে সংঘটিত হয়েছে, বরং আরও এক ধাপ এগিয়ে বলা যায় যে আল্লাহর সাথে তাঁর যে সম্পর্ক বিদ্যমান সেটাকেও ধ্বংস করার হীন চক্রান্ত করা হয়েছে। আর আয়শা (রা.)-এর চরিত্রের ওপর কলংক লেপন দ্বারা একমাত্র তাঁকেই যে কলংকিত করা হয়েছে তা নয়, এ কলংক তো ছিলো নবী (স.)-এর আকীদার ওপর। আল্লাহ তায়ালা সব কিছুর মালিক এবং সকল ক্ষমতার অধিকারী একমাত্র তিনি এবং সকল কিছু তিনিই নিয়ন্ত্রণ করেন, তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে এবং তাঁর জ্ঞানের বাইরে বিশ্ব জাহানের কোথাও কিছু সংঘটিত হতে পারে না– এ আকীদা যে গ্রহণ করেছে সে প্রকাশ্য ও গোপনে জীবনের শুদ্ধি রক্ষা করে চলে, আল্লাহ তায়ালাই তাকে নিয়ন্ত্রণ করেন, তাঁর প্রতিনিধির জান মাল ও ইযযতের যামীন সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালা নিজেই। ইচ্ছা করলেও তাঁর পরিবারের কেউ ক্ষতি করতে পারে না– শয়তানের যাবতীয় ষড়যন্ত্র সেখানে ব্যর্থ হতে বাধ্য এই মৌলিক আকীদার ওপরও ছিলো এ প্রচন্ড আঘাত! এ জন্যেই অবশেষে আল্লাহ রব্বুল আলামীন আল কোরআন নাযিল করলেন যাতে বিস্তারিতভাবে সে বিষয়টি মানুষের কাছে জানাজানি হয়ে যায় এবং ভবিষ্যতের মানুষ যেন আল্লাহর শক্তি ক্ষমতার ওপর তৃপ্তি সহকারে আত্মসমপর্ণ করে শয়তানের ষড়যন্ত্র থেকে দূরে থাকতে পারে; ইসলাম বিরোধী আল্লাহবিরোধী ও রসূল বিরোধী যে কোনো তৎপরতা মোকাবেলা করতে পারে এবং আল্লাহর মহা বিস্ময়কর জ্ঞানের সুপ্রশস্ত দরজা খুলে যায়, যেখানে মানুষ বুঝতে পারে যে আল্লাহ তায়ালা ছাড়া কেউ কিছুই জানে না, কিছুই করতে পারে না, তাই এরশাদ হচ্ছে,

'নিশ্চয়ই যারা নিয়ে এলো এই অপবাদের ঘটনাটি, তারা তোমাদের মধ্য থেকে বিপথগামী পথভ্রষ্ট একটি দল ......বরং এটা তোমাদের জন্যে সকল দিক দিয়েই কল্যাণকর ....ওদের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যেই রয়েছে সেই পাপের শাস্তি যা সে অর্জন করেছে, আর ওদের মধ্যে প্রধানত যে ব্যক্তি এ বিষয়টা পরিচালনা করেছে তার জন্যে রয়েছে বিরাট আযাব।'

মোনাফেকদের ধ্বংসাত্মক ষড়যন্ত্রের পরিণতি

ওপরের আয়াতটি দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে মিথ্যা অপবাদ রটনাকারীরা কোনো একজন ব্যক্তি বা কয়েকজন ব্যক্তির সমষ্টি মাত্র নয়, বরং তারা হচ্ছে এক বিশেষ উদ্দেশ্যে সংগঠিত একটি দল– এতে জড়িত শুধু একা আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুলই নয়, হাঁ, সে-ই এই কুচক্রী দলের প্রধান, সে-ই গোটা মুসলিম সংগঠন ও জনশক্তিকে ভেংগে চুরমার করে দেয়ার জন্যে ষড়যন্ত্র করেছিলো, সে-ই পারস্পরিক অবিশ্বাস সৃষ্টি করার জন্যে আল্লাহর পেয়ারা এ নবগঠিত ও সুসংহত দলটির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে চেয়েছিলো, পরস্পরের মধ্যে হিংসা বিদ্বেষ ও ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টি করে এবং একের বিরুদ্ধে অপরকে লেলিয়ে দিয়ে গোটা মুসলিম জাতিকে বিপর্যস্ত করতে চেয়েছিলো– এরা হচ্ছে সে জনগোষ্ঠী যারা প্রকাশ্য যুদ্ধে মুসলমানদেরকে হারাতে না পেরে গোপনে এক মাসের মধ্যেই এই মহা পরিকল্পনা তৈরী করে ফেলেছিলো, পর্দার আড়ালে থেকে তারা নিষ্ঠাবান মুসলমানদের কয়েকজনকে কাজেও লাগিয়ে ছিলো, বিশেষ করে নবী (স.)-এর আস্থাভাজন ও একান্ত কাছাকাছি মানুষদেরকেও কাজে লাগানোর ব্যর্থ চেষ্টা করতেও তারা কসুর করেনি, অবশ্য মিথ্যা অপবাদ রটনার এই ঘটনাটি ছিলো ইসলামকে ধ্বংস করার চক্রান্তসমূহের

মধ্যে এক বিরাট ধ্বংসাত্মক ষড়যন্ত্র, তারা ইসলামের মূল কেন্দ্র স্বয়ং নবীর ঘরেই আগুন ধরিয়ে দিয়েছিলো। যে মহান ব্যক্তির পরিচালনায় বিশ্বব্যাপী ইসলামের চূড়ান্ত অভিযান পরিচালিত হচ্ছিলো সেই মহা বিপ্লবী বীরকে হতবল করার উদ্দেশ্যে তাঁর হৃদয়কে ভেংগে চুরমার করে দিতে চেয়েছিলো তারা! দেখুন না কেমন করে রসূল (স.)-এর একান্ত ঘরের মানুষ হামনা বিনতে জাহশ, তাঁর বিশ্বস্ত সহচর ও গুণ মুগ্ধ কবি হাসসান বিন সাবেত, তাঁর নিজ গোষ্ঠীর মানুষ বদরী সাহাবী মেসতাহ ইবনে আসাসা প্রমুখ ব্যক্তিকে সে এই ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িয়ে ফেলেছিলো, যার জন্যে তারা এটা-ওটা দায়িত্বহীন মন্তব্য করে বসেছিলো, কিন্তু মূল ষড়যন্ত্রের হোতা ছিলো মোনাফেক সর্দার আবদুল্লাহ ইবনে উবাই নিজে, যার নেতৃত্বে পরিচালিত হচ্ছিলো এক সংঘবদ্ধ কুচক্রী দল, সে প্রকাশ্য দৃশ্যে না এসে পর্দার আড়ালে থেকে এমন নিপুণভাবে তার হৃতরাজ্য হারানোর প্রতিশোধ নিতে চাইছিলো যে তাকে কিছুতেই ধরা যাচ্ছিলো না। প্রকাশ্যে এমন কোনো কথা তার মুখ দিয়ে বেরোয়ানি যার দ্বারা তার দোষ প্রমাণিত হতে পারে এবং তাকে পাকড়াও করা যায়।

এই ভয়ংকর মোনাফেক সর্দার তার একান্ত বিশ্বস্ত বন্ধু পরিবার পরিজন ও পারিষদের সাথে গোপন পরামর্শের মাধ্যমে তার ঈপ্সিত চক্রান্ত জাল বিছিয়ে দিয়েছিলো। এ দলের ওপর তার পুরো আস্থা ছিলো এবং সে নিশ্চিন্ত ছিলো যে এদের মধ্যে কেউ তার মুখোশ খুলে দেবে না, তার বিরুদ্ধে যাবে না বা কখনো তার বিরুদ্ধে কোনো সাক্ষ্যও দেবে না। এতো দক্ষতা ও কূট কৌশলের মাধ্যমে এই মহা মোনাফেক তার পরিকল্পনা তৈরী করেছিলো যে পূর্ণ এক মাস ধরে গোটা মদীনা ব্যথা বেদনা ও মর্মজ্বালায় প্রকম্পিত হচ্ছিলো, কারণ এই রটনার মাধ্যমে বড়ই মুখোরোচক এক কাহিনী মানুষের মুখে তুলে দেয়া গেছে, যার ফলে সাধারণভাবে এর চর্চা চলছে, আর এরই ফলে পবিত্রতম ও সব থেকে আল্লাহভীরু ঘরের পরিবেশকে বিষিয়ে তোলার মতো এক মোক্ষম হাতিয়ার তাদের হস্তগত হয়ে গেছে। এতোদিন ধরে হিংসার আগুনে জ্বলে পুড়ে মরছিলো যে মহা কুচক্রী– তার জন্যে ছিলো এ এক মহা বিজয়।

এজন্যেই এই প্রসংগের আলোচনার শুরু হচ্ছে যাতে করে সে মহা ষড়যন্ত্রের রহস্য জাল ছিন্ন করা যায় এবং জানানো যায় যে এর মূল শেকড় কোথায়, কতো গভীরে তা লুকিয়ে আছে, আর যাতে তাও প্রকাশ করা যায় যে সে সংঘবদ্ধ কুচক্রী দল ইসলাম ও মুসলমানদের সর্বনাশ সাধনে কি বদ্ধপরিকর এবং তারা সূক্ষ্ম ও সুগভীর সন্তর্পণে এগিয়ে চলেছিলো।

তারপর এ মহা চক্রান্তের পরিণাম জানাতে গিয়ে আল্লাহ রব্বুল আলামীন মুসলমানদেরকে পরিপূর্ণ নিশ্চয়তার সাথে জানাচ্ছেন যে চক্রান্তকারীরা যাই আশা করুক না কেন এবং যতো ক্ষতি করার প্রয়াস পাক না কেন, ওরা তাদের কোনো ক্ষতিই করতে পারবে না, বরং ওদের সমস্ত পরিকল্পনা বুমেরাং হয়ে ওদের ওপরেই ফিরে আসবে, তাই বলছেন,

'না, না, তোমরা ভেবো না যে ওদের এসব চক্রান্ত তোমাদের জন্যে ক্ষতিকর বরং তোমাদের জন্যে এটা হবে সব দিক দিয়েই কল্যাণকর।'

কল্যাণকর, হাঁ অবশ্যই এভাবে এটা কল্যাণকর হবে যে, রসূলুল্লাহ (স.) এবং তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করার অজুহাতে সে কুচক্রীরা যে প্রকৃতপক্ষে ইসলামের বিরুদ্ধেই দুশমনি করছিলো আলোচ্য এ ঘটনার মাধ্যমে তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। আর মুসলমানদের জন্যে মিথ্যা রটনাকে সম্পূর্ণ হারাম ঘোষণা করা হয়েছে এবং অপবাদ দানকারীদের ওপর হদ জারী করা আল্লাহ তায়ালা ফরয ঘোষণা করেছেন, তিনি আরো জানাচ্ছেন এ জঘন্য অপরাধের দ্বারা দলীয় জীবনের সংহতি বিনষ্ট হয়, কারণ এসব কথা যখন কানাকানি জানাজানি হতে থাকে তখন আমাদের মা-বোনেরাই বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাদেরকে আল্লাহ তায়ালা পয়দা করেছেন

মায়া-মমতার প্রতীক হিসাবে, তাদের বিনয়-নম্রতা, শারীরিক নাযুকতা, হৃদয়াবেগ, কমনীয়তা-নমনীয়তা ও লাজুকতা সবই ভবিষ্যতের বংশধরদের জন্যে। তাদের সেসব গুণাবলী দ্বারাই যৌথ সংসার ও শান্তির পরিবার গড়ে ওঠে। তুচ্ছ কারণে বা নিছক সন্দেহের বশবর্তী হয়ে অথবা কোনো পদস্খলের আঘাত সইতে না পেরে যদি সঠিক পন্থায় পরিশুদ্ধ করার পরিবর্তে আমরা যত্রতত্র ও এলোমেলো সমালোচনার পথ গ্রহণ করি অথবা সহজভাবে এগুলোকে ছেড়ে দেই তাহলে সর্বনাশের কোনো সীমা থাকবে না এবং সমাজ সংসার ধ্বংসের অতল তলে তলিয়ে যাবে। এজন্যেই এ অপরাধকে ইসলাম অত্যন্ত কঠিন ও ধ্বংসাত্মক গণ্য করে এর জন্যে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করেছে এবং জানিয়েছে যে, প্রকাশ্যে ও যথেষ্টসংখ্যক দশর্কদের সামনে, এ শাস্তি দিতে হবে যাতে এ অপরাধকে কেউ সহজ না ভাবে, নচেৎ এই অপবাদ দিতে গিয়ে কারো কোনো মান সম্ভ্রমের তোয়াক্কা করবে না, এ বদনাম দেয়া থেকে কাউকেই বাদ দেবে না, ফলে মানুষে মানুষে ভালবাসি, কল্যাণকামিতা ও শ্রদ্ধাবোধ শেষ হয়ে যাবে– কোনো লজ্জা শরম ও মানুষের প্রতি দরদ ব্যথা থাকবে না।

এই দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়াটা উত্তম হয়েছে এজন্যে যে, এই উপলক্ষে এ ধরনের অপরাধের মোকাবেলা করার জন্যে মযবুত আইন করে দেয়া সম্ভব হয়েছে।

এ ঘটনার কারণে রসূলুল্লাহ (স.) আহলে বায়ত [রসূলুল্লাহ (স.)-এর পরিবার] ও গোটা মুসলিম সমাজকে যে কঠিন ব্যথা-বেদনা সইতে হয়েছে, মাসাধিককাল ধরে যে দুঃসহ জ্বালা ভোগ করতে– হয়েছে তা সবই এ বিষয়ক অভিজ্ঞতার চড়া মূল্য, কঠিন পরীক্ষার ফিস এবং বাধ্যতামূলক দেয় সংশোধনী বলেই বুঝতে হবে।

অপরাধ রটনার কাজে যারা মাথা ঘামিয়েছিলো, এ অপরাধের জন্যে তারা সবাই কিছু না কিছু দায়ী, অতপর এ ভোগান্তি বা শাস্তিও সবাইকে পেতে হবে। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'ওদের প্রত্যেকের জন্যে রয়েছে শাস্তি যা সে অপরাধের বিনিময়ে অর্জন করেছে।'

অর্থাৎ, যদি কেউ দুনিয়াতে শাস্তি না পায়, তাহলে অবশ্যই আল্লাহর কাছে তাকে তার দোষ অনুযায়ী সমুচিত শাস্তি পেতে হবে এবং সে শাস্তি হবে আরো যন্ত্রণাদায়ক আরো কঠিন। আর যারা জেনে বুঝে কাউকে কষ্ট দেয়ার বদ-নিয়তে ইচ্ছাকৃতভাবে এ মিথ্যা রটনার কাজে শরীক হয়েছে তারা অবশ্যই গুনাহে কবীরায় লিপ্ত এবং যেহেতু তা বান্দাহর হকের সাথে জড়িত এজন্যে তাদেরকে আল্লাহ তায়ালা মাফ করবেন না, দুনিয়াতে যেমন তাদের শাস্তি রয়েছে, তেমনি রয়েছে আখেরাতেও। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'আর ওদের মধ্য থেকে যে (এ ব্যাপারে) সব থেকে বড় হিসসা নিয়েছে তার জন্যে রয়েছে বিরাট আযাব।'

অর্থাৎ, যে কঠিন অপরাধ দুনিয়াতে সে করেছে তার প্রতিদানে সেই রকমই কঠিন শাস্তি তাকে দেয়া হবে।

এই জঘন্য অপরধজনক কাজের মধ্যে যে ব্যক্তি সব থেকে বড় অংশ নিয়েছিলো এবং এই অপরাধের শিকার মাসুম মানুষগুলোর ওপর যে সর্বাপেক্ষা নিষ্ঠুর হামলা চালানোর জন্যে প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলো সে ছিলো মোনাফেক সর্দার আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালূল। সে-ই ষড়যন্ত্রের মূল ঝান্ডা বহন করেছিলো, সে জানতো ইসলামী জামায়াতকে ভাংগার জন্যে সব থেকে নাযুক বিষয় কোনটা। আল্লাহ রব্বুল আলামীন এদেরকে তাঁর ক্ষমতা বলে সার্বক্ষণিকভাবে ঘিরে না রাখলে তাঁর রসূল (স.)-কে কঠিন চক্রান্তের আঘাত থেকে না বাঁচালে, ইসলামী দলের পরিচালনা তিনি নিজে না করলে এবং তিনি নিজেই তাঁর দ্বীনের হেফাযত না করতে থাকলে সে

তো তার ষড়যন্ত্রে প্রায় সাফল্যমন্ডিত হয়েই গিয়েছিলো। এক বর্ণনায় জানা যায়, যখন সাফওয়ান ইবনে মোয়াত্তাল উম্মুল মোমেনীন আয়শা (রা.)-এর হাওদাজ বাঁধা উটনীটি নিয়ে মূল কাফেলার কাছে পৌঁছে গেলেন, তখন আবদুল্লাহ ইবনে উবায় তার গোত্রের মধ্যে অবস্থান করছিলো। সে হাওদাজওয়ালা উটনীকে দেখেই ধৃষ্টতার সাথে জিজ্ঞাসা করলো (হাওদাজে) কে এটা? লোকেরা বললো, আয়শা (রা.) ...... তখন সংগে সংগে সে দুর্মুখো লোকটা বলে উঠলো, 'আল্লাহর কসম, সে ব্যক্তি থেকে সে কিছুতেই রেহাই পায়নি, সে ব্যক্তিও এ মহিলাটি থেকে রেহাই পায়নি।' সে আরো বললো, 'আরে শুনেছো তোমরা, তোমাদের নবীর স্ত্রী এক ব্যক্তির সাথে সারা রাত কাটিয়েছে, অবশেষে সকাল হয়ে গেছে, এখন সে তাকে সাথে করে উটের রশি ধরে (ভালো মানুষ সেজে) নিয়ে এসেছে!'

ছিঃ, সে জাহান্নামের কীট এ কি জঘন্য কথা উচ্চরণ করলো! আল্লাহর হুকুমে, নবী (স.)-এর স্ত্রীদেরকে মোমেনদের মা বলে যারা জানে ও মানে তাদের সম্পর্কে এভাবে চিন্তা তো সে-ই করতে পারে যে মুসলমান বলে পরিচয় দিলেও প্রকৃত পক্ষে সে আল্লাহর হুকুমের ধার ধারে না। এই কথা দ্বারাতেই তো সে তার কপটতা প্রমাণ করেছে এবং জানিয়েছে যে, সে তার সংগি-সাথী সংঘবদ্ধ কপট দলের সর্দার, সে একটি স্বাভাবিক ঘটনাকে বাঁকা করে চিত্রিত করে এমনভাবে মুসলমানদের মুখে তুলে দিলো যে তারা এই মিথ্যা কথাটা নির্দ্বিধায় বলাবলি করতে থাকলো এবং পুরো একটি মাস ব্যাপী এক মুখোরোচক বিষয় হিসাবে এর চর্চা হতে থাকলো, অথচ এটা তো মুসলমানদের জন্যে প্রথম শোনার সাথে সাথেই মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেয়া দরকার ছিলো। এই ঘটনার আকস্মিকতা ও এটা নিয়ে সে নিবেদিত প্রাণ মুসলিম সমাজের এমন ঘৃণ্য কথা কি ভাবে আলোচনা হতে থাকলো তা চিন্তা করলে আজও মানুষ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায়। এই কঠিন কু-ধারণার বিষকে একেবারে ইসলামী জনগোষ্ঠির শরীরের মধ্যেই প্রবেশ করিয়ে দেয়া হয়েছিলো এবং সবচেয়ে পবিত্র ব্যক্তিবর্গকে এবং সবার থেকে দোষমুক্ত মানুষদেরকে বেদনাহত করা হয়েছিলো।

এ চরম নিন্দনীয় আন্দোলন এমন সুকৌশলে চালানো হয়েছিলো যার ছোবল গোটা মুসলিম উম্মাসহ স্বয়ং আল্লাহর রসূলকে গ্রাস করে ফেলেছিলো, ইসলামের ভিত্তিকেই নাড়িয়ে দিয়েছিলো– আল্লাহর ভয় ও ইসলামের নৈতিকতার মানকে প্রকম্পিত করেছিলো। স্বয়ং রসূলুল্লাহ (স.)-এর জীবনে এ পর্যন্ত যতো কঠিন অবস্থা এসেছে এবং যতো মারাত্মক পেরেশানীর মোকাবেলা তাঁকে এতো বছর ধরে করতে হয়েছে তার মধ্যে এটা সম্ভবত ছিলো সব থেকে কঠিন, কারণ অসহনীয় এ দুঃখ বেদনায় জর্জরিত হয়ে চরম উদাস মনে তিনি আল্লাহ রব্বুল আলামীনের সাহায্য প্রার্থী হয়েছেন, কাতরভাবে তিনি আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ জানিয়েছেন, যেন আল্লাহ তায়ালা তাঁর ইযযত রক্ষা করেন, যে কোনো বড় থেকে বড় অপরাধকে ক্ষমা করার মতো প্রশস্ততা আল্লাহ তায়ালা তাঁর হৃদয়ের মধ্যে দান করেছেন এবং তাঁর মাঝে সুন্দরভাবে সবর এখতিয়ার করার তাওফিক দান করেছেন। তিনি এমন কথা বলা থেকে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের কাছে পানাহ চেয়েছেন, যাতে তাঁর ধৈর্যের বাঁধ ভেংগে গেছে বলে বুঝা যায় এবং পরীক্ষার এ বোঝা তিনি বইতে পারছেন না বলে প্রকাশ পায়। আর সত্যিকারের বলতে কি যে নিষ্ঠুর দুঃখ-বেদনার মোকাবেলা তাঁকে করতে হচ্ছিলো, সম্ভবত তাঁর জীবনে শারীরিক বা মানসিক কোনো দিক দিয়েই এমন কঠিন অবস্থা আর আসেনি, আর ইসলামের ইতিহাসেও এই মিথ্যার মতো কঠিন বিপদও আর কখনো আসেনি।

দুর্নাম শোনার পর একজন মোমেনের করণীয়

আর মুসলমানরা যদি এর কারণ বুঝতে চেষ্টা করে তাহলে তাদের অন্তরই তাদেরকে সঠিক কথাটা বলে দেবে, আর যদি কেউ যুক্তি দিয়ে বুঝতে চায় সেও এর সঠিক কারণটা সহজেই বুঝতে পারবে। যে কোনো বিষয় বুঝার জন্যে আল কোরআন এভাবেই সাহায্য করে, এজন্যে এ মহান কোরআন প্রথম পদক্ষেপেই তার বিবেককে আহ্বান জানায়। দেখুন আল কোরআন বলছে,

'মোমেন পুরুষ ও স্ত্রী লোকরা যখন তোমরা একথাটা শুনলে, তখন কেন তোমাদের নিজেদের ভালো ধারনা রাখলে না? আর কেনই বা তোমরা বললে না, এটা নির্জলা মিথ্যা রটনা?'

হাঁ, অবশ্যই মোমেনদের জন্যে এটাই প্রথম কর্তব্য ছিলো যে যখনই তাদের কানে একথাটা পৌঁছুল তখনই স্পষ্ট করে তাদের বলা উচিত ছিলো, অসম্ভব কথা, এটা হতে পারে না, অবশ্যই এটা এক নির্জলা মিথ্যা, এটাকে তাদের জন্যে কল্যাণকর মনে করা উচিত ছিলো যে এই রটনা দ্বারা মোনাফেকদের খাসলাত-চরিত্র ও ব্যবহার সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিলো এবং তাদের খোলস উন্মোচিত হয়ে গিয়েছিলো এবং এই ওজুহাতে, তাদের কোনো প্রকার সমর্থন না দিয়ে, তাদের থেকে দূরত্ব বজায় রাখার একটা সুযোগ তাদের হাতে এসে গিয়েছিলো .....এরপর, খেয়াল করে দেখুন তাদের সামনে এই যে দুই ব্যক্তির অবস্থা– একজন তাদেরই নবীর পবিত্র স্ত্রী এবং অপরজন তাদেরই ভাই একজন সাহাবী ও একজন মোজাহেদ। দু'জনই তো তাদের নিজেদের লোক তারা তো জাহেলী যুগের ও জাহেলী সমাজের এমন লোক নয়, যাদের মধ্যে আল্লাহর ভয় বা আখেরাতে জওয়াবদিহির চিন্তা নেই, কাজেই তাদের সম্পর্কে ভালো চিন্তাটাই তো প্রথম আসা দরকার ছিলো। এটা কি তাদের মনে করা উচিত ছিলো না যে, মোমেনদের নিজেদের কোনো মেয়ে এমন বিপদাপন্ন হলে এমন কিছু কি ঘটতে পারে? ঈমান অর্থাৎ আল্লাহর ভয় ও আখেরাতের বিশ্বাস যাদের মধ্যে আছে তারা প্রকাশ্যে ও গোপনে জীবনের শুদ্ধি রক্ষা করবে, সদা-সর্বদা, আল্লাহর কাছে জওয়াবদিহি করতে হবে– এ চিন্তা নিয়েই নিজেদের কর্তব্য নির্ধারণ করবে। সুতরাং তাদের সম্পর্কে ভালো ধারণা পোষণ করাই তো ছিলো উত্তম পন্থা। তাদের কারো দ্বারা এমন অন্যায় হতে পারাটা যদি সম্ভব বলে মনে না হয় তাহলে নবী (স.)-এর স্ত্রী দ্বারা এটা কি করে সম্ভব মনে করা যায় এবং সে ব্যক্তির দ্বারাই বা এমন অন্যায় পথে পা বাড়ানো কেমন করে সম্ভব মনে করা যেতে পারে, যার সম্পর্কে ভাল ছাড়া কোনো মন্দ কখনো জানা যায়নি।

আবু আইয়ুব খালেদ ইবনে যায়দ আনসারী (রা.) ও তাঁর স্ত্রী এভাবেই চিন্তা করেছিলেন, ইমাম মোহাম্মদ ইবনে এসহাক বর্ণনা করেছেন, একদিন আইয়ুবের বাপকে আয়ুবের মা বললেন, আচ্ছা, আইউবের বাপ, আপনি কি শোনেননি আয়শা (রা.) সম্পর্কে লোকেরা কী বলাবলি করছে? তিনি বললেন, হাঁ, এবং এটা ডাহা মিথ্যা। আয়ুবের মা, এমন পরিস্থিতি যদি তোমার হতো তাহলে তুমি কি এমনই কোনো অন্যায় কাজে জড়িয়ে পড়তে? তিনি বললেন, আল্লাহর কসম অবশ্যই আমি এমন কাজ করতাম না। আবু আইয়ুব বললেন, 'আল্লাহর কসম, আয়শা (রা.) অবশ্যই তোমার থেকে উত্তম ব্যক্তি .... আবার ইমাম মাহমুদ ইবনে ওমর আয্-যামাখশারী তার তাফসীর (আল কাশশাফ)-এর মধ্যে বর্ণনা করেছেন, আবু আইয়ুব একদিন তাঁর স্ত্রী উম্মে আইয়ুবকে বললেন, তুমি কি খেয়াল করেছো, কি সব কথা বলাবলি হচ্ছে? তিনি বললেন, হাঁ, কিন্তু আপনি যদি সাফওয়ানের স্থানে হতেন, তাহলে আপনি কি রসূলুল্লাহ (স.)-এর ইযযতের ওপর হামলা করার কথা চিন্তা করতে পারতেন? তিনি বললেন, কখনো নয়। তখন উম্মে আইয়ুব বললেন, শুনুন আমিও যদি আয়শার স্থানে হতাম, তাহলে কিছুতেই আল্লাহর রসূলের খেয়ানত করতে পারতাম না, অতপর অবশ্যই এটা সত্য যে আয়শা আমার চেয়ে ভালো এবং অবশ্যই সাফাওয়ানও আপনার থেকে উত্তম ব্যক্তি।

এ দুটি বর্ণনা থেকে বুঝা যায় যে, মুসলমানদের অনেকে তাদের বিবেকের ডাকে সাড়া দিয়েছে এবং আন্তরিকভাবে ব্যাপারটা বুঝার চেষ্টা করেছে, আর তারপর আয়শা (রা.) এবং একজন মুসলমান সম্পর্কে যেসব উল্লেখ করা হয়েছে তার থেকে তারা নিজেদেরকে দূরে রেখেছে– দূরে রেখেছে আল্লাহর না-ফরমানী করা থেকে এবং রসূলুল্লাহ (স.)-এর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা থেকে। এভাবে তারা লজ্জাকর ও পাপের চোরাবালির মধ্যে পতিত হয়ে ধ্বংস হয়ে যাওয়া থেকে নিজেদেরকে বাঁচিয়েছে। কখনো তারা শুধু সন্দেহের বশবর্তী হয়ে কারো সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করেনি এবং কোনো আলোচনাতেও অংশ নেয়নি।

এই হচ্ছে আল কোরআনে উপস্থাপিত যে কোনো বিষয়ে মাথা ঘামানোর পদ্ধতি, অর্থাৎ, কোনো সাক্ষ্য প্রমাণ তালাশ করার আগে প্রথমেই নিজের বিবেককে ব্যবহার করা। এটা হচ্ছে মুসলমানদের প্রথম কর্তব্য এবং সমস্যাদি সমাধানের ব্যাপারে তাদের প্রথম পদক্ষেপ। দ্বিতীয় পদক্ষেপ হচ্ছে বাস্তব দলীল প্রমাণ দ্বারা কোনো কিছুর ব্যাপারে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া। তাই এরশাদ হচ্ছে,

কেন তারা (তাদের উত্থাপিত অভিযোগের পক্ষে প্রমাণস্বরূপ) চারজন (দেখা) সাক্ষী হাযীর করে না! যদি চারজন সাক্ষী হাযীর করতে ওরা না পারে তাহলে ওরাই আল্লাহর কাছে মিথ্যাবাদী বলে প্রমাণিত হবে।'

অর্থাৎ, এসব নির্জলা ও ডাহা মিথ্যার দৌড় বহু দূরে। এসব মিথ্যার বিহিত না করা হলে এর আওতায় ছোট বড় গরীব ধনী এবং সর্বোচ্চ সম্মানী ব্যক্তি পর্যন্ত এসে যাবে, যেমন এর ধাক্কা থেকে আল্লাহর মহান নবী ও তাঁর পবিত্র পরিবার পর্যন্ত রেহাই পায়নি। সুতরাং, এহেন অপরাধকে সহজে ছেড়ে দেয়া যায় না বা তুচ্ছও মনে করা উচিত হবে না। বিনা সাক্ষীতে এবং বিনা দলীল প্রমাণে যে যার নামে যা চাইবে মুখোরোচক গল্প হিসাবে আলাপ আলোচনা করতে থাকবে, যার মুখে যা আসবে সে তাই বলবে এবং এভাবে মানুষের ইযযত আবরুকে ধুলায় মিশিয়ে দেবে। আল্লাহ রব্বুল আলামীনের রাজ্যে এমন অরাজকতা সহ্য করা সম্ভব নয়। আল্লাহ পরওয়ারদেগার এসব দেখবেন এবং তিনি এর কোনো বিহিত করবেন না বা করতে পারবেন না, এমন তো হতে পারে না, তিনি কোনো আঁধার নগরীর মুকুটবিহীন ও দেউলে বা ক্ষমতাহীন রাজা নন যে, কিছু করতে চাইলে করতে পারবেন না।

এজন্যেই এরশাদ হচ্ছে,

'কেন তারা চারজন (দেখা) সাক্ষী! নিয়ে আসে না'

অর্থাৎ তারা যদি এরকম সাক্ষী হাযির না করে তাহলে অবশ্যই তারা মিথ্যাবাদী বলে প্রমাণিত হবে। তারা মহান আল্লাহর কাছে মিথ্যাবাদী বলে সাব্যস্ত হবে, যাঁর কাছে কোনো কথা পরিবর্তন হয় না এবং তাঁর হুকুম পরিবর্তিতও হয় না, তাঁর নির্দেশ বাস্তবায়িত হওয়া বন্ধও হয় না। এ অপরাধীদের জন্যে এ এমন কঠিন শাস্তি, যা প্রযোজ্য হবেই অবশ্যই এ শাস্তি দেয়া হবে এবং এ শাস্তি স্থায়ীভাবে থাকবে। এর থেকে রেহাই পাওয়ার কোনো উপায় নেই এবং এ শাস্তির পরিণাম আরো আরো ধ্বংসাত্মক– এর থেকে বাঁচারও আর কোনো পথ নেই। তাহলে বুঝা গেলো, এ ধরনের কোনো খবর বা দোষারোপের কথা কানে আসার সাথে সাথে মুসলমানরা দুটি কাজ করবে।

এক. নিজেদের বিবেক বুদ্ধি খাটিয়ে সে খবরের যথার্থতা বুঝার চেষ্টা করবে।

দুই. সে খবরের ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহণ না করা পর্যন্ত তারা কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করবে না– কাউকে বলাও যাবে না বা কোনো খারাপ মন্তব্যও করা যাবে না ....কিন্তু দুঃখজনক হলেও একথা সত্য যে মোমেনরা সে মোনাফেকদের ষড়যন্ত্রের ফাঁদে পা দিয়ে আটকে গিয়েছিলো

এবং শত্রুর উদ্দেশ্যকে সফল করে নিজেরাও ধ্বংসের অতল তলে ডুবে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিলো। তারা মিথ্যা ও মনগড়া অপবাদ রটনাকারীদেরকে প্রতিরোধ না করে, বরং গোটা পরিবেশকে বিষাক্ত করার জন্যে তাদেরকে খোলা আযাদী দিয়ে দিয়েছিলো এবং স্বয়ং সোনার মানুষ মোমেনদের চোখের মনি ও প্রাণ প্রিয় নেতার মান-সম্মান ধ্বংসের কাজ করার জন্যে তাদেরকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে দিয়েছিলো। এটা তো এতো বড় কঠিন ব্যাপার ছিলো যে আল্লাহর মেহেরবানী না থাকলে গোটা মুসলিম জামায়াত এক মহা-বিপদে পড়ে যেতো। এজন্যে আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাদেরকে চূড়ান্তভাবে সতর্ক করছেন এতো কঠিন ও বেদনাদায়ক শিক্ষা লাভ করার পর যে, আর কোনোদিন এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি তারা না ঘটায়। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'আর যদি দুনিয়া এবং আখেরাতে তোমাদের ওপর আল্লাহর মেহেরবানী এবং দয়া না থাকতো তাহলে তোমরা যা শুরু করেছিলে, তাতে তোমাদেরকে অবশ্যই মহা বিপদজনক আযাব স্পর্শ করতো।'

ওপরের আয়াতে বুঝা যাচ্ছে যে, আল্লাহ তায়ালা উদীয়মান মুসলিম জামায়াতকে অত্যন্ত কঠোরভাবে এক শিক্ষা দিলেন, তারপর তাদের ওপর মান-মর্যাদা ও দয়ার বৃষ্টি নাযিল করলেন এবং তাদেরকে তাঁর কঠিন পাকড়াও থেকে ও ভীষণ আযাব থেকে রেহাই দিলেন, যদিও তাদের আচরণ তাদেরকে আযাবের হকদারই বানিয়ে দিয়েছিলো। তারা রসূলুল্লাহ (স.) তাঁর স্ত্রী এবং তাঁর এমন এক সংগীর বিরুদ্ধে কথা বলেছিলো যার সম্পর্কে কেউ কোনো দিন ভালো ছাড়া মন্দ পায়নি– এদেরকে তারা যে কষ্টের মধ্যে ফেলেছিলো তার প্রতিদানে তারা অবশ্যই বিরাট শাস্তি পাওয়ার যোগ্য হয়ে গিয়েছিলো। আর তাদের ওপর সেই শাস্তি অবধারিত হয়ে গিয়েছিলো যা মুসলিম জামায়াতকে কঠিন কষ্টের মধ্যে ফেলার কারণে এবং তাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালানোর কারণে তাদের ভাগ্যে তারা নিজেরা ডেকে এনেছিলো। তারা সেসব পবিত্র বিষয়গুলোকে মলিন করার চেষ্টা করেছিলো যার ওপর জামায়াতী জীবনের শান্তি ও নিরাপত্তা নির্ভর করে। মুসলমানদের দলীয় জীবন ও সামষ্টিক শক্তিকে ধ্বংস করার জন্যে এবং আল্লাহর প্রতি ও নবী (স.)-এর প্রতি তাদের যে গভীর বিশ্বাস ছিলো তাকে মূলোৎপাটিত করার জন্যে পূর্ণ একটি মাস ধরে যে মারাত্মক চক্রান্ত তারা করেছিলো তার জন্যে তারা আল্লাহর মহা গযবের হকদার হয়ে গিয়েছিলো। কোনো নিশ্চিত তথ্য ছাড়াই তারা গোটা মুসলিম জামায়াতকে ধ্বংসের অতল তলে তলিয়ে দেয়ার জন্যে এই গভীর ষড়যন্ত্রের জাল বিছিয়ে দিলো, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে বেদনাদায়ক এক শিক্ষা দান করার পর তাদেরকে নিজ মেহেরবানী ও রহমত দ্বারা নাজাত দিলেন।

আল কোরআন অতি চমৎকারভাবে সে সময়টির ছবি এঁকেছে, যখন মানুষের নৈতিকতার লাগাম ঢিল হয়ে গেলো, ভালো মন্দ বিচারের মানদন্ডসমূহ পরিত্যক্ত হলো, মানুষের মূল্যবোধ বিভ্রান্তিতে ছেয়ে গেলো এবং মূল নীতিসমূহ সংকীর্ণ হয়ে গেলো। এরশাদ হচ্ছে,

'স্মরণ করে দেখো সেই সময়ের কথা যখন ....এবং সেটা আল্লাহর কাছে অত্যন্ত বড় ব্যাপার।' (আয়াত ১৫)

এ আয়াতটি এমন একটি অবস্থার ছবি এঁকেছে যা দেখে বুঝা যাচ্ছে, সে দলটি এমন একটি কঠিন বিষয় নিয়ে কতো হালকাভাবে চিন্তা করেছে এবং কতো অবহেলার সাথে এতো বড় ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা করেছে,

'তোমরা বলাবলি করছিলে'

অর্থাৎ চিন্তাহীনভাবে, না দেখে যাঁচাই না করে এবং গভীরভাবে খেয়াল না করে এক জিহবা আর এক জিহবার সাথে সাক্ষাত করছিলো, এমনকি তাদের মনেই হয়নি যে এ কথাটার ক্ষতি

মনের মধ্যে যাঁচাই করার পূর্বেই কথাটা কানে কানে ছড়িয়ে পড়বে, এ নিয়ে বহু লোকই মাথা ঘামাতে শুরু করবে। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'তোমরা ভাবছো ব্যাপারটা তো তেমন কিছু নয়, তুচ্ছ।

'কিন্তু তোমরা একটুও চিন্তা করলে না, বিষয়টা স্বয়ং আল্লাহর রসূলের মান সম্ভ্রমের সাথে জড়িত, তাঁর সম্মানের ওপর এটা প্রচন্ড এক আঘাত। এর অন্তরালে অপর যে কথাটি প্রচ্ছন্ন ছিলো তা হচ্ছে, মোহাম্মদ (স.) সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রতিনিধি হওয়ার দাবী করছে, অথচ তার ঘর বিগড়ে গেলো, সেখানে তার মালিক তাকে কোনো সাহায্য করতে পারলো না। তাহলেই বোঝ কেমন নবী সে! এ ঘটনা তাঁর ওপর এমন তীব্র ব্যথা-বেদনা ডেকে আনলো যে তাঁর স্ত্রী ও গোটা পরিবারের অন্তর ফেটে চৌচির হয়ে গেলো, এমনকি যালেমরা সিদ্দীকে আকবারের ঘরকেও এই মারাত্মক অপরাধের সাথে জড়িয়ে ফেললো। তিনি তো ছিলেন সেই মহান ব্যক্তিত্ব যার ওপর জাহেলী যুগেও এ ধরনের অপবাদ দিতে কেউ সাহস পায়নি এবং আল্লাহর পথে জেহাদকারী উল্লেখিত সে সাহাবীকেও কোনো দিন কেউ এভাবে দোষারোপ করতে পারেনি, কেউ রসূলুল্লাহ (স.)-এর চরিত্রের ওপর আঘাত হানতে পারেনি এবং তাঁর রবের সাথে তাঁর মহব্বতের কেউ চিড় ধরাতেও পারেনি বা আল্লাহর পরিচালনার বাইরেও তিনি কখনো থাকেননি। এজন্যেই খোদ আল্লাহ তায়ালাই বলছেন,

'তোমরা ভাবছো এটা খুব সহজ ব্যাপার অথচ আল্লাহর কাছে এটা এক বিরাট ব্যাপার'। (আয়াত ১৫) ....

আর আল্লাহর কাছে তো সেসব জিনিসই বড় এবং ভারী যা পাহাড়কে কাঁপিয়ে তোলে এবং পৃথিবী থেকে আকাশ পর্যন্ত এক তুফান শুরু হয়ে যায়।

যে কোনো মুসলমানের পক্ষে এ ন্যক্কারজনক কথা কানে আসার সাথে সাথে তাদের অন্তর ভয়ে থরথর করে কেঁপে উঠা উচিত ছিলো এবং তাদের সামনে এ সম্পর্কিত কোনো কথা উচ্চারিত হলে তাদের কণ্ঠ স্তব্ধ হয়ে যাওয়াটাই ছিলো বাঞ্ছনীয়, এটাকে কোনো আলোচ্য বিষয় মনে করাকেও অবশ্যই খারাপ মনে করা উচিত ছিলো, উচিত ছিলো মনকে আল্লাহর দিকে রুজু করে নবীকে এসব কিছু দুর্বলতার উর্ধে ভাবা এবং উচিত ছিলো সে পবিত্র পরিবেশ থেকে বহু বহু দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেয়া এই দোষারোপের নিকৃষ্টতম কথাগুলোকে উপেক্ষা করা। এরশাদ হচ্ছে,

'তোমরা যখন এ কথাটা শুনলে তখন কেন বলে উঠলে না, অবশ্যই এ বিষয়ে আমাদের কোনো মন্তব্য করা উচিত নয়, এ বিষয়ে কোনো আলাপ-আলোচনা করাও ঠিক হবে না। পবিত্র তুমি হে আল্লাহ! অবশ্যই এ হচ্ছে এক ভয়ানক মিথ্যা অপবাদ'।

আর যখনই তোমাদের কাছে এ গুজবটা পৌঁছুলো, তোমাদের অন্তরের গভীরে রেখাপাত করলো, তোমাদের গোটা সত্ত্বাকে, আন্দোলিত করলো আসলে সে সময়ে যে কথাগুলো চালাচালি হচ্ছিলো, তখন তার ভয়াবহতা এবং তার ঘৃণ্য প্রকাশ ও প্রচারের কারণে তোমাদের মধ্যে মারাত্মক এক ভয় ছড়িয়ে পড়া উচিত ছিলো। এজন্যে তোমাদেরকে এ ধরনের কঠিন অবস্থা যখন যেখানেই আসুক না কেন, তোমরা যেন সাবধান থাক এবং সেসব অপপ্রচার থেকে তোমাদের মনোযোগকে সংগে সংগে ফিরিয়ে নিয়ে আসা। এরশাদ হচ্ছে,

'আল্লাহ তায়ালা তোমাদের নসীহত করছেন যেন তোমরা পুনরায় আর কখনই এ ধরনের ঘটনার সাথে জড়িয়ে না পড়।'

'তিনি তোমাদেরকে নসীহত করছেন' মানুষকে গড়ে তোলার জন্যে এ এক অতি উত্তম ও প্রভাবপূর্ণ পদ্ধতি। শোনা, আনুগত্য করা এবং বিবেচনা করার জন্যে এটাই সর্বাপেক্ষা সুন্দর পদ্ধতি। আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে নসীহত করছেন যেন তোমরা পুনরায় এ ধরনের কাজ আর না করো। আল্লাহ তায়ালা চান তারা এ নসীহত গ্রহণ করে উপকৃত হোক।

'যদি তোমরা মোমেন হও' ....

কারণ এই যে ঘৃণ্য কথাগুলো ছড়ানো হলো যারা প্রকৃত মোমেন তারা এগুলো করতে পারবে না এসব আচরণ করতে গেলে অবশ্যই তাদেরকে আল্লাহর ভয় নিয়ন্ত্রণ করবে এবং তাদের প্রতি এই সতর্কবানী উচ্চারণ করা হচ্ছে যেন অতীতে যেসব ভুল ভ্রান্তি হয়েছে সেগুলো পুনরায় আর না হয়, যেহেতু তারা মোমেন এ সাবধানতা তাদের জন্যে একান্ত প্রয়োজন।

'আর তোমাদের কাছে আল্লাহ তায়ালা সুস্পষ্টভাবে এ আয়াতগুলো বর্ণনা করছেন।'

মিথ্যা অপবাদের যে ঘটনাটি ওপরে উল্লেখিত হয়েছে, এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে আরো যেসব চক্রান্ত চলেছে এবং এসবের সাথে পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে পড়ার কারণে যার যে সব ক্রটি বিচ্যুতি হয়েছে সেগুলো আল্লাহ তায়ালা ছাফ ছাফ জানিয়ে দিচ্ছেন, যেন মানুষ এসব ক্রটির ভয়াবহতা বুঝতে পারে এবং এসবের পুনরাবৃত্তি আর না ঘটায়,

'আর আল্লাহ তায়ালা মহাজ্ঞানী মহা বিজ্ঞানময়।'

তিনি জানেন মানুষের মন-মানসিকতা এবং তাদের উদ্দেশ্য লক্ষ্য কি, জানেন তাদের অন্তরে কি সব কথা নিশিদিন আনাগোনা করে, তিনি জানেন মানুষের জীবনের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে তার সমস্যাসমূহও। আর তিনিই সেগুলোর সমাধান দিয়ে থাকেন– তিনিই তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করেন এবং তাদের যাবতীয় কাজের ব্যবস্থা তিনিই করে থাকেন; তাদের জীবনের শৃংখলা বিধান এবং তাদেরকে সঠিক পথে রাখার জন্যে তিনিই সব কিছুকে নিয়ন্ত্রণ করেন, আর ভুল-ক্রটি হয়ে গেলে তাদের সংশোধনের ব্যবস্থাও তিনিই দিয়ে থাকেন।

মিথ্যা অপবাদ-রটনার ঘটনা বর্ণনা, এ অপরাধের শাস্তির উল্লেখ এবং ঘৃণিত এই কাজের ফলে সমাজের সর্বত্র যে অশান্তিকর পরিবেশ সৃষ্টি হয় সেগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করার পর এ ধরনের অপরাধ যেন মুসলিম সমাজে আর না ঘটে তার জন্যে বারবার সতর্ক করা হয়েছে, যারা কোনো চক্রান্তের শিকার হয়ে এ ঘৃণ্য অপরাধে ইন্ধন জুগিয়েছে এবং যারা পরিণামের চিন্তা না করে হেলা ভরে এ ষড়যন্ত্রের সমর্থন দিয়েছে, তাওবা করলে তাদেরকে ক্ষমা করা হবে বলে সংবাদ দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে যে, তাদের জন্যে রয়েছে আল্লাহর রহমতের অবারিত দ্বার। সাথে সাথে দৃঢ়তার সাথে তাদেরকে একথাও জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে সরলা, সতী সাধ্বী মোমেনদের বিরুদ্ধে যখন কেউ অপ্র-প্রচার চালাবে, তার চরিত্রে কলংক লেপন করবে, আন্দাজে তাদেরকে বদনাম করার চেষ্টা করবে, তাদের জন্যে (দুনিয়ার শাস্তির সাথে সাথে) পরকালেও রয়েছে আল্লাহর আযাব। এটা এজন্যেই বলে দেয়া হয়েছে যেন কেউ এ অপরাধকে হালকা মনে না করে এবং দুনিয়ার অন্যান্য বিষয়ের মতো এটাকে ছোটখাট কোনো ঘটনা মনে না করে। আর যদি কেউ এ বিষয়টির গুরুত্ব বুঝার পর সঠিকভাবে তাওবা করে তাহলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ যেন সর্বান্তকরণে তাকে ক্ষমা করে দেয় এবং খেয়াল রাখা হয় যেন এর কোনো প্রভাব দুনিয়াবী লেনদেন ও ব্যবহারের ওপর পড়তে না পারে, যেমনকি আবু বকর (রা.)-এর ব্যবহারে তার আত্মীয় মেসতাহ ইবনে আসাসাকে– আর দান করবেন না বলে প্রতিজ্ঞা করার কারণে ঘটেছিলো, এ ছিলো সেই ব্যক্তি যে, অপবাদের এ ঘটনাটির ওপর যারা মন্তব্য করেছিলো তাদের সাথে সে যোগ দিয়ে কিছু কথা বলেছিলো। তাই এরশাদ হয়েছে,

'নিশ্চয়ই যারা মোমেনদের (কোনোভাবে) অশ্লীলতার প্রসার ঘটায় তাদের জন্যে রয়েছে দুনিয়া ও আখেরাতে বেদনাদায়ক আযাব, আর আল্লাহ তায়ালা জানেন এবং তোমরা জানো না।' (আয়াত ১৯)

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا
وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٢٧﴾ فَإِن لَّمْ
تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ ۖ وَإِن قِيلَ لَكُمُ
ارْجِعُوا فَارْجِعُوا ۖ هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨﴾ لَّيْسَ
عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ ۚ وَاللَّهُ
يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿٢٩﴾ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ
وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾
وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ

রুকু ৪

২৭. হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, তোমরা নিজেদের ঘর ছাড়া অন্য কারো ঘরে– সে ঘরের লোকদের অনুমতি না নিয়ে ও তার বাশিন্দাদের প্রতি সালাম না করে কখনো প্রবেশ করো না; (নৈতিকতা ও শালীনতার দিক থেকে) এটা তোমাদের জন্যে উত্তম (পন্থা, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের এসব বলে দিচ্ছেন), যাতে করে তোমরা (কথাগুলো) মনে রাখতে পারো। ২৮. (ঘরের দরজায় গিয়ে) যদি তোমরা কাউকে সেখানে না পাও, তাহলে সেখানে প্রবেশ করো না, যতোক্ষণ না তোমাদের (ঘরে ঢোকার) অনুমতি দেয়া হবে, যদি (কোনো অসুবিধার কথা জানিয়ে) তোমাদের বলা হয় তোমরা ফিরে যাও, তাহলে তোমরা অবশ্যই (বিনা দ্বিধায়) ফিরে যাবে, এটা তোমাদের জন্যে উত্তম; তোমরা (যখন) যা কিছু করো, আল্লাহ তায়ালা সে সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত থাকেন। ২৯. তবে যেসব ঘরে কেউ বসবাস করে না, যেখানে তোমাদের কোনো মাল সামানা রয়েছে, তেমন কোনো ঘরে প্রবেশে তোমাদের কোনো পাপ নেই; (কেননা) আল্লাহ তায়ালা জানেন যা কিছু তোমরা প্রকাশ করো আবার যা কিছু তোমরা গোপন করো। ৩০. (হে নবী,) তুমি মোমেন পুরুষদের বলো, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে (নিম্নগামী ও) সংযত করে রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানসমূহকে হেফাযত করে; এটাই (হচ্ছে) তাদের জন্যে উত্তম পন্থা; (কেননা) তারা (নিজেদের চোখ ও লজ্জাস্থান দিয়ে) যা করে, আল্লাহ তায়ালা সে সম্পর্কে পূর্ণাংগভাবে অবহিত রয়েছেন। ৩১. (হে নবী, একইভাবে) তুমি মোমেন নারীদেরও বলো, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নিম্নগামী করে রাখে এবং নিজেদের লজ্জাস্থানসমূহের হেফাযত করে, তারা যেন তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন করে না বেড়ায়, তবে

زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ ۖ وَلَا
يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَآئِهِنَّ اَوْ اٰبَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ
اَبْنَآئِهِنَّ اَوْ اَبْنَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ
اَخَوٰتِهِنَّ اَوْ نِسَآئِهِنَّ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِ التّٰبِعِيْنَ غَيْرِ اُولِي
الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَآءِ ۖ
وَلَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ ۚ وَتُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ
جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٣١﴾ وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ
وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَآئِكُمْ ۚ اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ
فَضْلِهٖ ۚ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿٣٢﴾ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ نِكَاحًا

তার (শরীরের) যে অংশ (এমনিই) খোলা থাকে (তার কথা আলাদা), তারা যেন তাদের বক্ষদেশ মাথার কাপড় দ্বারা আবৃত করে রাখে, তারা যেন তাদের স্বামী, তাদের পিতা, তাদের শ্বশুর, তাদের ছেলে, তাদের স্বামীর (আগের ঘরের) ছেলে, তাদের ভাই, তাদের ভাইর ছেলে, তাদের বোনের ছেলে, তাদের (সচরাচর মেলামেশার) মহিলা, নিজেদের অধিকারভুক্ত সেবিকা দাসী, নিজেদের অধীনস্থ (এমন) পুরুষ যাদের (মহিলাদের কাছ থেকে) কোনো কিছুই কামনা করার নেই, কিংবা এমন শিশু যারা এখনো মহিলাদের গোপন অংগ সম্পর্কে কিছুই জানে না– (এসব মানুষ ছাড়া তারা যেন) অন্য কারো সামনে নিজেদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে, (চলার সময়) যমীনের ওপর তারা যেন এমনভাবে নিজেদের পা না রাখে– যে সৌন্দর্য তারা গোপন করে রেখেছিলো তা (পায়ের আওয়াযে) লোকদের কাছে জানাজানি হয়ে যায়; হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, (ত্রুটি বিচ্যুতির জন্যে) তোমরা সবাই আল্লাহর দরবারে তাওবা করো, আশা করা যায় তোমরা নাজাত পেয়ে যাবে। ৩২. তোমাদের মধ্যে যাদের স্ত্রী নেই, তোমরা তাদের বিয়ের ব্যবস্থা করো, (একইভাবে) তোমাদের দাস-দাসীদের মধ্যে যারা ভালো মানুষ তাদেরও (বিয়ে শাদীর ব্যবস্থা করো); যদি তারা অভাবী হয়, (তাহলে) আল্লাহ তায়ালা (অচিরেই) তাঁর অনুগ্রহ দিয়ে তাদের অভাবমুক্ত করে দেবেন; আল্লাহ তায়ালা প্রাচুর্যময় ও সর্বজ্ঞ, ৩৩. যাদের বিয়ে (করে ব্যয়ভার বহন) করার সামর্থ নেই, আল্লাহ তায়ালা তাদের নিজ অনুগ্রহে

حَتّٰى يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۗ وَالَّذِيْنَ يَبْتَغُوْنَ الْكِتٰبَ مِمَّا مَلَكَتْ
اَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوْهُمْ اِنْ عَلِمْتُمْ فِيْهِمْ خَيْرًا ۖ وَّاٰتُوْهُمْ مِّنْ مَّالِ اللّٰهِ
الَّذِيْٓ اٰتٰىكُمْ ۗ وَلَا تُكْرِهُوْا فَتَيٰتِكُمْ عَلَى الْبِغَآءِ اِنْ اَرَدْنَ تَحَصُّنًا
لِّتَبْتَغُوْا عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُّكْرِهْهُّنَّ فَاِنَّ اللّٰهَ مِنْۢ بَعْدِ
اِكْرَاهِهِنَّ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٣٣﴾ وَلَقَدْ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكُمْ اٰيٰتٍ مُّبَيِّنٰتٍ وَّمَثَلًا مِّنَ
الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿٣٤﴾

অভাবমুক্ত না করা পর্যন্ত তারা যেন সংযম অবলম্বন করে; তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস দাসীদের ভেতর যারা (মুক্তির কোনো অগ্রিম লিখিত) চুক্তি লিখিয়ে নিতে চায়, তোমরা তাদের তা লিখে দাও, যদি তোমরা তাদের (এ চুক্তির) মধ্যে কোনো ভালো (সম্ভাবনা) বুঝতে পারো, (তাহলে) আল্লাহ তায়ালা তোমাদের যে সম্পদ দান করেছেন তা থেকে তাদের মুক্তির সময় (মুক্তহস্তে) দান করবে; তোমাদের অধীনস্থ দাসীদের যারা সতী সাধ্বী থাকতে চায়, নিছক পার্থিব ধন সম্পদের আশায় কখনো তাদের ব্যভিচারের জন্যে বাধ্য করো না; যদি তোমাদের কেউ তাদের (এ ব্যাপারে) বাধ্য করে, (তাহলে তারা যেন আল্লাহ তায়ালার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, কারণ) তাদের এ বাধ্য করার পরেও (তাওবাকারীদের প্রতি) আল্লাহ তায়ালা (হামেশাই) ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। ৩৪. (হে মোমেনরা,) আমি তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ নাযিল করেছি, আরো উদাহরণ (হিসেবে) পেশ করেছি তোমাদের আগে (দুনিয়া থেকে) চলে গেছে তাদের (ঘটনাগুলো), পরহেযগার লোকদের জন্যে (তা হচ্ছে শিক্ষণীয়) উপদেশ।

তাফসীর

আয়াত ২৭-৩৪

আমরা ইতিপূর্বে বলেছি যে, ইসলাম তার ঈপ্সিত পরিচ্ছন্ন ও সৎ সমাজ গড়ার ব্যাপারে কেবল শাস্তির ওপরই নির্ভর করে না, বরঞ্চ সব কিছুর আগে সে নির্ভর করে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার ওপর। ইসলাম মানুষের স্বভাবগত চাহিদাকে প্রতিহত করে না, তবে এগুলোকে সুশৃংখল ও পরিশীলিত করে এবং এগুলোর জন্যে এমন পরিচ্ছন্ন পরিবেশ নিশ্চিত করে যেখানে কোনো কৃত্রিম উত্তেজনা সৃষ্টিকারী উপকরণ থাকবে না।

এ ক্ষেত্রে ইসলামী প্রশিক্ষণ পদ্ধতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো, বিপথগামিতার সুযোগ যতো দূর পারা যায় সংকীর্ণ করতে হবে, খারাপ পথে ঠেলে দেয় এমন উপকরণগুলোকে দূর করতে হবে এবং যৌন আবেগকে উস্কে দেয় এমন উপকরণ যাতে সমাজে প্রবেশ করতে না পারে, তার ব্যবস্থা করতে হবে। সেই সাথে স্বাভাবিকভাবে এবং শরীয়ত সম্মত পরিচ্ছন্ন পন্থায় যৌন চাহিদা পূরণের পথের সকল বাধাও দূর করতে হবে।

এ কারণেই ইসলাম মুসলমানদের বাড়ী ঘরকে এতোটা পবিত্র ও সুরক্ষিত করেছে যে, সে কাউকে তার পবিত্রতাকে লংঘন করার অনুমতিই দেয় না। অনুমতি না নিয়ে কোনো আগন্তুকের অতর্কিতে অন্যের গৃহে প্রবেশ করাকেও অনুমতি দেয় না। এভাবে গৃহবাসীর অজান্তে তাদের

গোপনীয় জিনিস ও আবরনীয় অংগে কারো দৃষ্টি পড়ার আশংকা থাকে না। এর পাশাপাশি মুসলিম নারী পুরুষের দৃষ্টি সংযত করা এবং যৌন কামনা বাসনাকে উস্কে দেয়ার মতো সাজ-গোজ করে বেপর্দাভাবে ঘোরাফেরা করা থেকে বিরত থাকার বিধানও বলবৎ রয়েছে।

একই উদ্দেশ্যে দরিদ্র নারী ও পুরুষের বিয়ে সহজ করার বিধানও চালু রয়েছে ইসলামে। কেননা ব্যাভিচার প্রতিরোধের প্রকৃত নিশ্চয়তা নিহিত রয়েছে বিয়ের ব্যবস্থায়। অনুরূপভাবে, দাসীবাঁদীদেরকে দেহ ব্যবসায় নিয়োগ করতেও নিষেধ করা হয়েছে, যাতে করে এই অপরাধ সমাজে সহজ সাধ্য হয়ে যেতে না পারে।

কারো ঘরে প্রবেশের অনুমতি নেয়ার গুরুত্ব

এবার ইসলামের প্রতিরোধ ব্যবস্থাগুলোর ওপর বিস্তারিতভাবে দৃষ্টি দেয়া যাক।

'হে মোমেনরা, তোমরা অন্যদের বাড়ীতে প্রবেশ করো না গৃহবাসীর অনুমতি না নিয়ে ও তাদেরকে সালাম না দিয়ে। ...... (আয়াত ২৭-২৮)

আল্লাহ তায়ালা গৃহকে আশ্রয়স্থল বানিয়েছেন। মানুষ বাইরের কাজ কর্ম সেরে বিশ্রামের জন্যে নিজের বাড়ীতে ফিরে আসে। তখন তাদের মন তৃপ্ত ও নিশ্চিন্ত হয় এবং নিজেদের গোপনীয়তা ও সম্ভ্রমের নিরাপত্তা সম্পর্কে আশ্বস্ত হয়। বাইরে সতর্কতা ও সচেতনতার যে চাপ তার স্নায়ুকে ভারাক্রান্ত করে রাখে। বাড়ী এসে তা ঝেড়ে ফেলে সে হাপ ছেড়ে বাঁচে। বাড়ী যদি এতোটা নিরাপদ ও সুরক্ষিত আশ্রয়স্থল না হতো যে, বাড়ীর অধিবাসীদের অনুমতি ছাড়াই যে কেউ সেখানে ঢুকে পড়তে পারে, তাহলে তা এরূপ তৃপ্তিকর জায়গায় পরিণত হতো না।

বিনা অনুমতিতে অপরের বাড়ীতে প্রবেশের ফল দাঁড়ায় এই যে, আকস্মিকভাবে কোনো গোপনীয় ও অবাঞ্ছিত দৃশ্য চোখে পড়ে যেতে পারে, কোনো আপত্তিকর ও কামোত্তেজনা সৃষ্টিকারী ব্যাপারও দৃষ্টিগোচর হয়ে যেতে পারে এবং অনিচ্ছাকৃত আকস্মিক দৃষ্টিপাত একাধিকবার হয়ে তা ইচ্ছাকৃত দৃষ্টিপাতে রূপান্তরিত হয়ে বিপথগামীতার সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে। অতপর ক্রমশ তা পাপাচারমূলক ও অবৈধ সম্পর্কেরও জন্ম দিতে পারে।

জাহেলী যুগে এরূপ রীতি প্রচলিত ছিলো যে, একজন আরব অতর্কিতে অন্যের বাড়ীতে ঢুকে পড়তো এবং বলতো, 'ঢুকে পড়েছি!' এভাবে কখনো কখনো গৃহকর্তাকে স্বীয় স্ত্রীর সাথে এমন অবস্থায় দেখতে পেতো যা অন্য কারো দেখা উচিত নয়, অথবা নারী বা পুরুষকে নগ্ন কিংবা দেহের গোপনীয় অংশ অনাবৃত অবস্থায় দেখতে পেতো। এটা গৃহকর্তার জন্যে বিব্রতকর ও কষ্টদায়ক হতো এবং গৃহের নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা বিঘ্নিত হতো। তা ছাড়া উত্তেজনাকর দৃশ্য বহিরাগতদের চোখে পড়ার কারণে জায়গায় জায়গায় গোলযোগ ও উচ্ছৃংখলতার ঘটনাও ঘটতো।

এ সব কারণেই আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদেরকে এই উঁচুমানের আদব তথা ভদ্র আচরণ শিক্ষা দিয়েছেন যে, অন্যের বাড়ীতে প্রবেশের আগে গৃহবাসীর কাছে থেকে অনুমতি নিতে হবে, তাদেরকে সালাম দিয়ে তাদেরকে আপন করে নিতে হবে এবং তাদের মন থেকে বিরূপ মনোভাব দূর করতে হবে,

'হে ঈমানদাররা! তোমরা অন্যের বাড়ীতে ততোক্ষণ প্রবেশ করো না যতোক্ষণ না সে বাড়ীর অধিবাসীদের অনুমতি গ্রহণ ও তাদেরকে সালাম করো। ....'

লক্ষণীয় বিষয় এই যে, এখানে অনুমতি গ্রহণ বুঝানোর জন্যে 'ইসতেনাস' শব্দটা ব্যবহার করা হয়েছে, যার ধাতুগত অর্থ দাঁড়ায়, 'বন্ধুসুলভ অভ্যর্থনা পাওয়া, ঘনিষ্ঠ হওয়া, আন্তরিকতা সহকারে অভ্যর্থনা পাওয়া, আপন হওয়া বা করা, পোষ মানানো, বিনীত হওয়া, বশীভূত হওয়া,

ইত্যাদি। অর্থাৎ শুধু অনুমতি গ্রহণের আনুষ্ঠানিকতা নয়, বরং আন্তরিকভাবে ও বন্ধুসুলভ মনোভাব নিয়ে অভ্যর্থনা জানানো চাই, এ দ্বারা সচ্ছন্দে ও সাদরে অনুমতি দান এবং আগন্তুকের ভদ্রজনোচিতভাবে আগমন ও অনুমতি প্রার্থনাও বুঝায়, যা গৃহবাসীর মনে তার প্রতি স্বতস্ফূর্ত সহৃদয়তা ও অভ্যর্থনার মানসিক প্রস্তুতি জন্মায়। এভাবে যে বিষয়টির দিকে অত্যন্ত সুক্ষ্মভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে তা এই যে, আগন্তুক অতিথিকে অন্যের বাড়ীতে প্রবেশের আগে বাড়ীওয়ালার মানসিক অবস্থা, সাংসারিক অবস্থা ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট সেসব অত্যাবশ্যকীয় বিষয়কে বিচেনায় আনতে হবে, যা দিনে কিংবা রাতে আগত অতিথির সামনে প্রকাশ পাক এটা বাড়ীওয়ালা পছন্দ করে না বা প্রকাশ পেলে কিছুটা বিব্রত বোধ করে।

অনুমতি চাওয়ার পর দু'রকম অবস্থা দেখা দিতে পারে, বাড়ীর অধিবাসীরা কেউ বাড়ীতে নেই অথবা আছে। যদি কেউ না থাকে, তাহলে সাড়াশব্দ না পাওয়া সত্তেও অনুমতি চাওয়ার পরই ঢুকে পড়া জায়েয নয়। কেননা অনুমতি প্রাপ্তি ছাড়া প্রবেশ বৈধ নয়।

'যদি সেসব বাড়ীতে তোমরা কাউকে না পাও, তাহলে অনুমতি না পাওয়া পর্যন্ত প্রবেশ করো না।'

আর যদি অধিবাসীদের কেউ বাড়ীতে থেকে থাকে এবং অনুমতি না দেয়, তাহলেও প্রবেশ করা যাবে না। কেননা অনুমতি চাইলেই প্রবেশ বৈধ হয়ে যায় না। অনুমতি না দিলে অপেক্ষা করা ও ধর্ণা দিয়ে পড়ে থাকার পরিবর্তে ফিরে যাওয়া কর্তব্য। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'আর যদি তোমাদেরকে বলা হয়, 'ফিরে যাও,' তাহলে তোমরা ফিরে যাবে। এটাই তোমাদের জন্যে উত্তম।'

অর্থাৎ কোনো রকম অপমান বোধ বা কুণ্ঠাবোধ না করে এবং বাড়ীওয়ালা খারাপ ব্যবহার করলো বা ঘৃণা ও অবজ্ঞা প্রকাশ করলো ইত্যাদি না ভেবে সরাসরি ফিরে যাওয়া উচিত। কেননা মানুষের অনেক অজানা সমস্যা, অসুবিধা বা ওযর আপত্তি থাকতেই পারে। মানুষের নিত্য নৈমিত্তিক সমস্যা ও পরিস্থিতি বিবেচনা করে তাদেরকে বিব্রত না করে একাকী থাকতে দেয়া উচিত।

'আর তোমরা যা কিছুই করো, আল্লাহ তায়ালা সে সম্পর্কে অবগত।'

অর্থাৎ মানুষের মনের যাবতীয় গোপন অবস্থা এবং যাবতীয় আবেগ ও উত্তেজনা সম্পর্কে তিনি অবহিত।

পক্ষান্তরে যে সমস্ত ঘর বাড়ীতে সব সময় লোকজন বসবাস করে না, যেমন হোটেল, মটেল ও অতিথিশালা ইত্যাদি, সেগুলোতে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ দূষণীয় নয়। কেননা অতিথিদের কষ্ট লাঘবের জন্যে প্রবেশ অপরিহার্য। আর যে যে কারণে অনুমতি গ্রহণ জরুরী, তা এখানে অনুপস্থিত।

'যেসব ঘর বাড়ীতে কেউ বাস করে না, কিন্তু তোমাদের জিনিসপত্র রয়েছে, সেগুলোতে তোমাদের প্রবেশে আপত্তি নেই। আল্লাহ তায়ালা জানেন তোমরা যা কিছু গোপন করো এবং যা কিছু প্রকাশ করো।'

বস্তুত সমগ্র ব্যাপারটা মানুষের গোপন ও প্রকাশ্য উভয় অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহর অবগত থাকা ও উভয় অবস্থা তাঁর নিয়ন্ত্রণে থাকার ওপরই নির্ভরশীল। এই নিয়ন্ত্রণ ও অবগতিই হৃদয়ের আনুগত্য ও উল্লেখিত উন্নতমানের ভদ্র আচরণ নিশ্চিত করে যার উল্লেখ আল্লাহ তায়ালা স্বীয় গ্রন্থে করেছেন। এই গ্রন্থই মানুষের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রের জন্যে বিধান দিয়ে থাকে।

বস্তুত কোরআন একটা পূর্ণাংগ জীবন বিধান। সমাজ জীবনের এই ক্ষুদ্র বিধানটা এতে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে সন্নিবেশিত হয়েছে। কেননা মানব জীবনের জন্যে মৌলিক ও খুঁটিনাটি উভয় প্রকারের জরুরী নিয়ম বিধি বর্ণনা করা তার আওতাভুক্ত। কেননা সে তার মৌলিক চিন্তাধারা ও খুঁটিনাটি বিধির মাঝে সমন্বয় বিধান করতে চায়। অন্যের বাড়ীতে প্রবেশের আগে অনুমতি গ্রহণের কড়াকড়ি ও বাধ্যবাধকতা সে সব গৃহের নিরাপত্তা ও পবিত্রতা নিশ্চিত করে। আর এই নিরাপত্তা ও পবিত্রতা নিশ্চিত হওয়ার ফলেই মানুষের বাড়ী ঘর বসবাসের যোগ্য হয়েছে, এর অধিবাসীরা আকস্মিক জনসমাগমজনিত সমস্যা থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছে এবং তাদের আভ্যন্তরীণ ও গোপনীয় বিষয়গুলো নিয়ে যখন তখন বিব্রত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। মানুষের আভ্যন্তরীণ ও গোপনীয় বিষয় শুধু যে শরীরের সাথে সংশ্লিষ্ট তা নয়, বরং পোশাক পরিচ্ছদ, খাদ্য দ্রব্য ও আসবাবপত্রের সাথেও এর সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। যে কোনো বাড়ীর অধিবাসীদের জন্যে এটা অবাঞ্ছিত, অরুচিকর ও বিব্রতকর বোধ হওয়া বিচিত্র নয় যে, কোনো অতিথি আকস্মিকভাবে বাড়ীর ভেতরে প্রবেশ করে তাদের দ্রব্য সামগ্রীকে অগোছালো অপরিপাটি ও অপরিষ্কার অবস্থায় দেখে ফেলুক। তা ছাড়া গৃহবাসীর মানসিক অবস্থা ও ভাবাবেগেরও গোপনীয়তা থাকতে পারে। যেমন আমাদের অনেকেই এমন স্পর্শকাতর রুচির অধিকারী থাকতে পারে যে, সে বাড়ীর ভেতরে কোনো ভাবাবেগের বশবর্তী হয়ে কান্নাকাটি করছে, কিংবা কোনো উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনায় কারো ওপর ক্রোধান্বিত হয়ে আছে অথবা কোনো কারণে বেদনায় কাতর হয়ে ছটফট করছে, অথচ এসব দৃশ্য বা এর কারণ সে কোনো বহিরাগতকে দেখতে বা জানতে দিতে ইচ্ছুক নয়।

এসব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ও ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রেখে কোরআন এই উচ্চাংগের আচরণবিধি তথা অনুমতি ছাড়া অন্যের গৃহে প্রবেশে কড়াকড়ি সম্বলিত বিধি রচনা করেছে। সেই সাথে আকস্মিক দৃষ্টি বিনিময়ের ও দেখা-সাক্ষাতের সুযোগ যাতে কম হয়, সেদিকেও দৃষ্টি দিয়েছে। কেননা এগুলো অনেক সময় মানুষের মনের সুপ্ত কামনা-বাসনাকে জাগিয়ে তোলে, এ থেকে অনেক অবাঞ্ছিত সম্পর্ক ও সংযোগের সৃষ্টি হয় এবং শয়তান এ সবের সুযোগ গ্রহণ করে নানা স্থানে নানা রকমের ফেতনা-ফাসাদের জন্ম দিয়ে থাকে।

এ আয়াতগুলো নাযিল হবার সময়ই মুসলমানরা এই সূক্ষ্ম সমস্যাগুলোকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। সবার আগে উপলব্ধি করেছিলেন স্বয়ং রসূল (স.)।

আবু দাউদ ও নাসায়ী শরীফে বর্ণিত হাদীসে হযরত সা'দ বিন ওবাদার ছেলে কায়েস বর্ণনা করেন যে, একবার রসূল (স.) আমাদের বাড়ীতে এসে 'আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ' বলে দরজায় করাঘাত করলেন। সা'দ অস্ফুট স্বরে জবাব দিলেন এবং অনুমতি দিলেন না। কায়েস বলেন, আমি বললাম, আপনি কি রসূল (স.)-কে বাড়ীতে প্রবেশের অনুমতি দিচ্ছেন না? সা'দ বললেন, একটু অপেক্ষা করো। তাঁকে আমাদের ওপর বেশী করে সালাম দেয়ার সুযোগ দাও।' কিছুক্ষণ পর রসূল (স.) পুনরায় বললেন, 'আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ।' এবারও সা'দ অস্ফুট স্বরে সালামের জবাব দিলেন এবং অভ্যর্থনা না জানিয়ে চুপচাপ বসে রইলেন। রসূল (স.) আবারো বললেন, 'আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।' এবারও বাড়ীর ভেতর থেকে কোনো সাড়া না পেয়ে রসূল (স.) ফিরে চললেন। সা'দ তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে এলেন এবং রসূল (স.)-এর পিছু পিছু চললেন। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রসূল, আমি আপনার প্রতিটি সালাম শুনছিলাম ও চুপিসারে তার জবাব দিচ্ছিলাম, যাতে আপনি আমাদের ওপর আরো বেশী করে

সালাম দিতে থাকেন।' এ কথা শুনে রসূল (স.) সা'দের সাথে তার বাড়ীর দিকে ফিরে চললেন। সা'দ রসূল (স.)-এর গোছলের ব্যবস্থা করলেন। গোছলের পর তাঁকে জাফরান রঞ্জিত একটা পশমী পোশাক-'খুমাইসা' পরতে দিলেন। অতপর রসূল (স.) হাত তুলে দোয়া করলেন, 'হে আল্লাহ, সা'দের পরিবার পরিজনের ওপর তোমার রহমত ও অনুগ্রহ বর্ষণ করো।'

আবু দাউদে বর্ণিত অপর একটা হাদীসে আবদুল্লাহ ইবনে বিশর বর্ণনা করেন যে, রসূল (স.) কারো বাড়ীতে গেলে দরজার মুখের ওপর গিয়ে দাঁড়াতেন না বরং দরজার ডান কোণে বা বাম কোণে দাঁড়াতেন এবং উচ্চ স্বরে বলতেন, 'আস্ সালামু আলাইকুম, আস সালামু আলাইকুম।' কেননা তৎকালে দরজায় কোনো পর্দা টানানো থাকতো না। তাই দরজার মাঝখানে দাঁড়ালে বাড়ীর ভেতরে দৃষ্টি চলে যেতো।

আবু দাউদে আরো বর্ণিত আছে যে, একবার এক ব্যক্তি এসে রসূল (স.)-এর বাড়ীর দরজার ওপর দাঁড়িয়ে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি চাইতে লাগলো। রসূল (স.) তাকে বললেন, এভাবে দাঁড়াও অথবা এভাবে। (অর্থাৎ দরজার ডান কোণে বা বাম কোণে) কেননা দৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্যেই অনুমতি প্রার্থনা করা হয়ে থাকে।'

সহীহ বোখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, রসূল (স.) বলেছেন, কেউ যদি তোমার বাড়ীতে উঁকি ঝুঁকি মারে, তাহলে তুমি যদি তাকে পাথর মেরে চোখ ফুটো করে দাও, তাহলেও তোমার কোনো দোষ হবে না।

আবু দাউদে বর্ণিত আছে যে, বনু আমের গোত্রের এক ব্যক্তি এসে রসূল (স.)-এর বাড়ীতে প্রবেশের অনুমতি চাইলো। রসূল (স.) তখন বাড়ীতেই ছিলেন। সে বললো, আমি কি ভেতরে আসতে পারি? রসূল (স.) তখন বাড়ীতেই ছিলেন। সে বললো, আমি কি ভেতরে আসতে পারি? রসূল (স.) স্বীয় ভৃত্যকে বললেন, তুমি আগন্তুকের কাছে যাও এবং তাকে অনুমতি চাওয়ার পদ্ধতি শিখিয়ে দাও। তাকে বলো, তুমি বলো, 'আসসালামু আলাইকুম, আমি কি ভেতরে আসতে পারি?' লোকটি পদ্ধতিটা শিখে নিয়ে বললো, 'আসসালামু আলাইকুম, আমি কি ভেতরে আসতে পারি?' তখন রসূল (স.) তাকে অনুমতি দিলেন এবং সে প্রবেশ করলো।

মোজাহেদ বর্ণনা করেন যে, ইবনে ওমর কোনো একটা প্রয়োজনে ফুসতাতে এক কোরেশী মহিলার কাছে এসেছিলেন। রৌদ তপ্ত পথ দিয়ে হেঁটে আসতে তার বেশ কষ্ট হয়েছিলো। তথাপি তিনি কোনো তাড়াহুড়ো না করে শান্তভাবে বললেন, আসসালামু আলাইকুম, আমি কি ভেতরে আসতে পারি? মহিলা বললো, শান্তির সাথে প্রবেশ করুন। ইবনে ওমর পুনরায় অনুমতি চাইলেন এবং সে মহিলাও আগের জবাবের পুনরাবৃত্তি করলেন। এই সময়ে ইবনে ওমর বাইরেই পায়চারি করতে লাগলেন। তিনি তৃতীয়বার বললেন, বলুন, আমি ভেতরে আসতে পারি? মহিলা বললেন, ভেতরে আসুন। অতপর ইবনে ওমর ভেতরে প্রবেশ করলেন।

আতা ইবনে আবি রাবাহ হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন যে, আমি জিজ্ঞেস করলাম, আমার কিছু এতিম বোন রয়েছে, যারা আমার সাথেই লালিত পালিত হয়েছে এবং আমরা একই বাড়ীতে থাকি। তাদের কাছে যেতেও কি আমার অনুমতি নেয়া প্রয়োজন? তিনি বললেন, হা। আমি আবারও তাকে জিজ্ঞেস করলাম, যাতে আমাকে অনুমতি দেন। কিন্তু তিনি অনুমতি দিলেন না। তিনি বললেন, তুমি কি তাদেরকে উলংগ দেখতে চাও? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, তাহলে অনুমতি নিয়ে প্রবেশ করো। আমি আবারও তাঁর মতামত জানতে চাইলাম।

তিনি বললেন, তুমি কি আল্লাহর আদেশ মানতে চাও? আমি বললাম হাঁ। তিনি বললেন, তাহলে অনুমতি নিয়ে প্রবেশ করো।

সহীহ বোখারীতে বর্ণিত হয়েছে যে, রসুল (স.) গভীর রাতে নিজ পরিবারের কাছে উপস্থিত হয়ে তাদেরকে বিব্রত করতে নিষেধ করেছেন।

অপর এক হাদীসে আছে যে, রসূল (স.) দিনের বেলায় মদিনায় উপস্থিত হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তৎক্ষণাত ভেতরে প্রবেশ না করে মদিনার উপকণ্ঠে যাত্রা বিরতি করেন এবং নিজের সফরসংগীদেরকে বলেন, তোমরা অপেক্ষা করো, আমরা দিনের শেষ ভাগে শহরে প্রবেশ করবো, যাতে তার অধিবাসীরা নিজেদের সাজগোছ পরিপাটি ও পরিচ্ছন্ন করার সুযোগ পায়।

রসূল (স.) ও সাহাবায়ে কেরামের অনুভূতি যে এতোখানি তীব্র ও সংবেদনশীল হয়েছিলো তার কারণ এই যে, স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা তাঁদেরকে এরূপ উন্নতমানের আচরণ পদ্ধতি শিখিয়েছিলেন।

অথচ আজ আমরা মুসলমান হওয়া সত্তেও এ ধরনের সূক্ষ্ম বিষয়ে আমাদের অনুভূতি ভোতা হয়ে গেছে। আমাদের মধ্যকার কোনো ব্যক্তি তার কোনো আত্মীয় বা পরিচিত ব্যক্তির কাছে দিনের বা রাতের যে কোনো প্রহরে ও যে কোনো মুহূর্তে অতর্কিতে অতিথি হতে কিছুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করে না, একবার অতিথি হয়ে এলে আর বিদায় হবার নামটিও মুখে আনি না। যতোক্ষণ বাড়ীওয়ালা বিরক্ত হয়ে বিদায় না দেয়, ততোক্ষণ যেতেই চায় না। অনেকের বাসায় টেলিফোন থাকে। কারো বাড়ীতে যাওয়ার আগে টেলিফোনের মাধ্যমে অনুমতি চাওয়ার সুযোগ থাকে। এতে করে তাৎক্ষণিকভাবে অনুমতি পাওয়া যেতে পারে, আবার সময়টা অনুপযোগী এই ওজুহাতে তা বিলম্বিতও হতে পারে। অথচ আমরা এর কোনো তোয়াক্কা না করে সময় অসময় বিবেচনা না করে যখন তখন আমাদের আত্মীয়স্বজনের ঘাড়ে সওয়ার হই। তারপর প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় এমন রীতিও চালু নেই যে, গৃহস্থ এরূপ অতর্কিত অতিথির আগমনে বিরক্ত হলে আগন্তুক ফিরে যাবে।

আমরা এমন মুসলমান যে, ঠিক খাওয়া দাওয়ার সময়েও যে কোনো আত্মীয়স্বজনের বাড়ীতে হাযির হয়ে যাই। গৃহস্থ যদি খাবার না দেয় তবে তাতেও অসন্তুষ্ট হই। কখনো বা রাতের বেলা হাযির হয়ে যাই এবং গৃহস্থ যদি রাতে থাকতে না বলে তবে অসন্তুষ্ট হই। তাদের সুবিধা অসুবিধার কোনো তোয়াক্কা করি না।

এর কারণ এই যে, আমরা ইসলামী রীতিনীতির অনুশীলন করতে অভ্যস্ত হইনি। রসূলের শিক্ষাকে আমরা নিজেদের খেয়াল খুশীর উর্ধে স্থান দিতে প্রস্তুত নই। আমরা নিছক একটা ভ্রান্ত সমাজ ব্যবস্থার দাসে পরিণত হয়ে গিয়েছি, যার সপক্ষে আল্লাহ তায়ালা কোনো প্রমাণ নাযিল করেননি।

অথচ অমুসলিমদের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই, তারা ইসলামী রীতিনীতির অনেকটা কাছাকাছি রীতিনীতি অনুসরণ করে। তাদের রীতিনীতি আমাদেরকে অনেক সময় মুগ্ধ করে। আর আমরা নিজেদের আসল দ্বীন সম্পর্কে জানতে চেষ্টা করি না। যদি তা করতাম তাহলে তার দিকে ফিরে গিয়েই আমরা সাচ্ছন্দ ও তৃপ্তি অনুভব করতাম।

অন্যের বাড়ীতে প্রবেশ করার আগে অনুমতি গ্রহণের বাধ্যবাধকতা সংক্রান্ত ইসলামী আচরণ নিয়ে আলোচনা এখানে শেষ করা হয়েছে। এটা শুধু যে একটা সুসভ্য নৈতিক আচরণ তা নয়, বরং ভাবাবেগ ও মনমানসিকতাকে পবিত্র করা ও পবিত্র রাখা এবং এ ক্ষেত্রে বিশৃংখলা ও অরাজকতার উপকরণগুলো থেকে সমাজকে রক্ষা করার নিশ্চয়তা দানকারী একটা নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাও বটে।

চারিত্রিক বিকৃতি রোধে কোরআনের কর্মসূচী

এরপর চলাচলের পথে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী সেই আপদটি নিয়ে আলোচনা শুরু করা হচ্ছে, যা দৃষ্টি ও চলাচলের মধ্য দিয়ে বিপথগামিতায় প্ররোচিত করে। আল্লাহ বলেন,

'তুমি মোমেন পুরুষদেরকে বলে দাও, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানকে হেফাযত করে ......। (আয়াত ৩০-৩১)

ইসলাম এমন একটা পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চায়, যেখানে সর্বক্ষণ যৌন উত্তেজনা সৃষ্টি করা হয় না এবং সর্বক্ষণ যৌন ভাবাবেগকে উদ্দীপিত করার কার্যক্রম চালু থাকে না। কেননা অব্যাহত যৌন সুড়সুড়িমূলক তৎপরতা সমাজে এমন কামোন্মাদনা সৃষ্টি করে, যা কখনো প্রশমিত ও পরিতৃপ্ত হয় না। কুদৃষ্টি নিক্ষেপ, উত্তেজনা সৃষ্টিকারী ভংগিতে চলাফেরা, সৌন্দর্য প্রদর্শন করে চলা এবং নগ্নতা এর কোনোটাই পাশবিক কামোন্মত্ততা সৃষ্টি করা ছাড়া আর কোনো সুফল বয়ে আনে না। মানুষের আত্মসংযমের ক্ষমতাকে বিনষ্ট করে দেয়াই হচ্ছে এগুলোর একমাত্র স্বার্থকতা। আত্মসংযমের এই ক্ষমতাকে নষ্ট করে দেয়ার পর যদি অবাধ যৌনাচারের সুযোগ দেয়া হয়, তাহলে সেটা হবে সমাজকে এক উদ্দাম উচ্ছৃংখলতা, বেলেল্লাপনা ও নৈরাজ্যের মধ্যে নিক্ষেপ করার শামিল। আর উত্তেজিত করার পর যদি কঠোর দমন নীতি অবলম্বন করা হয়, তাহলে স্নায়বিক রোগ ও মানসিক বৈকল্য দেখা দেয়া অবশ্যম্ভাবী। এই শেষোক্ত ব্যাপারটা হবে এক ধরনের নির্যাতনমূলক কার্যক্রম।

যৌন আবেগকে প্ররোচিত ও উত্তেজিত করার এ জাতীয় তৎপরতা প্রতিহত করা, নর নারীর স্বাভাবিক যৌন আবেগকে সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে বহাল রাখা এবং কোনো কৃত্রিম উপায়ে তাকে উস্কে না দিয়ে তার পবিত্র ও নিরাপদ প্রয়োগ অব্যাহত রাখার ব্যবস্থা করাই ইসলামের পরিচ্ছন্ন সমাজ গড়ার অন্যতম কর্মপন্থা।

এক সময়ে বলা হতো যে নরনারীর অবাধ দৃষ্টি বিনিময়, নিয়ন্ত্রণহীন আলাপ ও ভাবের আদান প্রদান, অবাধ মেলামেশা, পরস্পরের গোপনীয় অংগ প্রত্যংগ সম্পর্কে অবগতি, ও নর নারীর মধ্যে অবাধ যোগাযোগ ইত্যাদি তাদের সম্পর্ককে স্বাভাবিকতা ও স্বাচ্ছন্দ দান করে, তাদের অবরুদ্ধ কামনা বাসনাগুলোকে স্বাধীন ও মুক্ত করে, মানসিক পীড়ন ও মনস্তাত্বিক জটিলতা থেকে রক্ষা করে, যৌন উৎপীড়ন ও চাপজনিত উত্তাপ ও উত্তেজনাকে প্রশমিত করে এবং অন্যান্য অবাঞ্ছিত দৈহিক ও মানসিক চাপ থেকে মুক্ত করে।

নর নারীর সম্পর্ককে অবাধ ও বল্গাহীন করার স্বপক্ষে এই প্রচারণা ফ্রয়েড ও তাঁর সমমনা দার্শনিকদের রচিত বিভিন্ন মতবাদ প্রচারিত হবার ফলেই ব্যাপকতা লাভ করে। সেসব মতবাদের উদ্দেশ্য ছিল মানুষকে সেই সমস্ত গুণ বৈশিষ্ট্য থেকে বঞ্চিত করা, যা তাকে পশু থেকে পৃথক ও উন্নত এক প্রাণী হিসেবে চিহ্নিত করে। মানুষকে পুরোপুরি পশুতে রূপান্তরিত করাই ছিলো সেসব মতবাদের একমাত্র লক্ষ্য। কিন্তু উল্লেখিত প্রচারণা নিছক তাত্বিক আন্দায অনুমান ছাড়া আর কিছু নয়। যেসব দেশে নর নারীর সম্পর্ক সবচেয়ে অবাধ, বল্গাহীন ও স্বেচ্ছাচারিতায় পূর্ণ এবং সব রকমের সামাজিক, নৈতিক, ধর্মীয় ও মানবীয় কড়াকড়ি বর্জিত, সেসব দেশে আমি স্বচক্ষে যা দেখেছি, তা সে প্রচারণাকে সম্পূর্ণ মিথ্যা ও অসার প্রতিপন্ন করে।

আমি সেসব দেশে প্রত্যক্ষ করেছি যে, নগ্নতা ও অবাধ মেলামেশা যতো রকমের ও যতো আকারের হতে পারে, তার সবই সেখানে বিদ্যমান এবং তাতে বিন্দুমাত্রও কোনো কড়াকড়ি ও বিধিনিষেধ নেই। কিন্তু এর ফলে যৌন আবেগ কিছুমাত্র পরিচ্ছন্ন ও পরিশীলিত হয়নি, বরং এর

ফলে যৌনতা আরো বল্গাহীন, উদ্দাম, অবাধ ও স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠেছে। এ উন্মত্ততা ও স্বেচ্ছাচারিতা কোনোক্রমেই শান্ত ও পরিতৃপ্ত তো হয়নি, উপরন্তু তা আরো উগ্র ও আরো তৃষ্ণার্ত রূপ ধারণ করেছে। যে সমস্ত মানসিক রোগ ও জটিলতা নিছক পর্দা প্রথার কারণে নারী সংগ লাভে ব্যর্থ ও বঞ্চিত থাকার কারণে সৃষ্ট হয় বলে মনে করা হতো। সেগুলো প্রচুর পরিমাণে দেখেছি। সেই সাথে সব ধরনের যৌন বিকৃতির হিড়িকও দেখেছি। এ সবই দেখা দিয়েছে সীমাহীন, বল্গাহীন ও অবাধ মেলামেশা ও প্রেম প্রণয়ের প্রত্যক্ষ ফল হিসাবে, যার উপস্থিতিতে কোনো কিছুই আর নিষিদ্ধ থাকে না। প্রকাশ্য রাস্তাঘাটে নগ্ন দেহের প্রদর্শনী, যৌন সুঁড়সুড়ি দানকারী কার্যকলাপ– যার বিস্তারিত বিবরণ দেয়ার অবকাশ এখানে নেই এবং অনুরূপ অন্যান্য উত্তেজক কর্মকান্ডই এ সব বিড়ম্বনার ফল। এ থেকে দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রমাণিত হয় যে, ফ্রয়েড ও তার সমমনাদের সে সব মতবাদ পুনর্বিবেচনা করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। কেননা চাক্ষুস বাস্তবতাই ওগুলোকে মিথ্যা ও ভ্রান্ত প্রমাণিত করেছে।

প্রাণীজগতের জন্ম ও বিকাশে নারী ও পুরুষের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ সহজাত ও মজ্জাগত। কেননা আল্লাহ তায়ালা এ পদ্ধতিতেই পৃথিবীতে জীবনের বিস্তার ও মানুষের খেলাফত বাস্তবায়িত করেছেন। নর নারীর এই পারস্পরিক টান ও আকর্ষণ একটা স্থায়ী জিনিস। স্বাভাবিকভাবে তা কখনো উত্তেজিত এবং কখনো প্রশমিত হয়ে থাকে। তাকে ক্রমাগতভাবে উত্তেজিত করতে থাকলে তার তেজ ও তীব্রতা বাড়তেই থাকে এবং তাকে দৈহিক মিলনের মাধ্যমে প্রশান্তি লাভের দিকে ঠেলে দেয়া হয়। কিন্তু সেই মিলন যখন সম্ভব হয় না, তখন উত্তেজিত স্নায়ূমন্ডলী অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এটা একটা সার্বক্ষণিক নির্যাতনে পর্যবসিত হয়।

যৌন উত্তেজনা নানাভাবে সৃষ্টি হয়। কখনো চাহনি দ্বারা, কখনো আচরণ দ্বারা, কখনো হাসি দ্বারা এবং কখনো কৌতুক ও রসিকতা দ্বারা এর সৃষ্টি হয়ে থাকে। কখনো বা আকর্ষণ প্রকাশকারী কথাবার্তা দ্বারাও এর সৃষ্টি হয়। এসব উত্তেজক উপকরণকে কমিয়ে রাখাই নিরাপদ, যাতে পারস্পরিক আকর্ষণ স্বাভাবিক সীমার মধ্যে থাকে এবং স্বাভাবিক চাহিদা পূরণ করে। এটাই সবচেয়ে বাস্তবসম্মত ও কল্যাণময় পথ। এর সাথে সাথে সে স্বভাব চরিত্রকে পরিশীলিতও করে এবং মানবীয় শক্তিকে শুধু রক্ত মাংসের চাহিদা পূরণের কাজে নিয়োজিত না করে জীবনের অন্যান্য কাজেও নিয়োজিত করে। ফলে শুধু যৌন চাহিদা পূরণই মানুষের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় না।

এ আয়াত দুটোতে নর নারী উভয়ের পক্ষ থেকে উত্তেজনা, প্ররোচনা ও বিকৃতির সুযোগ কিভাবে কমাতে হয়, তার কিছু নমুনা পেশ করা হয়েছে। যেমন,

'ঈমানদার পুরুষদেরকে বলো, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে ও লজ্জাস্থানকে হেফাযত করে। এটা তাদের জন্যে পবিত্রতম ব্যবস্থা। নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা তাদের কর্মকান্ড সম্পর্কে অবহিত।'

পুরুষদের পক্ষ থেকে দৃষ্টি সংযত রাখা রিপু ও কু-প্রবৃত্তি দমনের একটা উৎকৃষ্ট উপায় এবং নারীর চেহারা ও দেহের সুন্দর ও প্রলুব্ধকারী বৈশিষ্ট্যসমূহ জানার ইচ্ছা ও দেখার কৌতূহল সংযত করার এক স্বার্থক প্রচেষ্টা। এটা বিপথগামিতা ও অশ্লীলতার পথ বন্ধ করারও অব্যর্থ পন্থা।

লজ্জাস্থানকে সংরক্ষণ দৃষ্টি সংযমেরই স্বাভাবিক ফল। অন্য কথায়, এটা মনোবাসনা নিয়ন্ত্রণ, আত্মসংযম এবং কু-প্রবৃত্তি দমনের পথের প্রাথমিক পদক্ষেপ। এ জন্যে এই দুটোকে একই আয়াতে একত্রিত করা হয়েছে। কারণ এ দুটোর একটা কারণ ও অপরটা ফল। মনোজগতে ও বাস্তবতার জগতে এ দুটো পর্যায়ক্রমিক পদক্ষেপ। এভাবে দুটোই পরস্পরের কাছাকাছি।

'এটা তাদের জন্যে পবিত্রতম ব্যবস্থা।'

অর্থাৎ মনের ইচ্ছা ও আবেগকে পবিত্র রাখার সুষ্ঠ ও সুন্দর ব্যবস্থা, অবৈধ ও অপবিত্র স্থানে যৌন চাহিদা চরিতার্থ করা থেকে বিরত থাকার নিশ্চয়তার ব্যবস্থা এবং মানুষের ভাবাবেগকে পশুত্বের পর্যায়ে নেমে যাওয়া থেকে বিরত রাখার প্রকৃষ্ট উপায়। এটা সমাজ জীবনের শালীনতা, পরিচ্ছন্নতা, নারীদের মানসম্ভ্রম ও পরিবেশে সুস্থতা বজায় রাখারও সর্বোত্তম পন্থা।

যেহেতু আল্লাহ মানুষের মনস্তাত্ত্বিক ও স্বভাবগত গঠন এবং তাদের দেহ ও মনের গতি প্রকৃতি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল, তাই তিনিই তাদের চরিত্রের পবিত্রতা রক্ষার এই ব্যবস্থা করেছেন। 'নিশ্চয় আল্লাহ তাদের কর্মকান্ড সম্পর্কে অবগত।'

পর্দার বিধান অপরাধ দমনের সুনিশ্চিত গ্যারান্টি

আল্লাহ তায়ালা পুনরায় বলেন,

'ঈমানদার নারীদেরকে বলো, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত ও লজ্জাস্থানকে সংরক্ষণ করে। ....'

অর্থাৎ পুরুষদের মনের সুপ্ত কদর্য বাসনাকে উস্কে দেয় এমন চোরা চোরা ও বুভুক্ষু চাহনি এবং ইংগিতপূর্ণ ও উত্তেজক দৃষ্টি নিক্ষেপ থেকে যেন বিরত থাকে। আর এমন পবিত্র ও বৈধ পন্থায়ই যেন লজ্জাস্থানকে ব্যবহৃত হতে দেয়, যা পরিচ্ছন্ন ও নিরুদ্বেগ পরিবেশে দেহের স্বাভাবিক চাহিদা পূরণ করে এবং এভাবে যে সন্তানরা জন্মগ্রহণ করবে, তারা যেন সমাজের কাছে মুখ দেখাতে লজ্জা না পায়।

'আর তাদের সাজ সজ্জাকে যেন প্রকাশ না করে, কেবল আপনা থেকে যা প্রকাশিত হয়ে পড়ে তা ছাড়া।'

বস্তুত নারীর স্বাভাবিক ও প্রকৃতিগত দাবী অনুসারেই সাজ-সজ্জা করা বৈধ। সুন্দরী হওয়া ও সুন্দরী সাজা প্রত্যেক নারীর মজ্জাগত ইচ্ছা। সময়ের ব্যবধানে আকৃতিগতভাবে সাজ গোছের রকম ফের হতে পারে, কিন্তু তার স্বভাবগত ও প্রকৃতিগতভাবে তা মূলত একই রকম। সেটা এই যে, প্রত্যেক নারীই পুরুষদেরকে আকৃষ্ট করার জন্যে সৌন্দর্যমন্ডিত হতে চায়, আর জন্মগত সৌন্দর্য পুরুষদেরকে আকৃষ্ট করার জন্যে যথেষ্ট না হলে সাজ সজ্জা দ্বারা সৌন্দর্যকে পূর্ণতা দান করতে চায়।

ইসলাম এই সহজাত ইচ্ছাকে প্রতিহত করে না। সে শুধু একে সুশৃংখল ও পরিশীলিত করে। সে চায় প্রত্যেক নারী তার সাজ সজ্জা ও সৌন্দর্য শুধু একজন পুরুষকে দেখতে দিক, যে তার জীবন সংগী। কেননা এই জীবন সংগী তার জীবনের এমন অনেক কিছুই দেখবার অধিকারী, যা অন্য কেউ দেখবার অধিকারী নয়। তবে তার সৌন্দর্য ও সাজ সজ্জার কিছু অংশ জীবন সংগী ছাড়া মহররম ও এই আয়াতের পরবর্তী অংশে বর্ণিত পুরুষরাও দেখতে পারে। কেননা তাতে এসব পুরুষের মধ্যে কামোত্তেজনার সৃষ্টি হয় না।

পক্ষান্তরে সৌন্দর্যের যে অংশটুকু এমনিতেই প্রকাশিত হয়ে পড়ে, তা হচ্ছে হাত ও মুখের সৌন্দর্য। এটুকু উন্মুক্ত করা জায়েয আছে। কারণ রসূল (স.) হযরত আবু বকরের মেয়ে আসমাকে বলেছিলেন, 'হে আসমা, একজন বয়োপ্রাপ্তা মেয়ের হাত ও মুখমন্ডল ছাড়া আর কিছু খোলা বৈধ নয়।'

'আর তারা যেন তাদের চাদর বুকের ওপর জড়িয়ে রাখে।'

'জাইব' শব্দটা দ্বারা এখানে বুকের ওপর কাপড়ের সংযোগস্থলকে বুঝানো হয়েছে। আর 'খেমার' হলো মাথা, গলা ও বুক ঢাকার চাদর বা ওড়না। এই ওড়না বা চাদর দিয়ে বুক ঢাকতে বলার উদ্দেশ্য নারীর দেহের বিপজ্জনক স্থানগুলোকে শিকারী চোখ থেকে এমনকি আকস্মিক দৃষ্টি থেকেও নিরাপদ রাখা। এগুলোকে উন্মুক্ত রাখা হলে এগুলোর ওপর যাদের নযর পড়তো, তাদের জন্যে তা পরবর্তী সময়ে কু-প্ররোচনার উৎস হতে পারতো। মোমেনদের মনকে আল্লাহ তায়ালা এ ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে নিক্ষেপ করতে চান না।

যে সকল ঈমানদার নারীর প্রতি এই নিষেধাজ্ঞা উচ্চারিত হয়েছিলো, তাদের অন্তর আল্লাহর জ্যোতিতে জ্যোতির্ময় ছিলো এবং সৌন্দর্য ও সাজ সজ্জা প্রকাশের স্বাভাবিক আগ্রহ তাদের মধ্যে থাকলেও তাদের ভেতর স্বামীর আনুগত্যে কোনো কমতি ছিলো না। জাহেলী যুগের নারীরা পুরুষদের সামনে বুক ফুলিয়ে চলতো এবং তাতে কোনো আবরণ জড়াতো না। তারা তাদের ঘাড়, চুল কান খোলা রেখেই চলাফেরা করতো। যখন আল্লাহ তায়ালা নারীদেরকে চাদর দিয়ে বুক ঢাকার নির্দেশ দিলেন এবং আপনা থেকে প্রকাশিত হওয়া অংশ ব্যতীত তাদের সৌন্দর্য ও সাজসজ্জা অপর পুরুষের সামনে খুলতে নিষেধ করলেন, তখন তারা এই নিষেধাজ্ঞা অক্ষরে অক্ষরে পালন করলেন। হযরত আয়শা বলেন, প্রাথমিক যুগের মোহাজের মহিলাদের ওপর আল্লাহ তায়ালা রহমত বর্ষণ করুন। কেননা আল্লাহ তয়ালা যখনই নাযিল করলেন যে, 'তারা যেন তাদের বুকের ওপর চাদর বা ওড়না জড়িয়ে নেয়।' অমনি তারা তাদের ব্যবহারের অন্যান্য কাপড় ছিঁড়ে তা দিয়ে ওড়না বানিয়ে বুক ঘাড় ইত্যাদি ঢাকতে শুরু করলেন। (বোখারী)

হযরত সফিয়া বিনতে শায়বা বর্ণনা করেন যে, আমরা একদিন হযরত আয়েশা (রা.)-এর কাছে বসেছিলাম। তিনি কোরায়শ বংশীয় নারীদের মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করছিলেন। তিনি বললেন, কোরায়েশী নারীদের বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। আল্লাহর কসম, আমি আনসারদের স্ত্রীদের চেয়ে আল্লাহর কেতাবের ভক্ত ও বিশ্বাসী আর কাউকে দেখিনি। যখন সূরা নূরের এই অংশ নাযিল হলো, 'তারা যেন চাদর দিয়ে তাদের বুক ঢাকে' তখন তাদের পুরুষরা তাদের কাছে ছুটে এলো, সদ্য নাযিল হওয়া বিধানগুলো তাদেরকে পড়ে শোনালেন এবং প্রত্যেক পুরুষ নিজ নিজ স্ত্রী, মেয়ে, বোন ও প্রত্যেক আত্মীয়কে তা পড়ে শোনাতে লাগলেন। এ আয়াত নাযিল হবার পর কোনো মুসলিম মহিলা বসে থাকেনি। প্রত্যেকে নিজ নিজ কোমরবন্দ খুলে ওড়না বানিয়ে নিয়েছে, যাতে আল্লাহর নাযিল করা বিধান বাস্তবায়িত করা যায়। তারপর রসূল (স.)-এর পেছনে ফজরের সময় যতো মহিলা নামাযে দাঁড়িয়েছে, তাদের সবাই ওড়না পরিহিত ছিলো। (আবু দাউদ)

বস্তুত ইসলাম মুসলিম সমাজের রুচির উন্নতি ঘটিয়েছে এবং তার সৌন্দর্যবোধকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করেছে। সৌন্দর্যবোধের যে অশালীন রূপ রয়েছে, সেটা তার মনোপূত নয়। সুসভ্য মানবীয় সৌন্দর্যবোধই তার পছন্দনীয়। দেহকে অনাবৃত রাখার মাধ্যমে যে সৌন্দর্যবোধের প্রকাশ ঘটে সেটা অশালীন ও অসভ্যজনোচিত সৌন্দর্যবোধ। এ সৌন্দর্যের প্রতি কোনো মানুষ যখন আকৃষ্ট হয়, তখন সে পাশবিক আবেগ অনুভূতি নিয়েই আকৃষ্ট হয়, চাই তা যতোই সুষ্ঠু ও সর্বাংগীন সুন্দর হোক না কেন। পক্ষান্তরে লজ্জা ও শালীনতার মধ্য দিয়ে যে সৌন্দর্যের প্রকাশ ঘটে, সেটাই পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন সৌন্দর্য, সেটাই সৌন্দর্যবোধকে সমুন্নত করে, সেটাই মানুষের উপযোগী এবং সেটাই মানুষের চেতনা অনুভূতি ও মানসিকতাকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করে।

আজও ইসলাম মুসলিম নারীদের মধ্যে এই পরিবর্তন সূচিত করে থাকে। যদিও সর্বত্র নিম্নমানের রুচিবোধ ও মানসিকতার ছড়াছড়ি, যদিও সমাজের অশালীন ও পাশবিক স্বভাবের

ব্যাপক প্রচলন, যদিও সর্বত্র নগ্নতা, নির্লজ্জতা ও পশুসুলভ বেহায়ামি প্রকট তথাপি মুসলিম নারীরা স্বতস্ফূর্তভাবেই নিজ নিজ দেহের সৌন্দর্যকে ও আকর্ষণীয় অংশকে লুকিয়ে রাখতে সদা সচেষ্ট। যে সমাজের সর্বত্র নগ্নতা, অবাধ মেলামেশা, ঢলাঢলি ও বেলেল্লাপনার হিড়িক চলছে, যে সমাজে পশুদের মত নারীরা পুরুষদেরকে কুরুচিপূর্ণ ইংগিত দিতে অভ্যস্ত, সেই একই সমাজে বাস করে মুসলিম নারীদের এই শালীন ও পবিত্র চাল চলন বিস্ময়কর বৈ' কি?

এই লজ্জা, শালীনতা ও কঠোর পর্দা ব্যক্তি ও সমাজের নিরাপত্তার অন্যতম ব্যবস্থা। পক্ষান্তরে যেখানে বিপদের আশংকা নেই, সেখানে কোরআন পর্দার কড়াকড়ি শিথিল করে। এ জন্যে সাধারণত যাদের মধ্যে যৌন আকর্ষণ একেবারেই জাগে না, সেসব মহররম পুরুষ থেকে পর্দা না করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। যেমন বাপ দাদা, ছেলে, স্বামীদের বাপ দাদা ও ছেলেরা, ভাইরা ও ভাইয়ের ছেলেরা, বোনদের ছেলেরা ইত্যাদি। অনুরূপভাবে মুসলিম নারীদের বেলায়ও এই বিধি শিথিল। তবে অমুসলিম নারীদের বেলায় নয়। কেননা তারা তাদের স্বামী, ভাই ও তাদের স্বজাতীয় পুরুষদের কাছে নিজেদের দেখা মুসলিম নারীদের সৌন্দর্য বর্ণনা করতে পারে। বোখারী ও মুসলিম বর্ণিত এক হাদীসে রসূল (স.) বলেছেন, কোনো নারীর অন্য (বিধর্মী) নারীর সামনে নিজের দেহকে অনাবৃত করা উচিত নয়। তাহলে হয়তো সে নিজ স্বামীর কাছে তার এমন বিবরণ দেবে যে তাকে তার স্বচক্ষে দেখার মতোই মনে হবে। এ ব্যাপারে মুসলিম নারীরা যথেষ্ট বিশ্বস্ত। ইসলাম তাদেরকে নিজ স্বামীর কাছে অন্য কোনো মুসলিম নারীর দেহ ও সৌন্দর্যের বর্ণনা দিতে নিষেধ করে। ইসলাম দাসদের বেলায়ও পর্দার বিধিনিষেধ শিথিল করে। কেউ কেউ বলেন, শুধু দাসীদের বেলায়। আবার কেউ কেউ বলেন, দাসদের বেলায়ও। কেননা কোনো দাস তার মহিলা মনীবের প্রতি যৌন আকর্ষণ অনুভব করে না। তবে প্রথম মতটাই ভালো। অর্থাৎ পর্দার শিথীলতা শুধু দাসীর মধ্যে সীমিত রাখাই উত্তম। কেননা দাস তো রক্ত মাংসেরই মানুষ। সাময়িকভাবে তার অবস্থা যতোই ভিন্নতর হোক না কেন তার মধ্যে যৌন আকর্ষণ সৃষ্টি হতেও পারে। পর্দার বিধান আরো শিথিল করা হয়েছে, সেসব পুরুষের ক্ষেত্রেও, যারা কোনো কারণবশত নারীদের প্রতি যৌন আকর্ষণ পোষণ করে না। যেমন নপুংশক, নির্বোধ, পাগল কিংবা অন্য এমন কোনো প্রতিবন্ধী পুরুষ, যার নারীর প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টিতে কোনো গুরুতর বাধা রয়েছে। কেননা এক্ষেত্রে কোনো বিপদ বা প্রলুব্ধতার আশংকা নেই। অনুরূপভাবে 'যে শিশু নারী দেহের গোপনীয়তা সম্পর্কে অবহিত নয়।' তাকেও এই কড়াকড়ির আওতার বাইরে রাখা হয়েছে। অর্থাৎ সেসব শিশু যাদের নারীর দেহ দেহ কোনো যৌন অনুভূতি জাগে না। যখন এই অনুভূতি জাগবে, তখন তাদের যৌবন প্রাপ্তি না ঘটলেও তারা এই কড়াকড়ির আওতায় পড়বে।

একমাত্র স্বামী ছাড়া এসব বিপদমুক্ত পুরুষকে নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত ব্যতীত শরীরের সকল অংশ দেখতে দেয়া জায়েয এবং তাদেরও শরীরের সকল অংশ দেখা নারীর জন্যে বৈধ। কারণ যে বিপদ থেকে আত্মরক্ষা করা এই পর্দার উদ্দেশ্য, তা এখানে অনুপস্থিত। অবশ্য স্বামীর জন্যে স্ত্রীর দেহের সকল অংশ দেখা জায়েয।

আর যেহেতু নারীর সতিত্ব ও সম্ভ্রমের সুরক্ষাই এই বিধানের উদ্দেশ্য, তাই আয়াতে নারীর এমন কার্যকলাপও নিষিদ্ধ করা হয়েছে, যা তার গুপ্ত সৌন্দর্যকে প্রকাশ করে অন্যের সুপ্ত যৌন আবেগকে উস্কে দেয়, যদিও সরাসরি তারা তাদের সৌন্দর্যকে প্রকাশ না করে।

'তারা যেন এমন জোরে জোরে পা না ফেলে, যাতে তাদের লুকানো সৌন্দর্য প্রকাশিত হয়ে পড়ে।'

এ উক্তি থেকে বুঝা যায় যে, মানুষের মন মানসিকতা, গঠন প্রক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে আল্লাহর জ্ঞান কতো গভীর যার ভিত্তিতে তিনি এ নির্দেশ দিয়েছেন। এ দ্বারা বুঝা যায় যে, অনেক সময় চাক্ষুস দর্শনের চেয়ে কল্পনা যৌন আবেগ উস্কে দেয়ার ব্যাপারে অধিকতর শক্তিশালী হয়ে থাকে। কেউ কেউ এমনও আছে, যাদের যৌন আবেগ নারীর দেহ দর্শনের চেয়েও তার জুতো, পোশাক বা গহনা দর্শনে অধিকতর উত্তেজিত হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে, অনেকে এমনও আছে, যার সামনে নারীর প্রকাশ্য উপস্থিতির চেয়ে তার কল্পনা তাকে অধিকতর উত্তেজিত করে থাকে। এসব উপসর্গ আধুনিক মনোব্যাধি বিশেষজ্ঞদের কাছে সুপরিচিত। এ ছাড়া দূর থেকে গহনার শব্দ শ্রবন ও আতর বা সেন্টের সুবাস গ্রহণ বহু পুরুষের অনুভূতিকে জাগ্রত করে, তাদের স্নায়ুতন্ত্রীকে উত্তেজিত করে এবং তাদেরকে এমনভাবে আলোড়িত ও প্রলুব্ধ করে যে, তা থেকে তারা কিছুতেই নিস্তার পায় না। কোরআন এই সমস্ত জটিল সমস্যার সমাধান দেয়। কেননা যিনি এ কোরআন নাযিল করেছেন তিনিই মানুষ সহ যাবতীয় সৃষ্টির স্রষ্টা এবং তিনি তার সৃষ্টি সম্পর্কে যথাযথভাবে অবগত। তিনি সুক্ষ্মদর্শী সর্বজ্ঞ।

সবার শেষে সকল মোমেনের অন্তরকে আল্লাহর দিকে কেন্দ্রীভূত করা হয়েছে এবং কোরআন নাযিল হবার পূর্বে কৃত সকল গুনাহ থেকে তাওবা করার নির্দেশ দিয়ে তাওবার সুযোগ উন্মুক্ত করা হয়েছে,

'হে ঈমানদাররা! তোমরা আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন কর, হয়তো তোমরা সফলকাম হবে।'

এভাবে আল্লাহর তদারকী, তত্ত্বাবধান ও দয়াশীলতা সম্পর্কে সকলকে সচকিত করা হয়েছে, বিপরীত লিংগের প্রতি মানুষের সুগভীর স্বাভাবিক দুর্বলতায় তিনিই যে একমাত্র সাহায্যকারী এবং তাঁর অনুভূতি ও ভীতিই যে তাকে এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশী সাহায্য করতে পারে, সে কথা জানিয়ে দেয়া হয়েছে।

বিয়ের ব্যবস্থা করা একটি সামাজিক দায়িত্ব

এ পর্যন্ত যা কিছু আলোচিত হয়েছে, তা ছিল সমস্যাটার মনস্তাত্ত্বিক ও নিরাপত্তামূলক তথা নেতিবাচক সমাধান। তবে নর নারীর পরপস্পরের প্রতি ঝোঁক ও আকর্ষণ যেহেতু একটা বাস্তব সমস্যা, তাই তার বাস্তব ও ইতিবাচক সমাধানও অপরিহার্য। এই বাস্তব সমাধান হলো বিয়েকে সহজ করে দেয়া। বিয়ের কাজে সহায়তা ও সহযোগিতা করা এবং সেই সাথে যৌন সংগমের অন্য সকল পন্থাকে কঠিন করে দেয়া বা পুরোপুরিভাবে বন্ধ করা। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'তোমাদের মধ্যকার অবিবাহিতদেরকে......... বিয়ে দাও........।' (আয়াত ৩২-৩৩)

বস্তুত বিয়ে হচ্ছে নর নারীর পারস্পরিক সহজাত আকর্ষণ ও আবেগ চরিতার্থ করার স্বাভাবিক পন্থা এবং এই আবেগ ও আকর্ষণের পবিত্র লক্ষ্য। তাই এই বিয়ের পথের সকল বাধা অপসারিত করা সকলের কর্তব্য, যাতে মানব জীবন তার স্বাভাবিক ও অকৃত্রিম গতিতে সচল থাকতে পারে। কিন্তু দাম্পত্য জীবন গড়া ও নর নারীর সতিত্ব ও শ্লীলতা রক্ষার পথের পয়লা বাধাই হলো অর্থনৈতিক বাধা। অথচ ইসলাম একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। সে সতিত্ব ও শ্লীলতা সংরক্ষণকে ফরয করার আগে তার উপায় ও উপকরণ যোগাড় করার ব্যবস্থা করে থাকে এবং সমান অবস্থা সম্পন্ন নরনারীর জন্যে বিয়ে সহজ সাধ্যতা নিশ্চিত করে থাকে। ফলে একমাত্র সেই ব্যক্তিই ব্যাভিচারে লিপ্ত হয়ে থাকে যে সহজ ও পবিত্র পন্থাকে সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় এবং কোনোরকম বাধ্যবাধকতা ছাড়াই উপেক্ষা করে।

এ কারণেই আল্লাহ তায়ালা মুসলিম সমাজকে নির্দেশ দেন যে, যারা একমাত্র অর্থের অভাবে হালাল ও বৈধভাবে বিয়ে করতে অক্ষম, তাদেরকে বিয়ে করতে যেন তারা সর্বতোভাবে সাহায্য করে,

'তোমরা তোমাদের মধ্যকার অবিবাহিতদের বিয়ে দিয়ে দাও এবং তোমাদের দাসদাসীদের মধ্যে যারা সৎ ও যোগ্য তাদেরও। তারা যদি দরিদ্র হয় তবে আল্লাহ তায়ালা নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে ধনী করে দেবেন।' ....

এখানে 'আয়ামা' শব্দটা দ্বারা সেসব স্বাধীন নারী ও পুরুষকে বুঝানো হয়েছে যারা স্বামীহীন বা স্ত্রীহীন অবস্থায় রয়েছে। 'আয়ামা'র পরেই দাসদাসীর কথা আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়েছে এভাবে,

'আর তোমাদের দাসদাসীদের মধ্যে যারা বিয়ের যোগ্য তাদেরকেও।'

এই উভয় শ্রেণীর লোকদেরই অভিন্ন বৈশিষ্ট্য হলো অর্থাভাব, যা পরবর্তী বাক্য দ্বারা বুঝা যায়,

'তারা যদি দরিদ্র হয়ে থাকে, তবে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে ধনী বানিয়ে দেবেন।'

এখানে মুসলিম সমাজকে আদেশ দেয়া হয়েছে তাদেরকে বিয়ে দিতে। অধিকাংশ ইমাম ও তাফসীরকারের মতে এ আদেশ বাধ্যতামূলক নয়, বরং উপদেশমূলক। তাদের প্রমাণ এই যে, রসুল (স.)-এর যুগে অনেক লোক স্বামীহীন বা স্ত্রীহীন অবস্থায় জীবন কাটিয়ে দিয়েছে। তাদেরকে বিয়ে দেয়া হয়নি। এ আয়াতের আদেশ যদি বাধ্যতামূলক হতো, তবে তাদেরকে অবশ্যই বিয়ে দেয়া হতো।

কিন্তু আমার মত এই যে, এ আদেশ অবশ্যই বাধ্যতামূলক। তবে সেটা এ অর্থে নয় যে, রাষ্ট্র ও সরকার স্বামীহীন ও স্ত্রীহীন নরনারীকে বিয়ে করতে বাধ্য করবে। বরঞ্চ তার অর্থ এই যে, তাদের মধ্যে যারা বিয়ে করতে ইচ্ছুক, তাদেরকে আর্থিক সহায়তা দিয়ে তাদের সতিত্ব ও শ্লীলতাকে নিরাপদ করা ও সংরক্ষণ করা ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্যে অবশ্য কর্তব্য বা ওয়াজেব। কেননা বিয়ে হচ্ছে সতিত্বকে কার্যকরভাবে সংরক্ষণ ও সমাজকে ব্যাভিচার ও অশ্লীলতা থেকে পবিত্র করা ও পবিত্র রাখার সবচেয়ে বাস্তবসম্মত পন্থা ও উপায়। সমাজকে ব্যাভিচার থেকে পবিত্র রাখা যখন ওয়াজেব, তখন তার পন্থা ও উপায় অবলম্বন করাও ওয়াজেব।

এই সাথে আমাদের এ কথাও বিবেচনায় রাখতে হবে যে, ইসলাম একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে যাবতীয় অর্থনৈতিক সমস্যার মৌলিক সমাধান দিয়ে থাকে। তাই সে সকল সুস্থ ও সবল মানুষকে নিজের যাবতীয় মৌলিক প্রয়োজন পূরণের উপযোগী অর্থ ও জীবিকা উপার্জনে সমর্থ বানায় এবং সরকারী কোষাগারের মুখাপেক্ষী হতে দেয় না। তবে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সে সরকারী কোষাগারকেও কিছু কিছু সাহায্য করতে বাধ্য করে। ইসলামী ব্যবস্থায় মূল কথা হলো প্রত্যেক নাগরিক নিজ নিজ উপার্জনে স্বয়ম্ভর হবে এবং কারো মুখাপেক্ষী থাকবে না। সকল নাগরিকের কর্ম সংস্থান ও পর্যাপ্ত পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা করাকে সে রাষ্ট্রের কর্তব্য হিসেবে ধার্য করে। বাইতুল মাল বা সরকারী কোষাগার থেকে সাহায্য করাটা ব্যতিক্রমী বা বিশেষ ব্যবস্থা হিসেবে গণ্য। এর ওপর ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নির্ভরশীল নয়।

এতদসত্তেও ইসলামী সমাজে যদি কখনো এমন কিছু অবিবাহিত নর নারী বিদ্যমান থাকে, যাদের নিজস্ব সহায় সম্পদ বিয়ে করার জন্যে যথেষ্ট নয়, তাহলে তাদের বিয়ের ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রের

দায়িত্ব। দাসদাসীর ব্যাপারটাও তদ্রূপ। তবে তাদের মনিব বা অভিভাবক যতোক্ষণ তাদের বিয়ের ব্যবস্থা করতে সক্ষম থাকবে, ততোক্ষণ এটা তাদেরই দায়িত্ব থাকবে।

নারী হোক বা পুরুষ হোক যারা বিয়ের যোগ্য ও বিয়ে করতে ইচ্ছুক, তাদের বিয়ে শুধু অর্থাভাবে আটকে থাকবে এটা অন্যায় ও অবৈধ। মনে রাখতে হবে, জীবিকা আল্লাহর হাতে। আর আল্লাহ তায়ালাই তাদের অভাব দূর করার নিশ্চয়তা দিয়েছেন যদি তারা নিজেদের সতিত্ব ও শ্লীলতা রক্ষার পবিত্র পথ অবলম্বন করে,

'তারা যদি অভাবী হয় তবে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদের অভাব দূর করে দেবেন।'

রসূল (স.) বলেছেন, তিন ব্যক্তির সাহায্য করা আল্লাহর দায়িত্ব, আল্লাহর পথে জেহাদকারী, যে পরাধীন ব্যক্তি মুক্তিপণ দিয়ে মুক্তি লাভে ইচ্ছুক এবং ব্যক্তি বিয়ে করে নিজের সতিত্ব ও শ্লীলতাকে নিরাপদ করতে চায়। (তিরমিযী ও নাসায়ী)

সমাজ বা রাষ্ট্র কর্তৃক স্বামীহীন নারী ও স্ত্রীহীন পুরুষদেরকে বিয়ে দেয়ার উদ্যোগ গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত তারা যাতে নিজেদের সতিত্ব ও শ্লীলতা রক্ষায় সচেষ্ট থাকে, সে জন্যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে পরবর্তী আয়াতে,

'যারা বিয়ে করার সুযোগ পাচ্ছে না তাদের উচিত নিজ নিজ শ্লীলতা রক্ষা করা যতোক্ষণ না আল্লাহ তায়ালা নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করেন ....'

বস্তুত আল্লাহ তায়ালা সৎ জীবন যাপনে ইচ্ছুকদের পথ সংকীর্ণ করেন না। কেননা তিনি তাদের ইচ্ছা ও সততা সম্পর্কে ওয়াকেফহাল।

দাস দাসীদের মানবাধিকার সংরক্ষণ ও পতিতাবৃত্তি দমনে ইসলামের কর্মসূচী

এভাবে ইসলাম এই সমস্যার বাস্তবানুগ সমাধান দেয়। বিয়ের যোগ্য কোনো ব্যক্তি কেবল আর্থিক অক্ষমতার কারণে বিয়ে করতে না পারলে সে তাকে আর্থিক আনুকূল্য দিয়ে বিয়ে করার ক্ষমতা যোগায়। বিয়ে করার পথে সম্ভবত অর্থাভাবই সবচেয়ে বড়ো বাধা। যেহেতু সমাজে দাসদাসীদের অস্তিত্ব সমাজের সামগ্রিক নৈতিক মানের অবনতি ঘটানোর সহায়ক ছিলো এবং এই শ্রেণীটির নিজের মানবিক মর্যাদা সংক্রান্ত চেতনা দুর্বল থাকার কারণে তাদের মধ্যে চারিত্রিক শৈথিল্য দেখা দেয়ার আশংকা ছিলো। অথচ তৎকালে ইসলামের শত্রুরা মুসলিম যুদ্ধবন্দীদেরকে দাসদাসীতে পরিণত করার দরুণ তাদের যুদ্ধবন্দীদের সাথেও অনুরূপ আচরণ না করে অর্থাৎ তাদেরকেও দাস দাসীতে পরিণত না করে উপায় ছিলো না, তাই ইসলাম সুযোগ পেলেই এসব দাস দাসীকে মুক্তি দেয়ার ব্যবস্থা করে। বিশ্ব পরিস্থিতি যতোক্ষণ দাস প্রথা সর্বতোভাবে বিলোপের অনুকূল না হয়, ততোক্ষণ পর্যন্ত অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসেবে ইসলাম মুক্তিপণ গ্রহণ করে দাস মুক্তির অনুমতি দেয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'তোমাদের দাস দাসীদের মধ্যে যারা মুক্তিপণ দিয়ে মুক্তি পেতে আগ্রহী, তাদের মধ্যে যদি কল্যাণ দেখতে পাও, তবে মুক্তিপণ নিয়ে মুক্তি দাও .... ।'

এই মুক্তিপণ নিয়ে মুক্তি দেয়ার বাধ্যবাধকতা সম্পর্কে ফকীহদের মতভেদ রয়েছে। আমার মতে এটা অবশ্যই বাধ্যতামূলক। কেননা এ ব্যবস্থা স্বাধীনতা ও মানবীয় মর্যাদা রক্ষায় ইসলামের মৌলিক বিধানের সাথে সংগতিপূর্ণ। মুক্তিপণ দিয়ে মুক্তি লাভের চুক্তি সম্পাদিত হবার সময় থেকে শুরু করে দাস বা দাসীর উপার্জিত সকল অর্থ ও পারিশ্রমিক তার নিজের মালিকানাভুক্ত হয়ে যায়,

যাতে সে তা দিয়ে মুক্তি অর্জন করতে পারে। যাকাতেরও একটা অংশ এরূপ ব্যক্তির প্রাপ্য, 'আর আল্লাহ তোমাদেরকে যে সম্পদ দিয়েছেন তা থেকে কিছুটা তাদেরকে দাও।' এই ব্যবস্থার জন্যে একমাত্র শর্ত এই যে, মনিব এতে দাস বা দাসীর জন্যে কল্যাণকর মনে করে। আর কল্যাণের পয়লা বিষয় হলো তার ইসলাম গ্রহণ। দ্বিতীয়, তার উপার্জনক্ষম হওয়া চাই। কেননা স্বাধীন হবার পর সে মানুষের ঘাড়ের ওপর বোঝা হয়ে চেপে বসুক-সেটা ইসলাম চায় না। সে উপার্জনের সর্বনিম্ন পন্থারও আশ্রয় নিতে পারে, যা তার মৌলিক প্রয়োজন পূরণ করার নিশ্চয়তা দেয়। ইসলাম নাগরিকদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দানকারী একটা বাস্তব ব্যবস্থা। তার দৃষ্টিতে 'দাস মুক্তি লাভ করেছে' এই প্রচারণাই বড় কথা নয়। কেননা নিছক লেবেলকে সে গুরুত্ব দেয় না। তার দৃষ্টিতে বাস্তবতাই গুরুত্বপূর্ণ। কোনো দাস কেবল তখনই মুক্তি পাবে, যখন এই মর্মে নিশ্চয়তা পাওয়া যাবে যে সে স্বাধীন হবার পর উপার্জনে সক্ষম হবে। সমাজের গলগ্রহ হয়ে রইবে না। কোনো নোংরা পেশা অবলম্বন করে বেঁচে থাকবে না এবং এমন কোনো জিনিস বিক্রি করতে বাধ্য হবে না, যা নাম সর্বস্ব স্বাধীনতার চেয়েও দামী। কেননা সে সমাজকে পরিশুদ্ধ ও পরিচ্ছন্ন করার জন্যেই তাকে স্বাধীন করেছে, নতুন করে কলূষিত করার জন্যে নয়।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কিছু দাসীর বেশ্যাবৃত্তির পেশায় নিয়োজিত হওয়া খোদ দাস প্রথার চেয়েও মারাত্মক। জাহেলী যুগের মানুষের রীতি ছিলো এ রকম যে, তাদের কারো কোনো দাসী থাকলে তাকে বেশ্যাবৃত্তিতে নিয়োগ করতো এবং তার ওপর কর ধার্য করে তা তার কাছ থেকে আদায় করতো। আজও এই পেশা দেশে দেশে প্রচলিত রয়েছে। ইসলাম যখন সামাজিক পরিবেশকে বিশুদ্ধ করতে চাইলো, তখন ব্যাভিচারকে সর্বতোভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করলো। তবে বল প্রয়োগের মাধ্যমে ব্যাভিচারে নিয়োগ করা সম্পর্কে বিশেষ বিধি জারী করলো এভাবে,

'তোমাদের দাসীদেরকে বলপূর্বক ব্যাভিচারে বাধ্য করো না– যদি তারা সতী থাকতে ইচ্ছুক হয় ....।'

এখানে যারা এই অপকর্মে দাসীদেরকে বাধ্য করতো, তাদেরকে বলপ্রয়োগ করতে নিষেধ করা হয়েছে। এহেন জঘন্য পন্থায় দুনিয়ার সম্পদ উপার্জন করার জন্যে তাদেরকে কঠোরভাবে ভর্ৎসনা করা হয়েছে এবং যাদেরকে বাধ্য করা হতো, তাদেরকে ক্ষমা ও দয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। কেননা এই অপকর্মে তাদের কোনো হাত ছিলো না। তারা নিছক বলপূর্বক ব্যবহৃত হয়েছে।

সুদ্দী বলেন, এ আয়াত মোনাফেক সরদার আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সলুল সম্পর্কে নাযিল হয়। মুয়াযা নামে তার এক দাসী ছিলো। তার কাছে কোনো অতিথি এলে সে দাসীকে তার মনোরঞ্জনের জন্যে ও অর্থোপার্জনের জন্যে তার কাছে রাত যাপন করতে ও ব্যাভিচার করতে পাঠাতো। দাসীটা হযরত আবু বকরের কাছে গিয়ে ফরিয়াদ জানালে তিনি রসূল (স.)-কে ব্যাপারটা জানান। রসূল (স.) তাকে আটক করার জন্যে আবু বকর (রা.)-কে আদেশ দেন। আবদুল্লাহ এবনে উবাই এ নিয়ে হৈ চৈ করলো। সে এই বলে ক্ষোভ প্রকাশ করলো যে, 'মোহাম্মদের অত্যাচার থেকে আমাদেরকে কে বাঁচাবে? সে আমাদের দাসীর ওপরও জোর খাটাচ্ছে।' এই সময় আল্লাহ তায়ালা এ আয়াত নাযিল করেন।

সতিত্ব বজায় রাখতে ইচ্ছুক দাসীকে অর্থোপার্জনের নিমিত্তে ব্যাভিচারে বাধ্য করার বিরুদ্ধে এই নিষেধাজ্ঞা সমাজ সংস্কারের কোরআনী কর্মসূচীর অংশ বিশেষ। এ দ্বারা সে যৌন ইচ্ছা

চরিতার্থ করার নোংরা পন্থাগুলো রহিত করেছে। কেননা সমাজে বেশ্যাবৃত্তি চালু থাকলে তা অনেককে সেদিকে প্রলুব্ধ করে। কেননা এটা সহজ পন্থা। এটা যদি প্রচলিত না থাকতো, তাহলে মানুষ পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র পন্থায় এ কাজ সমাধা করতে উদ্বুদ্ধ হতো।

কেউ কেউ বলে যে, বেশ্যাবৃত্তি সমাজের নিরাপত্তা রক্ষা করা এবং এ দ্বারা ভদ্র পরিবারগুলোর ইযযত সম্ভ্রম রক্ষা পাচ্ছে। কেননা যাদের পক্ষে বিয়ে করা সম্ভব নয়, তাদের স্বাভাবিক যৌন চাহিদা পূরণের জন্যে এই নোংরা পন্থার বিকল্প নেই। অন্য কথায় তারা বলতে চায়, যৌন ক্ষুধায় উন্মত্ত পশুগুলোর হাত থেকে সতী সাধ্বী নারীদের সম্ভ্রমকে বাঁচাতে হলে এই নোংরা খাদ্যগুলো প্রস্তুত রাখা জরুরী।

আসলে এই চিন্তাধারায় সম্পূর্ণ উল্টো যুক্তি প্রয়োগ করে হয়েছে এবং কারণ ও ফলাফলকে উল্টোভাবে স্থাপন করা হয়েছে। যৌন সংযোগ ও সম্পর্ককে পবিত্র, পরিচ্ছন্ন ও নতুন প্রজন্মের দ্বারোদঘাটক হিসাবে বহাল রাখা জরুরী। সমাজ ও রাষ্ট্রকে সচেষ্ট থাকতে হবে তার অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সংস্কার সাধন পূর্বক এমন এক পরিবেশ গড়ার জন্যে, যেখানে প্রত্যেক ব্যক্তি সংগতভাবে জীবন যাপন ও বিয়ে শাদী করতে সমর্থ হবে। এরপরও যদি সেই সমাজে কোনো ব্যতিক্রমী পরিস্থিতি দেখা দেয় তবে বিশেষ ব্যবস্থাধীনে তার চিকিৎসা করতে হবে। এতে সমাজে বেশ্যাবৃত্তি বা অন্য এমন কোনো নোংরা প্রথা থাকার প্রয়োজন হয় না, যা যৌন চাহিদা পূরণের দায় দায়িত্ব থেকে অব্যহতি লাভে ইচ্ছুক লোকেরা এ পন্থা অবলম্বন করে থাকে এবং সমাজের জ্ঞাতসারেই এহেন দায়িত্বহীন কাজ তারা করে।

আসলে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সংস্কার এমনভাবে হওয়া প্রয়োজন, যাতে এ ধরনের কদর্য কার্যকলাপের কোনো অবকাশই না থাকে এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিকৃতির ওজুহাত দেখিয়ে মানবতার এমন অবমাননাকে বৈধ করার কসরত চালানো না হয়।

ইসলাম তার স্বয়ংসম্পূর্ণ পরিচ্ছন্ন ব্যবস্থা দিয়ে এই মহৎ কাজই সমাধা করেছে। এ দ্বারা সে অধপতিত মানবতার অভাবনীয় উন্নতি সাধন করেছে।

এই পর্বের উপসংহার টানা হয়েছে পবিত্র কোরআনের সেই বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা দানের মাধ্যমে, যা তার পটভূমি ও আলোচ্য বিষয়ের সাথে সংগতিপূর্ণ।

'আর আমি তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী নাযিল করেছি এবং আল্লাহভীরুদের অতীত জাতিগুলোর উদাহরণ এবং সদুপদেশকে এর অন্তর্ভুক্ত করেছি।'

বস্তুত কোরআনের আয়াতসমূহ সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন, এতে কোনো জটিলতা ও দুর্বোধ্যতা নেই, সঠিক ও সোজা পথ থেকে বিচ্যুত হবারও কোনো কারণ নেই। অতীতে যারা আল্লাহর বিধান থেকে বিচ্যুত হয়ে আল্লাহর আযাবে ধ্বংস হয়েছে তাদের বিবরণও এতে রয়েছে। যারা আল্লাহর ভয়ে কম্পমান এবং আল্লাহর ভয়ে সঠিক পথে চলে তাদের জন্যে এতে সদুপদেশ রয়েছে। এ পর্বে আলোচিত বিধিসমূহ এই উপসংহারের সাথে সংগতিশীল, যা কোরআন নাযিলকারী মহান আল্লাহর সম্পর্কে হৃদয়কে সজাগ করে।

اَللّٰهُ نُوۡرُ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ ؕ مَثَلُ نُوۡرِهٖ كَمِشۡكٰوةٍ فِيۡهَا مِصۡبَاحٌ ؕ اَلۡمِصۡبَاحُ
فِىۡ زُجَاجَةٍ ؕ اَلزُّجَاجَةُ كَاَنَّهَا كَوۡكَبٌ دُرِّىٌّ يُّوۡقَدُ مِنۡ شَجَرَةٍ مُّبٰرَكَةٍ زَيۡتُوۡنَةٍ
لَّا شَرۡقِيَّةٍ وَّلَا غَرۡبِيَّةٍ ۙ يَّكَادُ زَيۡتُهَا يُضِىۡٓءُ وَلَوۡ لَمۡ تَمۡسَسۡهُ نَارٌ ؕ نُوۡرٌ عَلٰى
نُوۡرٍ ؕ يَهۡدِى اللّٰهُ لِنُوۡرِهٖ مَنۡ يَّشَآءُ ؕ وَيَضۡرِبُ اللّٰهُ الۡاَمۡثَالَ لِلنَّاسِ ؕ
وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَىۡءٍ عَلِيۡمٌ ۙ‏ ﴿۳۵﴾ فِىۡ بُيُوۡتٍ اَذِنَ اللّٰهُ اَنۡ تُرۡفَعَ وَيُذۡكَرَ فِيۡهَا
اسۡمُهٗ ۙ يُسَبِّحُ لَهٗ فِيۡهَا بِالۡغُدُوِّ وَالۡاٰصَالِ ۙ‏ ﴿۳۶﴾ رِجَالٌ ۙ لَّا تُلۡهِيۡهِمۡ تِجَارَةٌ
وَّلَا بَيۡعٌ عَنۡ ذِكۡرِ اللّٰهِ وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيۡتَآءِ الزَّكٰوةِ ۙ يَخَافُوۡنَ يَوۡمًا
تَتَقَلَّبُ فِيۡهِ الۡقُلُوۡبُ وَالۡاَبۡصَارُ ۙ‏ ﴿۳۷﴾ لِيَجۡزِيَهُمُ اللّٰهُ اَحۡسَنَ مَا عَمِلُوۡا

রুকু ৫

৩৫. আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন আসমানসমূহ ও যমীনের নূর; তাঁর এ নূরের উদাহরণ হচ্ছে– তা যেমন একটি তাকের মতো, তাতে একটি প্রদীপ (রাখা) আছে; প্রদীপটি (আবার) স্থাপন করা হয়েছে (স্বচ্ছ একটি) কাচের আবরণের ভেতর; কাচের আবরণটি হচ্ছে উজ্জ্বল একটি তারার মতো– তা প্রজ্বলিত করা হয় পবিত্র যয়তুন গাছ (নিসৃত তেল) দ্বারা, যা (শুধু) পূর্ব দিকের (সূর্যের আলো থেকেই আলোকপ্রাপ্ত) নয়, পশ্চিম দিকের (সূর্যের আলোকপ্রাপ্তও) নয়; (বরং এটি সব সময়ই প্রজ্বলিত থাকে); আবার এর তেল এতো পরিষ্কার, (দেখলে) মনে হয়, তা বুঝি নিজে নিজেই জ্বলে ওঠবে, যদি আগুন তাকে (ততোক্ষণে) স্পর্শও না করে থাকে; (আর যদি আগুন স্পর্শ করেই ফেলে তাহলে তা হবে) নূরের ওপর (আরো) নূর; আল্লাহ তায়ালা তাঁর এ নূরের দিকে যাকে চান তাকেই হেদায়াত দান করেন; আল্লাহ তায়ালা (এভাবে) মানুষদের (বোঝানোর) জন্যে নানা উপমা পেশ করে থাকেন; আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক বিষয় সম্পর্কেই সম্যক অবগত আছেন, ৩৬. (এসব ব্যক্তিদের পাওয়া যাবে) সে ঘরসমূহে, যার মধ্যে আল্লাহ তায়ালার সম্মান মর্যাদা উন্নীত করা এবং (তাতে) তাঁর নিজের (পবিত্র) নাম স্মরণ করার জন্যে সবাইকে আদেশ দিয়েছেন, সেসব জায়গাসমূহে সকাল সন্ধ্যা (এরা) আল্লাহ তায়ালার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে, ৩৭. তারা এমন লোক– ব্যবসা বাণিজ্য যাদের কখনো আল্লাহ তায়ালা থেকে গাফেল করে দেয় না– না বেচাকেনা তাদের আল্লাহ তায়ালার স্মরণ, নামায প্রতিষ্ঠা ও যাকাত আদায় করা থেকে গাফেল রাখতে পারে, তারা সেদিনকে ভয় করে যেদিন তদের অন্তর ও দৃষ্টিশক্তি ভীতবিহ্বল হয়ে পড়বে। ৩৮. যারা নেক কাজ করে আল্লাহ তায়ালা তাদের যথার্থ উত্তম পুরস্কার দেবেন, তিনি তাঁর অনুগ্রহে

وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٨﴾ وَالَّذِينَ

كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ

يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ ۗ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٣٩﴾

أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ سَحَابٌ ۚ

ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا ۗ وَمَن لَّمْ

يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ ﴿٤٠﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي

السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ ۖ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ ۗ

وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿٤١﴾ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَإِلَى

তাদের যা পাওনা তার চাইতেও বেশী দান করবেন; (মূলত) আল্লাহ তায়ালা যাকে চান তাকে অপরিমিত রেযেক দান করেন। ৩৯. (অপর দিকে) যারা আল্লাহ তায়ালাকে অস্বীকার করে– তাদের (দৈনন্দিন) কার্যকলাপ মরুভূমিতে মরীচিকার মতো (একটি প্রতারণা), পিপাসার্ত মানুষ (দূরে থেকে) তাকে পানি বলে মনে করলো; পরে যখন সে তার কাছে এলো তখন সেখানে পানির (মতো) কিছুই সে পেলো না, (এভাবে প্রতারণা ও মরীচিকার জীবন শেষ হয়ে গেলে) সে শুধু আল্লাহ তায়ালাকেই তার পাশে পাবে, অতপর তিনি তার পাওনা পূর্ণমাত্রায় আদায় করে দেবেন, নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা ত্বরিত হিসাব গ্রহণে সক্ষম। ৪০. কিংবা (তাদের কর্মকান্ডের উদাহরণ হচ্ছে) অতল সমুদ্রের অভ্যন্তরস্থ গভীর অন্ধকারের মতো, অতপর তাকে একটি বিশাল আকারের ঢেউ এসে ঢেকে (আরো অন্ধকার করে) দিলো, তার ওপর আরো একটি ঢেউ (এলো), তার ওপর (ছেয়ে গেলো কিছু) ঘন কালো মেঘ; এক অন্ধকারের ওপর (এলো) আরেক অন্ধকার; যদি কেউ (এ অবস্থায়) তার হাত বার করে, (আঁধারের কারণে) তার তা দেখার কোনো সম্ভাবনা থাকবে না; বস্তুত আল্লাহ তায়ালা যার জন্যে কোনো আলো বানাননি তার জন্যে তো (কোথাও থেকে) আলো থাকবে না।

রুকু ৬

৪১. (হে মানুষ,) তুমি কি (ভেবে) দেখোনি, যতো (সৃষ্টি) আসমানসমূহ ও পৃথিবীতে আছে, তারা (সবাই) আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে, আর পাখীকুল– যারা পাখা বিস্তার করে (আকাশে ওড়ে চলেছে), তারা সবাইও (এ কাজ করে চলেছে,) তিনি তার সৃষ্টির প্রত্যেকের প্রশংসা ও মহিমা ঘোষণার পদ্ধতি জানেন; এরা যে যা করছে আল্লাহ তায়ালা তা সম্যক অবগত রয়েছেন। ৪২. (মূলত) আসমানসমূহ ও যমীনের যাবতীয় সার্বভৌমত্ব একমাত্র

اللّٰهِ الْمَصِيْرُ ﴿٤٢﴾ اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُزْجِيْ سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهٗ ثُمَّ
يَجْعَلُهٗ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلٰلِهٖ ۚ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ
جِبَالٍ فِيْهَا مِنْۢ بَرَدٍ فَيُصِيْبُ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ وَيَصْرِفُهٗ عَنْ مَّنْ يَّشَآءُ ؕ يَكَادُ
سَنَا بَرْقِهٖ يَذْهَبُ بِالْاَبْصَارِ ﴿٤٣﴾ يُقَلِّبُ اللّٰهُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ
لَعِبْرَةً لِّاُولِى الْاَبْصَارِ ﴿٤٤﴾ وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَآبَّةٍ مِّنْ مَّآءٍ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ
يَّمْشِيْ عَلٰى بَطْنِهٖ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِيْ عَلٰى رِجْلَيْنِ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِيْ
عَلٰۤى اَرْبَعٍ ؕ يَخْلُقُ اللّٰهُ مَا يَشَآءُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٤٥﴾

আল্লাহরই জন্যে, (সব কিছুকে) তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে। ৪৩. তুমি কি দেখো না, আল্লাহ তায়ালাই (এ) মেঘমালা সঞ্চালিত করেন, অতপর তিনি তাকে (তার টুক্‌রোগুলোর) সাথে জুড়ে দেন, তারপর তাকে স্তরে স্তরে সাজিয়ে (পুঞ্জীভূত করে রাখেন), অতপর এক সময় তুমি মেঘের ভেতর থেকে বৃষ্টি (-র ফোঁটাসমূহ) বেরিয়ে আসতে দেখবে, (আরো দেখবে) আসমানের শিলাস্তর থেকে তিনি শিলা বর্ষণ করেন এবং যার ওপর চান তার ওপর তা বর্ষণ করেন, (আবার) যাকে চান তাকে তিনি তার (আঘাত) থেকে অব্যাহতিও দেন; মেঘের বিদ্যুত ঝলক (চোখে ধাঁধা লাগিয়ে দেয়), মনে হয় তা বুঝি দৃষ্টি (-শক্তিকে এক্ষুণি) নিষ্প্রভ করে দিয়ে যাবে; ৪৪. আল্লাহ তায়ালাই রাত ও দিনের পরিবর্তন ঘটান; অবশ্যই অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষদের জন্যে এর মাঝে (আল্লাহ তায়ালার কুদরতের) অনেক শিক্ষা রয়েছে। ৪৫. আল্লাহ তায়ালা বিচরণশীল প্রতিটি জীবকেই পানি থেকে পয়দা করেছেন, অতপর তাদের মধ্যে কিছু চলে তার বুকের ওপর ভর দিয়ে, কিছু চলে দু'পায়ের ওপর, (আবার) কিছু চলে চার (পা)-এর ওপর (ভর করে); আল্লাহ তায়ালা যখন যা চান তখন তাই পয়দা করেন, অবশ্যই তিনি সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান।

তাফসীর

আয়াত ৩৫-৪৫

পূর্ববর্তী দুটো অধ্যায়ে মানব চরিত্রের নিকৃষ্টতম নৈতিক দোষগুলো আলোচিত হয়েছে। এর উদ্দেশ্য মানব চরিত্রকে এগুলো থেকে সংশোধন করে নির্মল পবিত্র ও জ্যোতির্ময় করা। এই নৈতিক দোষগুলো হচ্ছে মানুষের রক্ত মাংস থেকে উদ্ভূত যৌন কামনা ও কু-দৃষ্টি, মানুষের প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ ও কুৎসা রটনা এবং অপবাদ আরোপকারীর প্রতি আক্রোশ ও প্রতিশোধের স্পৃহা। অশ্লীলতাকে যাতে ব্যক্তির চরিত্র, সমাজ জীবন ও কথাবার্তা সব কিছু থেকে উচ্ছেদ করা যায় সে জন্যে ব্যভিচারের শাস্তি ও অপবাদের শাস্তি কঠোরভাবে আরোপ করা হয়েছে। সরলমনা, সতী ঈমানদার নারীদের প্রতি অপবাদ আরোপের এক জঘন্য ও পৈশাচিক নমুনা তুলে ধরা হয়েছে এবং কতিপয় সতর্কতামূলক ও নিরাপত্তামূলক বিধি জারী করা হয়েছে।

যেমন, বাড়ীতে প্রবেশের পূর্বে অনুমতি লাভ, দৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ, সৌন্দর্য ও সাজসজ্জা গোপন করণ, কামোত্তেজক উপকরণসমূহ নিষিদ্ধকরণ, বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী উপকরণসমূহ নিষিদ্ধকরণ,বিয়ের যোগ্য নরনারীর বিয়ের ব্যবস্থা করা, বেশ্যাবৃত্তির উচ্ছেদ ও দাসমুক্তি প্রভৃতি। এসব বিধির উদ্দেশ্য হলো রক্ত ও মাংস থেকে উদ্ভূত কাম বাসনা নিবৃত্ত করা এবং মানুষের সতিত্ব, সততা, শ্লীলতা ও স্বচ্ছতা রক্ষার ব্যবস্থা করা।

অপবাদ আরোপ সংক্রান্ত ঘটনার জের হিসেবে যে আক্রোশ ও প্রতিশোধ স্পৃহা জাগ্রত হয় এবং মূল্যবোধের ক্ষেত্রে যে বিপর্যয় সৃষ্টি হয় ও যে উদ্বেগের সঞ্চার হয়, ঘটনার শেষে তার সমাধান আলোচিত হয়েছে। এ সমাধানের পর রসূল (স.), হযরত আয়েশা, হযরত আবুবকর সাফওয়ান বিন মোয়াত্তাল সকলেই শান্ত, পরিতৃপ্ত ও সন্তুষ্ট হয়ে যান। আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত সাক্ষ্য ও অপবাদ দূরীকরণে সবার মন প্রসন্ন ও উৎফুল্ল হয়ে যায়। সাধারণ মুসলমানরাও আল্লাহর দিকে রুজু হয়ে যায় এবং তাওবা করে। তাদের মনের সকল ক্লেদ ও বিভ্রান্তি দূর হয়ে যায়, সবার মন আল্লাহর অনুগ্রহ ও পথ নির্দেশনা লাভে কৃতজ্ঞতায় পরিপ্লুত হয়।

আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন আসমান ও যমীনের নূর

এরূপ নির্মল ও চমকপ্রদ শিক্ষা ও দিক নির্দেশনার মাধ্যমে মানুষকে পরিশুদ্ধ করা হয়েছে। এর ফলে পরিশুদ্ধ মানুষগুলো আল্লাহর জ্যোতিতে জ্যোতির্ময় হয়েছে এবং আকাশ ও পৃথিবীর মুক্ত দিগন্তে মহান আল্লাহর বৃহত্তম জ্যোতি লাভ করে আপন অন্তরাত্মাকে উদ্ভাসিত করেছে। শুধু উদ্ভাসিতই করেনি, বরং জ্যোতির্ময় এক জগতে নিজেকে নিরন্তর আল্লাহর নূর লাভের যোগ্যও বানিয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'আল্লাহ তায়ালা আকাশ ও পৃথিবীর জ্যোতি। ....

এই চমকপ্রদ বাক্যটা উচ্চারিত হওয়ার সাথে সাথেই উজ্জ্বল দিক নির্দেশক আলো গোটা জগতে ছড়িয়ে পড়ে, সমগ্র সৃষ্টিজগতকে তা উদ্ভাসিত করে, মানব জাতির সমগ্র চিন্তা চেতনা ও অংগ প্রত্যংগে দেদিপ্যমান করে। সকল আবেগ ও অনুভূতিকে পরিপ্লুত করে, আর এই নয়নাভিরাম জ্যোতির দিগন্তপ্লাবী জোয়ারে সমগ্র সৃষ্টিজগত আল্লাহর তাসবীহ করে, এই জ্যাতিকে সকলের চোখ আলিংগন করে, সকল পর্দা অপসৃত হয়, সকল অন্তর দর্পণের মতো স্বচ্ছ হয়, সকল আত্মা আনন্দে উদ্বেলিত হয়, আলোর বন্যায় প্লাবিত সমগ্র বিশ্ব প্রকৃতিতে সকল সৃষ্টি তাসবীহ পাঠ করতে থাকে। আলোর সমুদ্রে অবগাহন করে সকল জিনিস পবিত্র হয়ে যায়, প্রত্যেক জিনিস স্বীয় কলুস কালিমা ও মরিচা থেকে মুক্ত হয়ে যায়। ফলে সর্বত্র ওড়ে স্বাধীনতা ও মুক্তির পতাকা, অনুষ্ঠিত হয় জ্ঞান ও মিলনের মহোৎসব। প্রীতি, ভালোবাসা, আনন্দ ও খুশীর মহা সমারোহ। সমগ্র সৃষ্টিজগত ও তার অভ্যন্তরে বিদ্যমান সকল বস্তু ও প্রাণী সব রকমের বাধা ও সীমানার বন্ধনমুক্ত এমন এক আলোয় আলোকিত হয়ে যায়, যার মধ্যে আকাশ ও পৃথিবী মিলিত হয়ে একাকার হয়ে যায়, সকল জড় ও প্রাণী, সকল নিকট ও দূরের সৃষ্টি, সকল পাহাড় ও সমতল প্রান্তর, সকল গোপন ও প্রকাশ্য বস্তু এবং সকল হৃদয় ও অনুভূতি এক দেহে লীন হয়ে যায় ।

'আল্লাহ তায়ালা আকাশ ও পৃথিবীর জ্যোতি।'

অর্থাৎ যে জ্যোতি থেকে আকাশ ও পৃথিবীর অস্তিত্বের ডদ্ভব ঘটেছে এবং যে জ্যোতি দ্বারা আকাশ ও পৃথিবীর শৃংখলা রক্ষিত ও বিধি ব্যবস্থা পরিচালিত হচ্ছে, আল্লাহ তায়ালাই সেই জ্যোতি। এই জ্যোতিই বিশ্ব জগতকে অস্তিত্ব দান করে এবং এর নিয়ম শৃংখলা ও বিধিব্যবস্থা রচনা করে।.........মানব জাতি সাম্প্রতিককালে তাদের বিজ্ঞানের শক্তি দ্বারা এই নিগুঢ়তম তত্ত্বের

কিছু অংশ উপলব্ধি করতে পেরেছে। তাদের হাতেই যখন এটম বা অনু ভেদে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে বস্তুকে নিছক আলোকরশ্মীতে রূপান্তরিত করেছে, তখন তারা স্বচক্ষেই দেখতে পেরেছে যে, বস্তুর মূল উৎস আলো ছাড়া আর কিছু নয়। বস্তুর প্রতিটা অনু বহুসংখ্যক ইলেকট্রনের সমষ্টি মাত্র, যাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করলে একটা রশ্মীর আকার পরিগ্রহ করে এবং যার সারাংশ আলো ছাড়া আর কিছু নয়। মানুষের অন্তর এই সুক্ষ্মতম ও নিগুঢ়তম সত্যকে বিজ্ঞানের অভ্যুদয়ের শত শত বছর আগেই অনুধাবন করতে পেরেছিলো। মন যখন স্বচ্ছ ও পরিষ্কার থাকতো এবং আলোর জগতে পরিভ্রমণ করতো, তখন এ সত্য অনুধাবন করতো। রসূলের হৃদয় এ সত্যকে তায়েফ থেকে ফেরার সময় পূর্ণাংগভাবে উপলব্ধি করেছিলো। দু'হাত মেলে আল্লাহর আশ্রয় কামনা করে তিনি বলেছিলেন, তোমার সেই আলোর কাছে আশ্রয় চাই, যা সকল অন্ধকারকে উদ্ভাসিত করে দিয়েছে এবং যার কল্যাণে দুনিয়া ও আখেরাতের সব কিছু শুধরে গেছে।' মেরাজের সফরেও তিনি এই সত্যকে অবলোকন করেছিলেন। হযরত আয়েশা (রা.) যখন তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি আপনার প্রভুকে দেখেছেন? তখন তিনি বললেন, 'তিনি তো জ্যোতি। কিভাবে তাঁকে দেখবো?'

তবে মানব সত্ত্বার মধ্যে এই জ্যোতির প্লাবনকে ধারণ ও গ্রহণ করার ক্ষমতা সব সময় দীর্ঘস্থায়ী হয় না। সেই দূর দিগন্তকে দীর্ঘদিন সে পর্যবেক্ষণও করতে পারে না। এই দূর দিগন্তকে আয়াতে স্পষ্ট করে দেয়ার পর পুনরায় তার অবস্থান নির্ণয় করার জন্যে এবং একটা সহজ উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দেয়ার জন্যে বলা হচ্ছে,

'তার জ্যোতির দৃষ্টান্ত যেন একটা তাক, তাতে আছে, একটা প্রদীপ, সে প্রদীপটা একটা কাঁচের ফানুসের মধ্যে রয়েছে, কাঁচের ফানুসটা যেন একটা উজ্জ্বল নক্ষত্র, সে প্রদীপ জ্বালানো হয় পূত পবিত্র যয়তুন গাছের তেল দিয়ে, যা পূর্বমুখীও নয়, পশ্চিম মুখীও নয়, আগুন তাকে স্পর্শ না করলেও যেন তার তেল নিজেই উজ্জ্বল আলো দিচ্ছে (আর যদি স্পর্শ করে তাহলে তা হবে) জ্যোতির ওপর জ্যোতি।'

এটা এমন একটা উদাহরণ, যার সাহায্যে সীমাবদ্ধ বোধশক্তিকে একটা অসীম বিষয় বুঝিয়ে দেয়া হয় এবং অনুভূতি শক্তি যখন কোনো জিনিসের আসল রূপ কল্পনা করতে অক্ষম হয়, তখন তার ক্ষুদ্র নমুনাকে চিত্রায়িত করে তার সামনে রাখা হয়। মানবীয় বোধশক্তি যখন আল্লাহর জ্যোতির ব্যাপকতাকে উপলব্ধি করতে অক্ষম হয়, তখন এ উদাহরণ দ্বারা তাকে সে জ্যোতির স্বভাব ও প্রকৃতি কি, তা বুঝিয়ে দেয়া হয়। কেননা তার বোধশক্তি এতো সীমিত ক্ষমতা সম্পন্ন যে, আল্লাহর জ্যোতির ব্যাপকতা ও তার বিশাল বিচরণ ক্ষেত্রকে সে কল্পনা করতে পারে না।

যে জ্যোতি সমগ্র আকাশ ও পৃথিবী জুড়ে বিরাজমান, তাকে এই উদাহরণে আকাশ ও পৃথিবীর বিস্তৃত একে বিশাল ক্ষেত্র থেকে নিয়ে একটা তাকের মধ্যে কেন্দ্রীভূত করা হয়েছে। এই তাক হলো প্রাচীরের গায়ে অবস্থিত জানালার চেয়ে ক্ষুদ্র একটা ফোঁকর। এতে প্রদীপ রাখা হয়। এই ক্ষুদ্র তাকে যখন প্রদীপ রাখা হয়, তখন তার আলো ওর ভেতরে সংকুচিত ও সীমাবদ্ধ হওয়ার কারণে জোরদার ও তীব্র মনে হয়। 'একটা তাকের মতো যার ভেতরে প্রদীপ রয়েছে।' 'প্রদীপটি রয়েছে একটা কাঁচের ফানুসের ভেতরে।' এই কাঁচের ফানুস প্রদীপকে বাতাস থেকে রক্ষা করে, প্রদীপের আলোকে স্বচ্ছ ও তীব্র করে। 'কাঁচের ফানুসটা যেন একটা উজ্জ্বল নক্ষত্র।' অর্থাৎ তা স্বকীয়ভাবেই উজ্জ্বল, দেদিপ্যমান ও আলো বিকীরণকারী। ....এখানে আসল ও উদাহরণের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করা হচ্ছে, নমুনা ও আসলকে পরস্পরের সাথে যুক্ত করা হচ্ছে। ক্ষুদ্র কাঁচের ফানুসকে সুবৃহৎ নক্ষত্রের সাথে তুলনা করার মাধ্যমে আসল ও নমুনার মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা

হচ্ছে, যাতে কল্পনা কেবল ক্ষুদ্র নমুনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে থেকে না যায়, যাকে কেবল সুবৃহৎ আসলকে বুঝানোর জন্যেই ব্যবহার করা হয়েছে। এই তুলনা সম্পন্ন করার পর পুনরায় নমুনার দিকে তথা প্রদীপের দিকে প্রত্যাবর্তন করা হয়েছে। বলা হয়েছে,

'সে প্রদীপ জ্বালানো হয় পূতপবিত্র যয়তুন গাছের তেল দিয়ে।'

এটা সবার জানা ছিলো যে, যয়তুন তেলের প্রদীপ সবচেয়ে স্বচ্ছ আলো দেয়। কিন্তু শুধুমাত্র এ কারণেই এ উদাহরণটা দেয়া হয়নি। বরং পূত পবিত্র যয়তুন গাছ থেকে যে মহিমান্বিত ভাবচিত্রটা পাওয়া যায়, সেটাই এ উদাহরণ দেয়ার মূল কারণ। তূর পর্বত সংলগ্ন সেই পবিত্র উপত্যকার ভাবচিত্রটা এখানে পাওয়া যায়, যা আরব উপদ্বীপের নিকটতম যয়তূন উৎপাদনকারী স্থান। কোরআনে এই যয়তুন গাছের দিকে আরো আভাস ইংগিত দেয়া হয়েছে। যেমন সূরা মোমেনূনে বলা হয়েছে, 'সিনাই এর তূর উপত্যকা থেকে জন্মানো সেই গাছ, যা আহরণকারীদের জন্যে তেল ও রং নিয়ে উৎপন্ন হয়ে থাকে।' যয়তুন একটা দীর্ঘজীবী গাছ, যার তেল, কাঠ, ফল ও পাতা সব কিছুই জনহিতকর। অতপর ক্ষুদ্র নমুনা বাদ দিয়ে পুনরায় বৃহৎ আসলের উল্লেখ করা হচ্ছে। কেননা এই গাছ কোনো নির্দিষ্ট গাছ নয় এবং তা কোনো নির্দিষ্ট স্থান বা দিকের সাথেও সংশ্লিষ্ট নয়। বরং এটা নিছক বুঝানোর জন্যে একটা উদাহরণ মাত্র, 'পূর্বমুখীও নয়, পশ্চিমমুখীও নয়।' এর তেলও এই সুনির্দিষ্ট ও দৃষ্টিগ্রাহ্য তেল নয়, বরং তা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধাঁচের এক বিস্ময়কর তেল, 'আগুন তাকে স্পর্শ না করলেও যেন তার তেল নিজেই উজ্জ্বল আলো দিচ্ছে।' অর্থাৎ তা স্বতই এতো স্বচ্ছ এবং এতো উজ্জ্বল যে, আগুন দিয়ে না জ্বালালেও তা যেন জ্বলে। 'জ্যোতির ওপর জ্যোতি।' এভাবে আমরা চূড়ান্ত পর্যায়ে গভীর ও উদ্ভাসিত জ্যোতির দিকে ফিরে যাই।

আলোকিত মানুষের পরিচয়

বস্তুত আল্লাহর জ্যোতির কল্যাণেই আকাশ ও পৃথিবীর অন্ধকার দূরীভূত হয়ে আলোয় উদভাসিত হয়। এই জ্যোতির প্রকৃত স্বরূপ এবং এর ব্যাপকতা ও বিস্তৃতি আমরা বুঝতে অক্ষম। এ জ্যোতির উল্লেখের উদ্দেশ্য মানুষের মনকে তাঁর দিকে আকৃষ্ট করা ও তাঁর সাথে আত্মার সম্পর্ক সৃষ্টি করার জন্যে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে তোলা ছাড়া আর কিছু নয়।

'তিনি তার জ্যোতির দিকে যাকে চান পথ প্রদর্শন করেন।'

অর্থাৎ যারা নিজেদের হৃদয়কে আল্লাহর জ্যোতি দর্শনের জন্যে উন্মুক্ত করে, তাদের মধ্য থেকে আল্লাহ তায়ালা যাকে যাকে চান এই জ্যোতির দিকে পথ প্রদর্শন করেন, ফলে তারা এই জ্যোতি দেখতে পায়। এই জ্যোতি আকাশ ও পৃথিবীর সর্বত্র বিরাজমান, সর্বত্র বহমান, সর্বত্র সর্বক্ষণ বিদ্যমান। কখনো তার প্রবাহ বন্ধ হয় না, বিচ্ছিন্ন হয় না, নেভে না। যেদিকেই কেউ মনোনিবেশ করে, সেদিকেই সে এই জ্যোতি দেখতে পায়। পথহারা ব্যক্তি যে দিকেই তাকায় এই জ্যোতি তাকে পথ দেখায়। যেখানেই কেউ এই জ্যোতির সন্ধান পায়, সেখানেই সে আল্লাহকে পেয়ে যায়।

আল্লাহ তায়ালা তাঁর জ্যোতি সম্পর্কে যে উদাহরণই দেন, মানুষের কাছে তা সহজবোধ্য করার জন্যেই দেন। কেননা মানুষের বোধশক্তির সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে তিনি জ্ঞাত,

'আল্লাহ মানুষের সুবিধার্থেই উদাহরণ দেন। তিনি সর্ব বিষয়ে জ্ঞাত।'

ওই উন্মুক্ত, সর্বত্র বিরাজমান ও সর্বত্র প্রবহমান জ্যোতি আল্লাহর সেই সব গৃহে দীপ্তিমান, যেখানে আল্লাহর সাথে মানুষের মন মিলিত হয়, আল্লাহর সন্ধান করে, আল্লাহকে স্মরণ করে, আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহর জন্যে নিবেদিত ও উৎসর্গীত হয় এবং পৃথিবীর সকল লোভনীয় সামগ্রীর ওপর আল্লাহকেই অগ্রাধিকার দেয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'এমন সব গৃহে যেগুলোকে আল্লাহ তায়ালা সমুন্নত করার অনুমতি দিয়েছেন এবং তাঁর নাম স্মরণ করার অনুমতি দিয়েছেন, সেসব গৃহে এমন কিছু লোক আল্লাহর মহিমা বর্ণনা করে, যারা ব্যবসায় বাণিজ্য ও বেচাকেনায় লিপ্ত থেকেও আল্লাহর স্মরণ, নামায কায়েম করা ও যাকাত দেয়ার কথা ভোলে না..........। (আয়াত ৩৬-৩৭)

পূর্ববর্তী আয়াতে যে তাকের দৃশ্য এবং ঐ আয়াতে যে গৃহের দৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে, এই উভয়টার মধ্যে একটা যোগসূত্র রয়েছে। সাদৃশ্যপূর্ণ অথবা তার কাছাকাছি দৃশ্যপট তুলে ধরার ব্যাপারে কোরআনে একটা শৈল্পিক সমন্বয়ের রীতি অনুসৃত হয়ে থাকে। সেই রীতি অনুসারেই এখানে এই যোগসূত্র স্থাপন করা হয়েছে। তা ছাড়া তাকে স্থাপিত আলোকদীপ্ত প্রদীপ এবং আল্লাহর ঘরে এবাদাতে লিপ্ত জ্যোতির্ময় হৃদয়গুলোর মধ্যেও একই ধরনের যোগসূত্র রয়েছে।

'যে ঘরগুলোকে সমুন্নত করার জন্যে আল্লাহ অনুমতি দিয়েছেন।'

এই অনুমতি প্রকৃতপক্ষে আদেশ যা বাস্তবায়িত হবার জন্যে দেয়া হয়। তাই সে ঘরগুলো সমুন্নত, মহিমান্বিত ও প্রতিষ্ঠিত। এই ঘরগুলোর সমুন্নত দৃশ্য আকাশ ও পৃথিবীতে দীপ্তিমান জ্যোতির মতোই সমুন্নত এবং তার প্রকৃতিও সমুজ্জ্বল জ্যোতির প্রকৃতির মতোই মহিমান্বিত। এই মহিমান্বিত প্রকৃতি নিয়েই তা আল্লাহর নাম উল্লেখের জন্যে প্রস্তুত। এবং তাতে আল্লাহর নাম স্মরণ করারও অনুমতি দিয়েছেন। উজ্জ্বল, পবিত্র, ভয়ে কম্পমান, তাসবীহ পাঠরত, নামাযে লিপ্ত ও যাকাত প্রদানকারী হৃদয়সমূহ সে মহিমান্বিত ঘরগুলোর সাথে সুসমন্বিত। এই হৃদয়গুলো সেই সব লোকের,

'যারা কোনো ব্যবসা বাণিজ্য ও কেনাবেচায় লিপ্ত হয়েও আল্লাহর স্মরণ, নামায কায়েম করা ও যাকাত দেয়ার কথা ভোলে না।'

ব্যবসায় বাণিজ্য ও ক্রয় বিক্রয় পার্থিব সম্পদ উপার্জনের উদ্দেশ্যেই করা হয়ে থাকে। এসব কাজ করেও তারা নামাযের মাধ্যমে আল্লাহর হক প্রদান এবং যাকাতের মাধ্যমে বান্দার হক প্রদানে শৈথিল্য প্রদর্শন করে না।

'তারা সেই দিনকে ভয় করে, যেদিন হৃদয়সমূহ ও দৃষ্টিসমূহ ওলটপালট হতে থাকবে।'

অর্থাৎ ক্রমাগত ভয়াবহ দৃশ্যসমূহ দেখার কারণে দৃষ্টি ও হৃদয় ওলটপালট হতে থাকবে এবং কোনো একটা ভয়াল দৃশ্যের ওপর তা স্থির হয়ে থাকবে না। আর তারা সেই দিনকে ভয় পায় বলেই ব্যবসায় বাণিজ্যে লিপ্ত থেকেও নামায, যাকাত ও আল্লাহর স্মরণ থেকে উদাসীন হয় না।

আর এই ভয়ের পাশাপাশি তারা আল্লাহর পুরস্কারেরও আশা করে

'যেন আল্লাহ তাদেরকে তাদের সর্বোত্তম কাজের পুরস্কার দেন এবং নিজ অনুগ্রহে আরো কিছু বেশী প্রদান করেন।'

বস্তুত আল্লাহর অনুগ্রহ সম্পর্কে তাদের আশা কখনো বৃথা যাবে না।

'আল্লাহ তায়ালা যাকে চান বিনা হিসাবে দান করেন।'

অর্থাৎ তার সীমাহীন করুণা ও অনুগ্রহ থেকে বিনা হিসেবে দান করেন।

কুফরীর অন্ধকারে আল্লাহর নূরের অবস্থান সম্ভব নয়

আকাশ ও পৃথিবী জুড়ে বিরাজমান, আল্লাহর ঘরগুলোতে দেদিপ্যমান এবং মোমেনদের হৃদয়ে প্রোজ্জ্বল জ্যোতির ঠিক বিপরীত আর একটা জগতকে তুলে ধরা হচ্ছে পরবর্তী আয়াতে। এ জগত হচ্ছে অন্ধকারাচ্ছন্ন, ভয়াবহ ও বিপজ্জনক এক জগত, যেখানে কোনো কল্যাণ নেই। এ জগত

হচ্ছে কুফরীর জগত এবং কাফেরদের আবাস ভূমি, যারা কুফরী করেছে তাদের কাজগুলো মরুভূমিতে মরীচিকার মতো, যাকে পিপাসিত পথিক পানি মনে করে, কিন্তু তার কাছে এলেই দেখে তা কিছু নয়, সেখানে আল্লাহকে পায় এবং তিনি তাব হিসাব পুরোপুরি বুঝিয়ে দেন। ....(আয়াত ৩৯-৪০)

এ আয়াতে কাফেরদের অবস্থা ও শোচনীয় পরিণামের দৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে। এই দুটো দৃশ্য বড়ই বিস্ময়কর, চঞ্চল ও জীবন্ত।

প্রথম দৃশ্যটাতে তাদের কৃতকর্মকে একটা বিস্তীর্ণ উন্মুক্ত প্রান্তরে মরিচিকার সাথে তুলনা করা হয়েছে। এই মরীচিকায় একটা প্রতারণাময় মিথ্যে চমক দেখা যায়। তৃষ্ণার্ত পথিক এই আশায় এগিয়ে যায় যে, সেখানে পানি আছে এবং তৃষ্ণা নিবারণ করা যাবে। কিন্তু সেখানে আসলে কী রয়েছে, তা সে জানেনা। সহসা সে দৃশ্যপট এক প্রচন্ড ঝাঁকুনি দেয় পথিককে। সে পানির আশায় সেখানে পৌঁছে যায়। কিন্তু পানি পায় না এবং তার পিপাসাও মেটে না। বরং সেখানে এসে সে এমন এক আকস্মিক দৃশ্যের মুখোমুখী হবে, যা তার চেতনা হরণ করবে এবং এমন এক ভয়াবহ দৃশ্য দেখবে, যা তাকে উন্মাদ করে তুলবে,

'তার কাছে আল্লাহকে পায়।'

যে আল্লাহকে সে অমান্য ও অগ্রাহ্য করেছে, যে আল্লাহর সাথে শত্রুতা পোষণ করেছে, সেই আল্লাহকেই সে তার জন্যে অপেক্ষমান দেখতে পাবে। এ ধরনের আকস্মিক পরিস্থিতিতে সে যদি একজন মানুষকেও পেতো, তাহলেও সে ভড়কে যেতো। কেননা সে সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত। সুতরাং আল্লাহকে পেলে যে কী অবস্থা হবে, তা তো বলারই অপেক্ষা রাখে না। কেননা আল্লাহ তায়ালা মহা শক্তিশালী, মহা প্রতাপশালী ও প্রতিশোধ গ্রহণকারী।

'তিনি তাকে সমস্ত হিসাব বুঝিয়ে দেন।'

এরূপ দ্রুত ও আকস্মিকভাবে সমস্ত হিসাব বুঝিয়ে দেন।

'আর আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।'

এ মন্তব্যটা ওই আকস্মিক ও ভয়াবহ দৃশ্যের সাথে সংগতিপূর্ণ।

মরীচিকার মিথ্যে প্রতারণাময় দৃশ্যের পর দ্বিতীয় দৃশ্যে অন্ধকারকে দেখানো হচ্ছে। এই ভয়াল দৃশ্য অথৈ সমুদ্রের অন্ধকারের মধ্যে প্রতিফলিত। সেই অথৈ সমুদ্রে তরংগের পর তরংগ এবং তার ওপর মেঘমালা বিরাজমান। ঘুটঘুটে প্রগাঢ় অন্ধকার। সে অন্ধকার এতো গাঢ় যে, চোখের সামনে হাত মেলে ধরলেও তা দেখা যায় না।

এ অন্ধকার কুফরী ছাড়া আর কিছু নয়। কেননা কুফরী সারা বিশ্বজগত জুড়ে প্রবহমান আল্লাহর জ্যোতি থেকে বিচ্ছিন্ন। এ অন্ধকার গোমরাহীর অন্ধকার, যার ভেতরে হেদায়াতের নিকটতম চিহ্নও অন্তরচক্ষুতে ধরা পড়ে না। এ অন্ধকার ভীতির অন্ধকার, যার উপস্থিতিতে স্বস্তি ও স্থিতি নিশ্চিহ্ন হয়ে যয়।

'আর যাকে আল্লাহ তায়ালা জ্যোতি দেননি, তার আর কোনো জ্যোতি নেই।'

কেননা আল্লাহর জ্যোতি হৃদয়ে সঠিক পথের সন্ধান দেয়, অন্তর্দৃষ্টি খুলে দেয়, আল্লাহর যে প্রাকৃতিক বিধান আকাশ ও পৃথিবীতে কার্যকর, তার সাথে মানুষের প্রকতির সংযোগ ও সমন্বয় ঘটায় এবং এগুলোর সম্মেলনই হলো আকাশ ও পৃথিবীর জ্যোতি।

সুতরাং এই জ্যোতির সাথে যার সংযোগ ঘটে না, সে এমন অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত হয় যেখান থেকে আর কখনো আলোর মুখ দেখা যায় না, এমন ভীতিতে নিক্ষিপ্ত হয় যেখান থেকে আর

নিরাপত্তার মুখ দেখা যায় না এবং এমন ভ্রষ্টতায় নিক্ষিপ্ত হয়, যেখান থেকে সুপথ প্রাপ্তির আর আশা থাকে না। আয়াত দুটোতে বলা হয়েছে যে, কাফেরদের সৎ কাজের ফল মরীচিকার মতো, যা ধ্বংস ও আযাবে পর্যবসিত হয়। কেননা আকীদা ও ঈমান ছাড়া কোনো কর্ম গ্রহণযোগ্য হয় না। আল্লাহর হেদায়াতই একমাত্র হেদায়াত এবং আল্লাহর জ্যোতিই একমাত্র জ্যোতি।

বিশ্ব প্রকৃতিতে বিরাজমান আল্লাহর কিছু নিদর্শন

এতো গেলো মানব জগতে কুফরী, গোমরাহী ও অন্ধকারের দৃশ্য। এরপরই আসছে সুবিশাল বিশ্ব প্রকৃতিতে ঈমান, হেদায়াত ও জ্যোতির দৃশ্য। এই দৃশ্যপটে গোটা বিশ্বজগত ও তার যাবতীয় বস্তু ও প্রাণী আল্লাহর তাসবীহ পাঠরত অবস্থায় দৃশ্যমান। জ্বিন, মানুষ সহায় সম্পদ আকাশ, জীব ও জড় সবই এখানে আল্লাহর গুণকীর্তনরত এবং তা উপলব্ধি করলে মানুষের স্নায়ুমন্ডলী শিউরে ওঠে,

'তুমি কি দেখোনি যে, আকাশ ও পৃথিবীতে বিরাজমান সব কিছু এবং কাতারে কাতারে উড্ডয়নরত পাখিকুল আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করে? সকলেই নিজ নিজ নামায ও তাসবীহ কিরূপ, তা জেনে নিয়েছে। তোমরা যা যা করো, তা আল্লাহ জানেন। (আয়াত ৪১)

এই সুপরিসর প্রকৃতির জগতে মানুষ একা নয়। তার চার পাশে, তার ডানে বামে, ওপরে নীচে, যে দিকে তার চোখ যায় এবং যে দিকে তার কল্পনা বিস্তৃত হয়, সর্বত্রই তার ভাইয়েরা রয়েছে। আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যেই এই সব ভাই রয়েছে। তাদের হরেক রকম স্বভাব, হরেক রকম আকৃতি এবং হরেক রকম চেহারা। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তারা সবাই আল্লাহর বান্দা হিসেবে একাকার, আল্লাহর দিকে নিবিষ্ট চিত্ত এবং আল্লাহর প্রশংসায় পঞ্চমুখ,

'তাদের কর্মকান্ড সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা অবহিত।'

কোরআন মানুষকে তার চার পাশে আকাশ ও পৃথিবীর অভ্যন্তরে আল্লাহর যতো সৃষ্টি রয়েছে, সেই সব সৃষ্টিকে পর্যবেক্ষণ করতে নির্দেশ দিয়েছে, তারা যে আল্লাহর প্রশংসা করে ও আল্লাহকে ভয় করে তা উপলব্ধি করতে বলেছে এবং যা সে প্রতিনিয়তই দেখে, কিন্তু তা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে না। সেই দৃশ্যটা হলো আল্লাহর তাসবীহ পাঠরত অবস্থায় ডানা মেলে উড্ডয়নরত পাখিকুলের দৃশ্য।

'প্রত্যেকেই নিজ নিজ নামায ও তাসবীহ কি রকম তা জেনে নিয়েছে।'

আর মানুষই হচ্ছে আল্লাহর একমাত্র সৃষ্টি, যে স্বীয় প্রভুর তাসবীহ সম্পর্কে সচেতন নয়। অথচ ঈমান, তাসবীহ ও নামায পড়ার দায়িত্বটা মানুষেরই সবচেয়ে বেশী।

সমগ্র সৃষ্টিজগত মহান আল্লাহর অনুগত, তাঁর তাসবীহ পাঠরত ও নামায পাঠরত। এটা সকল সৃষ্টির স্বভাবগত। আল্লাহর প্রাকৃতিক বিধির আনুগত্যের মধ্য দিয়েই সে আল্লাহর আনুগত্য করে। মানুষের মন যখন স্বচ্ছ ও নির্মল থাকে, তখন সে সৃষ্টিজগতের এই আনুগত্য এমনভাবে উপলব্ধি করে যেন সে তা দেখতে পায়। সৃষ্টি জগতের প্রতিটি ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়াকে সে এমনভাবে শুনতে পায় যে, তা তার কাছে আল্লাহর তাসবীহের মতোই মনে হয়। মহাবিশ্বের প্রতিটি সৃষ্টি অপর সৃষ্টির তাসবীহ ও নামাযে অংশীদার হয়। রসূল (স.)ও চলার পথে নিজের পায়ের নীচের পাথরের টুকরোগুলোর তাসবীহ শুনতে পেতেন। হযরত দাউদ (আ.)ও যখন আল্লাহর কেতাব পাঠ করতেন তখন তার সাথে পাহাড় পর্বত ও পাখিকুলও শরীক হতো।

'আকাশ ও পৃথিবীর রাজত্ব আল্লাহর এবং আল্লাহর দিকেই (প্রতিটি সৃষ্টিকে) প্রত্যাবর্তন (করতে হবে)।'

তাই আল্লাহর দিকেই সকলের চিত্ত নিবিষ্ট করতে হবে, তার কাছেই সকলকে আশ্রয় নিতে হবে, তার মুখোমুখি না হয়ে কারো গত্যন্তর নেই, তার আযাব থেকে কেউ কাউকে রক্ষা করতে পারে না এবং আল্লাহর দিকেই সকলের শেষ প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

সৃষ্টি জগতের আরো একটা দৃশ্য এমন রয়েছে, যা মানুষ দেখেও না দেখার ভান করে উদাসীনভাবে চলে যায়। অথচ এতে চোখের জন্যেও আনন্দ রয়েছে, মনের জন্যেও শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। এতে আল্লাহর সৃষ্টি ও নিদর্শন নিয়ে যথেষ্ট চিন্তা ভাবনার সুযোগ রয়েছে এবং হেদায়াত জ্যোতি ও ঈমানের সাক্ষ্য প্রমাণগুলোতে চিন্তা গবেষণার বিষয় রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'তুমি কি দেখোনি যে, আল্লাহ তায়ালা মেঘমালাকে পরিচালিত করেন, অতপর এক মেঘকে অপর মেঘের সাথে মিলিত করেন, অতপর সেগুলোকে স্তূপীকৃত করেন, অতপর.....।' (আয়াত ৪৩)

এখানে দৃশ্যটা বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হচ্ছে এবং এর বিভিন্ন অংশ নিয়ে চিন্তা ভাবনা করার আহ্বান জানানো হচ্ছে। এ সব বিবরণের আসল উদ্দেশ্য হলো মানুষের অন্তরকে সচকিত করা ও জাগ্রত করা, তাকে চিন্তা ভাবনা করতে ও শিক্ষা গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করা এবং তার পশ্চাতে আল্লাহর যে গভীর সৃষ্টি রহস্য লুকিয়ে আছে, তা নিয়ে গবেষণা করতে আগ্রহী করে তোলা।

আল্লাহর হাত মেঘমালাকে সঞ্চালিত করে এবং এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তরিত করে, অতপর সেগুলোকে একত্রিত করে। এভাবে মেঘমালার স্তূপ জমা হয়। এই স্তূপ যেই ভারী হয়, অমনি তা থেকে পানি বের হয়। পানি ভর্তি মেঘমালা প্রকান্ড পর্বতের আকার ধারণ করে এং তাতে ছোট ছোট তুষার খন্ড থাকে। মেঘমালার দৃশ্য পাহাড় পর্বতের দৃশ্যের মতই। এ দৃশ্য বিমান আরোহীরা যেমন নিখুঁতভাবে দেখতে পায়, তেমন আর কেউ দেখতে পায় না। বিমান মেঘের ওপরে চলে গেলে বা মেঘের ভেতর দিয়ে চলতে থাকলে তা যথাযর্থই পাহাড় পর্বতের মতো দেখা যায়। পাহাড় পর্বতের মতোই তার বিশালত্ব, তার চড়াই-উৎরাই ও খাদ দেখা যায়। এখানে এমন একটা সত্য ছবির আকারে দেখানো হয়েছে, যা মানুষ বিমানে আরোহণ করার আগে কখনো দেখেনি।

এই সব পাহাড় পর্বত আল্লাহর হুকুমের অনুগত। আল্লাহর যে প্রাকৃতিক বিধান সৃষ্টিজগতকে পরিচালনা করে, সেই বিধান অনুসারেই এসব পাহাড় পর্বত চলে। আর এই প্রাকৃতিক বিধান অনুসারেই আল্লাহ তায়ালা যাকে চান বৃষ্টি দেন এবং যাকে চান তা থেকে বঞ্চিত করেন। এই বিশাল দৃশ্যপটের বিবরণ যে বাক্য দ্বারা পূর্ণতা লাভ করেছে তা হলো,

'সে মেঘের বিদ্যুতের চমক এমন যেন সে দৃষ্টি শক্তি কেড়ে নিতে চায়।'

এভাবে বিশাল জ্যোতির্ময় বিশ্বের পরিবেশের সাথে পূর্ণ সমন্বয় সাধিত হয়েছে।

এরপর আসছে তৃতীয় প্রাকৃতিক দৃশ্য। এটা হলো রাত ও দিনের দৃশ্য।

'আল্লাহ তায়ালা রাত ও দিনের আবর্তন ঘটান। নিশ্চয়ই এতে অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন লোকদের জন্যে শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে।'

যে অটুট শৃংখলার মধ্য দিয়ে রাত ও দিনের আবর্তন চলছে, তা মানুষ মাত্রেরই অন্তরে সাড়া জাগায় এবং সৃষ্টি জগতকে নিয়ন্ত্রণকারী প্রাকৃতিক বিধান ও আল্লাহর সৃষ্টি বৈচিত্র্য নিয়ে চিন্তা ভাবনা করার প্রেরণা যোগায়। কোরআন এই সব প্রাকৃতিক দৃশ্যের দিকে মানুষকে মনোনিবেশ করার নির্দেশ দেয়, যাতে সে নিত্য নতুন চেতনা ও অনুভূতি নিয়ে চিন্তা ও গবেষণা করে। বস্তুত দিন ও রাতের আবর্তনের বিস্ময়কর দৃশ্য নিয়ে মানুষ যখন প্রথম চিন্তা গবেষণা করে, তখন সেটা তার কাছে খুবই আনন্দদায়ক লাগে। অথচ এই আবর্তন আবহমান কাল ধরে যেমন ছিলো তেমনি আছে। এতে কোনোই পরিবর্তন আসেনি। এর সৌন্দর্যে ও মনোহরত্বে কোনো রদবদল হয়নি। কেবল মানুষের মনেই মরিচা ধরেছে এবং নির্জীবতা এসেছে। তাই তার ভেতরে এর আর কোনো উপলব্ধি জন্মে না। প্রকৃতির এসব বৈশিষ্ট্য, যা আমাদের প্রথম অনুভূতিকে আনন্দ দিয়েছিলো, এসব বৈশিষ্ট্যের কাছ দিয়ে উদাসীনভাবে অতিক্রম করার সময় আমাদের আয়ুষ্কালের বিরাট অংশ নষ্ট হয়ে যাবে এবং এই সৃষ্টি জগতের সৌন্দর্যের অনেকাংশই আমাদের কাছ থেকে হারিয়ে যাবে।

কোরআন আমাদের নির্জীব অনুভূতিকে সজীব ও ঘুমন্ত স্নায়ুতন্ত্রীকে জাগ্রত করে, যাতে আমরা এই সৃষ্টি জগতকে প্রথমবার যেভাবে দেখেছিলাম, সেভাবে দেখি ও উপভোগ করি। প্রত্যেকটা প্রাকৃতিক দৃশ্যের সামনে আমরা দাঁড়াবো এবং তার অন্তর্নিহিত রহস্য নিয়ে তার কাছে প্রশ্ন করবো। তাহলে আমাদের চার পাশে প্রতি মুহূর্তে আল্লাহর সৃজনশীল হাতকে সক্রিয় দেখতে পাবো, তাঁর সৃষ্টি নৈপুন্য লক্ষ্য করবো এবং সমগ্র সৃষ্টিতে ছড়িয়ে থাকা তার নিদর্শনাবলী থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবো।

মহান আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে সাহায্য করতে চান। আমরা যখনই কোনো সৃষ্টির একটি বৈশিষ্ট্যের দিকে তাকাই, তখনই একবার সে সৃষ্টিটাকে আমাদের হাতে অর্প ৭২ণ করেন। এই সময় আমরা সে সৃষ্টিকে উপলব্ধি করার নেয়ামতটাকে এমনভাবে উপভোগ করি, যেন তাকে প্রথম দেখলাম। এভাবে গোটা সৃষ্টিকে আমরা অসংখ্যবার দেখি ও উপভোগ করি। এভাবে প্রতিবারই যেন তাকে নতুন করে পাই এবং নতুন করে ভোগ করি।

এই সৃষ্টিজগত বড়ই সুন্দর এবং মনোরম। এ সৃষ্টিজগতের স্বভাব প্রকৃতির সাথে আমাদের স্বভাবেরও মিল রয়েছে। কেননা এ জগতের ও আমাদের উৎসও অভিন্ন এবং উভয়কে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনাকারী প্রাকৃতিক বিধানও অভিন্ন। তাই এই সৃষ্টিজগতের সাথে তাল মিলিয়ে চললে আমরা শান্তি ও সখ্যতা অনুভব করি এবং অদেখা নিকটাত্মীয়ের সাথে পরিচিত ও মিলিত হলে যেমন আনন্দ পাওয়া যায় তেমনি আনন্দ পাই। সেখানে আমরা আল্লাহর জ্যোতিও পাই। কেননা আল্লাহ তায়ালা আকাশ ও পৃথিবীর জ্যোতি। তাকে আমরা প্রকৃতির মাঝেও পাই, নিজেদের সত্ত্বার মাঝেও পাই। যে মুহূর্তে সচেতন অনুভূতি দিয়ে এ বিশ্ব জগতকে প্রত্যক্ষ করি, ঠিক সেই মুহূর্তেই আল্লাহর জ্যোতিকে দেখতে পাই। উন্মুক্ত হৃদয় ও শানিত চিন্তার মাধ্যমে যখনই সৃষ্টিকে অবলোকন করি, তখন তা দেখতে পাই।

এ জন্যেই কোরআন আমাদেরকে বারংবার জাগ্রত করে, আমাদের আত্মা ও চেতনাকে সৃষ্টির বিভিন্ন দৃশ্য নিয়ে চিন্তা গবেষণা করতে উদ্বুদ্ধ করে, যাতে আমরা অবচেতন ও উদাসীনভাবে চোখ বুজে সেগুলোর কাছ দিয়ে অতিক্রম না করি। কেননা এরূপ করলে আমাদের পার্থিব জীবনের সফরটা হবে সম্পূর্ণ নিষ্ফল অথবা স্বল্প লাভজনক।

এরপরও প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী তুলে ধরা অব্যাহত রয়েছে। অব্যাহত রয়েছে আমাদেরকে প্রকৃতি পর্যবেক্ষণে উদ্বুদ্ধ করার কাজও। পরবর্তী আয়াত আমাদের কাছে জীবনের অভিন্ন উৎস, অভিন্ন স্বভাব ও প্রকৃতি, অতপর সেই উৎস ও স্বভাবের অভিন্নতা সত্ত্বেও বিভিন্ন বৈচিত্রের উল্লেখ করেছে। যেমন,

'আল্লাহ্ প্রত্যেক প্রাণীকে পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন, অতপর তাদের কেউ পেটের ওপর ভর করে চলে, কেউ দু'পায়ে এবং কেউ চার পায়ে চলে।.........' (আয়াত ৪৫)

এতো সহজ ভাষায় যে বিরাট সত্যটা কোরআন পেশ করছে, অর্থাৎ সকল প্রাণীর পানি থেকে সৃষ্টি হওয়ার সত্যটা, এ দ্বারা এ কথাও বুঝানো হয়ে থাকতে পারে যে, যাবতীয় প্রাণীর সৃষ্টির ক্ষেত্রে পানিই অভিন্ন মৌল উপাদান। আবার এ দ্বারা এ কথাও বুঝানো হয়ে থাকতে পারে, যা আধুনিক বিজ্ঞান প্রমাণ করতে সচেষ্ট যে, প্রাণের সৃষ্টি হয়েছে সমুদ্র থেকে এবং মূলত পানির মধ্যেই তা জন্মেছে। অতপর তা বিচিত্র রূপ ধারণ করেছে ও বিভিন্ন জাতিতে পরিণত হয়েছে।

তবে যেহেতু আমি এই নীতি অনুসরণ করে আসছি যে, কোরআনের চিরস্থায়ী সত্যগুলোকে বিজ্ঞানের পরিবর্তনযোগ্য ও সংশোধনযোগ্য মতবাদগুলোর ওপর নির্ভরশীল করে রাখা চলবে না। তাই এ ক্ষেত্রে এর চেয়ে বেশী কিছু উল্লেখ করতে চাই না। শুধুমাত্র কোরআনের প্রমাণিত শাশ্বত সত্যকেই যথেষ্ট মনে করি। সেটা এই যে, আল্লাহ তায়ালা যাবতীয় প্রাণীকে পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন। তাই প্রাণীর মূল উপাদান এক ও অভিন্ন। অতপর তা বিভিন্ন আকার ধারণ করেছে, যেমন চাক্ষুস দেখা যায়। যেমন, পেটের ওপর ভর করে চলা সরিসৃপ, দু'পায়ে চলা পাখি ও মানুষ এবং চার পায়ে চলা পশু। এ সবই আল্লাহর ইচ্ছা ও তারই প্রাকৃতিক নিয়ম ও রীতি অনুসারে হয়ে থাকে কোনো আকস্মিক দুর্ঘটনা বা অপরিকল্পিত কোনো কাকতালীয় ব্যাপার হিসেবে নয়। এ জন্যেই আল্লাহ তায়ালা বলছেন,

'আল্লাহ যা চান, তাই সৃষ্টি করেন।'

অর্থাৎ তিনি কোনো ছক বাঁধা নিয়মের অধীন নন। মহাবিশ্বে যেসব প্রাকৃতিক নিয়ম ও রীতি চালু আছে, তাও আল্লাহর স্বাধীন ইচ্ছা অনুসারেই সৃষ্ট।

'নিশ্চয় আল্লাহ সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান।'

একই মৌল উপাদান থেকে জন্ম নিয়েও প্রাণীর এতো বিচিত্র রূপ, রং ও আকৃতি প্রকৃতি থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, এর পেছনে রয়েছে সুপরিকল্পিত ইচ্ছা ও উদ্যোগ, কোনো কাকতালীয় বা আকস্মিক কার্যকারণ নয়। নচেত এতোসব পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা কোনো কাকতালীয় বা আকস্মিক ঘটনা থেকে জন্ম নিলো? এ সবই হলো মহা বিজ্ঞানী ও মহা পরাক্রমশালী আল্লাহর সুনিপুণ সৃষ্টিকর্ম, যিনি প্রত্যেক জিনিসকে সৃষ্টি করেছেন এবং তারপর তাকে সুপথ প্রদর্শন করছেন।

لَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ ۚ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٤٦﴾
وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن
بَعْدِ ذَٰلِكَ ۚ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٧﴾ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ
لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ ﴿٤٨﴾ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا
إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ﴿٤٩﴾ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ
اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ ۚ بَلْ أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٥٠﴾ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ
الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا
سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٥١﴾ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿٥٢﴾ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ

৪৬. আমি অবশ্যই (হেদায়াতের কথা) সুস্পষ্ট করার আয়াতসমূহ নাযিল করেছি, আর (এর মাধ্যমে) আল্লাহ তায়ালা যাকে চান তাকে সহজ সরল পথে পরিচালিত করেন। ৪৭. (যারা মোনাফেক) তারা বলে, আমরা আল্লাহ তায়ালা ও রসূলের ওপর ঈমান এনেছি এবং আমরা তাঁর আনুগত্য করি। (অথচ) এর একটু পরেই তাদের একটি দল আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের আদেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়; (বস্তুত) ওরা আসলে মোমেন নয়। ৪৮. যখন ওদের (সত্যি সত্যিই) আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের দিকে আহ্বান করা হয়, যাতে করে (আল্লাহর রসূলের পক্ষ থেকে) তাদের পারস্পরিক (বিরোধের) মীমাংসা করা যায়, তখন তাদের একটি দল পাশ কেটে সরে পড়ে। ৪৯. যদি এ (বিচার ফয়সালার) বিষয়টা তাদের সপক্ষে যায়, তাহলে তারা একান্ত বিনীতভাবে তাঁর কাছে ছুটে আসে; ৫০. এদের অন্তরে কি (কুফুরের কোনো) ব্যাধি আছে, না এরা (রসূলের নবুওতের ব্যাপারে) সন্দেহ পোষণ করে, অথবা এরা কি ভয় করে, আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূল ওদের প্রতি কোনো রকম অবিচার করবেন? (আসলে তা নয়;) বরং তারা নিজেরাই হচ্ছে যালেম।

রুকু ৭

৫১. (অপর দিকে) ঈমানদার লোকদের যখন তাদের পারস্পরিক বিচার ফয়সালার জন্যে আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের দিকে আহ্বান জানানো হয়, তখন (খুশী মনেই) তারা বলে, হ্যাঁ, আমরা (আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের আদেশ) শোনলাম এবং তা (যথাযথ) মেনেও নিলাম; বস্তুত এরাই হচ্ছে সফলকাম ব্যক্তি। ৫২. যারা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে, আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করে এবং তাঁর নাফরমানী (করা) থেকে বেঁচে থাকে, তারাই হচ্ছে সফলকাম। ৫৩. (হে নবী,) এ (মোনাফেক) লোকেরা আল্লাহ

أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ ۖ قُل لَّا تُقْسِمُوا ۖ طَاعَةٌ مَّعْرُوفَةٌ ۚ إِنَّ
اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٥٣﴾ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ۖ فَإِن
تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُمْ ۖ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا ۚ
وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿٥٤﴾ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن
قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ
خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۚ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ۚ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٥٥﴾ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا

তায়ালার নামে শক্ত কসম খেয়ে বলে (আমরা তোমার এতোই অনুগত যে), তুমি যদি আদেশ করো তাহলে আমরা (ঘরবাড়ী ছেড়ে) অবশ্যই তোমার সাথে বেরিয়ে যাবো। (হে নবী,) তুমি বলো, তোমরা (বেশী) শপথ করো না, (তোমাদের) আনুগত্য (আমার তো) জানাই (আছে); তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ তায়ালা তা ভালো করেই জানেন। ৫৪. (হে নবী,) তুমি (এদের আরো) বলো, তোমরা আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করো, আনুগত্য করো আল্লাহর রসূলের (হ্যাঁ), তোমরা যদি মুখ ফিরিয়ে নাও (তাহলে জেনে রেখো), আল্লাহ তায়ালার দ্বীন পৌঁছানোর যে দায়িত্ব তার ওপর দেয়া হয়েছে তার জন্যে সে দায়ী, (অপরদিকে আনুগত্যের) যে দায়িত্ব তোমাদের ওপর দেয়া হয়েছে তার জন্যে তোমরা দায়ী; যদি তোমরা তার কথামতো চলো তাহলে তোমরা সঠিক পথ পাবে; রসূলের কাজ হচ্ছে (আল্লাহ তায়ালার কথাগুলো) ঠিক ঠিক মতো পৌঁছে দেয়া। ৫৫. তোমাদের মধ্যে যারা (আল্লাহ তায়ালার ওপর) ঈমান আনে এবং (সে অনুযায়ী) নেক কাজ করে, তাদের সাথে আল্লাহ তায়ালা ওয়াদা করেছেন, তিনি যমীনে তাদের অবশ্যই খেলাফত দান করবেন–যেমনিভাবে তিনি তাদের আগের লোকদের খেলাফত দান করেছিলেন, (সর্বোপরি) যে জীবন বিধান তিনি তাদের জন্যে পছন্দ করেছেন তাও তাদের জন্যে (সমাজে ও রাষ্ট্রে) সুদৃঢ় করে দেবেন, তাদের ভীতিজনক অবস্থার পর তিনি তাদের অবস্থাকে (নিরাপত্তা ও) শান্তিতে বদলে দেবেন, (তবে এ জন্যে শর্ত হচ্ছে) তারা শুধু আমারই গোলামী করবে, আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না; এরপরও যে (এবং যারা) তাঁর নেয়ামতের নাফরমানী করবে তারাই গুনাহগার (বলে পরিগণিত হবে)। ৫৬. (হে

الرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿٥٦﴾ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مُعْجِزِيْنَ فِي

الْأَرْضِ ۚ وَمَأْوٰىهُمُ النَّارُ ۖ وَلَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿٥٧﴾

মুসলমানরা,) তোমরা নামায প্রতিষ্ঠা করো, যাকাত দাও, রসূলের আনুগত্য করো, আশা করা যায় তোমাদের ওপর দয়া (ও অনুগ্রহ) করা হবে। ৫৭. কাফেরদের ব্যাপারে কখনো একথা ভেবো না যে, তারা যমীনে (আমাকে) অক্ষম করে দিতে পারবে, তাদের ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নাম; (আর) কতো নিকৃষ্ট এ ঠিকানা!

তাফসীর

আয়াত ৪৬-৫৭

বিশাল সৃষ্টিজগতের দৃশ্যাবলীর মধ্য থেকে দুটো জ্যোতির্ময় ক্ষেত্র সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনার পর এবার সূরা তার মূল আলোচ্য বিষয়ে ফিরে এসেছে। বিষয়টা হলো, সেই সব নিয়ম বিধি সংক্রান্ত, যার ভিত্তিতে কোরআন মুসলমানদেরকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন মনমানসিকতা সম্পন্ন ও আল্লাহর জ্যোতিতে উদ্ভাসিত একটা সুসভ্য জাতি হিসেবে গড়ে তুলতে চায়।

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে সেই সব সৎ লোক সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, যারা ব্যবসা বাণিজ্য ও বেচাকেনায় লিপ্ত থেকেও আল্লাহর স্মরণ নামায ও যাকাতের ব্যাপারে উদাসীন হয় না। আরো আলোচিত হয়েছে কাফেরদের সৎ কর্মের পরিণতি এবং তাদের অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত হওয়ার বিষয়।

এবারের অধ্যায়টাতে আলোচনা করা হয়েছে মোনাফেকদের সম্পর্কে, যারা আল্লাহর সুস্পষ্ট আয়াতগুলো দ্বারাও উপকৃত হয় না এবং হেদায়াত লাভ করে না। তারা নিজেদেরকে মুসলমান বলে পরিচয় দিলেও মোমেনরা যেভাবে আল্লাহর রসূলের আনুগত্য করে ও তাঁর আদেশে সন্তুষ্ট ও তৃপ্ত থাকে, তারা সেভাবে আনুগত্য করে না। এ অধ্যায়ে তাদের ও খাঁটি মোমেনদের পার্থক্য দেখানো হয়েছে। বলা হয়েছে যে, খাঁটি মোমেন যারা, তাদেরকে তো আল্লাহ তায়ালা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তাদেরকে পৃথিবীর খেলাফত দান করবেন। ইসলামী জীবন যাপনের সুযোগ দেবেন, নিরাপত্তা দেবেন এবং এ সবই আল্লাহ তায়ালা ও রসূলের আনুগত্যে পুরস্কার হিসেবে দেবেন যদিও কাফেররা তাদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করে থাকে। বস্তুগত দৃষ্টিকোণ থেকে অনেক শক্তিশালী হতে পারে, কিন্তু কাফেররা পৃথিবীতে অজেয় শক্তির অধিকারী নয়। তাদের শেষ পরিণতি জাহান্নাম, যা খুবই খারাপ জায়গা।

ইসলামের প্রতিষ্ঠা না চাওয়াটাই মোনাফেকীর লক্ষণ

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'আমি সুস্পষ্টভাবে বর্ণনাকারী আয়াতসমূহ নাযিল করেছি, আল্লাহ তায়ালা যাকে চান সঠিক পথ দেখান।'

বস্তুত আল্লাহর আয়াতগুলো দ্ব্যর্থহীন ও অকাট্য। এগুলো আল্লাহর জ্যোতিকে স্বচ্ছভাবে প্রতিফলিত করে এবং তাঁর হেদায়াতের উৎসকে স্পষ্ট করে। ভালো ও মন্দ এবং ন্যায় ও অন্যায়কে স্পষ্ট করে দেখিয়ে দেয় এবং ইসলামের জীবন ব্যবস্থাকে দ্ব্যর্থহীনভাবে তুলে ধরে। পৃথিবীতে আল্লাহর নির্দেশগুলোকে সন্দেহমুক্তভাবে পেশ করে। মানুষ যখন আল্লাহর বিধান অনুসারে পথ নির্দেশ চায়, তখন একটা সুস্পষ্ট ও নির্ভুল শরিয়তের কাছেই পথ নির্দেশ চায়। এতে কারো অধিকার হরণেরও আশংকা থাকে না, হকের সাথে বাতিলের বা হারামের সাথে হালালের মিশ্রণও ঘটে না।

'আল্লাহ তায়ালা যাকে ইচ্ছা তাকে সরল পথের সন্ধান দেন'

অর্থাৎ এ ব্যাপারে আল্লাহর ইচ্ছাই চূড়ান্ত ও শর্তহীন। তবে আল্লাহ তায়ালা হেদায়াতের জন্যে একটা পথ নির্ধারণ করে রেখেছেন। যারা নিজেদেরকে সে পথে পরিচালিত করতে সচেষ্ট হয় তারাই হেদায়াত লাভ করতে পারে, আল্লাহর নূর লাভ করতে পারে, তাঁর সাথে সম্পৃক্ত হতে পারে, সঠিক পথে পরিচালিত হতে পারে এবং আল্লাহর ইচ্ছায় নিজ গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পারে। অপরদিকে যারা সেই পথ থেকে দূরে সরে যাবে অথবা উপেক্ষা করবে তারা সত্যের আলো থেকে বঞ্চিত হবে, বিপথে চলে যাবে। এখানেও আল্লাহর ইচ্ছাই কাজ করবে। আর এভাবেই হেদায়াত ও গোমরাহীর ক্ষেত্রে আল্লাহর ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটে।

এতো সব সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণ ও নিদর্শনাদি দেখার পরও একদল কপট ও মোনাফেক লোকেরা বাহ্যিকভাবে নিজেদেরকে মুসলমান রূপে যাহির করতো অথচ ইসলামের আদব কায়দা ও গুণাবলী তারা ধারণ করতো না। তারা বলতো,

'আমরা আল্লাহ ও রসূলের প্রতি ঈমান এনেছি ....। (আয়াত ৪৭-৫০)

সঠিক ও নির্ভেজাল ঈমান হৃদয়ের গভীরে বদ্ধমূল হলে তার প্রভাব ব্যক্তির আচার আচরণেও প্রকাশ পাবে। ইসলাম হচ্ছে একটি গতিময় আদর্শের নাম। এতে নেতিবাচক আচরণের কোনো অবকাশ নেই। ফলে এই আদর্শের প্রফিলন চেতনার জগতে যখনই ঘটবে তখনই তার বহিপ্রকাশ ঘটবে বাস্তব জগতে, কর্মের মাধ্যমে ও আচার আচরণের মাধ্যমে। ইসলামের মৌলিক শিক্ষাই হচ্ছে এই যে, মানুষ তার হৃদয়ের সুপ্ত আকীদা বিশ্বাসকে বাস্তব রূপ দান করবে এবং স্থির প্রথা বা নীতিতে রূপান্তরিত করবে। সাথে সাথে প্রতিটি আচরণ ও কর্মের পেছনে ওই মূল আকীদা বিশ্বাসের চেতনা ও প্রেরণা ক্রীয়াশীল থাকতে হবে। এর ফলে প্রতিটি আচরণ ও কর্ম হবে জীবন্ত এবং মূল উৎসের সাথে সম্পৃক্ত। এই সে তারা বলতো,

'আমরা আল্লাহ ও রসূলের প্রতি ঈমান এনেছি এবং আনুগত্য স্বীকার করেছি'

এটা তাদের নিছক একটা মৌলিক দাবী ছিলো। কারণ, এর কোনো বাস্তব প্রতিফলন তাদের কর্ম জীবনে ঘটেনি। বরং তাদের কর্ম জীবন তাদের এই মৌলিক দাবীর সম্পূর্ণ পরিপন্থী ছিলো। তাই আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা দিয়ে জানিয়ে দিচ্ছেন,

'এরা মোমেন নয়'।

কারণ মোমেনদের কথা ও কাজ এক হয়। তাদের কাছে ঈমান কোনো খেল তামাশার বস্তু নয় যে, কিছুক্ষণ খেলার পর তা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে যে দিক খুশী যাওয়া যাবে। বরং তাদের কাছে ঈমান হচ্ছে অন্তরের গভীরে স্থান দেয়ার মতো একটা বস্তু, একটা মানসিক চেতনার নাম এবং বাস্তব জীবনে চর্চা করার মতো এটা আদর্শ। হৃদয়ের গভীরে এই চেতনা ও বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়ে গেলে তা থেকে বিন্দু পরিমাণও বিচ্যুত হওয়া সম্ভব হয় না।

ওই মোনাফেকগোষ্ঠী মুখে ঈমানের দাবী করলেও নিজেদের আচরণের মাধ্যমেই এই দাবীর অসারতা নিজেরাই প্রমাণ করে দিতো যখন তাদেরকে শরীয়ত অনুযায়ী বিচার করার জন্যে রসূলুল্লাহ (স.)-কে বিচারক হিসেবে গ্রহণ করতে আহ্বান করা হতো। এই প্রসঙ্গে নিচের আয়াতে বলা হয়েছে,

'তাদের মধ্যে ফয়সালা করার জন্যে যখন তাদেরকে আল্লাহ ও রসূলের দিকে আহ্বান করা হয় তখন তাদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয়। সত্য তাদের সপক্ষে হলে তারা বিনীতভাবে রসূলের কাছে ছুটে আসে।'

ওদের ভালই জানা ছিলো যে, আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের বিচার পক্ষপাতমূলক হতে পারে না, মনগড়া হতে পারে না এবং শত্রুতা ও মিত্রতার দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে না। কিন্তু তা সত্তেও তারা এই ন্যায় বিচারকে এড়িয়ে যেতো, আল্লাহ তায়ালা ও রসূলের ইনসাফপূর্ণ ফয়সালার প্রতি অনীহা প্রকাশ করতো। কারণ, তারা সত্যের প্রত্যাশী নয়। কাজেই ন্যায় বিচারকে তারা বরদাশত করতে পারে না। কিন্তু তাদের নিজেদের কোনো স্বার্থ বা অধিকারের ব্যাপারে থাকলে তখন তারা বিচারের জন্যে রসূলুল্লাহ (স.)-এর কাছে দৌড়ে যেতো এবং তাঁর ফয়সালা মাথা পেতে নিতো, তাতে রাযী খুশী থাকতো। কারণ, তারা মনে প্রাণে বিশ্বাস করতো যে, রসূলুল্লাহ (স.) শরীয়ত অনুযায়ী ন্যায় বিচারই করবেন, তিনি এতে কোনো অন্যায়ের প্রশ্রয় দেবেন না এবং কারো অধিকার খর্ব করবেন না।

ঈমানের দাবীদার এই গোষ্ঠীই আবার অন্যায়ের ক্ষেত্রে ভিন্ন আচরণের আশ্রয় নিতো। এরা হচ্ছে কপটের দল, মোনাফেকের দল। প্রত্যেক যুগে ও প্রত্যেক স্থানে এরা এই পরিচয়েই আবির্ভূত হয়। এরা নিজেদের কুফরী বিশ্বাসকে লুকিয়ে রাখে, জনসমক্ষে প্রকাশ করতে সাহস পায় না। তাই ইসলামের আবরণে নিজেদেরকে পেশ করে, অথচ শরীয়ত অনুযায়ী তাদের বিচার আচার হোক এতে তারা রাযী নয়। তাই আল্লাহ তায়ালা ও রসূলের ফয়সালার দিকে তাদেরকে আহ্বান করা হলে তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, অস্বীকৃতি জানায় এবং নানা ওযর আপত্তি ও টাল বাহানার আশ্রয় নেয়। কারণ ওরা প্রকৃত অর্থে মোমেন নয়। ঈমান যদি তাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল হতো, তাহলে তারা কখনো আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের ফয়সালাকে অগ্রাহ্য করতে পারতো না, অমান্য করতে পারতো না এবং কেবল নিজেদের স্বার্থ রক্ষার খাতিরেই শরীয়তের দ্বারস্থ হতো না, ইসলামী আইনের আশ্রয় নিতো না।

আল্লাহ তায়ালা ও রসূলের ফয়সালায় রাযী খুশী থাকা ও সন্তুষ্ট থাকাই হচ্ছে প্রকৃত ঈমানের পরিচয়। এর মাধ্যমেই প্রমাণিত হয়, হৃদয়ের গভীরে ঈমানের হাকীকত ও তাৎপর্য বদ্ধমূল হয়েছে কিনা। এর মাধ্যমেই প্রমাণিত হয়, আল্লাহ তায়ালা ও রসূলের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধার গভীরতা। কাজেই যারা আল্লাহর ফয়সালাকে অগ্রাহ্য করে, আল্লাহর রসূলের ফয়সালাকে অগ্রাহ্য করে, তাদের মাঝে ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধের বহিপ্রকাশ ঘটেনি, তাদের হৃদয়ে ঈমানের আলো প্রজ্জলিত হয়নি। তারা রোগাগ্রস্ত, তারা সংশয়বাদী, তারা অদ্ভূত চরিত্রের অধিকারী। ওই কারণেই আল্লাহ তায়ালা বিস্ময় প্রকাশ করে জিজ্ঞেস করছেন,

'তাদের অন্তরে কি রোগ আছে, না তারা ধোঁকায় পড়ে আছে ....। (আয়াত ৫০)

প্রথম প্রশ্নটি ওদের চারিত্রিক ব্যাধিই প্রমাণিত করে। কারণ, অন্তরে রোগ থাকলেই কেবল এই অবস্থার সৃষ্টি হয়। একজন সুস্থ ও স্বাভাবিক হৃদয়ের অধিকারী ব্যক্তির দ্বারা কখনো এ জাতীয় আদর্শচ্যুতি ঘটতে পারে না, বরং হৃদয় রোগাগ্রস্ত হলেই মানুষের স্বভাব ও চরিত্রের মাঝে বিকৃতি ঘটে ও নৈতিক পদস্খলন ঘটে। তখন মানুষ ঈমানের বাস্তবতা ও তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারে না এবং ঈমানের সঠিক আদর্শকে ধারণ করতে পারে না। দ্বিতীয় প্রশ্নটি দ্বারা ওদের সংশয়বাদী স্বভাবের প্রতি বিস্ময় প্রকাশ করা হয়েছে। অর্থাৎ এরা ঈমানের দাবীদার হয়েও আল্লাহর ফয়সালার ব্যাপারে কি করে সন্দেহ পোষণ করে? তাহলে কি এরা ওই ফয়সালাকে খোদায়ী ফয়সালা হিসেবে বিশ্বাস করতে দ্বিধাগ্রস্ত? অথবা এরা কি মনে করে যে ওই ফয়সালার দ্বারা ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়? এই মনোভাবই যদি ওদের হয়ে থাকে তাহলে নিসন্দেহে বলা যায়, ওরা মোমেনদের আদর্শের অনুসারী নয়।

তৃতীয় প্রশ্নটি দ্বারা ওদের এই অদ্ভূত স্বভাব ও প্রকৃতির প্রতি নিন্দাবাদ জানানোর সাথে সাথে বিস্ময়ও প্রকাশ করা হয়েছে। অর্থাৎ, ওরা কি ভাবে মনে করতে পারে যে, ওদের প্রতি আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূল অবিচার করবেন? ওই জাতীয় আশংকা ঈমানের দাবীদার একজন ব্যক্তির মনে কি ভাবে দেখা দিতে পারে? কারণ, আল্লাহ তায়ালা হচ্ছেন সবার সৃষ্টিকর্তা এবং সবার পালনকর্তা। কাজেই তিনি নিজের সৃষ্টির প্রতি অবিচার করতে পারেন না, কারো প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট আচরণও করতে পারেন না।

মনে রাখতে হবে, কেবল আল্লাহর ফয়সালাই হতে পারে পক্ষপাতমুক্ত, সব ধরনের সংশয় সন্দেহের উর্ধে। কারণ, আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন একমাত্র ন্যায় বিচারক যিনি কখনো কারো প্রতি অন্যায় ও অবিচার করেন না। তাঁর দৃষ্টিতে সব মানুষ সমান। কাজেই তিনি একজনের স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে আর এক জনের প্রতি অবিচার করতে পারেন না, যুলুম করতে পারেন না। আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত আর যে কোনো ব্যক্তির বিচারের মাঝে পক্ষপাতিত্ব বা অনিয়মের আশঙ্কা থাকতে পারে। কারণ, ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বা রাষ্ট্র নিজ নিজ স্বার্থ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে। কাজেই আইন প্রণয়নের সময় অথবা আইন প্রয়োগের সময় এই ব্যক্তি স্বার্থ বা দলীয় স্বার্থ বা রাষ্ট্রীয় স্বার্থের উর্ধে থাকা সম্ভবপর হয় না।

ব্যক্তি যখন আইন প্রণয়ন করে অথবা আইন প্রয়োগ করে তখন সে নিজের জীবন ও স্বার্থ রক্ষা করার বিষয়টির প্রতি সচেতন থাকে। এই একই নিয়ম দল বা গোষ্ঠীর বেলায়ও দেখা যায় এবং রাষ্ট্র বা একাধিক রাষ্ট্রীয় বলয়ের ক্ষেত্রেও দেখা যায়। কিন্তু একমাত্র আল্লাহর ক্ষেত্রেই এই নিয়ম পরিলক্ষিত হয় না। কারণ, তাঁর আইনের পেছনে তাঁর নিজের কোনো স্বার্থ নেই, নিজের কোনো লাভ লোকসান নেই। যা আছে তা আগাগোড়াই ন্যায় বিচার ও পক্ষপাতহীন বিধি বিধান। এর সমকক্ষ অন্য কোনো বিচার ব্যবস্থা নেই এবং এর মতো বাস্তবসম্মত ও ন্যায়সম্মত অন্য কোনো বিধি-বিধান নেই।

কাজেই যারা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের ফয়সালা সন্তুষ্টি চিত্তে মেনে নেয় না তারা নিজেরাই অত্যাচারী ও যালেম। কারণ, এরা চায় না সমাজে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত হোক, এরা চায় না সমাজে সত্যের জয় হোক। সত্য বলতে কি, এরা আল্লাহর বিচার ও ফয়সালায় পক্ষপাতিত্বেরও আশংকা করে না এবং আল্লাহর ন্যায় বিচারের ব্যাপারেও সন্দেহ পোষণ করে না। বরং এরা নিজেরাই অত্যাচারী ও যালেম। কাজেই এরা সুষ্ঠু ও ন্যায় বিচার গ্রহণ করতে পারছে না।

মোমেনের যথার্থ পরিচয়

অপরদিকে যারা সত্যিকার অর্থে মোমেন, তাদের আচার-আচরণই ভিন্ন। তাই, আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের ফয়সালার প্রতি তাদেরকে আহ্বান করা হলে তাদের মুখ দিয়ে সে কথাই বের হয় যা একজন মোমেনের জন্যে শোভা পায়, যা তাদের হৃদয়ের ঈমানী চেতনারই পরিচয় বহণ করে। তাদের বক্তব্য পবিত্র কোরআনে এভাবে এসেছে।

'মোমেনদের বক্তব্য কেবল একথাই যখন তাদের মধ্যে ফয়সালা করার জন্যে........।'

অর্থাৎ মোমেনদের বক্তব্যে দ্বিধাহীন, সংকোচহীন ও তর্কবিহীন আনুগত্য প্রকাশ পায় কারণ তাদের পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস হচ্ছে এই যে, ন্যায় বিচার কেবল আল্লাহ তায়ালা ও রসূলের বিচারই হতে পারে। আর অন্যদের বিচার হয় মনগড়া ও পক্ষপাতদুষ্ট। মোমেনরা একমাত্র মহান আল্লাহর প্রতিই নিশর্ত আনুগত্য প্রকাশ করে থাকে। কারণ একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন জীবন দাতা, জীবনের নিয়ন্ত্রক ও পরিচালক। তাঁর ইচ্ছায়ই গোটা সৃষ্টি জগত পরিচালিত হয়, তিনি মানুষের

জন্যে যা কামনা করেন ও করবেন তা নিসন্দেহে মংগলজনক। এমনকি খোদ মানুষ নিজের জন্যে যা কামনা করে, তার চেয়েও অধিক মংগলজনক হচ্ছে আল্লাহর কামনা। কারণ আল্লাহ তায়ালা হচ্ছেন সৃষ্টিকর্তা। কাজেই তাঁর সৃষ্টির জন্যে কোন জিনিসটি মংগলজনক, তা তিনিই ভাল জানেন।

মোমেনরাই সফলকাম। কারণ, স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা তাদের সকল বিষয় দেখা-শুনা করেন, তাদের গোটা জাগতিক সম্পর্কের মাঝে শৃংখলা বিধান করেন এবং তাদের ভালো মন্দের সব কিছুর ফয়সালা করেন। আর এই ফয়সালা হয় তাঁর জ্ঞান ও ন্যায়নীতির ওপর ভিত্তি করেই। কাজেই মোমেনরা সেসব লোকদের তুলনায় অবশ্যই সফলকাম হবে যাদের সকল খুঁটি নাটি বিষয় ও বিচার আচারের ভার তাদেরই মতো একদল দুর্বল ও স্বল্পজ্ঞানের অধিকারী মানুষের হাতে ন্যস্ত। মোমেনরাই সফলকাম। কারণ তাদের গোটা জীবন পরিচালিত হয় একটি সহজ, সরল ও সত্য আদর্শের ওপর ভিত্তি করে। এই আদর্শের প্রতি তাদের রয়েছে অবিচল আস্থা, এই আদর্শের ওপর চলতে গিয়ে তারা কখনো বিভ্রান্তির শিকার হয় না। ফলে তাদের সময় ও শক্তির অপচয় হয় না, ভ্রান্ত ও ভ্রষ্ট কোনো আদর্শ তাদেরকে আঘাত করতে পারে না। নিজেদের খেয়াল-খুশী মতো তারা জীবন যাপন করে না। বরং তাদের সামনে থাকে সুস্পষ্ট ও সরল খোদায়ী আদর্শ।

'যারা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে, আল্লাহকে ভয় করে ও তাঁর শাস্তি থেকে বেঁচে থাকে তারাই কৃতকার্য'

আগের আয়াতে খোদায়ী বিধানের প্রতি আনুগত্য ও আত্মসমর্পণের ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে। এখন আলোচনা করা হচ্ছে, সকল বিষয়ে খোদায়ী বিধি-নিষেধ মেনে চলার প্রসংগটি। এখানে আল্লাহর প্রতি ভয় ও খোদাভীতি প্রদর্শনের বিষয়টিও স্থান পেয়েছে। উল্লেখ্য যে, খোদাভীতি বা তাকওয়া পরহেযগারী হচ্ছে ভয় ও ভীতির তুলনায় একটা ব্যাপক গুণ। কারণ তাকওয়া ও পরহেযগারী হচ্ছে, ছোট বড় সকল বিষয়ে আল্লাহকে হাযির ও নাযির মনে করা, তাঁর অস্তিত্বকে উপলব্ধি করা এবং আল্লাহর মহাসত্তার প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা ও সমীহ প্রদর্শন করার মানসে তাঁর অপছন্দনীয় কোনো কাজ করতে দ্বিধাগ্রস্ত হওয়া এবং সাথে সাথে তাঁকে ভয়ও করা।

কাজেই যারা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করবে, আল্লাহকে ভয় করবে ও বেঁচে থাকবে তারা অবশ্যই এই পৃথিবীর বুকেও সফলকাম হবে এবং পরকালেও সফলকাম হবে এটা আল্লাহরই ওয়াদা। আর আল্লাহ তায়ালা কখনো ওয়াদা বরখেলাপ করেন না। এই শ্রেণীর বান্দারা সফলকাম হওয়ার উপযুক্তই। এর পেছনে বাস্তব কারণও রয়েছে তাদের জীবনে। কারণ আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের আনুগত্যের দাবী হচ্ছে আল্লাহর পছন্দনীয় ও মনোনীত আদর্শ অনুযায়ী জীবন যাপন করা। আর যাদের জীবন খোদায়ী আদর্শ অনুযায়ী পরিচালিত হবে তারা তো সফলকাম হবেই। তদুপরি তারা প্রতিটি মুহূর্তে আল্লাহকে হাযির নাযির মনে করে, প্রতিটি মুহূর্তে তাঁর অস্তিত্বকে অনুভব করে। ফলে তাদের মাঝে কখনো আদর্শচ্যুতি ঘটে না, তারা কখনো জীবনের মায়াজালে আবদ্ধ হয়ে পড়ে না এবং বিভ্রান্তির গহ্বরে তলিয়ে যায় না।

ভয় ও ভক্তি এবং তাকওয়া ও পরহেযগারীর মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা ও রসূলের প্রতি যে আনুগত্য প্রদর্শন করা হয় তা অত্যন্ত উঁচুদরের আনুগত্য। কারণ এই আনুগত্যের মাধ্যমেই প্রমাণিত হয়, হৃদয় ও মন খোদায়ী নূর দ্বারা কতটুকু নূরান্বিত, আল্লাহর সাথে সম্পর্কের গভীরতা কতোটুকু এবং আল্লাহর প্রতাপ ও প্রতিপত্তির প্রতি সচেতনতা কতোটুকু। শুধু তাই নয়, এর দ্বারা মোমেনদের উঁচু মন-মানসিকতার ও মান-মর্যাদারও পরিচয় মেলে। যে আনুগত্য আল্লাহ তায়ালা ও রসূলের আনুগত্যের ওপর নির্ভরশীল নয় তা অমর্যাদারই নামান্তর, এই অমর্যাদাকে একজন

প্রকৃত মোমেন কখনো মেনে নিতে পারে না, তার বিবেক কখনো এতে সায় দিতে পারে না। কারণ, একজন প্রকৃত মোমেনের মাথা একমাত্র মহা ক্ষমতাধর ও লা-শরীক আল্লাহর সামনেই নত হয়, অন্য কারো সামনে নয়।

মোমেন ও মোনাফেকদের আচরণ ও মন-মানসিকতার পার্থক্য তুলে ধরার পর এখন মোনাফেকদের প্রসংগ আর একবার আলোচিত হচ্ছে। তাদের সম্পর্কে বলা হচ্ছে,

'তারা দৃঢ়ভাবে আল্লাহর কসম খেয়ে বলে....... রসূলের দায়িত্ব তো কেবল সুস্পষ্টরূপে পৌছিয়ে দেয়া। (আয়াত ৫৩-৫৪)

রসূলুল্লাহ (স.)-এর সামনেও এই মোনাফেক গোষ্ঠী কসম খেয়ে বলতো, তারা রসূলের সাথে অবশ্যই যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করবে, অথচ তারা যে মিথ্যাবাদী সে কথা আল্লাহ তায়ালা ভালোভাবেই জানেন, তাই অত্যন্ত অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্যভরে বলছেন,

'ওদেরকে বলে দিন ওরা যেন কসম না খায়, ওদের আনুগত্যের বিষয় জানা আছে'

যারা ওয়াদা করে ওয়াদা রক্ষা করে না, যারা সত্য কথার আবরনে মিথ্যা কথা বলে, যারা প্রতারণা ও প্রবঞ্চনায় অভ্যস্ত, তারা শতবার কসম খেলেও তাদের কথা বিশ্বাস করা যায় না, তাদের প্রতি আস্থা রাখা যায় না, তাই কোনো মিথ্যাবাদী কারও সামনে নিজেকে সত্যবাদী প্রমাণ করতে গিয়ে কসমের আশ্রয় নিতে গেলে তাকে বলা হয়, 'দোহাই তোমার, আর কসম খেয়ো না, তোমার সম্বন্ধে ভালই জানা আছে,' ঠিক আল্লাহ তায়ালাও এভাবে ওদেরকে জানিয়ে দিচ্ছেন যে, ওদের কীর্তি-কলাপ সম্পর্কে তিনি ভালোই জানেন। তাই কসম খেলেও কোনো কাজ হবে না।

এ কারণেই তিনি ওদেরকে সত্যিকার আনুগত্যের নির্দেশ দিয়ে বলছেন,

'বলো, তোমরা আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য কর'

যদি তারা এতে সাড়া না দেয় অথবা মোনাফেকীর আশ্রয় নেয় তাহলে এর দায়দায়িত্ব ও প্রায়শ্চিত্ত তারা নিজেরাই বহন করবে ও ভোগ করবে। রসূলের কোনো দায়-দায়িত্ব এ ব্যাপারে থাকবে না, কারণ, তিনি দাওয়াত ও তাবলীগের দায়িত্ব যথাযর্থরূপে পালন করেছেন। এর অতিরিক্ত তার আর কিছুই করার নেই। আর যদি তারা সত্যিকার অর্থে রসূলের আনুগত্য করে তাহলে তারা সত্য আদর্শের সন্ধান পাবে যে আদর্শ ইহকাল ও পরকালের সাফল্য ও কামিয়াবীর চাবীকাঠি। রসূল তাদের ঈমানের ব্যাপারে দায়বদ্ধ নন। এমনকি তাদের অবাধ্যতার জন্যেও তিনি দায়ী নন। বরং তারা নিজেরাই এ সব ব্যাপারে পরিপূর্ণভাবে দায়ী, কাজেই এর শুভ ও অশুভ পরিণতির দায়ভারও তাদেরকেই বহন করতে হবে।

দ্বীন প্রতিষ্ঠার ওয়াদা ও তার শর্ত

এখন মোনাফেকদের প্রসংগ বাদ দিয়ে মোমেনদের প্রসংগ আলোচিত হচ্ছে। অর্থাৎ যারা সত্যিকার অর্থে আল্লাহর আনুগত্য করে এবং তাঁর প্রতি বাস্তব অর্থে ঈমান রাখে তাদের প্রতিদান কেয়ামতের আগে এই পৃথিবীর বুকেই কি হবে, সে সম্পর্কে বলা হচ্ছে,

'তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে.........।' (আয়াত ৫৫)

রসূলের উম্মতের জন্যে আল্লাহ তায়ালা ওয়াদা করছেন যে, যারা ঈমান গ্রহণ করবে এবং সৎকার্য করবে তাদেরকে তিনি পৃথিবীর রাজত্ব দান করবেন, তাদের দ্বীনকে জয়ী করবেন এবং তাদের ভয়-ভীতিকে শান্তি ও নিরাপত্তায় রূপান্তরিত করবেন। এটা আল্লাহর ওয়াদা। আর আল্লাহর ওয়াদা সব সময়ই সত্য হয়ে থাকে, তাঁর ওয়াদা সব সময়ই বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। আল্লাহ তায়ালা কখনো ওয়াদার বরখেলাপ করেন না, এখন প্রশ্ন সেই ঈমান কেমন হওয়া উচিৎ? আর সেই রাজত্ব ও ক্ষমতাই বা কেমন হবে?

উত্তরে বলছি, যে ঈমানের ফলে খোদায়ী ওয়াদা বাস্তবায়িত হবে সেই ঈমানের প্রকৃতি ও বাস্তবতা অত্যন্ত সুবিশাল, এই ঈমানের আওতায় গোটা মানব জীবনের কর্মকান্ডই এসে যায়, এই ঈমানই গোটা মানবজীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে ও পথনির্দেশনা করে থাকে। এই ঈমান যখনই হৃদয়ের গভীরে প্রোথিত হবে তখনই তার প্রকাশ ঘটবে ব্যক্তির কাজে কর্মে, আচার আচরণে ও চলনে-বলনে। তখন ব্যক্তির প্রতিটি কাজ ও প্রতিটি পদক্ষেপই হবে আল্লাহ তায়ালা মুখী। তার প্রতিটি কাজই হবে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে, যে ঈমানের বিনিময়ে আল্লাহর এই ওয়াদা সে ঈমান হচ্ছে একমাত্র আল্লাহরই আনুগত্যের নাম, আল্লাহর হাতেই খুটি-নাটি সব কিছুই ছেড়ে দেয়ার নাম। এই ঈমানের যখন প্রকাশ ঘটবে তখন ব্যক্তির খেয়াল খুশীর কোনো অস্তিত্ব থাকবে না, জৈবিক চাহিদার হাতে সে বন্দী থাকবে না এবং স্বভাব ও প্রকৃতির টানে ভেসে যাবে না। বরং এসব বিষয়েও সে আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের পূর্ণ আনুগত্য ও দাসত্ব করবে।

যে ঈমানের বিনিময়ে আল্লাহর এই ওয়াদা, সেই ঈমানের আওতায় পড়ে গোটা মানব জীবনের কর্মকান্ড। এই ঈমানের প্রভাব ব্যক্তির চিন্তা জগতে পড়বে, মনজগতে পড়বে, আধ্যাত্মিক জগতে পড়বে, স্বভাব প্রবণতায় পড়বে, দেহের ওপর পড়বে, অংগ প্রত্যংগের ওপর পড়বে এবং পরিবার পরিজন ও সকল মানুষের সাথে তার আচরণেও পড়বে। অর্থাৎ ব্যক্তির সকল কর্মকান্ডই হবে তখন একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে নিবেদিত। আলোচ্য আয়াতে বিষয়টির প্রতি স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা ইংগিত করে বলছেন

'তারা আমার এবাদাত করে এবং আমার সাথে কোনো কিছুকে শরীক করে না।' ....

বলাবাহুল্য যে, শেরকের বিভিন্ন প্রকার ও শ্রেণী রয়েছে। এমনকি গায়রুল্লাহর উদ্দেশ্যে কোনো আমল নিবেদন করা একমাত্র আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কোনো উৎস থেকে উৎসারিত কোনো জীবন ব্যবস্থা বা কোনো আইন কানুন মেনে নেয়া অথবা আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তি, চক্র বা গোষ্ঠীর কোনো মতাদর্শ, তন্ত্র বা মতবাদ চেতনায় স্থান পাওয়াও শেরক।

শেরেক ও কুফরমুক্ত ঈমানই হচ্ছে পরিপূর্ণ জীবন বিধান। এতে আল্লাহর সব ধরনের বিধি-নিষেধ রয়েছে, জীবন পরিচালনার জন্যে অপরিহার্য সব কিছুই গ্রহণ করার নির্দেশ রয়েছে। সর্বোপরি পৃথিবীর বুকে আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব বা খেলাফতের গুরুদায়িত্ব পালনের জন্যে সকল প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশনা রয়েছে।

পৃথিবীর রাজত্ব বলতে কী বুঝি? এই রাজত্ব বলতে নিছক কর্তৃত্ব প্রভাব প্রতিপত্তি, দমন পীড়ন এ শাসনকে বুঝায় না, বরং রাজত্ব বলতে এসব কিছুই বুঝাবে যদি তা সংস্কার ও সংশোধনের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়, নির্মাণ ও গড়ার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়, মানবজাতির জীবন পরিচালনার জন্যে আল্লাহ তায়ালা নির্ধারিত আদর্শের বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় এবং আশরাফুল মখলুকাত বা সৃষ্টির সেরা মানুষের জীবনকে এই পৃথিবীর বুকে পরিপূর্ণতার শীর্ষে পৌঁছিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়।

পৃথিবীর রাজত্ব হচ্ছে এমন একটি ক্ষমতা যার মূল উদ্দেশ্য হবে গঠন ও সংস্কার; ধ্বংস ও নৈরাজ্য নয়। এই ক্ষমতার উদ্দেশ্য হবে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা ও শান্তি প্রতিষ্ঠা; যুলুম-অত্যাচার ও দমন-পীড়ন নয়। এই ক্ষমতা মানবজীবন উন্নত করে, মানুষের জীবন ব্যবস্থাকে উন্নত করে। এই ক্ষমতা কখনো মানুষকে পশুর স্তরে নিয়ে পৌঁছায়না।

এই রাজত্ব আল্লাহ তায়ালা কেবল তাদেরকেই দান করবেন বলে আল্লাহ ওয়াদা করছেন যেমনটি তিনি অতীতেও সৎকর্মশীল মোমেনদেরকে দান করেছিলেন। এর দ্বারা মোমেন বান্দারা

আল্লাহর মনোনীত আদর্শের বাস্তবায়ন ঘটাবে, আল্লাহর মনোনীত ন্যায় বিচার ব্যবস্থার বাস্তবায়ন ঘটাবে, এবং গোটা মানব জাতিকে পূর্ণতার পথে এবং মংগল ও কামিয়াবীর পথে পরিচালিত করবে। অপরদিকে যারা ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব হাতে পেয়ে পৃথিবীর বুকে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে, যুলুম অত্যাচারের বিভীষিকাময় পরিবেশ সৃষ্টি করে এবং গোটা সমাজ ব্যবস্থাকে পাশবিকতার স্তরে নিয়ে পৌঁছায় তারা কখনো পৃথিবীর বুকে আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হতে পারে না, তারা কখনো আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে গণ্য হতে পারে না। বরং তাদের এই ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব হচ্ছে এক প্রকার পরীক্ষা। এই পরীক্ষার সম্মুখীন তারা নিজেরাও এবং তাদের প্রজারাও। এর পেছনে অবশ্য আল্লাহর হেকমত ও কুদরতই কাজ করে থাকে।

ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের এই যথার্থ ধারণা আমরা আল্লাহর এই বক্তব্যের মাঝেই পাই,

'এবং তিনি অবশ্যই তাদের দ্বীনকে সুদৃঢ় করবেন যা তিনি তাদের জন্যে পছন্দ করেছেন'

অর্থাৎ এই দ্বীনকে প্রথমে অন্তরের মাঝে সুদৃঢ় করতে হবে। এর পর জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এর বাস্তবায়ন হতে হবে। আর তখনই আল্লাহর ওয়াদাও বাস্তবায়িত হবে। ফলে তারা পৃথিবীর রাজত্ব ও কর্তৃত্ব লাভ করতে সক্ষম হবে, তাদের জন্যে মনোনীত দ্বীনই পৃথিবীর বুকে বিজয়ী হবে। কারণ তাদের এই দ্বীন সংস্কার ও সংশোধনের নির্দেশ দেয়, হক ও ইনসাফের নির্দেশ দেয়, পৃথিবীর সকল কামনা বাসনার উর্ধে থাকার নির্দেশ দেয়, পৃথিবীকে গড়ার নির্দেশ দেয় এবং পৃথিবীর মাঝে আল্লাহ তায়ালা যে সব সম্পদ ও শক্তি রেখেছেন সে গুলোকে ব্যবহার করার নির্দেশ দেয়। আর এই সব কিছুই হতে হবে একমাত্র তাঁরই সন্তুষ্টি-লাভের উদ্দেশ্যে।

'এবং তাদের ভয় ভীতির অবস্থা পরিবর্তন করে অবশ্যই তাদেরকে নিরাপত্তা দান করবেন'.........

অর্থাৎ তারা ভয়-ভীতির মাঝে জীবন যাপন করছিলো, তাদের জীবনে কোনো নিরাপত্তা ছিলো না এবং মদীনায় রসূলুল্লাহ (স.)-এর হিজরতের আগ পর্যন্ত তারা কখনো অস্ত্র ত্যাগ করতে পারতো না।

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আবুল আলিয়ার বরাত দিয়ে রবী এবনে আনাস বলেন যে, রসূলুল্লাহ (স.) ও তাঁর সাহাবারা দশ বছর পর্যন্ত মক্কায় গোপনে মানুষকে ঈমানের দাওয়াত দিতেন, তাদেরকে শেরক ত্যাগ করে কেবল আল্লাহর এবাদাত বন্দেগীর জন্যে আহ্বান জানাতেন। তাঁরা ভয়-ভীতির মাঝে এই দাওয়াতী কাজ আঞ্জাম দিতেন। তাদের প্রতি তখনও লড়াইয়ের নির্দেশ ছিলো না। এই নির্দেশ মদীনায় হিজরতের পর তাদেরকে দেয়া হয়েছিলো। তারা মদীনায় পৌঁছার পর আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে লড়াইয়ের নির্দেশ দেন, মদীনায়ও তারা ভয় ভীতির মাঝে দিন যাপন করতো। ফলে অস্ত্র হাতেই তাদের দিন-রাত কাটতো। এই অবস্থার ওপরই তারা আল্লাহর ইচ্ছায় ধৈর্যধারণ করেছেন, এরপর একজন সাহাবী রসূলকে উদ্দেশ্য করে বললো, 'হে আল্লাহর রসূল! আমাদের কি এভাবেই সারাক্ষণ ভীত ও সন্ত্রস্ত থাকতে হবে? এমন দিন কি কখনো আসবে না যখন আমরা নিরাপদ হতে পারবো এবং হাত থেকে অস্ত্র নামাতে পারবো? উত্তরে রসূল (স.) বললেন, আর অল্প কিছু দিনই তোমাদেরকে ধৈর্যধারণ করতে হবে, এরপর তোমাদের কেউ বিরাট জনসমক্ষে বসলে সেখানে একটি লোহাও থাকবে না' আল্লাহ তায়ালা আলোচ্য আয়াতটি নাযিল করেন এবং এর মর্মানুসারে তাঁর প্রিয় নবীকে গোটা আরব জাহানের কর্তৃত্ব দান করেন। ফলে মুসলমানরা জীবনের নিরাপত্তা ফিরে পান, যুদ্ধাবস্থা থেকে মুক্তি পান। আল্লাহর নবী দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়ার পর আবু বকর, ওমর ও ওসমান (রা.) এই তিনজন খলিফার শাসন আমলেও

মুসলমানরা নিরাপদে ছিলেন, শান্তিতে ছিলেন, এরপর যা ঘটার তাই ঘটেছে। ফলে সমাজ জীবনে ভয় ভীতি দানা বেঁধে উঠেছে। শাসকবর্গ নিজেদের নিরাপত্তার খাতিরে প্রহরী ও পুলিশ নিয়োগ করতে বাধ্য হয়েছে। তারা নিজেরাও বদলে গিয়েছিলো, ফলে আল্লাহ তায়ালাও তাদের সাথে সেভাবেই ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ তাদের জীবন থেকে নিরাপত্তা উঠিয়ে নিয়েছেন।

'এরপর যারা অকৃতজ্ঞ হবে, তারাই হবে অবাধ্য'

অর্থাৎ আল্লাহর শর্তের ব্যাপারে অবাধ্য হবে, আল্লাহর ওয়াদার ব্যাপারে অবাধ্য হবে এবং অংগীকারের ব্যাপারে অবাধ্য হবে। আল্লাহ তায়ালা একবার তাঁর ওয়াদা পূর্ণ করে দেখিয়েছেন এবং তিনি ভবিষ্যতেও পূর্ণ করে দেখাবেন যদি মুসলমানরা তার শর্ত অনুযায়ী জীবন যাপন করতে পারে। আর তা হচ্ছে,

'তারা আমার এবাদাত করবে আমার সাথে কোনো কিছুকে শরীক না করে'-

অর্থাৎ আমার সাথে কোনো দেব-দেবী, ব্যক্তি, গোষ্ঠী, চক্র এবং নিজের ব্যক্তিগত খেয়াল খুশী ও কামনা বাসনাকে শরীক করবে না। সকল কিছুর উর্দ্ধে আমার ইচ্ছাকে, আমার হুকুমকে প্রাধান্য দেবে, আমার প্রতি অবিচল ঈমান ও বিশ্বাস রাখবে এবং সৎকাজ করবে। আল্লাহর এই ওয়াদা কেয়ামত পর্যন্ত বহাল থাকবে, কাজেই এই উম্মতের যে কোনো ব্যক্তি ওপরে বর্ণিত শর্তগুলো পালন করবে, তার ক্ষেত্রেই আল্লাহর ওই ওয়াদা বাস্তবায়িত হবে। আর যদি উক্ত শর্তগুলো পালনে কোনো রূপ শৈথিল্য প্রদর্শন করা হয়, তাহলে আল্লাহর সাহায্য বিলম্বিত হবে, ক্ষমতা প্রাপ্তি বিলম্বিত হবে, পৃথিবীর বুকে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা বিলম্বিত হবে এবং শান্তি প্রতিষ্ঠাও বিলম্বিত হবে। তবে মুসলিম জাতি আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষাস্বরূপ যদি কোনো বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয় এবং নিজেদের জান-মালের নিরাপত্তার ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হয়ে আল্লাহর সাহায্য কামনা করে, অথবা লাঞ্ছনা গঞ্জনার সম্মুখীন হয়ে আল্লাহর কাছে মান সম্মান কামনা করে, অথবা পশ্চাদপদতায় নিমজ্জিত হয়ে উন্নতি-অগ্রগতি কামনা এবং আল্লাহ তায়ালা নির্দেশিত পথ অবলম্বন করে তাহলে আল্লাহ তায়ালা তাঁর ওয়াদা পূরণ করে দেখাবেন। এ ব্যাপারে কোনো কিছুই বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না।

কাজেই এই ওয়াদা পালনের পূর্ব শর্ত হিসেবে নামায আদায় করতে, যাকাত আদায় করতে এবং আল্লাহর পূর্ণ আনুগত্যের নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। সাথে সাথে রসূল (স.) কে বলা হচ্ছে তিনি এবং তাঁর উম্মত যেন কোনোভাবেই কাফের সম্প্রদায়কে ভয় করে না চলেন, আমলে না আনেন। তাই বলা হচ্ছে,

'নামায কায়েম করো, যাকাত প্রদান করো এবং রসূলের আনুগত্য করো যাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হও ....। (আয়াত ৫৬-৫৭)

আল্লাহর সাথে সম্পর্ক, নামায আদায়ের মাধ্যমে অন্তরের পরিচ্ছন্নতা, যাকাত আদায়ের মাধ্যমে চারিত্রিক নির্মলতা, রসূলের প্রতি আনুগত্য, আল্লাহর নির্দেশের প্রতি আত্মসমর্পণ, ছোটো বড়ো সকল বিষয়ে আল্লাহর বিধানের অনুসরণ, আল্লাহর মনোনীত জীবনাদর্শ অনুযায়ী জীবন যাপন এসবই হচ্ছে আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ লাভের উপায় উপকরণ। এর মাধ্যমেই মানুষ পৃথিবীর বুকে সব ধরনের আপদ বিপদ, ভয় ভীতি, উদ্বেগ উৎকণ্ঠা এবং ভ্রান্তি ও বিচ্যুতির হাত থেকে রক্ষা পায়। আর পরকালে মুক্তি পায় আল্লাহর গযব, আযাব ও শাস্তির কবল থেকে।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা মুসলিম জাতিকে লক্ষ্য করে বলছেন যে, তোমরা যদি সঠিক আদর্শের অনুসারী হও, তাহলে কাফের মোশরেকদের কোনো শক্তিই তোমাদেরকে টলাতে

পারবে না। তোমাদের চলার পথে তারা কখনো বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না। কারণ তোমাদের শক্তির উৎস হচ্ছে তোমাদের ঈমান, তোমাদের আদর্শ এবং তোমাদের নৈতিক মনোবল। জাগতিক ও বৈষয়িক শক্তি সামর্থ্যের দিক থেকে তোমরা দুর্বল হলেও তোমরা অজেয় ঈমানী শক্তির অধিকারী। এই ঈমানী শক্তির বলেই তোমরা অসাধ্য সাধন করতে সক্ষম।

ইসলাম হচ্ছে একটি বিরাট সত্য। এই সত্য উপলব্ধি করতে না পারলে আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত আল্লাহর ওয়াদার তাৎপর্যও উপলব্ধি করা সম্ভবপর হবে না। কাজেই আল্লাহর ওয়াদার ব্যাপারে কোনোরূপ সংশয় সন্দেহ পোষণ করার আগে মানব ইতিহাসে ইসলামী জীবন বিধানের অবদান ও প্রভাবগুলো খতিয়ে দেখতে হবে।

এটা ঐতিহাসিকভাবে সত্য যে, মুসলিম জাতি যখনই আল্লাহর বিধান মেনে চলেছে, আল্লাহর দ্বীনকে জীবনের সর্বস্তরে বাস্তবায়িত করেছে তখনই আল্লাহ তায়ালা নিজের ওয়াদা পূরণ করেছেন এবং মুসলিম জাতিকে পৃথিবীর শাসন ও কর্তৃত্ব দান করেছেন। আর যখনই সে খোদায়ী বিধানের বরখেলাপ করেছে তখনই তাকে পেছন সারিতে সরিয়ে দেয়া হয়েছে, তার কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে এবং শত্রুদের হাতে তাদের অসহায়ভাবে ছেড়ে দেয়া হয়েছে।

মনে রাখতে হবে, আল্লাহর ওয়াদা এখনও বলবৎ রয়েছে। এই ওয়াদা বাস্তবায়নের পূর্ব শর্তগুলোও সবার সামনে রয়েছে। কাজেই কেউ এই ওয়াদার বাস্তবায়ন চাইলে তাকে প্রথমে এর পূর্ব শর্তগুলো পূরণ করে দেখাতে হবে। যদি এই শর্তগুলো পূরণ করা হয় তাহলে আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই তাঁর ওয়াদা বাস্তবায়িত করবেন। কারণ, তাঁর চেয়ে বড় ওয়াদা রক্ষাকারী আর কে হতে পারে?

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِيَسْتَاْذِنْكُمُ الَّذِيْنَ مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ وَالَّذِيْنَ لَمْ
يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلٰثَ مَرّٰتٍ ، مِنْ قَبْلِ صَلٰوةِ الْفَجْرِ وَحِيْنَ تَضَعُوْنَ
ثِيَابَكُمْ مِّنَ الظَّهِيْرَةِ وَمِنْۢ بَعْدِ صَلٰوةِ الْعِشَآءِ ۚ ثَلٰثُ عَوْرٰتٍ لَّكُمْ ،
لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌۢ بَعْدَهُنَّ ، طَوّٰفُوْنَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلٰى
بَعْضٍ ، كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ ، وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿٥٨﴾ وَاِذَا بَلَغَ
الْاَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَاْذِنُوْا كَمَا اسْتَاْذَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ،
كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ ، وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿٥٩﴾ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ
النِّسَآءِ الّٰتِيْ لَا يَرْجُوْنَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ اَنْ يَّضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ
غَيْرَ مُتَبَرِّجٰتٍۢ بِزِيْنَةٍ ، وَاَنْ يَّسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ ، وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٦٠﴾

রুকু ৮

৫৮. হে (মানুষ,) তোমরা যারা ঈমান এনেছো (মনে রেখো), তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস দাসীরা এবং তোমাদের মধ্য থেকে যারা এখনো বয়োপ্রাপ্ত হয়নি, তারা যেন তিনটি সময়ে তোমাদের (কাছে আসার জন্যে) অনুমতি চেয়ে নেয় (সে সময়গুলো হচ্ছে); ফজর নামাযের আগে, দুপুরে যখন তোমরা (কিছুটা আরাম করার জন্যে) নিজেদের পরিধেয় বস্ত্র (শিথিল করে) রাখো এবং এশার নামাযের পর। (মূলত) এ তিনটি (সময়) হচ্ছে তোমাদের পর্দা অবলম্বনের (সময়), এগুলো ছাড়া (অন্য সময়ে আসা যাওয়ার ব্যাপারে) তোমাদের ওপর কোনো দোষ নেই, না এতে তাদের জন্যে কোনো রকমের দোষ আছে; (কেননা) তোমরা তো প্রায়ই একে অপরের কাছে সব সময়ই যাতায়াত করে থাকো, আল্লাহ তায়ালা এভাবেই (নিজের) নির্দেশগুলো তোমাদের জন্যে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন; (বস্তুত) আল্লাহ তায়ালা মহাজ্ঞানী, তিনি প্রবল প্রজ্ঞাবান। ৫৯. তোমাদের (নিজেদের) সন্তানরাও যখন বয়োপ্রাপ্ত হয়ে যায় তখন তারা যেন (তোমাদের কামরায় প্রবেশের আগে) সেভাবেই অনুমতি নেয়, যেভাবে তাদের আগে (বড়োরা) অনুমতি নিতো; আল্লাহ তায়ালা এভাবেই তাঁর আয়াতসমূহকে তোমাদের কাছে খুলে খুলে বর্ণনা করেন; আল্লাহ তায়ালা (সব কিছু) জানেন, তিনি পরম কুশলী বটে। ৬০. বৃদ্ধা নারী, যাদের এখন আর কারো বিয়ের (বন্ধনে আসার) আশা নেই, তাদের ওপর কোনো দোষ নেই, যদি তারা তাদের (শরীর থেকে অতিরিক্ত) কাপড় খুলে রাখে, (তবে শর্ত হচ্ছে) তারা সৌন্দর্য প্রদর্শনকারী হবে না; (অবশ্য) এ (অতিরিক্ত কাপড় খোলা) থেকেও যদি তারা বিরত থাকতে পারে তা (তাদের জন্যে) ভালো; আল্লাহ তায়ালা (সব কিছু) শোনেন, আল্লাহ তায়ালা (সব কিছু) জানেন।

لَيْسَ عَلَى الْاَعْمٰى حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْاَعْرَجِ حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْمَرِيْضِ
حَرَجٌ وَّلَا عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ اَنْ تَاْكُلُوْا مِنْۢ بُيُوْتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اٰبَآئِكُمْ اَوْ
بُيُوْتِ اُمَّهٰتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اِخْوَانِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اَخَوٰتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ
اَعْمَامِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ عَمّٰتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اَخْوَالِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ خٰلٰتِكُمْ اَوْ مَا
مَلَكْتُمْ مَّفَاتِحَهٗٓ اَوْ صَدِيْقِكُمْ ۚ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَاْكُلُوْا جَمِيْعًا اَوْ
اَشْتَاتًا ۚ فَاِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوْتًا فَسَلِّمُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ
مُبٰرَكَةً طَيِّبَةً ۚ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿٦١﴾ اِنَّمَا
الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاِذَا كَانُوْا مَعَهٗ عَلٰٓى اَمْرٍ جَامِعٍ
لَّمْ يَذْهَبُوْا حَتّٰى يَسْتَاْذِنُوْهُ ۚ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَاْذِنُوْنَكَ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ

৬১. যে ব্যক্তি অন্ধ তার ওপর কোনো (বিধি নিষেধের) সংকীর্ণতা নেই, যে পঙ্গু তার ওপর কোনো (বিধি নিষেধের) সংকীর্ণতা নেই, যে ব্যক্তি অসুস্থ তার ওপরও কোনো বাধ্যবাধকতা নেই এবং তোমাদের নিজেদের ওপরও কোনো দোষ নেই– যদি তোমরা তোমাদের নিজেদের ঘর থেকে কিছু খেয়ে নাও, একইভাবে এটাও তোমাদের জন্যে দূষণীয় হবে না, যদি তোমরা তোমাদের পিতা (পিতামহের) ঘরে, মায়েদের ঘরে, ভাইদের ঘরে, বোনদের ঘরে, চাচাদের ঘরে, ফুফুদের ঘরে, মামাদের ঘরে, খালাদের ঘরে, (আবার) এমন সব ঘরে– যার চাবি তোমাদের অধিকারে রয়েছে, কিংবা তোমাদের বন্ধুদের ঘরে (কিছু খাও); অতপর এতেও কোনো দোষ নেই যে, (এসব জায়গায়) তোমরা সবাই একত্রে খাবে কিংবা আলাদা আলাদা খাবে, তবে যখনি (এসব) ঘরে প্রবেশ করবে তখন একে অপরের প্রতি সালাম করবে, এটা হচ্ছে আল্লাহর কাছ থেকে (তাঁরই নির্ধারিত) কল্যাণময় এক পবিত্র অভিবাদন; এভাবেই আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্যে তাঁর আয়াতসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেন, যাতে করে তোমরা বুঝতে পারো।

রুকু ৯

৬২. (খাঁটি ঈমানদার ব্যক্তি তো হচ্ছে তারা,) যারা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের ওপর ঈমান আনে, কখনো যদি তারা কোনো সমষ্টিগত ব্যাপারে তার সাথে একত্রিত হয় তাহলে যতোক্ষণ তারা তার কাছ থেকে অনুমতি চাইবে না, ততোক্ষণ তারা (সেখান থেকে) কেউ সরে যাবে না; (হে নবী,) যারা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের ওপর বিশ্বাস করে, যদি তারা কখনো তাদের নিজেদের কোনো কাজে (বাইরে যাবার জন্যে) তোমার কাছে অনুমতি

يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَرَسُولِهٖ ۚ فَاِذَا اسْتَاْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَاْنِهِمْ فَاْذَنْ لِّمَنْ
شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝٦٢ لَا تَجْعَلُوا
دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا ۚ قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ الَّذِينَ
يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا ۚ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ اَمْرِهٖٓ اَنْ تُصِيبَهُمْ
فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيمٌ ۝٦٣ اَلَآ اِنَّ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ
قَدْ يَعْلَمُ مَآ اَنْتُمْ عَلَيْهِ ۚ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ اِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا ۚ وَاللّٰهُ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝٦٤

চায়, তাহলে তুমি যাকে ইচ্ছা তাকে অনুমতি দিয়ো এবং আল্লাহ তায়ালার কাছে এদের গুনাহ মাফের জন্যে দোয়া করো, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। ৬৩. (হে মুসলমানরা,) যখন নবী তোমাদের ডাকে, তখন তাঁর ডাককে পারস্পরিক ডাকের মতো মনে করো না; আল্লাহ তায়ালা সেসব লোকদের ভালো করেই জানেন যারা (নিজেদের) আড়াল করে (নবীর) সামনে থেকে (নানা অজুহাতে) সরে যায়, সুতরাং যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তাদের এ ব্যাপারে ভয় করা উচিত, তাদের ওপর (এ বিরুদ্ধাচরণের জন্যে এ দুনিয়ায়) কোন বিপর্যয় এসে পড়বে কিংবা (পরকালে) কোনো কঠিন আযাব এসে তাদের গ্রাস করে নেবে। ৬৪. (হে মানুষ, তোমরা) জেনে রেখো, আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে তা সবই আল্লাহ তায়ালার জন্যে (নিবেদিত), তোমরা যে (অবস্থার) ওপর আছো; আল্লাহ তায়ালা তা ভালো করেই জানেন; যেদিন মানুষ সবাই তাঁর দিকেই প্রত্যবর্তিত হবে, সেদিন তিনি তাদের সবকিছুই জানিয়ে দেবেন, যা কিছু তারা (দুনিয়ায়) করতো। আল্লাহ তায়ালা সব বিষয়েই ওয়াকেফহাল।

তাফসীর

আয়াত ৫৮-৬৪

'হে মোমেনরা! তোমাদের দাস দাসীরা এবং তোমাদের মধ্যে যারা প্রাপ্ত বয়স্ক হয়নি ......। (আয়াত ৫৮)

ইসলাম হচ্ছে একটি পূর্ণাংগ জীবন বিধান। আর সে কারণে মানব জীবনের খুঁটি নাটি প্রতিটি বিষয় ও দিক সম্পর্কে এর নির্দেশনা রয়েছে। সাধারণ জীবন যাপন করতে গিয়ে কি কি নিয়ম কানুন ও আদব কায়দা মেনে চলতে হবে- সে শিক্ষাও অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে ইসলাম মানুষকে দিয়ে থাকে। মোট কথা ইসলাম মানব জীবনকে সঠিক পথে পরিচালিত করে আল্লাহমুখী করে তোলে।

আলোচ্য সূরা আমাদের এই বক্তব্যের বাস্তব প্রমাণ। এই সূরার প্রথম দিকে কিছু ফৌজদারী বিধান বর্ণিত হয়েছে। তারপর বর্ণিত হয়েছে কারো বাড়ীতে প্রবেশ করার আগে অনুমতি প্রার্থনার বিষয়টি। এরপর বর্ণিত হয়েছে বিশাল সৃষ্টি জগতের বিভিন্ন বিষয়াদি। এরপর বর্ণিত হয়েছে

আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের ফয়সালার প্রতি মুসলমান ও মোনাফেকদের দৃষ্টিভংগির পার্থক্য। এরপর বর্ণিত হয়েছে পৃথিবীর কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা দানের ব্যাপারে আল্লাহর ওয়াদার বিষয়টি। আর এখন আবার আলোচনায় আসছে ঘরে প্রবেশের পূর্বে অনুমতি প্রার্থনার বিষয়টি। সাথে সাথে রসূলের বৈঠক থেকে ওঠার পূর্বে অনুমতি প্রার্থনা, বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনদের সাথে দেখা সাক্ষাত, আদর আপ্যায়ন ও খানাপিনা সংক্রান্ত আদব কায়দার প্রসংগও আলোচনা করা হয়েছে। এসব আদব কায়দা মেনে চলে মুসলিম সমাজ নিজেদের মধ্যকার সম্পর্ক সুসংহত ও সুশৃংখল করতে সক্ষম হোক, এটাই পবিত্র কোরআনের উদ্দেশ্য। সে কারণেই জীবনের খুঁটি-নাটি সকল ক্ষেত্রেই পবিত্র কোরআন দিকনির্দেশনা দিয়ে থাকে।

ঘরের লোকদেরও অনুমতি নিয়ে প্রবেশ করতে হবে

এর আগে কারো বাড়ীতে প্রবেশ করার আগে অনুমতি প্রার্থনার বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। এখন আলোচনা করা হচ্ছে ঘরের ভেতরে থাকা অবস্থায় অনুমতি প্রার্থনার বিষয়টি।

আলোচ্য আয়াতে বলা হচ্ছে যে, বাড়ীর ভেতর সেবায় নিয়োজিত ক্রীতদাস এবং বোধ সম্পন্ন শিশুরা অনুমতি ছাড়াই ঘরে প্রবেশ করতে পারবে। তবে তিনটি সময়ে তাদেরকেও অনুমতি নিয়ে ঘরে প্রবেশ করতে হবে। সময় তিনটি হচ্ছে, ফজরের নামাযের পূর্বে, দুপুরে বিশ্রামের সময় এবং এশার নামাযের পর। কারণ, এই তিনটি মুহূর্তে মানুষ সাধারণত পরনের কাপড় খুলে বিশ্রামের জন্যে হাল্কা কাপড় পরে থাকে। এই তিনটি মুহূর্তে অসর্তকতার কারণে মানুষের লজ্জাস্থান উম্মুক্ত হতে পারে। তাই দাস দাসী ও ছোট বাচ্চাদেরকে অনুমতি নিয়ে ঘরে ঢুকতে বলা হয়েছে যেন তাদের পিতা-মাতা বা আত্মীয় স্বজনদের কারো লজ্জাস্থানের প্রতি নযর না পড়তে পারে। এটা একটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় আদব বা শিষ্টাচার । অথবা এই প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ শিষ্টাচারটির ব্যাপারে ঘরোয়া জীবনে অনেকেই উদাসীন। তাদের ধারণা, চাকর-বাকরদের দৃষ্টি কখনো মনিবদের লজ্জাস্থানের ওপর পড়তে পারে না। তাদের আরো ধারণা, অপ্রাপ্ত বয়স্ক বাচ্চারা কখনো এসব বিষয় নিয়ে মাথা ঘামায় না। অথচ আধুনিক মনোবিজ্ঞান এতো যুগ পরে এসে প্রমাণ করে দেখাচ্ছে যে, বাল্যকালে দেখা কোনো অবাঞ্ছিত ঘটনা বা দৃশ্য মানুষের গোটা জীবনকে প্রভাবিত করে এবং এর অশুভ পরিণতি হিসেবে শিশুরা দুরারোগ্য মানসিক ব্যাধিতেও আক্রান্ত হয়ে পড়ে।

কিন্তু, আল্লাহ তায়ালা তো সব কিছুই জানেন ও দেখেন। তিনি এমন একটি জাতি গঠন করতে চান যে জাতি হবে সুস্থ মন মানসিকতার অধিকারী, নির্মল অনুভূতির অধিকারী, পবিত্র মনের অধিকারী এবং পরিচ্ছন্ন চিন্তা চেতনার অধিকারী। তাই তিনি এসব আদব কায়দার তালিম দিচ্ছেন।

এই তিনটি মুহূর্তে লজ্জাস্থান উন্মুক্ত হওয়ার আশংকা আছে বলেই অনুমতি নিয়ে ঘরে প্রবেশ করার কথা বলা হয়েছে। অন্য সময় চাকর বাকর ও ছোট-বাচ্চাদের অনুমতি নেয়ার প্রয়োজন নেই। কারণ, এটা তাদের জন্যে কষ্টকর হবে। তারা প্রতি মুহূর্তে ভেতর বাড়ীতে থাকার ফলে সময় অসময়ে বড়দের ঘরে ঢুকে থাকে। তাই যে মুহূর্তে লজ্জাস্থান উন্মুক্ত হওয়ার আশংকা থাকে কেবল সে মুহূর্তগুলোতেও তাদেরকে অনুমতি নিয়ে ঢুকতে বলা হয়েছে, অন্য সময়ে নয়।

তবে ছোট বাচ্চারা সাবালক হয়ে গেলে তখন তাদেরকেও বেগানা পুরুষদের মতোই অনুমতি নিয়ে ঘরে ঢুকতে হবে। কারণ তাদের বেলায়ও অনুমতি প্রার্থনা সংক্রান্ত বিধান কার্যকর হবে। এই বিধান পূর্বে আলোচিত হয়েছে। আয়াতের শেষে বলা হয়েছে,

'আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়'

অর্থাৎ এসব আদব কায়দা মানুষের জীবনের জন্যে কতোটুকু প্রয়োজন ও গুরুত্বপূর্ণ তা আল্লাহ তায়ালা যথার্থরূপে জানেন। সাথে সাথে তিনি আরো জানেন, কোন পন্থায় ও কোন পদ্ধতিতে মানুষের হৃদয় ও মনের চিকিৎসা করা সম্ভব।

ক্ষেত্র বিশেষ শিথিলতা প্রদর্শন ও আত্মীয় স্বজনের সাথে সম্পর্কের ধরন

ইতিপূর্বে মেয়েদেরকে নিজেদের সাজগোজ লুকিয়ে রেখে চলাফেরার কথা বলা হয়েছে যেন কোনো প্রকার অশ্লীল ও অপ্রীতিকর ঘটনার সৃষ্টি না হয়। এখন আলোচনা করা হচ্ছে সেই সকল নারীদের ব্যাপারে যারা বিগত যৌবনা, যাদের মাঝে কামোদ্দিপক দৈহিক বৈশিষ্ট্যগুলো অনুপস্থিত। তাদের ব্যাপারে আয়াতে বলা হচ্ছে,

'বৃদ্ধা নারী যারা বিবাহের আশা রাখে না, যদি তারা তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে তাদের বস্ত্র খুলে রাখে তাদের জন্যে দোষ নেই। তবে এ থেকে বিরত থাকাই তাদের জন্যে উত্তম।'

অর্থাৎ দুটো শর্ত সাপেক্ষে বিগত যৌবনা বৃদ্ধা মহিলারা নিজেদের বহিরাবরণ খুলে রাখতে পারবেন। প্রথম শর্ত হলো, এর দ্বারা যেন তাঁদের লজ্জাস্থান উন্মুক্ত না হয়ে পড়ে। আর দ্বিতীয় শর্ত হলো, এর ফলে যেন তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শিত না হয়। তবে ঢেকে-ঢুকে থাকাটাই হবে তাদের জন্যে উত্তম। কারণ, খোলামেলা পোষাক অনেক অনাচারের জন্ম দেয়। অপরদিকে শালীনতাপূর্ণ পোষাকাদি মানুষকে উপহার দেয় সংযত জীবন ও নির্মল চরিত্র। ওই কারণেই ইসলাম সব ধরনের অশ্লীলতা অশালীনতা ও কামোদ্দিপক পোষাক পরিচ্ছদ ও আচার-আচরণকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে, 'আল্লাহ তায়ালা সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ' ......

অর্থাৎ তিনি শুনেন ও জানেন। মানুষ মুখে কি বলে, সে সম্পর্কে তিনি অবগত আছেন এবং তার মনের গভীরে কি সব জল্পনা কল্পনা চলে সে সম্পর্কেও তিনি অবগত আছেন। কারণ গোটা বিষয়টাই হচ্ছে বিবেক নির্ভর, সদিচ্ছা নির্ভর। বিবেকের খবরও যেহেতু আল্লাহর জানা আছে, কাজেই এখানে কপটতার কোনো অবকাশ নেই।

এর পরের আয়াতে ভাই-বেরাদর, আত্মীয়স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যকার সম্পর্ক ও দায় দায়িত্ব কি রূপ হওয়া উচিত সে সম্পর্কে বলা হয়েছে। যেমন,

'অন্ধের জন্যে দোষ নেই, খঞ্জের জন্যে দোষ নেই ....এমনিভাবে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্যে আয়াতসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেন যাতে তোমরা বুঝে নাও। (আয়াত ৬১)

বর্ণিত আছে যে, সাহাবায়ে কেরামরা আয়াতে উল্লেখিত বাড়ীগুলোতে কোনো প্রকার পূর্ব অনুমতি ছাড়াই ঢুকতেন এবং খাবার গ্রহণ করতেন। অনেক সময় তাঁদের আত্মীয়রা অন্ধ, খোঁড়া ও অসুস্থ ব্যক্তিদেরকেও খাওয়ানোর জন্যে তাদের সাথে করে নিয়ে আসতে বলতেন। কিন্তু দাওয়াত ছাড়া এসব লোকদেরকে আনতে তারা দ্বিধাবোধ করতেন। এমনকি ওইসব লোকেরা বিনা দাওয়াতে কারো বাড়ীতে খেতে দ্বিধাবোধ করতো। কারণ, অপর একটি আয়াতে বলা হয়েছে,

'তোমরা অন্যায়ভাবে পরস্পরের সম্পদ গ্রাস করো না।' (সূরা নিসা ২৯)

এই আয়াতের মর্মার্থ তাদের সামনে ছিলো বলে তারা অন্যের বাড়ীতে বিনা দাওয়াতে খাবার গ্রহণ করতে এতো দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। তারা সব সময়ই সতর্ক থাকতেন যেন কোনো নিষিদ্ধ কাজ তাদের দ্বারা না হয়ে যায়। তাই আল্লাহ তায়ালা আলোচ্য আয়াত নাযিল করে অন্ধ, খোঁড়া, অসুস্থ ও আত্মীয়স্বজনদের ব্যাপারে ছাড় দিয়ে বলেছেন যে, তারা আয়াতে বর্ণিত ব্যক্তিদের বাড়ীতে

নিসংকোচে খেতে পারে এবং অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিদেরকেও সাথে নিয়ে গিয়ে খাওয়াতে পারে। তবে শর্ত হচ্ছে এই যে, বাড়ীর কর্তার যেন এতে কোনো আপত্তি না থাকে এবং এর দ্বারা যেন তার কোনো ক্ষতি না হয়। কারণ শরীয়তের একটা সাধারণ বিধান হচ্ছে, 'কারো ক্ষতি করা যাবে না' এবং 'সন্তুষ্টি ও অনুমতি ব্যতীত কোনো মুসলমানের সম্পদ অপর মুসলমানের জন্যে বৈধ নয়।'

আলোচ্য আয়াতটি যেহেতু আইন সংক্রান্ত, তাই এর বর্ণনা ভংগি অত্যন্ত সুস্পষ্ট, শব্দ বিন্যাস অত্যন্ত সূক্ষ্ম এবং বিষয়বস্তুর ধারাবাহিকতাও অত্যন্ত যুক্তিসংগত। আরো একটি বিষয় লক্ষণীয়, সেটা হচ্ছে আত্মীয়তার বর্ণনার মাঝে ধারাবাহিকতা। আয়াতে পুত্র ও স্বামীর ঘরকে 'তোমাদের নিজেদের ঘর' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কারণ, পুত্রের ঘর পিতার জন্যে আপন ঘর হিসেবেই বিবেচিত হয়ে থাকে, ঠিক তেমনিভাবে স্বামীর ঘরও স্ত্রীর জন্যে আপন ঘর হিসেবেই গণ্য হয়। এরপর এসেছে পিতার ঘর, তারপর মাতার ঘর, তারপর ভাইদের ঘর, তারপর বোনদের ঘর, তারপর চাচাদের ঘর, তারপর ফুফুদের ঘর, তারপর মামাদের ঘর, তারপর খালাদের ঘর। এই আত্মীয়তার সম্পর্কের সাথে আর এক প্রকার সম্পর্ককে যোগ করা হয়েছে। সেটা হচ্ছে কর্মের সম্পর্ক। অর্থাৎ কেউ যদি কারো সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকে তাহলে সেও প্রয়োজন অনুসারে নিয়োগকর্তার ঘরে খাবার গ্রহণ করতে পারে। এরপর বন্ধু বান্ধবদেরকে ও আত্মীয়স্বজনদের পর্যায়ে স্থান দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ যদি কোনো আপত্তি না থাকে তাহলে যে কোনো বন্ধু অপর বন্ধুর ঘরে অনুমতি ছাড়াই খাবার গ্রহণ করতে পারে।এখন খাবার গ্রহণের নিয়ম বলা হচ্ছে,

'তোমরা একত্রে আহার করো, অথবা পৃথকভাবে আহার করো, তাতে তোমাদের কোনো দোষ নেই।'

ইসলাম পূর্ব যুগে আরবদের মাঝে একটা প্রথার প্রচলন ছিলো। সেটা হচ্ছে, তারা একা একা খেতো না। কাউকে না পেলে আহার বন্ধ রাখতো। আল্লাহ তায়ালা এই কষ্টসাধ্য প্রথা রহিত করে একটা সহজ ও স্বাভাবিক নিয়ম প্রবর্তন করে বলছেন যে, তোমরা একত্রেও খেতে পারো এবং পৃথক পৃথকও খেতে পারো এতে দোষের কিছু নেই।

এখন কারো ঘরে প্রবেশ করার আগে কি করতে হবে তা বর্ণনা করা হচ্ছে,

'অতপর যখন তোমরা গৃহে প্রবেশ করো, তখন তোমাদের স্বজনদের প্রতি সালাম করবে। এটা আল্লাহর কাছ থেকে কল্যাণময় ও পবিত্র দোয়া।'

অর্থাৎ নিজেদের আত্মীয়স্বজন ও বন্ধু বান্ধবদের প্রতি সালাম জানানোর মাধ্যমে মানুষ প্রকৃতপক্ষে নিজের জন্যেই কল্যাণের দোয়া করে থাকে। আর এই দোয়া অন্য কারো পক্ষ থেকে নয়, বরং স্বয়ং আল্লাহর পক্ষ থেকে। এর মাধ্যমে আত্মীয়তার বন্ধন আরো দৃঢ় হয়, আরো গভীর হয়।

কেবল আত্মীয়তার বন্ধনই দৃঢ় হয় না। বরং বান্দার সাথে তার রব বা প্রতিপালকের বন্ধনও দৃঢ় হয়। সাথে সাথে বান্দা তার প্রতিপালকের নির্দেশের মাহাত্ম ও তাৎপর্যও উপলব্ধি করতে পারে। তাই বলা হয়েছে,

'এমনিভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্যে আয়াতসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা বুঝতে পার।'

একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক শিক্ষা

আত্মীয়স্বজন ও বন্ধু বান্ধবদের মধ্যকার সম্পর্কের সুশৃংখলা বিধানের পর এখন মুসলিম উম্মাহ ও তাদের নেতা ও প্রধান মোহাম্মদ (স.)-এর মধ্যকার সম্পর্ক কি রূপ হওয়া উচিত এবং তাঁর বৈঠকে বসতে হলে কি ধরনের আদব কায়দা রক্ষা করে চলা উচিত সে সম্পর্কে বলা হচ্ছে,

'মোমেন তো তারাই যারা আল্লাহ ও রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে ....আয়াত ৬২-৬৪)

আলোচ্য আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন যে, খন্দক যুদ্ধের সময় কোরায়শ ও তাদের মিত্রবাহিনী যখন সম্মিলিতভাবে মদীনা আক্রমণের পরিকল্পনা নেয় তখন মদীনাকে রক্ষা করার জন্যে পরিখা খনন করা হয়। এই খনন কাজে উৎসাহ দেয়ার জন্যে স্বয়ং রসূল (স.) তাতে শরীক হয়েছেন। মুসলমানরা অত্যন্ত পরিশ্রম ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করছিলেন। অপরদিকে মোনাফেকরা অত্যন্ত ঢিলেমী ভাব নিয়ে কাজ করতো আর সুযোগ পেলে রসূলকে না জানিয়েই সটকে পড়তো। অথচ মুসলমানরা যে কোনো ছোট-খাটো প্রয়োজন বা অসুবিধা দেখা দিলে তা রসূলকে জানাতেন এবং তা দূর করার জন্যে রসূলের কাছ থেকে অনুমতি প্রার্থনা করতেন। তিনি অনুমতি দিলে তারা যেতেন এবং প্রয়োজন শেষ হওয়ার সাথে সাথে ফিরে এসে পুনরায় খনন কাজে যোগ দিতেন। এটা করতেন তারা একমাত্র আল্লাহকে রাজী খুশী করার জন্যে এবং ইহকাল ও পরকালের মঙ্গলের আশায়। তাই তাদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াতে প্রশংসার বাণী উচ্চারিত। অপরদিকে মোনাফেকদের কার্য-কলাপের নিন্দাবাদ জানানো হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতের শানে নুযূল বা পটভূমি যাই থাকুক না কেন এর মাধ্যমে সাংগঠনিক ও মনস্তাত্তিক নিয়ম নীতি বর্ণনা করা হয়েছে। এর দ্বারা কোনো সংগঠনের সাধারণ অনুসারী ও নেতৃস্থানীয় লোকদের মধ্যকার সম্পর্কের ধরন ও প্রকৃতিও তুলে ধরা হয়েছে। এই আদব কায়দা ও শিষ্টাচার যদি অনুভূতি, চেতনা ও বিবেকের গভীর থেকে উৎসারিত না হয় এবং তা জীবনের চলার পথে অনুসৃত প্রথা ও অলংঘনীয় নীতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত না হয় তাহলে কোনো সামষ্টিক কার্যক্রমই স্থায়িত্ব লাভ করতে পারবে না, স্থিতিশীল হতে পারবে না। বরং তা সীমাহীন নৈরাজ্যে পর্যবসিত হবে।

আলোচ্য আয়াতে যে সকল মোমেনদের কথা বলা হয়েছে তাঁরা হচ্ছেন সত্যিকার অর্থে মোমেন। কথায় ও কাজে মোমেন। তাঁরা এমন মোমেন নন যারা কেবল মুখে ঈমানের দাবী করে, অথচ বাস্তব জীবনে ঈমানের কোনো চিহ্নই তাদের মাঝে দেখা যায় না। কারণ, তারা আল্লাহরও আনুগত্য করে না এবং রসূলেরও আনুগত্য করে না।

এখানে সমষ্টিগত কাজ বলতে এমন গুরুত্বপূর্ণ কাজ বুঝানো হয়েছে যে ব্যাপারে সলা-পরামর্শ করার জন্যে সকলের উপস্থিতি প্রয়োজন হয়ে পড়ে। যেমন যুদ্ধ-বিগ্রহ বা জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোনো বিষয়। এ সকল ক্ষেত্রে একজন মোমেনের দায়িত্ব হলো, নেতা বা দায়িত্বশীল ব্যক্তির অনুমতি ব্যতীত সভা ত্যাগ না করা। অন্যথায় গোটা ব্যাপারটাই উচ্ছৃংখল ও নৈরাজ্যপূর্ণ পরিস্থিতির শিকার হয়ে পড়বে।

আর যারা এই পর্যায়ের মযবুত ঈমানী গুণাবলীর অধিকারী হয় এবং এই পর্যায়ের আদব কায়দা ও নিয়ম নীতির অনুসারী হয় তারা অত্যন্ত অসুবিধায় না পড়লে অনুমতি প্রার্থনা করে না। তাদের ঈমান এবং তাদের শিষ্টাচারই তাদেরকে বাধ্য করে জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে না রাখতে। এরপরও উম্মতের কর্ণধার মহান নেতা রসূলুল্লাহ

(স.) কে অনুমতি প্রদান করা বা না করার পূর্ণ এখতিয়ার দেয়া হয়েছে। এ সম্পর্কে কোরআনের বক্তব্য হলো,

'অতপর তারা তোমার কাছে তাদের কোনো কাজের জন্যে অনুমতি চাইলে তুমি তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা অনুমতি দাও।'

উল্লেখ্য যে, ইতিপূর্বে মোনাফেকদেরকে যুদ্ধে না যাওয়ার অনুমতি দেয়ার কারণে রসূলকে তিরস্কার করে বলা হয়েছে,

'আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুন, তুমি কেন তাদেরকে অব্যাহতি দিলে, যে পর্যন্ত না তোমার কাছে সত্যবাদীরা পরিস্কার হয়ে যেতো এবং জেনে নিতে মিথ্যাবাদীদের' (সূরা তাওবা ৪৩)

তাই আলোচ্য আয়াতে তাঁকে অনুমতি দেয়া বা না দেয়ার ব্যাপারে পূর্ণ স্বাধীনতা দেয়া হচ্ছে। এর ফলে গুরুতর প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে কাউকে অনুমতি না দেয়ার স্বাধীনতাও তিনি পেয়ে গেলেন। এই হিসেবে একজন দলনেতার দায়িত্ব হলো, অনুমতি প্রার্থনাকারীর উপস্থিতি ও অনুপস্থিতি সামষ্টিক স্বার্থের ক্ষেত্রে কতোটুকু প্রভাব ফেলতে পারে, তা বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। সাংগঠনিক বিষয়ে সুষ্ঠু পরিচালনার স্বার্থে তার মতামতই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

এ সত্তেও আয়াতের মূল বক্তব্য দ্বারা বুঝা যায় যে, ব্যক্তিগত প্রয়োজন ত্যাগ করে সমষ্টিগত প্রয়োজনকে প্রাধান্য দেয়াই উত্তম এবং অনুমতি নিয়ে সভা ত্যাগ করাও এক প্রকারের দোষ ও ত্রুটি। যার ফলে রসূলকে তাদের জন্যে এস্তেগফার বা ক্ষমা প্রার্থনা করার জন্যে বলা হয়েছে যেমন,

'এবং তাদের জন্যে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল, মেহেরবান।'

আর এ কারণেই অনুমতি প্রার্থনা করতে গিয়ে প্রকৃত মোমেনদের বিবেকে বাধবে। ফলে শত প্রয়োজন থাকলেও তারা সহজে অনুমতি তলব করবে না।

এই আয়াতে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। তাহলো, অনুমতি তলব করার সময় বা যে কোনো অবস্থায় আল্লাহর নবীকে তাঁর নাম ধরে সম্বোধন করা যাবে না। বরং তাঁকে 'হে আল্লাহর রসূল' বা 'হে আল্লাহর নবী' .... এভাবে সম্বোধন করতে হবে। কারণ, আল্লাহ তায়ালা নিজেই তাঁকে এভাবে সম্বোধন করে সম্মানিত করেছেন। তাই বলা হয়েছে,

'রসূলের আহ্বানকে তোমরা তোমাদের একে অপরকে আহ্বানের মতো গণ্য করো না'.......

বরং অত্যন্ত আদবের সাথে ও সম্মানের সাথে তাঁকে সম্বোধন করতে হবে।

এই নির্দেশের ফলে নবীর প্রতি মোমেনদের ভক্তি শ্রদ্ধা আরো বৃদ্ধি পাবে এবং তাঁর প্রতিটি কথা ও প্রতিটি নির্দেশকে তারা সম্মানের চোখে দেখবে। এটা অত্যন্ত জরুরী বিষয়। একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তির মাঝে গাম্ভীর্য থাকতে হবে। একজন নেতার আচারণ আচরণে ও কথা বার্তায় একটা ওযন থাকতে হবে। তিনি অবশ্যই বিনয়ী হবেন, উদার হবেন ও নম্র হবেন। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, তার অনুসারীরা তাঁর মান-মর্যাদার কথা ভুলে গিয়ে তাঁকে সেভাবেই সম্বোধন করবে যে ভাবে নিজেরা একে অপরকে সম্বোধন করে থাকে। বরং অনুসারীদের মনে নেতার প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা থাকতে হবে, তাঁর মান-মর্যাদার অনুভূতি থাকতে হবে যেন কোনোভাবেই তারা নেতার প্রতি অসম্মানজনক আচরণ করতে না পারে।

এরপর আলোচ্য আয়াতে মোনাফেকদেরকে সতর্ক করা হচ্ছে যে, রসূলের দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে এবং অনুমতি ছাড়াই চুপিসারে সটকে পড়লেও তারা আল্লাহর দৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে পারবে না। তারা যা কিছু করছে তা সবই আল্লাহর দৃষ্টির সামনে রয়েছে। বলা হচ্ছে,

'আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে জানেন, যারা তোমাদের মধ্যে চুপিসারে সরে পড়ে' ......

আলোচ্য আয়াতে মোনাফেকদের আচরণের বর্ণনা যে ভাষায় দেয়া হয়েছে তা দ্বারা ওদের কাপুরুষতা ও নীচুতা প্রকাশ পায়।

ওদেরকে সতর্ক করে বলা হয়েছে,

'অতপর যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা এ বিষয়ে সতর্ক হোক যে, বিপর্যয় তাদেরকে স্পর্শ করবে অথবা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করবে।' ....

এটা অত্যন্ত ভীতিকর সতর্কবাণী, অত্যন্ত লোমহর্ষক সতর্কবাণী। এই সতর্কবাণী তাদের জন্যে যারা রসূলের নির্দেশকে অমান্য করে, যারা তাঁর আদর্শের বিপরীতে চলে, যারা স্বার্থ সিদ্ধির জন্যে অথবা কোনো ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে অনুমতি ছাড়াই সটকে পড়ে। এদেরকে এমন বিপর্যয় থেকে সতর্ক করা হচ্ছে যে বিপর্যয়ের ফলে সব কিছু লন্ডভন্ড হয়ে পড়বে, সকল মানদন্ড ভেংগে পড়বে, শান্তি-শৃংখলা বিনষ্ট হয়ে পড়বে। ফলে ন্যায় অন্যায়ের পার্থক্য থাকবে না, ভালো মন্দের পার্থক্য থাকবে না, সামাজিক জীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে। তখন কারো জীবনের নিরাপত্তা থাকবে না, কেউ কোনো নিয়ম নীতির ধার ধারবে না। মংগল অমংগলের কোনো পার্থক্যই তখন অবশিষ্ট থাকবে না। এ জাতীয় মুহূর্ত নিসন্দেহে সবার জন্যে হবে দুর্ভাগ্যজনক। যদি এ জাতীয় কোনো বিপর্যয়ের সম্মুখীন তারা না হয় তাহলে অবশ্যই এই পৃথিবীর বুকে অথবা পরকালে আল্লাহর নির্দেশকে অমান্য করার কারণে এবং তাঁর মনোনীত জীবন বিধানকে পাশ কাটিয়ে চলার অপরাধে তাদেরকে বেদনাদায়ক শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে।

এই সাবধানবাণী উচ্চারণ করার পর এই সূরাটির সমাপ্তি ঘটছে, মুসলিম ও অমুসলিম সকলের দৃষ্টি একটি নিতান্ত বাস্তব সত্যের প্রতি আকর্ষণ করা হচ্ছে। আর তা হলো,

'মনে রেখো, আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে তা আল্লাহরই। তোমরা যে অবস্থায় আছো তা তিনি জানেন........। (আয়াত ৬৪)

মানুষের মনের মাঝে আল্লাহ তায়ালা থাকুক, দৃষ্টির সামনে আল্লাহ তায়ালা থাকুক এবং গোপনে ও প্রকাশ্যে মানুষ আল্লাহকে ভয় করে চলুক এটাই হচ্ছে আলোচ্য সূরার শেষ বক্তব্য। কারণ এই আল্লাহভীতিই হচ্ছে তার রক্ষাকবচ এবং আল্লাহর যাবতীয় বিধি-নিষেধ ও নীতি-নৈতিকতার অতন্দ্র প্রহরী।

সূরা আল ফোরকান

আয়াত ৭৭ রুকু ৬

মক্কায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

تَبٰرَكَ الَّذِیْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰی عَبْدِهٖ لِیَكُوْنَ لِلْعٰلَمِیْنَ نَذِیْرَا ۙ ①
الَّذِیْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَمْ یَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ یَكُنْ لَّهٗ
شَرِیْكٌ فِی الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَیْءٍ فَقَدَّرَهٗ تَقْدِیْرًا ② وَاتَّخَذُوْا مِنْ
دُوْنِهٖۤ اٰلِهَةً لَّا یَخْلُقُوْنَ شَیْئًا وَّهُمْ یُخْلَقُوْنَ وَلَا یَمْلِكُوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ ضَرًّا
وَّلَا نَفْعًا وَّلَا یَمْلِكُوْنَ مَوْتًا وَّلَا حَیٰوةً وَّلَا نُشُوْرًا ③ وَقَالَ الَّذِیْنَ
كَفَرُوْۤا اِنْ هٰذَاۤ اِلَّاۤ اِفْكُ ۨافْتَرٰىهُ وَاَعَانَهٗ عَلَیْهِ قَوْمٌ اٰخَرُوْنَ ۚ فَقَدْ
جَآءُوْ ظُلْمًا وَّزُوْرًا ④ وَقَالُوْۤا اَسَاطِیْرُ الْاَوَّلِیْنَ اكْتَتَبَهَا فَهِیَ تُمْلٰی

রুকু ১

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে–

১. কতো মহান তিনি, যিনি তাঁর বান্দার ওপর (সত্য মিথ্যার মাঝে পার্থক্যকারী এই) 'ফোরকান' নাযিল করেছেন, যাতে করে সে (ব্যক্তি- এর দ্বারা) সৃষ্টিকুলের জন্যে সতর্ককারী হতে পারে, ২. (তিনিই আল্লাহ তায়ালা-) তাঁর জন্যে রয়েছে আসমানসমূহ ও যমীনের সার্বভৌমত্ব, তিনি কখনো কাউকে (নিজের) সন্তান বলে গ্রহণ করেননি– না (তাঁর এ) সার্বভৌমত্বে অন্য কারো কোনো শরীকানা আছে, তিনিই প্রতিটি বস্তু পয়দা করেছেন এবং তিনি তাঁর (সৃষ্টির) জন্যে (আলাদা আলাদা) পরিমাপ নির্ধারণ করেছেন। ৩. (এ সত্ত্বেও) এ (মোশরেক) লোকেরা তাঁকে বাদ দিয়ে এমন কিছুকে মাবুদ বানিয়ে নিয়েছে, যারা কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না; বরং তাদেরই সৃষ্টি করা হয়েছে, (সত্য কথা হচ্ছে), তারা (যেমন) নিজেরা নিজেদের ক্ষতি করতে সক্ষম নয়, তেমনি নিজেরা নিজেদের কোনো উপকারও করতে সক্ষম নয়। তারা কাউকে মৃত্যু দিতে পারে না– কাউকে জীবনও দিতে পারে না, (তেমনি) পারে না (কেউ একবার মরে গেলে তাকে) পুনরায় উঠিয়ে আনতে। ৪. যারা (আল্লাহ তায়ালাকে) অবিশ্বাস করে, তারা (এ কোরআন সম্পর্কে) বলে, এ তো মিথ্যা ছাড়া আর কিছুই নয়, যা এ ব্যক্তি নিজে থেকে বানিয়ে নিয়েছে এবং অন্য জাতির লোকেরা তার ওপর সাহায্যের হাত বাড়িয়েছে, (মূলত এসব কথা বলে) এরা (এক জঘন্য) যুলুম ও (নির্জলা) মিথ্যা নিয়ে হাযির হয়েছে। ৫. তারা বলে, এ (কোরআন) হচ্ছে সেকালের উপকথা, যা এ ব্যক্তি

عَلَيۡهِ بُكۡرَةً وَّاَصِيۡلًا ۝ قُلۡ اَنۡزَلَهُ الَّذِىۡ يَعۡلَمُ السِّرَّ فِى السَّمٰوٰتِ
وَالۡاَرۡضِ ؕ اِنَّهٗ كَانَ غَفُوۡرًا رَّحِيۡمًا ۝ وَقَالُوۡا مَالِ هٰذَا الرَّسُوۡلِ يَاۡكُلُ
الطَّعَامَ وَيَمۡشِىۡ فِى الۡاَسۡوَاقِ ؕ لَوۡلَاۤ اُنۡزِلَ اِلَيۡهِ مَلَكٌ فَيَكُوۡنَ مَعَهٗ
نَذِيۡرًا ۝ اَوۡ يُلۡقٰۤى اِلَيۡهِ كَنۡزٌ اَوۡ تَكُوۡنُ لَهٗ جَنَّةٌ يَّاۡكُلُ مِنۡهَا ؕ وَقَالَ
الظّٰلِمُوۡنَ اِنۡ تَتَّبِعُوۡنَ اِلَّا رَجُلًا مَّسۡحُوۡرًا ۝ اُنۡظُرۡ كَيۡفَ ضَرَبُوۡا لَكَ
الۡاَمۡثَالَ فَضَلُّوۡا فَلَا يَسۡتَطِيۡعُوۡنَ سَبِيۡلًا ۝ تَبٰرَكَ الَّذِىۡۤ اِنۡ شَآءَ جَعَلَ
لَكَ خَيۡرًا مِّنۡ ذٰلِكَ جَنّٰتٍ تَجۡرِىۡ مِنۡ تَحۡتِهَا الۡاَنۡهٰرُ ۙ وَيَجۡعَلۡ لَّكَ
قُصُوۡرًا ۝ بَلۡ كَذَّبُوۡا بِالسَّاعَةِ ۟ وَاَعۡتَدۡنَا لِمَنۡ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيۡرًا ۝

লিখিয়ে নিয়েছে এবং সকাল সন্ধ্যায় তার সামনে এগুলো পড়া হয়। ৬. (হে নবী,) তুমি (এদের) বলো, এ (কোরআন) তিনিই নাযিল করেছেন যিনি আকাশসমূহ ও যমীনের সমুদয় রহস্য জানেন; তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। ৭. ওরা বলে, এ আবার কেমন (ধরনের) রসূল যে (আমাদের মতো করেই) খাবার খায় এবং (আমাদের মতোই) হাটে বাজারে চলাফেরা করে। কেন তার কাছে কোনো ফেরেশতা নাযিল করা হলো না যে তার সাথে (আযাবের) সতর্ককারী হয়ে থাকতো, ৮. কিংবা (গায়ব থেকে) তার কাছে কোনো ধনভান্ডার এসে পড়লো না কেন, অথবা (কমপক্ষে) তার কাছে একটি বাগানই না হয় থাকতো, যা থেকে সে (খাবার সংগ্রহ করে) খেতো; এ যালেম লোকেরা (মুসলমানদের আরো) বলে, তোমরা তো (আসলে) একজন যাদুগ্রস্ত ব্যক্তিরই অনুসরণ করছো। ৯. (হে নবী,) চেয়ে দেখো, ওরা তোমার সম্পর্কে কি ধরনের কথা বানাচ্ছে, এরা (আসলে) গোমরাহ হয়ে গেছে, কখনো তারা আর সঠিক পথ পাবে না।

রুকু ২

১০. (হে নবী, তুমি এদের বলো,) আল্লাহ তায়ালা (এমন) এক মহান সত্তা, যিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের (এ একটি বাগান কেন) এর চাইতে উৎকৃষ্ট বাগানসমূহও দান করতে পারেন, যার নিম্নদেশে (অমীয়) ঝর্ণধারা, প্রবাহিত হবে, (এ ছাড়াও) তিনি (তোমাদের) দিতে পারেন (সুরম্য) প্রাসাদসমূহ! ১১. বরং এরা কেয়ামতের দিনকে অস্বীকার করে; আর যারাই কেয়ামত অস্বীকার করে তাদের জন্যে আমি (জাহান্নামের) জ্বলন্ত আগুন প্রস্তুত করে রেখেছি।

إِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍۭ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا ﴿١٢﴾ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا
مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا ﴿١٣﴾ لَّا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا
وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا ﴿١٤﴾ قُلْ أَذَٰلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي
وُعِدَ الْمُتَّقُونَ ۚ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا ﴿١٥﴾ لَّهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ
خَالِدِينَ ۚ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعْدًا مَّسْئُولًا ﴿١٦﴾ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ
مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَٰؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا
السَّبِيلَ ﴿١٧﴾ قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنبَغِي لَنَا أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ
أَوْلِيَاءَ وَلَٰكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا ﴿١٨﴾

১২. তারা যখন দূর থেকে তাদের (মতো অন্যান্য জাহান্নামীদের) দেখবে, তখন তারা (স্পষ্টত) তার গর্জন ও চীৎকার শুনতে পাবে। ১৩. অতপর হস্তপদ শৃংখলিত অবস্থায় যখন তাদের জাহান্নামের কোনো সংকীর্ণ স্থানে ফেলে দেয়া হবে, তখন সেখানে তারা শুধু (মৃত্যুর) ধ্বংসকেই ডাকতে থাকবে; ১৪. (তাদের তখন বলা হবে,) আজ তোমরা ধ্বংস হওয়াকে একবারই শুধু ডেকো না, বরং বহুবার ধ্বংসকে ডাকো– (কোনো কিছুই আজ তোমাদের কাজে আসবে না)। ১৫. (হে নবী, এদের) তুমি বলো, এটা (জাহান্নামের) এ (কঠোর আযাব) শ্রেয়– না সেই স্থায়ী জান্নাত, যার ওয়াদা পরহেযগার লোকদের (আগেই) দিয়ে রাখা হয়েছে; এ (জান্নাতই) হচ্ছে তাদের যথাযথ পুরস্কার ও (চূড়ান্ত) প্রত্যাবর্তনের স্থান! ১৬. সেখানে তারা যা কিছু পেতে চাইবে তাই তাদের জন্যে (মজুদ) থাকবে, (তাও আবার) থাকবে স্থায়ীভাবে; এ প্রতিশ্রুতির যথাযথ পালন তোমার মালিকেরই দায়িত্ব। ১৭. যেদিন তিনি এ (মোশরেক) ব্যক্তিদের এবং তাদের– ও তাদের (মাবুদদের), যাদের এরা আল্লাহর বদলে এবাদাত করতো, (সবাইকে) একত্রিত করবেন– অতপর তিনি (সে মাবুদদের) জিজ্ঞেস করবেন, তোমরাই কি আমার এ বান্দাদের গোমরাহ করেছো, না তারা নিজেরাই (সত্য থেকে) বিচ্যুত হয়ে গেছে; ১৮. ওরা (জবাবে) বলবে (হে আল্লাহ তায়ালা), তুমি পবিত্র, তুমি মহান, আমরা (তো ছিলাম তোমারই বান্দা,) তোমার বদলে অন্যকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করা আমাদের শোভনীয় ছিলো না, তুমি তো এদের এবং এদের পিতৃপুরুষদের (যথেষ্ট) ভোগের সামগ্রী দিয়েছিলে, (এগুলো পেয়ে) তারা এমনকি তোমার কথাই ভুলে বসেছে এবং (এভাবেই) তারা একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিতে পরিণত হয়ে গেছে।

فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ ۙ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَّلَا نَصْرًا ۚ وَمَنْ يَّظْلِمْ

مِّنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا ﴿١٩﴾ وَمَآ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ إِلَّآ إِنَّهُمْ

لَيَأْكُلُوْنَ الطَّعَامَ وَيَمْشُوْنَ فِي الْأَسْوَاقِ ۗ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً ۗ

أَتَصْبِرُوْنَ ۚ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيْرًا ﴿٢٠﴾

১৯. (আল্লাহ তায়ালা বলবেন,) তোমাদের এ মাবুদরা তো তোমরা যা বলছো তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করলো, অতএব (এখন) তোমরা (আর আমার আযাব) সরাতে পারবে না, না (তোমরা আজ) কারো সাহায্য পাবে। তোমাদের মধ্যে কেউ যদি (আমার আনুগত্যের) সীমালংঘন করে তাহলে তাকে আমি কঠোর আযাব আস্বাদন করাবো। ২০. (হে নবী,) তোমার আগে আমি আরো যতো রসূল পাঠিয়েছি, তারা (মানুষের মতোই) আহার করতো, (অন্য মানুষদের মতোই) তারা হাটে বাজারে যেতো। (আসল কথা হচ্ছে) মানুষদের মধ্য থেকে রসূল পাঠিয়ে আমি তোমাদের একজনকে আরেকজনের জন্যে পরীক্ষা (-র উপকরণ) বানিয়েছি; (এ পরীক্ষায়) তোমরা কি ধৈর্য ধারণ করবে না? তোমার মালিক (কিন্তু তোমাদের) সবকিছুই দেখছেন।

সংক্ষিপ্ত আলোচনা

পরম বরকতময় তিনি, যিনি তাঁর বান্দাদের কাছে হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টিকারী আল কোরআন নাযিল করেছেন......? আর তোমার রব তো সব কিছুই দেখছেন।'

আলোচ্য সূরাটি সম্পূর্ণভাবে মক্কী। এ সূরাটি রসূল (স.)-এর ওপর নাযিল হয়েছে এক আনন্দ, খুশী ও প্রশান্তির প্রতীক হিসাবে। এমন সময় এ সূরাটি রসূল (স.)-কে শক্তি ও সাহস যুগিয়েছে যখন তিনি কোরায়শ জাতির মধ্যে মোশরেক গোষ্ঠীর মোকাবেলা করছিলেন, মোকাবেলা করছিলেন তাঁর প্রতি তাদের দীর্ঘদিনের হিংসা ও ঘৃণা-বিদ্বেষের। নবুওতপ্রাপ্তির পর থেকেই অবিরতভাবে ওরা রসূলুল্লাহ (স.)-কে নানাভাবে কষ্ট দিয়ে আসছিলো, নানা প্রকার তর্ক-বিতর্ক করছিলো এবং সত্যের অগ্রগতিকে ঠেকিয়ে রাখার জন্যে সর্বোতভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলো।

এমনই এক কঠিন সময়ে এ সূরাটি তাঁর কাছে এক অনাগত দিনের সুসংবাদ বয়ে আনলো, তাঁর ব্যথিত হৃদয়ে মধুর পরশ বুলিয়ে দিলো। আল্লাহ রব্বুল আলামীনের তরফ থেকে তাঁর প্রিয়তম বান্দার জন্যে সুসংবাদের এমন ফল্গুধারা নেমে এলো, যা তাঁর সেই ব্যথা বেদনা ও ক্লান্তির ওপর প্রলেপ হিসাবে কাজ করলো। যখন সত্যবিরোধীদের ঘৃণা-বিদ্বেষ ভেংগে দিচ্ছিলো তাঁর অন্তরকে, সেই কঠিন সময়ে সূরাটি তাঁর মধ্যে আত্মবিশ্বাস, নিশ্চিন্ততা সৃষ্টি করলো, আর তাঁর মনে এ নিশ্চয়তা জাগালো যে পর্দার অন্তরাল থেকে আল্লাহ তায়ালা তাঁকে পরিচালনা করছেন।

আবার পরক্ষণেই দেখা যায়, সূরাটি সত্যকে অস্বীকারকারী, সত্য বিরোধী ও অবাধ্য জনগণের সাথে অবশ্যম্ভাবী এক চূড়ান্ত সংগ্রামের পূর্বাভাসও দান করেছে। এরা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের বিরোধিতায় দৃঢ় সংকল্প ছিলো এবং অত্যন্ত কঠিনভাবে সত্যের বিরুদ্ধে তারা লড়াই করে চলছিলো। তারা যুক্তিহীনভাবে সত্য থেকে দূরে সরে থাকছিলো, তাদের শত্রুতা দীর্ঘায়িত হচ্ছিলো। আসলে এই বিদ্বেষ পোষণ করে তারা নিজেরাই কষ্ট পাচ্ছিলো, কারণ যে সত্য তাদেরকে চোখে আংগুল দিয়ে সাফল্যের পথ দেখাচ্ছিলো তার থেকেই তারা দূরে সরে যাওয়ার জন্যে বদ্ধপরিকর ছিলো।

মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (স.)-এর বিরোধিতা করতে গিয়ে প্রকৃতপক্ষে সে পাষাণ হৃদয় জনগণ মহাগ্রন্থ আল কোরআন থেকেই ফিরে যাচ্ছিলো, এরশাদ হচ্ছে,

(ওরা বলছিলো), 'এটা মনগড়া এক মিথ্যা বৈ আর কিছু নয়, আর তাকে একাজে অন্যরাও সাহায্য করে থাকে'...... অথবা ওরা বলে প্রাচীন লোকদের কাহিনী লিখে নেয়া হয়েছে, যা সকাল সন্ধ্যা তাকে পড়ে শোনানো হয়।' কোরায়শদের কাফেররা সম্মানিত রসূল (স.) সম্পর্কে এ কথাগুলোই বলে থাকে। আরও বলে, 'তোমরা যাদুর স্পর্শে জ্ঞানহারা এক ব্যক্তির অনুসরণই তো করছো'.....অথবা ওরা মস্কারি করে বলে, 'হায়, এই নাকি সেই ব্যক্তি যাকে আল্লাহ তায়ালা রসূল বানিয়ে পাঠিয়েছেন?'...... এমনই এক হতভাগা জাতি ওরা যে, এতো সব বাজে কথা বলেও ওরা ক্ষান্ত হয়নি, বরং আরো অগ্রসর হয়ে স্বয়ং মহান আল্লাহর দোষ ধরতেও দ্বিধাবোধ করেনি, 'আর যখন তাদেরকে বলা হয়, সেজদা করো মহা দয়াময় আল্লাহকে, তখন ওরা বলে, দয়াময় (রহমান) আবার কে? আমরা কি সেজদা করবো তাকে যাকে তুমি সেজদা করতে বলবে? এভাবে, তারা আরও দূরে সরে যাবে, তাদের থেকে বেশী কিছু ফায়দা হবে না।' (আয়াত ৬০)

আর আল্লাহর আয়াত নাযিল হতে দেখে অনেক সময়ে ওরা কষ্ট পায় এবং বলে, 'আমাদের ওপর কেন ফেরেশতা দল নাযিল হয় না অথবা কেন আমরা আমাদের রবকে দেখতে পাই না?'

আর এটাই হচ্ছে সত্য বিরোধীদের চিরাচরিত নিয়ম। প্রাচীন কাল থেকে পথভ্রষ্ট লোকেরা এইভাবেই বলে এসেছে। নূহ (আ.)-এর সময় থেকে নিয়ে শেষ রসূল পর্যন্ত বরাবর একই নিয়ম দেখা যাচ্ছে।

এখানে দেখা যাচ্ছে সে যালেম জাতির আপত্তি হচ্ছে, আল্লাহ তায়ালা একজন মানুষকে কেন রসূল বানাবেন, অর্থাৎ রসূলের দায়িত্ব পালন ও মর্যাদা লাভের জন্যে মানুষ হওয়াটাই তাদের কাছে আপত্তিকর। এজন্যে তারা বলতো, 'এ আবার কেমন রসূল, যে খায়-দায় এবং বাজার ঘাটে হেঁটে বেড়ায়? তার কাছে একজন ফেরেশতা কেন নাযিল হয় না যে তার সাথে সতর্ককারী হিসেবে কাজ করতে পারতো!'

এরপর তারা মোহাম্মদ (স.)-এর অর্থনৈতিক যোগ্যতা বা সম্পদশালী হওয়া না হওয়ার ব্যাপার নিয়ে প্রশ্ন তুললো। ওরা বললো, 'অথবা তার ওপর যদি প্রচুর ধন সম্পদ বর্ষিত হতো অথবা যদি তার মালিকানায় এক সুবিশাল বাগিচা থাকতো, যার থেকে সে (ফলমূল) ভক্ষণ করতো।'

আবার আল কোরআনের অবতীর্ণ হওয়ার পদ্ধতি নিয়েও তারা প্রশ্ন তুলতো, বলতো, 'কেন (এক কোরআন) একবারেই সবটুকু নাযিল হয় না?'

এসব প্রশ্নের মধ্যে যেসব বে-আদবী নিহিত ছিলো তা হচ্ছে রসূলুল্লাহ (.)-কে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা, উপহাস বিদ্রূপ করা। আর এটা তার প্রতি মিথ্যারোপ করা থেকেও ছিলো গুরুতর। এর অর্থ দাঁড়ায় স্বয়ং আল্লাহর প্রতি দোষারোপ করা। তাঁর ক্ষমতার প্রতি এটা এক চ্যালেঞ্জও বটে!

রসূল (স.) ধীরস্থিরভাবে ও পরম দৃঢ়তার সাথে, এসব দুঃসহ পরিস্থিতির মোকাবেলা করে চলেছিলেন যদিও তিনি একা, সহায়-সম্পদহীন, একমাত্র তাঁর রবের ওপরই তিনি নির্ভরশীল, যার কারণে শত্রু কর্তৃক নিক্ষিপ্ত এসব হৃদয়বিদারক শেল তাকে আহত করলেও তাঁকে কখনো ধরাশায়ী করতে পারেনি, পারেনি তাঁকে তাঁর রবের প্রিয় কাজ পরিত্যাগ করাতে, বা ভিন্ন কোনো পথেও তাকে চালিত করতে পারেনি! দেখুন, সে অবস্থায় তিনি তাঁর রবের করুণা প্রার্থী হয়ে তাঁর কাছে কাতর কণ্ঠে দোয়া করছেন, 'হে আমার রব, তোমার গযব থেকে যদি আমি বেঁচে যেতে পারি, তাই আমার জন্যে যথেষ্ট, এতে যতো কিছু দুঃখ কষ্ট সইতে হয়- সবই সইবো। এতে আমার যতো কষ্টই হোক না কেন, তাতে আমার কোনো পরওয়া নেই, একমাত্র তোমার করুণা আমি ভিক্ষা চাই, চাই শুধু তোমার সন্তুষ্টি!'

অতপর, দেখা যাচ্ছে এই সূরাটির মধ্যে তাঁর রব তাঁকে নিজের কাছে আশ্রয় দিচ্ছেন, তাঁকে নিজ রহমতের ছায়াতলে টেনে নিচ্ছেন আর তাঁর ক্লান্তি ও ব্যথা বেদনাকে মুছে দিচ্ছেন, তিনি তাঁকে এই চরম দুঃখের মধ্যে সান্ত্বনা দিচ্ছেন এবং শত্রুদের সে ঘৃণ্য আচরণ থেকে তাঁর নযরকে সরিয়ে নিচ্ছেন। তাঁর জাতি যে বাড়াবাড়ি করে চলেছিলো এং যে চরম বে-আদবী করে চলছিলো তাঁর ও তাঁর সংগী সাথীদের ওপর দিনের পর দিন ও রাতের পর রাত ধরে সেগুলোকে সহজভাবে গ্রহণ করার জন্যে তাঁর মনকে তিনি প্রস্তুত করে দিচ্ছেন। অতি সহজভাবে তিনি এই কথাটাই গ্রহণ করছেন যে, যে হতভাগারা আপন সৃষ্টিকর্তা ও রেযেকদাতাকেই মানে না, যাঁকে তারা সৃষ্টিকর্তা বলে জানে, জানে তিনিই সৃষ্টির সব কিছুর নিয়ামক ও পরিচালক, তাঁর ওপরেই যখন তারা বাড়াবাড়ি করে তখন তারা এসব দুর্ব্যবহার করবে- এটা তো খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার! এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। এরশাদ হচ্ছে,

'আল্লাহকে বাদ দিয়ে তারা অন্যদের দাসত্ব আনুগত্য করে এবাদাত করে যারা তাদের কোনো উপকার করতে পারে না এবং কোনো ক্ষতিও করতে পারে না, আর এমন কাফের ব্যক্তি নিজেকে মনে করে, সেই তার রবের একজন সাহায্যকারী।'..... 'আর ওরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে আরো এমন অনেককে তাদের এবাদাত পাওয়ার যোগ্য হিসাবে গ্রহণ করে যারা ওদেরকে মৃত্যু দেয়ার মালিক নয় বাঁচিয়ে রাখার মালিকও নয় এবং পুনরায় কবর থেকে তুলতেও তারা পারবে না।.......আর যখন তাদেরকে বলা হয়, সেজদা কর রহমানকে ওরা বলে, রহমান আবার কে?'

মোহাম্মাদুর রসূল (স.) কোনো নবাগত বা অপরিচিত ব্যক্তি নন, তিনি তো তাদেরই মধ্যে লালিত পালিত। তাঁর স্বভাব চরিত্র ও মান সম্মান সবার জানা। এমন মহান ব্যক্তিকে তারা এমন হৃদয়হীনভাবে লাঞ্ছিত করছে, উপহাস-বিদ্রূপ করছে এবং তাঁর সাথে এতো হিংস্র ব্যবহার করছে, যার প্রতিক্রিয়া তাদের নিজেদের মধ্যেও মাঝে মাঝে দেখা দেয়। সে কঠিন অবস্থার চিত্র যখন সামনে আসে তখন বুঝা যায় যে কী ধংসাত্মক অবস্থার মধ্যে তারা হাবুডুবু খাচ্ছিলো-গড়াগড়ি দিচ্ছিলো তারা কী ঘৃণা পংকিলতার মধ্যে! এরশাদ হচ্ছে,

'তুমি কি চিন্তা করে দেখেছো, যে ব্যক্তি তার কু-প্রবৃত্তিকে তার মাবুদ বানিয়ে নিয়েছে, তুমি কি তার অভিভাবক হয়ে যাবে? অথবা তুমি কি মনে করো যে ওদের মধ্যে অধিকাংশ লোক (সত্যিকারে) শোনে ও তাদের জ্ঞানকে কাজে লাগায়? ওরা হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে পশুর মতো বরং তাদের থেকেও ওরা অধিক নিকৃষ্ট ও সত্য সঠিক পথ পরিহারকারী।' (আয়াত ৪৩-৪৪)

এ হঠকারী ও তর্কে নিয়োজিত কাফেরদের যুক্তিহীন ব্যবহারের এক পর্যায়ে আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূলকে সর্বপ্রকার সাহায্য করবেন বলে ওয়াদা করছেন, তিনি তাকে জানাচ্ছেন,

'ওরা তোমার সাথে তর্ক করতে গিয়ে যতো উদাহরণই পেশ করুক না কেন আমি সত্য বিষয়টিকে অতি সুন্দর ব্যাখ্যাসহ অবশ্যই তুলে ধরবো।' (আয়াত ৩৩)

এসব ঝগড়া ও তর্কের কথাগুলো জানানোর পর অতীতের হঠকারী ও মিথ্যা আরোপকারী অনুরূপ-যুক্তিহীন বচসাকে পেশ করা হচ্ছে, এরা বিভিন্ন যুগে একইভাবে যুক্তিহীনতার সাথে নবীদের সাথে ঝগড়া করেছে। এরা বাস করত মূসা, নূহ, আদ, সামুদ ও কূপবাসী এবং ওদের মধ্যবর্তী সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে।

এরপর একের পর এক, তাদের সামনে কেয়ামতের দৃশ্যাবলী তুলে ধরে তাদের ভয়ানক পরিণতি সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (স.)-কে অবহিত করা হচ্ছে। এরশাদ হচ্ছে,

'(ওরা হচ্ছে সেসব মানুষ) যাদেরকে মুখের ওপর টানতে টানতে নিয়ে যাওয়া হবে জাহান্নামের দিকে। এদের সেই বাসস্থানটা হবে বড়োই নিকৃষ্ট আর প্রকৃতপক্ষে তারাই নিকৃষ্ট পথের পথিক......বরং তারা কেয়ামত সম্পর্কে (রসূলের কথাকে) মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিয়েছে; আর আমি কেয়ামতকে অস্বীকারকারী ব্যক্তির জন্যে (জাহান্নামের) আগুন ঠিক করে রেখে দিয়েছি। এই আগুন যখন দূর থেকে নযরে পড়বে তখন তারা এর তর্জন-গর্জন ও হুংকার শুনতে পারে। আর যখন তাদেরকে সেখানে এক সংকীর্ণ স্থানের মধ্যে হাত পা বাঁধা অবস্থায় নিক্ষেপ করা হবে, তখন তারা সেই ধ্বংসকারী মৃত্যুকে ডাকতে থাকবে। (কিন্তু বলা হবে) এক ধ্বংস (মৃত্যু) কে ডেকো না আজ, (অর্থাৎ আজ এক মৃত্যুজ্বালাকে ডেকো না) অনেক অনেক মৃত্যু জ্বালাকে ডাকো।'

'সেদিন (প্রত্যেক) যালেম ব্যক্তি নিজের হাত কামড়াতে কামড়াতে বলবে, হায় আফসোস, আমি যদি রসুলের পথ ধরতাম! হায়রে দুর্ভাগ্য আমার! যদি গ্রহণ না করতাম অমুক ব্যক্তিকে আমার বন্ধুরূপে তাহলে কতই না ভালো হতো!......।' (আয়াত ২৭-২৮)

এ পর্যায়ে এসে আল্লাহ রব্বুল আলামীন রসূলে করীম (স.)-কে সান্তনা দিতে গিয়ে বলছেন,

'আর তোমার পূর্বে আমি যতো রসূলকে পাঠিয়েছি তারা (সবাই) খাদ্য খাবার খেতো এবং বাজার-ঘাটে চলাফেরা করতো'.....। (আয়াত ২০)

'আর এমনি করেই আমি অপরাধী লোকদের মধ্য থেকে প্রত্যেক নবীর জন্যে কোনো না কোনো শত্রু বানিয়ে দিয়েছি, তোমার জন্যে তোমার রবই পথ প্রদর্শক ও সাহায্যকারী হিসেবে যথেষ্ট।'

আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাঁর রসূলকে নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তিনি দৃঢ়তার সাথে সবর করেন এবং অপরকেও সবর করার জন্যে উৎসাহিত করেন এবং তাঁর কাছে মহাগ্রন্থ আল কোরআনের যে জ্ঞান-ভান্ডার রয়েছে তা দিয়েই যেন তিনি কাফেরদের মোকাবেলা করেন, কেননা এ পাক কালাম যথেষ্ট পরিমাণ মযবুত যুক্তি-প্রমাণ সহ সত্যের পক্ষে কথা বলেছে, যা হৃদয়ের অভ্যন্তরে গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করে। এরশাদ হচ্ছে,

'অতএব, কাফেরদের অনুসরণ করো না এবং তাদের সাথে সর্বাত্মক সংগ্রামে অবতীর্ণ হও।'

এখানে বিশেষভাবে খেয়াল করতে হবে যে, ৬৮-৭০নং আয়াত ছাড়া সূরাটির বাকী অংশ অবতীর্ণ হয়েছে যখন মুসলমানদের হাতে কোনো বস্তুগত শক্তি ক্ষমতা ছিলো না। তাদের ওপর আক্রমণকে প্রতিহত করার কোনো উপায়ও ছিলো না। এতদসত্ত্বেও আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূলকে নির্দেশ দিচ্ছেন, তিনি যেন তাঁর মালিক পরওয়ারদেগারের ওপর ভরসা করে সত্যের ওপর টিকে থাকার জন্যে এবং অপরকেও সত্যের দিকে আহ্বান জানানোর জন্যে চরম প্রচেষ্টা চালিয়ে যান।

বিরোধিতা, কষ্ট, অপমান অবমাননা উপহাস বিদ্রূপ যাই আসুক না কেন তাতে যেন তিনি দমে না যান এবং তাঁর দায়িত্ব পালনে কোনো সময়ে যেন তিনি বিরত না হন, বরং অবিরাম গতিতে তাঁর মিশনকে এগিয়ে নেয়ার জন্যে সর্বাত্মক চেষ্টা জারি রাখেন। এর প্রতিক্রিয়ার কোনো পরওয়া না করে, একমাত্র আল্লাহর ওপর ভরসা করেই যেন তিনি তাঁর দায়িত্ব পালনে অগ্রসর হতে থাকেন। একবার যে কদম সামনে বেড়েছে তা যেন আর কখনো পিছিয়ে না যায়। দেখুন, কী বলিষ্ঠ আল্লাহর নির্দেশ,

'ভরসা করো সেই চিরঞ্জীব সত্ত্বার ওপর, যিনি কখনো মৃত্যুবরণ করবেন না এবং তাঁর প্রশংসা ও কৃতিত্ব বর্ণনার সাথে সাথে ঘোষণা করো যে তিনি সকল প্রকার দোষ-ত্রুটি ও দুর্বলতার উর্ধে, তিনি অবশ্যই তাঁর বান্দাদের সম্পর্কে খবর রাখার জন্যে যথেষ্ট।'

এভাবে সূরাটির বর্ণনা এগিয়ে চলেছে। এ বর্ণনা ধারাতে কোনো সময়ে দেখা যাচ্ছে রসূল (স.)-এর প্রতি তাঁর মহব্বত ও স্নেহের ঝর্ণাধারা বিগলিত ধারায় ঝরছে, কখনো তাঁকে আনন্দ দান করা হচ্ছে, কখনো তাঁর প্রতি দয়া সহানুভূতি প্রদর্শন করা হচ্ছে, আবার কখনো বা দেখা যাচ্ছে যে, আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাঁর শক্তি-ক্ষমতা প্রদর্শন করে তাঁর রসূলের অন্তরে শক্তির সঞ্চার করছেন। আবার কোনো কোনো আয়াতে দেখা যাচ্ছে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূলকে নিজ শক্তি ক্ষমতার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাঁর মিশনকে এগিয়ে নেয়ার জন্যে উৎসাহিত করছেন। বাঞ্ছিত লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্যে কাফের-মোশরেকদের পক্ষ থেকে আসা সর্বপ্রকার দুঃখ-কষ্ট আরো কিছু দিন সয়ে যাওয়ার জন্যে তাঁকে উজ্জীবিত করছেন। সাথে সাথে সুস্পষ্টভাবে তাঁকে জানিয়ে দিচ্ছেন যে সত্য বিরোধী চক্রের ধ্বংস অনিবার্য ও অবশ্যম্ভাবী, যেহেতু আল্লাহ রব্বুল আলামীনের হাতেই নিবদ্ধ রয়েছে সকল শক্তি ক্ষমতার লাগাম। এ লাগামকে তিনি এজন্যেই একটু ঢিল দিয়ে রেখেছেন যাতে শত্রুপক্ষ দৌরাত্মের চরম সীমায় পৌঁছে যায়, তারপরই যখন তাদের তিনি পাকড়াও করবেন তখন সেই পাকড়াও থেকে বাঁচার আর কোনো উপায়ই আর তাদের থাকবে না, পাশাপাশি মেহেরবান মালিক তাদের অন্তরে তাঁর আদব মহব্বতের মধুর পরশ বুলিয়ে দিচ্ছেন যারা তাঁর দয়ার ভিখারী হয়ে তাঁরই হুকুম মেনে চলেছে। সর্বপ্রকার প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে যারা আল্লাহ তায়ালা প্রেমের সুরভিত বায়ুর খুশবুতে মাতোয়ারা হয়ে গেছে, যারা চিরন্তন সুন্দর জীবনের সুসংবাদে সকল দুঃখ জ্বালা ভুলে গেছে, যাদের অন্তর জান্নাতের সুনিশ্চিত আশ্বাসে নির্লিপ্ত নিশ্চিন্ত হয়ে গেছে, যারা দুঃসহ নির্যাতনের মাঝেও সত্য পথকে আঁকড়ে ধরে থাকার পরম প্রশান্তি লাভ করেছে........এই কথাটাই অনুরণিত হচ্ছে আল্লাহর উচ্চারিত আদরের ভাষায়, 'এবাদুর রহমান' মহা দয়াময়, যাঁর রহমতের বারি ধারা সকল মানবকুলের ওপর ঝরে পড়ে– সেই প্রেমময়ের একান্ত ভক্ত অনুগত তারা'– তাদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে,

'তারা পৃথিবীর বুকে বিনয়াবনতভাবে চলাফেরা করে। আর যখন তাদেরকে হঠকারী জাহেল ব্যক্তিরা যুক্তিহীন কথা বলে সম্বোধন করে তখন তারা (রুষ্টভাব না দেখিয়ে এবং কর্কশ জওয়াব না দিয়ে বলে 'সালাম' (অর্থাৎ শান্তিতে থাকুন, কল্যাণ হোক আপনাদের).......'

একথা দ্বারা সে সব পাষাণ হৃদয় মূর্খ নাদানের দলের সাথে সংঘর্ষ বাধানোকে এড়িয়ে চলা বুঝানো হয়েছে, যারা জেনে-বুঝেই ভুল পথ গ্রহণ করে নিজেদের জীবনকে কষ্টের মধ্যে ফেলে দিয়েছে– অপরদিকে এই সত্যপন্থী দল যেন মানব কুলের কাঁটাভরা গাছে ফুটে ওঠা সেই সুন্দর সমধুর ফল যার মধ্যে জীবনের সুরভিত সুমিষ্ট স্বাদ নিহিত রয়েছে, যার রূপ-রস-গন্ধ অত্যাচারিত অবহেলিত মানবতাকে শান্তি ও কল্যাণের ইংগিত দিচ্ছে!

সূরাটি শেষ হচ্ছে সে সুন্দর মনোরম মানব গোষ্ঠীর ছবি তুলে ধরে, যারা আল্লাহর সামনে বিনম্র-ভদ্র, বিনয়াবনত সর্বপ্রকার অহংকার বর্জিত। কেন মোমেনদের হৃদয়গুলো তাঁর কাছে কাতর প্রার্থনা করবে না, কেন ডাকবে না তারা তাঁকে বিনয়ের সাথে! তারা যে আল্লাহর মহব্বতের পরশ পেয়ে গেছে! এদের বাইরে যারা অহংকারী হঠকারী গোষ্ঠী রয়েছে তাদের জন্যে উচ্চারিত হচ্ছে, 'বলে দাও (তাদেরকে হে রসূল) আমার রব এতোটুকু পরওয়া করবেন না তোমাদের, যদি তোমরা তাঁকে না ডাকো। তোমরা সত্যকে অস্বীকার করেছো এবং মিথ্যাবাদী সাজিয়েছ (মহান নবীকে) সুতরাং তোমাদের জন্যে আশু আযাব অনিবার্য হয়ে গেছে।'

ওপরে আলোচিত কথাগুলোই হচ্ছে এ সূরাটির মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে সূরাটির বাকি কথাগুলো ও অন্যান্য কিছু বিষয় আবর্তিত হয়েছে। আলোচিত বিষয়গুলো একটি আর একটির সাথে ঘনিষ্টভাবে সম্পর্কিত, যেগুলোর একটিকে অপরটি থেকে বিচ্ছিন্ন করা বেশ কঠিন, তবে বিষয়গুলোকে মোট চারটি অধ্যায়ে ভাগ করা যায়।

প্রথম অধ্যায়টি শুরু হচ্ছে একথার সাথে যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর পরম প্রিয় বান্দার কাছে এই পাক কালাম আল কোরআনকে নাযিল করেছেন যাতে করে এই গ্রন্থ নিয়ে তিনি সারাবিশ্বের জন্যে সতর্ককারী হিসাবে দায়িত্ব পালন করতে পারেন, আর এই নেয়ামত লাভের কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তিনি যেন আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করেন ও আজীবন তাঁর কৃতিত্ব বর্ণনা করতে থাকেন। তাঁকে আরো জানানো হচ্ছে যে, তাঁর মূল দায়িত্ব হচ্ছে, যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর মালিক, একমাত্র তাঁরই প্রভুত্ব কর্তৃত্ব সর্বত্র প্রতিষ্ঠা করা, সবাইকে এ বিষয়ে অবহিত করা যে তিনিই সব কিছুর মালিক, তাঁর নিজস্ব প্রজ্ঞা ও শক্তি ক্ষমতা বলে তিনি সব কিছু পরিচালনা করছেন ও সব কিছুর ব্যবস্থাপনা আনজাম দিচ্ছেন। এসব কাজ করতে গিয়ে তাঁকে কারো ওপর নির্ভর করতে হয় না বা কারো সাহায্যও নিতে হয় না, আর এজন্যেই তাঁর কোনো সন্তানাদি বা কোনো অংশীদারের প্রয়োজন নেই।

তারপর উল্লেখ করা হচ্ছে যে এতদসত্ত্বেও মোশরেকরা এমন আরো অনেককে মাবুদ বানায়, যারা কোনো কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না, বরং তারা নিজেরাই সৃষ্ট জীব। রসূল (স.) আল্লাহর কাছ থেকে যে বাণী বহন করে এনেছেন সে কথা তো ওরা অস্বীকার করেই, উপরন্তু ওরা আরো দাবী করে বলে যে, তিনি নিজে এসব মনগড়া কথা নিজ থেকে তৈরী করে বলেন, আরো বলে যে এগুলো হচ্ছে সব প্রাচীনকালের কাহিনী, যা তিনি নিজে লিখিয়ে নিয়েছেন। তারা এসব কথাও দাবী করে বলে যে তিনি সাধারণ একজন মানুষ হয়ে রসূল হন কেমন করে? তিনি তো সাধারণ মানুষেরই মতো খানা পিনা করেন, বাজার ঘাটে চলাফেরা করেন। তারা আল্লাহর সমালোচনা করে একথাও বলে যে, আল্লাহ তায়ালা রসূলই যদি পাঠাবেন, তাহলে কোনো ফেরেশতাকে কেন রসূল বানিয়ে পাঠালেন না? আর মানুষকেই যদি রসূল বানানো প্রয়োজন হয়েছিলো তাহলে তাকে প্রচুর ধন সম্পদ দিয়ে সবার ওপর তাকে প্রভাবশালী কেন বানালেন না অথবা তাকে অসহায় দরিদ্র না বানিয়ে এমন কোনো ভালো বাগিচার মালিক কেন বানালেন না যার ফলমূল সে তৃপ্তির সাথে খেতে পারতো! এরপর দেখুন, তাঁর কুসুম কোমল নির্মল চরিত্রের পর দোষারোপ করা হচ্ছে, বলা হচ্ছে, তিনি যাদুগ্রস্থ এক ব্যক্তি.......আসলে এ কথার দ্বারা আল্লাহর ক্ষমতাকেই অস্বীকার করা হচ্ছে, আর এই কারণে রসূল (স.)-কেও অপমান করা হচ্ছে.....এভাবে তারা সঠিক পথ থেকে সরে দাঁড়াচ্ছে এবং অন্যদিকে আখেরাতকেও অস্বীকার করা হচ্ছে, অতপর এসব কিছুর পরিণতিতে আল্লাহ তায়ালা তাদের জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করবেন বলে ওয়াদা করছেন- সে স্থানটা হবে

অত্যন্ত সংকীর্ণ যেখানে তাদেরকে হাত পা বাঁধা অবস্থায় নিক্ষেপ করা হবে। এর পাশাপাশি চিত্র আঁকা হচ্ছে জান্নাতবাসী মোমেনদের

'সেখানে তাদের জন্যে রয়েছে তাই যা তাদের অন্তর চাইবে, চিরন্তন হবে সে জীবন।'

হাশরের দিনের সেই দৃশ্য সদা-সর্বদা মোমেনদের চোখের সামনে ভাসতে থাকে এবং অতীতে আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত অন্য যাদের বন্দেগী তারা করতো তাদের করুণ অবস্থাও যেন তাদের চোখের সামনে তারা দেখতে থাকে। অন্যদিকে আল্লাহর সাথে অন্য কারো কাছে সাহায্য চাওয়ার মাধ্যমে মোশরেকরা যে শেরক করে আর এ কারণে তারা রসূল (স.)-কে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করে.......এ পর্যায়ে রসূল (স.)-কে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে আল্লাহ তায়ালা জানাচ্ছেন যে, সকল রসূলের অবস্থা একই ছিলো, তারাও খাওয়া দাওয়া করতো ও বাজারে চলাফেরা করতো, তাদের এই একই প্রকার দুর্ব্যবহার করা হতো। অতপর রসূল (স.)-কে এসব কথা বলে সান্ত্বনা দান শেষে এ অধ্যায়টি শেষ করা হচ্ছে।

এরপর শুরু হচ্ছে দ্বিতীয় অধ্যায়, যার মধ্যে বর্ণনা এসেছে সে সব ব্যক্তির, যারা আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের প্রশ্নে রসূল (স.)-এর কথাকে প্রত্যাখ্যান করতো। তাদের কথাকে উদ্ধৃত করতে গিয়ে বলা হচ্ছে তারা বলতো, 'কেন নাযিল করা হয় না আমাদের ওপর ফেরেশতা অথবা কেন আমরা আমাদের রবকে দেখি না?' অর্থাৎ, যেদিন তারা ফেরেশতাদেরকে দেখতে থাকবে সেই দিনের দৃশ্য তাদের সামনে তুলে ধরে তাদেরকে শিক্ষা দেয়া হচ্ছে ...... আর সে দিনটা কাফেরদের জন্যে বড়োই কঠিন হবে......... সেদিন প্রত্যেক যালেম ব্যক্তি (দুঃখের চোটে) নিজ নিজ হাত কামড়াতে থাকবে, বলবে, হায় আফসোস, যদি আমি রসূলের সাথে পথ ধরতাম তাহলে কতোই না ভালো হতো! সেদিন রসূল (স.)-এর পথে না আসার কারণে তাদের বড়োই আফসোস হতে থাকবে, যেহেতু কোরআনকে তারা পরিত্যাগ করেছিলো, আর সেদিন, তাদের এই সত্য বিরোধিতা ও কোরআন পরিত্যাগ করার কারণে রসূল (স.) তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর দরবারে নালিশ দায়ের করবেন।

দেখুন, তাদের ধৃষ্ঠতা কত দূর পর্যন্ত গড়িয়েছিলো যে, তারা কোরআন নাযিলের পদ্ধতি সম্পর্কেও আল্লাহর ওপর প্রশ্ন তুলছিলো এবং বলছিলো, 'কেন তার ওপর সমগ্র কোরআন একযোগে নাযিল হয়নি?' তাদের এই বেয়াদবীপূর্ণ প্রশ্ন তোলার কারণে কেয়ামতের দিন তাদেরকে এই শাস্তি দেয়া হবে যে, তাদেরকে মুখের ওপর টানতে টানতে নিয়ে যাওয়া হবে জাহান্নামের দিকে, অথচ আজকে তারা সেই রোয কেয়ামতকেই অস্বীকার করছে। উপরন্তু, তাদের সামনে তাদের পূর্বেকার জাতি নূহ, আদ, সামূদ কূপবাসী এবং আরো বহু জাতির ভীষণ শাস্তির দৃশ্য ছবির মতো তুলে ধরা হচ্ছে। একথাও কি সত্য নয় যে তারা গযবপ্রাপ্ত লূত জাতির ধ্বংসাবশেষের পাশ দিয়ে যখন অতিক্রম করে তখন তারা নিজেরাই বিস্ময় প্রকাশ করে, কিন্তু তবুও তারা শিক্ষা নেয় না। কিন্তু রসূল (স.)-এর ওপর তারা যে বাড়াবাড়ি করছিলো তার জন্যে তারা নিজেদের অজান্তেই নিজেদের কাছে ছোট হয়ে যাচ্ছিলো। আবারও দেখুন, আল্লাহর কাজের ওপর তারা বিস্ময় প্রকাশ করছে বলছে, এই ব্যক্তিটাকেই কি আল্লাহ তায়ালা রসূল বানিয়ে পাঠিয়েছেন? তারপর তাদের এই বিদ্রূপাত্মক ব্যবহারের কারণে তারা কতো হীন অবস্থাপ্রাপ্ত হয় তা জানাতে গিয়ে বলা হচ্ছে, তারা নিকৃষ্ট পশুর মতো, বরং তাদের থেকেও আরো বেশী নিকৃষ্ট প্রাণী। আল কোরআন এর ভাষায় তাদের চিত্র আঁকতে গিয়ে বলা হচ্ছে,

'ওরা অবিকল পশুরই মতো, বরং ভুল পথে চলার দিক দিয়ে তারা পশু থেকেও খারাপ।'

এরপর আসছে তৃতীয় অধ্যায়ের আলোচনা, গোটা বিশ্ব প্রকৃতির মধ্যে পরিব্যাপ্ত আল্লাহ রব্বুল আলামীনের ক্ষমতার বিবরণ দিতে গিয়ে এ আলোচনা এগিয়ে চলেছে। তারপরই পাঠকের দৃষ্টি ফেরানো হচ্ছে পর্যায়ক্রমে রাত দিনের আনাগোনার দিকে, তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে প্রাণ সঞ্চারকারী পানিবাহী সুশীতল নির্মল বায়ুর সুসংবাদের দিকে, চিন্তা করতে বলা হচ্ছে যে এই তুচ্ছ পানি থেকেই তো মানুষের সৃষ্টি....... আর এতদসত্তেও তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন সব কিছু বন্দেগী করছে, যা তাদের কোনো উপকার করতে পারে না– বা তাদের কোনো ক্ষতিও করতে পারে না। আর এরপর তারা তাদের রব ও সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর ওপর তাদের প্রাধান্য বিস্তারের প্রগলভতাও দেখাচ্ছে, আর যখন তাদেরকে নিষ্ঠার সাথে আল্লাহর এবাদাত করার জন্যে আহ্বান জানানো হচ্ছে, তখন তারা নানা প্রকার ওযর আপত্তি দেখাচ্ছে......এরশাদ হচ্ছে, 'আর যখন তাদেরকে বলা হয়, সেজদা করো রহমানকে, তখন তারা বলে, রহমান আবার কে?'...... 'আর তিনিই তো সেই সত্ত্বা, যিনি আকাশের মধ্যে নিরাপত্তাপূর্ণ স্তরসমূহ বানিয়েছেন এবং তার মধ্যে বাতি ও উজ্জ্বল চাঁদ বানিয়েছেন। তিনিই তো রাত ও দিনকে বানিয়েছেন– একের পেছনে অপরকে আগমনরত অবস্থায়। যে কোনো ব্যক্তি এর থেকে শিক্ষা নিতে চাইবে এবং যে চাইবে শোকরগোযারি করতে অবশ্যই সে এর থেকে সর্ব প্রকার শিক্ষা পাবে।'......

কিন্তু হায়, দুঃখ তাদের জন্যে, তারা এর থেকে কোনো প্রকার শিক্ষা না নেয়, না তারা কোনো শোকরগোযারি করে।

এরপর আসছে তৃতীয় অধ্যায়টি, যার মধ্যে 'দয়াময় আল্লাহর বান্দাদের চিত্র আঁকা হয়েছে, যারা তাকে সেজদা করে এবং একমাত্র তাঁরই দাসত্ব করে এবং তারা তাদের সেই অবস্থানগুলো নির্ণয় করে যা তারা তাদের মহৎ গুণাবলী দ্বারা অর্জন করেছে, তিনি সেসব লোকের জন্যে তাওবার দরজা খুলে দিয়েছেন যারা প্রকৃতপক্ষে তাঁর দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং পরম করুণাময় আল্লাহর পথে চলতে শুরু করে, আর পাশাপাশি সেই নেককার ব্যক্তিদের পুরস্কারের কথাও ঘোষণা করেছেন যারা ঈমান আকীদার ওপর মযবুতভাবে টিকে থাকার জন্যে সংকল্প গ্রহণ করে এবং সর্বাবস্থায় চরম ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা দেখায়। এদের সম্পর্কে এরশাদ হচ্ছে,

'এরাই হচ্ছে সেসব ব্যক্তি, যাদের সবর এখতিয়ার করার কারণে তাদেরকে জান্নাতের সুসজ্জিত ও সুরভিত কক্ষ দান করা হবে এবং সেখানে তাদের সাথে অভিভাদন ও সালাম সহকারে সাক্ষাত করা হবে।'

এই কথা দ্বারা সূরাটির সমাপ্তি টানা হচ্ছে যে, যে যাই হোক না কেন, আল্লাহর সামনে মানুষ অতি তুচ্ছ ও অতি ছোট, অতএব তাঁর সামনে সদা-সর্বদা মানুষের বিনয়াবনত থাকা উচিত। মানুষের অন্তর যদি অনুগত না হয়, আল্লাহর ডাকে সাড়া না দেয় এবং আল্লাহকে যদি সে না চেনে তাহলে এসব অস্বীকারকারী মানুষ জীব জানোয়ারের মতোই জীবনের কঠিন পথে দিশেহারা হয়ে ঘুরে বেড়াবে এবং নিজেকে সে চরম অধপতনের দিকে নামিয়ে দেবে।

আল্লাহর পথ থেকে সরে যাওয়ার কারণে মানুষ কতো নীচে নামতে পারে তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় রসূল (স.)-এর সাথে তাদের ব্যবহারে। এতো নিষ্ঠুর ব্যবহার তারা কিভাবে করতে পারে তার কিছু কারণ এ সূরাটির মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে, সূরাটির মূল আলোচ্য বিষয় কি লক্ষ্যই বা কি তা জানানো হয়েছে এবং এ আলোচনার ধারা এমনই মনোজ্ঞ ও চমকপ্রদ যা আমাদেরকে আল কোরআনের এক অনবদ্য বর্ণনা ভংগি সম্পর্কে অবহিত করবে।

তাফসীর

আয়াত ১-২০

এবারে আমরা প্রথম অধ্যায়টির বিস্তারিত আলোচনা শুরু করছি,

'পরম বরকতময় তিনি, যিনি সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যকারী এক গ্রন্থ তাঁর বান্দার কাছে নাযিল করেছেন, যাতে করে সে সারা বিশ্বের জন্যে সতর্ককারী হিসাবে কাজ করতে পারে......... ওরা মালিক নয় মৃত্যু দান করার, জীবন দানের ক্ষমতাও তাদের নেই, না তারা তাদেরকে আবার জীবিত করে তুলতে পারবে।'

দেখুন, কী চমৎকার প্রাণবন্ত সেই সূরাটির এই শুরুর কথাগুলো, যা আল কোরআনের মৌলিক সূরাগুলোর অন্যতম। এর আগমন তো আল্লাহরই পক্ষ থেকে।

এখানে সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয়া হচ্ছে যে, রেসালাতে মোহাম্মাদী সমগ্র মানবমন্ডলীর জন্যে এবং আল্লাহ রব্বুল আলামীনের একত্ব ও একচ্ছত্র আধিপত্য নিরংকুশ তা প্রশ্নাতীত, অনবদ্য ও সকল সীমাবদ্ধতার উর্ধে, যেসব কারণে সেরা সৃষ্টজীব মানুষের সন্তান প্রয়োজন, প্রয়োজন কোনো শরীকের- সে সব প্রয়োজন থেকে তিনি সম্পূর্ণ পবিত্র। তাঁর মালিকানা সারা বিশ্বব্যাপী পরিব্যপ্ত, তাঁর যুক্তিপূর্ণ ব্যবস্থাপনা সবখানে বিরাজিত এবং সব কিছুই পূর্ব পরিকল্পিত ও পূর্ব নির্ধারিত। হায়, এসব কিছু (বুঝা সত্তেও) মোশরেকরা শেরক করে, মিথ্যা নির্মাণকারীরা অলীক কল্পনার জাল বুনে কূটতর্কে লিপ্ত হয়, আত্মগর্বী তার্কিকরা এবং অপরিণামদর্শী বলদর্পী অহংকারীরা মনে করে তারা আছে চিরদিন, আর থাকবেও বুঝি চিরদিন। একথাগুলো জানাতে গিয়েই আল্লাহ তায়ালা উচ্চারণ করছেন।

সত্য মিথ্যার মাঝে পার্থক্যকারী আল কোরআন

'মহা কল্যাণময় সত্ত্বা তিনি যিনি নাযিল করেছেন হক ও বাতেলের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়কারী (এ কেতাব) তাঁর এক বান্দার ওপর যেন (এ গ্রন্থ) মানুষের সামনে অবতীর্ণ হয় এক সতর্ককারীর ভূমিকায়।'

'তাবারাকা' শব্দটি 'তাফায়ালার' ধাতুগত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, অর্থাৎ পারস্পরিকভাবে বরকত (বা অযাচিত ও অচিন্তনীয় কল্যাণ) বিনিময় করা। এ শব্দটি ব্যবহারের মাধ্যমে আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাঁর মেহেরবানী, তাঁর করুণা, তাঁর দান ও তাঁর পক্ষ থেকে সম্মান বৃদ্ধি এসব কিছু সম্পর্কেই জানাচ্ছেন। এখানে আল্লাহ তায়ালা তাঁর নিজের বড়ত্ব-মহত্ব ও মর্যাদার কথা উল্লেখ করেননি, বরং তাঁর উপরোল্লিখিত গুণটির দিকে ইংগিত দিতে গিয়ে বলছেন, 'যিনি নাযিল করেছেন ফোরকান' (সত্য মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়কারী) যাতে করে পৃথিবীর এ স্থানের সাথে তাঁর নিবিড় সম্পর্ক পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় এবং সুস্পষ্টভাবে তাঁর গুণাবলী প্রকাশিত হয়, কারণ সূরার আলোচ্য বিষয়টি হচ্ছে রেসালাতের সত্যতা ও আল কোরআনের বাস্তবতা প্রতিষ্ঠা করা।

আল্লাহ তায়ালা সূরাটির নাম দিয়েছেন 'আল ফোরকান' কেননা এর মধ্যে হক ও বাতেল এর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়কারী যুক্তিসমূহ রয়েছে, জীবন ধারণের সুস্পষ্ট নীতিমালা রয়েছে এবং ভুল ও অকল্যাণকর সব কিছুকে চিহ্নিত করে দেয়া হয়েছে, বরং আরো স্পষ্ট করে বলতে গেলে বলতে হয় যে এ পাক কালাম আল্লাহর দেয়া জীবন বিধান ও অন্যান্য সকল বিধানের মাঝে পার্থক্য দেখিয়েছে এবং মানুষের জীবনের নিরাপত্তার জন্যে করা চুক্তি ও অন্যান্য চুক্তির মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করেছে। অতপর আল কোরআন গোটা জীবনের সব কিছুর জন্যে স্থায়ী এক বিধান ও কর্মসূচী পেশ করেছে এবং এমন যুক্তিপূর্ণ ভাষায় এর বর্ণনা এসেছে যা হৃদয় মনকে বিগলিত করে এবং মানুষের সাধারণ বিবেক বুদ্ধিকে আকর্ষণ করে। ঐতিহাসিক ঘটনাবলী উল্লেখ করে ইসলামী

ব্যবস্থার বাস্তবতাকে এমন জীবন্ত করে তোলা হয়েছে যে সত্যকে যথার্থভাবে উপলব্ধি করার পর মানব মন পরম পুলকে ভরে ওঠে, তখন কোনো জাতির সামনে এক নবযুগের সূচনা হয়- যে জাতি নির্লিপ্ত নিশ্চিন্ত ক্ষেত্রে এর যৌক্তিকতা ও সৌন্দর্যের, স্বাদ পায়নি সে জাতি অনুভব করে, যে এ অপূর্ব জীবন বিধান হচ্ছে তুলনাহীন, যার অভিজ্ঞতা অনেক দিন ধরে মানবকুল লাভ করেনি!

অতএব, এ পবিত্র কেতাব সর্বব্যাপক ও বিরাট অর্থেই 'ফোরকান'। যে ব্যক্তি সবেমাত্র শিশুকাল পার হয়ে যৌবনে পদার্পণ করেছে এবং এ পাক কালামের সংস্পর্শে এসেছে, সে যেমন এ কেতাবকে 'ফোরকান' রূপে দেখেছে, একইভাবে সেই ব্যক্তির সামনেও কোরআন নামক মহাগ্রন্থ 'ফোরকান' হয়ে হাযির হয়েছে যে, এ কেতাবের অত্যাশ্চর্য ও অলৌকিক বস্তুশক্তির কারিশমা দেখে এবং জ্ঞান বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধন করতে করতে মনস্তাত্তিক দিক দিয়েও সে এতোটা বেশী উন্নতি লাভ করেছে সে যেন রেসলাতের স্তরের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে, আর এ সময়ই আগমন ঘটেছে শেষ নবী মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (স.)-এর। যাঁকে অনাগত সকল মানব জাতির জন্যেই রসূল বানিয়ে পাঠানো হয়েছে। তাঁর সম্পর্কেই বলা হয়েছে, 'যেন সে বিশ্বজগতের সবার জন্যে সতর্ককারী হয়।' অর্থাৎ সতর্ককারীর দায়িত্ব পালন করে।

মানুষের মাঝ থেকেই নবী রসূল নির্বাচন

এরপর রসূলুল্লাহ (স.)-এর মান মর্যাদা ও মানবমন্ডলীর মধ্যে তাঁর অস্তিত্ব সম্পর্কে জানাতে গিয়ে বলা হচ্ছে যে, তিনি আল্লাহর বান্দা (অনুগত দাস), এজন্যে তাঁর সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'আলা আবদেহী' অর্থাৎ তাঁর বান্দার প্রতি......... একইভাবে তাঁর সম্পর্কে মেরাজ উপলক্ষেও (এই শব্দটি) 'আবদেহী' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, যা আমরা সূরায়ে 'আল ইসরাতে' দেখতে পাই। সূরায়ে জ্বিনের মধ্যে এভাবে তার দোয়ার মধ্যে ব্যবহৃত হয়েছে 'অ আন্নাহু লাম্মা কামা আবদুল্লাহ' (আর যখন তাঁর বান্দা তাঁর কাছে দোয়া করার জন্যে উঠে দাঁড়ালো)- মূলত যে পরিবেশ পরিস্থিতিতে সূরায়ে কাহাফ এর প্রথম অধ্যায়টি নাযিল হয়েছে, সেই একই পরিবেশে সূরায়ে আল ফোরকানও নাযিল হয়েছে। সূরায়ে কাহাফ এর শুরুতে নাযিল হয়েছে, 'সকল প্রশংসা আল্লাহর যিনি তাঁর বান্দার কাছে কেতাব নাযিল করেছেন এবং এর মধ্যে কোনো বক্রতা বানাননি।' আর রসূলুল্লাহ (স.)-এর 'উবুদিয়্যৎ' বা দাসত্বের যে গুণটি বিভিন্ন সূরার মধ্যে উল্লিখিত হয়েছেই সেই গুণটিই তাঁকে মহীয়ান করেছে। প্রকৃতপক্ষে মানুষ যতো গুণের অধিকারীই হোক না কেন এবং মানুষকে মর্যাদার যতো শিখরেই তোলা হোকনা কেন এই গুণটিই তার জন্যে সব থেকে গৌরবের, কারণ এর মধ্যে প্রত্যেকের জন্যে এক গোপন স্মরণিকা রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা অতি সংগোপনে উক্ত কথার মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন, হে আমার প্রিয় বান্দা, সাধারণ মানুষের স্তর থেকে তুলে এনে আমি তোমাকে আমার বৈশিষ্ট্য পূর্ণ বান্দাদের সারিতে স্থান দিলাম। এভাবে এরা বিশ্বসমূহের অধিপতি, সকল শক্তিক্ষমতার মালিকের খাস লোক তাঁর সাম্রাজ্যের ঘনিষ্ট ব্যক্তিতে পরিণত হয়ে গেলো। এদের ওপর মর্যাদাবান শুধু আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কেউ নয়, তিনি একচ্ছত্র অধিপতি এবং তাঁর রসূলরা তাঁর সর্বপ্রধান কর্মকর্তা। তাঁর সমকক্ষ বা তাঁর সাহায্যকারী কেউ নেই। তিনি ছাড়া আর কেউই নেই, তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেয়ারও কারো কোনো প্রয়োজন নেই। যা কিছু করার তিনি একাই করেন, তাঁর হয়ে অন্য কারো কিছু করার নেই, কোনো অধিকার কারোই নেই, এজন্যে সার্বভৌমত্ব বলতে যা কিছু বুঝায় সবই তাঁর। এ কর্তৃত্ব করার ক্ষমতা কারো নেই। এই উদাহরণটাই পেশ করা হয়েছে ইসরা কিংবা মে'রাজের ঘটনার মধ্যে, অথবা দোয়া-মোনাজাত বা ওহী এলহাম এর ঘটনার মধ্যে। এসব প্রসংগে সূরা ইসরায় কী চমৎকারভাবে বলা হয়েছে, 'মহা মহাপবিত্র সেই সত্ত্বা, যিনি তাঁর বান্দাকে নিয়ে গেলেন।'

এসব কথা ভালোভাবে না বুঝায় বা রসূল (স.)-এর শিক্ষার দিকে যথাযথভাবে মনোযোগ না দেয়ার কারণে ইতিপূর্বে অনেক রসূলের মর্যাদা হানি হয়েছে, তারা নিজ নিজ যামানার রসূলদেরকে বান্দার স্তর থেকে ওপরে তুলতে গিয়ে আল্লাহর ছেলেই মনে করে নিয়েছে অথবা সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক বা সর্বশক্তিমান সত্ত্বা যিনি, তাঁর সাথে অন্য সৃষ্টজীবের মৌলিক পার্থক্যটার দিকে তারা নযর দিতে পারেনি। এজন্যেই আল কোরআন এখানে আল্লাহর রসুলদের উবুদিয়্যাত বা দাসত্ব নামক এই গুণটির ওপর বিশেষ জোর দিয়েছে এবং জানিয়েছে যে, এই গুণের কারণেই রসূলরা আল্লাহর সাম্রাজ্যের মধ্যে সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী হয়েছেন।

এরপর ফোরকান নামক এই সূরাটি নাযিল হওয়ার লক্ষ্য নির্নিত হচ্ছে, 'যেন এ সূরা গোটা বিশ্বের জন্যে সতর্ককারী হয় ....' লক্ষ্য করুন, এ সূরাটি হচ্ছে মক্কী মক্কায় দাওয়াত পেশ করার একেবারে প্রথম দিককার দিনগুলো থেকে নিয়েই আল্লাহর এ কালামটির লক্ষ্য স্থির করে দেয়া হয়েছে, আর তা হচ্ছে রসূলুল্লাহ (স.)-এর আনীত বিশ্বজনীন দাওয়াতকে সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়া। কোনো কোনো অমুসলিম ঐতিহাসিকের মতে এ দাওয়াত বিশেষ এক দেশের জন্যে এসেছে; কিন্তু উপর্যুপরি বিজয়ের কারণে এ দাওয়াত ক্রমান্বয়ে বিশ্বজনীন হয়ে পড়েছে। এ ধরনের দাবী করা মোটেই ঠিক নয়, বরং সারাবিশ্বের সকল মানুষের জন্যেই এসেছে এ দাওয়াত, সবাইকে লক্ষ্য করেই আল কোরআন কথা বলেছে এবং সবাইকে ডেকেছে হেদায়াতের এই সার্বজনীন কল্যাণের পথে। এই কারণেই দেখা যায়, ইসলামী কাফেলা যুগে যুগে ও দেশে দেশে সারাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে মানুষকে ইসলামের দিকে আহ্বান জানিয়েছে। এই ফোরকানের আলোকেই তারা পৃথিবীর সকল বিদগ্ধ জনতার কাছে সত্য মিথ্যার এ পার্থক্য তুলে ধরেছে, যাতে করে সময় থাকতেই তারা সাবধান হতে পারে এবং মিথ্যার আঁধার চিরে প্রকৃত সত্যকে খুঁজে নিতে সক্ষম হয়, এ পবিত্র কালাম যেন তাদের জন্যে সতর্ককারীর ভূমিকা পালন করতে পারে। হায়, যে দাওয়াত বিশ্বের সব মানুষের জন্যে, আর যে মহা-মানব উদাত্ত কণ্ঠে সারা বিশ্বকে শান্তি সমৃদ্ধির পথে, কল্যাণের পথে আহ্বান জানাচ্ছেন, দেখুন তাঁকে কি নিষ্ঠুরভাবে প্রত্যাখ্যান করা হচ্ছে, কতো হৃদয়হীনভাবে প্রতিহত করা হচ্ছে, চরম হঠকারিতার সাথে তাকে অস্বীকার করা হচ্ছে!

আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও মানুষের ভাগ্য লিখন

তাই বিশ্ব সাম্রাজ্যের খোদ মালিক অধিপতি সান্ত্বনা দিতে গিয়ে তাঁকে বলছেন,

'বড়োই বরকতপূর্ণ সেই সত্ত্বা যিনি তাঁর বান্দার কাছে পাঠালেন............ আর সৃষ্টি করেছেন তিনি সব কিছুকে, তারপর সব কিছুর ভাগ্যও তিনিই নির্ধারণ করে দিয়েছেন।'

আরো দেখুন, আল্লাহ তায়ালা তাঁর নিজের মর্যাদা ব্যঞ্জক কথাবলীর পরিবর্তে এই পর্যায়ে সকল বস্তুর ওপর তাঁর কর্তৃত্ব ও মালিকানা প্রকাশ করার জন্যে যে গুণটি উল্লেখ করা একান্ত প্রয়োজন সে মহত গুণটিই এখানে উল্লেখ করছেন, যাতে করে পাঠক পাঠিকা যথাযথ গুরুত্ব সহকারে এ বিষয়ে-চিন্তা করতে পারে। এরশাদ হচ্ছে,

'তিনি সেই সত্ত্বা যাঁর বাদশাহী ছড়িয়ে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী ব্যাপী............'

অর্থাৎ, আসমান যমীনের সবখানেই রয়েছে তাঁর নিরংকুশ ক্ষমতা, রয়েছে মালিকানার ক্ষমতা, কর্তৃত্ব করার শক্তি সাহস, ব্যয় ও ব্যবস্থা নির্মাণের অধিকার এবং যে কোনো বিষয়কে পরিবর্তন করার সার্বিক এখতিয়ার একমাত্র তাঁরই রয়েছে।

'আর তিনি কোনো সন্তান গ্রহণ করেননি'

একথা দ্বারা বুঝতে হবে যে এই যে বিশেষ এক প্রক্রিয়ায় সন্তানাদি হওয়ার ব্যবস্থা এটা তো শুধু সৃষ্টিটাকে টিকিয়ে রাখার প্রয়োজনেই রাখা হয়েছে। আল্লাহর এক নিয়মের সাথে সম্পর্ক কি? যিনি নিজে সকল নিয়মের নিয়ামক তাঁকে কোনো নিয়মের গন্ডীর মধ্যে আনতে পারে কে? নিয়ম বানানো, পরিবর্তন করা না করা, ভাংগা গড়া সবই তো তাঁর নিজস্ব ব্যাপার, এখানে নাক গলানোর

ক্ষমতা আর কারো থাকতে পারে কি? তিনিই একমাত্র স্থায়ী, আর সবই তো অস্থায়ী। একমাত্র তিনিই সব কিছু করতে সক্ষম, আর কেউই কিছু করতে পারে না, তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন তাঁর মুখাপেক্ষী সবাই- অন্য সবাই। নিজেদের মধ্যে কারো না কারো মুখাপেক্ষী হতেই হয়। তাই বলা হচ্ছে,

'বাদশাহী বা নিরংকুশ মালিকানা ও কর্তৃত্বে তাঁর কোনো শরীক নেই, আসমান যমীনের যেখানে যা কিছু আছে, তা সবই একথার সাক্ষী যে তিনি একাই সেই সত্ত্বা, যাঁর সিদ্ধান্তে কোনো পরিবর্তন নেই, সকল ক্ষমতার মালিক এককভাবে তিনিই এবং সব কিছু ব্যবহারের ব্যাপারেও তাঁর একক সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। এরশাদ হচ্ছে,

'তিনি সব কিছুকে সৃষ্টি করেছেন তারপর সব কিছুর তাকদীর (ভবিষ্যত কি হবে তাও) তিনিই ঠিক করে দিয়েছেন। তিনিই সব কিছুর আকৃতি-প্রকৃতিকে নির্ধারণ করে দিয়েছেন, তাদের পেশা ও কাজকে স্থির করে দিয়েছেন তাদের সময় ও স্থানকে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন এবং এই মহা সৃষ্টির বুকে কার সাথে কি সম্পর্ক প্রয়োজন তাও তিনিই নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

এই মহা বিশ্বের গঠন প্রণালী এবং এর মধ্যস্থিত সব কিছুর আকৃতি প্রকৃতির দিকে তাকালে একেবারেই দিশেহারা হয়ে যেতে হয়, সকল প্রতিরোধ ক্ষমতা বিলুপ্ত হয় এবং কোনো বুদ্ধিই আর তখন কাজ করতে চায় না।

এ সময় মানুষের কাছে ভাগ্য লিখন যে কতো সত্য এবং কোনো অবস্থাতেই তাকদীরের সিদ্ধান্ত এড়ানো যায় না, একথাটি স্পষ্ট হয়ে যায়। মানুষ চেষ্টা করতে পারে, কিন্তু কিছুতেই সে জোর করে বলতে পারে না যে অমুক সময়ের মধ্যে অবশ্যই সে অমুক কাজটি করবে। সৃষ্টির রহস্য রাজির মধ্যে অবশ্যই এটা একটা বড়ো রহস্য। যতোবেশী মানুষ তার জ্ঞান বুদ্ধিকে কাজে লাগাতে থাকে ততো বেশী তার সামনে সৃষ্টি রহস্যের জট একে একে খুলতে থাকে এবং ততো বেশী সে বুঝতে থাকে যে, সারাবিশ্বের রহস্য রাজির সবগুলো পরস্পরের সাথে এমনভাবে সম্পৃক্ত যে একটা ছাড়া আর একটার অস্তিত্ব চিন্তা করা যায় না এবং পরিশেষে আমরা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি, তা হচ্ছে। সব কিছু মিলে গোটা সৃষ্টি একই সুরে গাঁথা এবং সে কিছুর এই একাত্মতা এই কথাই বলে দেয় যে সবার সৃষ্টিকর্তা এক, আর এ সব কিছু আরো জানায় যে সেই মহান স্রষ্টার বেঁধে দেয়া নিয়ম অনুসারে সবাইই একই নিয়মে চলতে বাধ্য।

সবকিছুই এখানে পরিমাপ মতো সৃষ্টি করা হয়েছে

এরপর পাঠকের সামনে একটি মহা গুরুত্বপূর্ণ কথা আসছে,

'আর তিনি সব কিছুকে সৃষ্টি করেছেন এক পূর্ব পরিকল্পিত নিয়মে এবং তাদের নিয়তিকেও তিনি স্থির করে দিয়েছেন।'

নিউ ইয়র্কের সায়েন্স একাডেমীর প্রেসিডেন্ট মিঃ ক্রেসি মরিসন তাঁর ম্যান ডাজ নট লিভ এ্যালোন নামক পুস্তকটিতে এমনই মন্তব্য করেন।(১)

বিশ্ব প্রকৃতির যে বিষয়টি আমাদের বুদ্ধিকে অকেজো করে দেয় তা হচ্ছে, বিশ্বের এই যে বিশাল আকৃতি এর মধ্যে এতো বেশী রহস্য রয়েছে যার দিকে তাকালে মানুষকে বুদ্ধিহারা হয়ে যেতে হয়, কোনো কিছুই বুঝা যায় না কারণ পৃথিবীর উপরিভাগের স্তর বা শিলাগুলো যদি আরো ৮/৯ ভাগ বেশী পুরু হয়ে যেতো তাহলে অক্সিজেনের মধ্যে যে কার্বন ডাই অকসাইড আছে তা পৃথিবীর আর্দ্রতাকে একেবারে শুষে নিতো। এর ফলে গাছ পালা শাক সজি কোনো কিছুই এখানে বেঁচে থাকতে পারতো না।

(১) পুস্তকটির আরবীতে অনুবাদ করেন মাহমূদ সালেহ আলফালকী এবং নাম করণ করেন, 'আল এলমু ইয়্যাদউ ইলাল ঈমান' অর্থাৎ বিজ্ঞান যা ঈমানের দিকে আহ্বান জানায়।

আবার বর্তমানে বাতাস যে অবস্থায় আছে, তার থেকে যদি আরো বেশী নির্মল হয়ে যেতো এবং আজকে যেসব কোটি কোটি অগ্নিশিখা বাতাসের মধ্যেই জ্বলে শেষ হয়ে যাচ্ছে তার কোনো একটি যদি ভূ-পৃষ্ঠায় আঘাত হানতো তাহলে পৃথিবীর অণু-পরমাণু সব কিছুই জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়ে যেতো। সবাই জানে, বৈজ্ঞানিকদের জ্ঞান গবেষণায় ধরা পড়েছে যে, আলো প্রতি সেকেন্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল গতিতে ছুটে চলে। তার মধ্যে অগ্নিশিখাসমূহের মধ্যে দাহ্য সকল বস্তুকে জ্বালিয়ে দেয়ার মতো শক্তি নিহিত রয়েছে। এতো তীব্র গতিতে আঘাত হানা তো দূরের কথা, যদি বন্দুকের গুলির তীব্রতা নিয়েও কোনো কিছু পৃথিবীর বুকে আঘাত হানতো তাহলেও পৃথিবীর সব কিছু ধ্বংস হয়ে যেতো এবং মানব জাতির পরিণতি এতো ভয়াবহ হতো যা কেউ কোনোদিন কল্পনাও করতে পারে না। সব থেকে দুর্বল ও কম গতিসম্পন্ন উল্কা পিন্ডটিও যদি মানুষকে আঘাত হানে তাহলে তার গতিও বন্দুকের গুলির গতি থেকে নব্বই গুণ বেশী হবে এবং এই উল্কা পিন্ড বায়ুমন্ডলের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করার কারণে যে তাপ উৎপন্ন হবে, শুধু সেই তাপেই সব কিছু ভেংগে চুরমার হয়ে যাবে!

কিন্তু আশ্চর্যজনক ব্যাপার হলেও একথা সত্য যে আল্লাহ রব্বুল আলামীন সুনির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সৃষ্টি জগতকে টিকিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে সৃষ্টির সকল কিছুর মধ্যে এক অদেখা সম্পর্ক স্থাপন করেছেন যেন তারা সবাই মিলে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে গোটা সৃষ্টিকে অভিষ্ট লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে নিতে পারে।

'আলোক রশ্মিগুলো যখন বায়ুমন্ডলের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে তখন তরল বায়ুকে বা বায়বীয় পদার্থসমূহকে এক নির্দিষ্ট পরিমাণে ঘনীভূত করতে করতে এগিয়ে যায়। এই ঘর্ষণজনিত ক্রিয়াকে বলা যায় রাসায়নিক ক্রিয়া। চাষ বাস করে গাছ গাছালি উৎপাদন করার জন্যে এই রাসায়নিক প্রভাব বা রাসায়নিক সারের বড়ো প্রয়োজন। এই রসায়নক্রিয়াই পোকা মাকড় ও বিভিন্ন রোগব্যাধির জীবানু ধ্বংস করতে সহায়তা করে এবং একে মানুষের জন্যে ধ্বংসাত্মক বানানোর পরিবর্তে বৃক্ষগুল্ম লতাসমূহকে ভিটামিনসমৃদ্ধ ও শক্তিশালী বানায়। তবে এগুলোকে যদি কেউ প্রয়োজন থেকে বেশী সময় ধরে ব্যবহার করে, তা স্বতন্ত্র কথা, তখন অবশ্যই সেখানে কিছু ক্ষতি হবে। বাস্তবে দেখা যাচ্ছে সারা বছর ধরে পৃথিবীর অভ্যন্তর থেকে গ্যাস বেরিয়ে চলেছে, যার বেশীর ভাগই বিষাক্ত, তা সত্তেও জীব জন্তু মানুষের সেবন ও জীবন ধারণের জন্যে প্রয়োজনীয় নির্মল বায়ু বর্তমান রয়েছে এবং বাতাস ও বিষাক্ত গ্যাসের সহ অবস্থানের মধ্যে যে ভারসাম্য রয়েছে তা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে না। এ বিষয়ে এ পর্যন্ত মানুষের জ্ঞান গবেষণায় যে সত্যটা ধরা পড়েছে, তা হচ্ছে প্রাণী জগতের অস্তিত্বকে টিকেয়ে রাখার জন্যে প্রধান ভূমিকা পালন করে পৃথিবীর তিন চতুর্থাংশ ব্যাপী জুড়ে থাকা পানির বিশাল মজুদ অর্থাৎ সাগর মহাসাগর, নদী নালা খাল বিল পুকুর ইত্যাদির অস্তিত্ব। এই পানির সরবরাহ থেকেই আসে জীবন ও জীবনের প্রয়োজনে খাদ্যসম্ভার। ভারসাম্যপূর্ণ আবহাওয়া, গাছ পালা ফসল ও ফল ফলাদিও এ থেকে আসে। সর্বশেষে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে স্বয়ং মানুষ নিজে। পৃথিবীর বুকে এতো প্রতিকূলতার মধ্যেও এসব কিছু আছে এবং তার ক্রমোন্নতি চলছেই।

অন্য এক অধ্যায়ে একই লেখক বলেন,

'বাতাসের মধ্যে অক্সিজেনের পরিমাণ সাধারণভাবে শতকরা একুশভাগ। এ অনুপাতের পরিবর্তন হয়ে যদি বাতাসে শতকরা পঞ্চাশ বা তার থেকে আরো কিছু বেশী অক্সিজেন এসে যায় তাহলে পৃথিবীতে দাহ্য যতো বস্তু আছে তা সবই আগুনের অংগারে পরিণত হয়ে যাবে এবং এতো প্রচন্ড বেগে তা জ্বলে উঠবে যে, তার একটি স্ফুলিংগের ঝলকানো আলো কোনো গাছে পড়লে যে অংগার সৃষ্টি হবে তা সন্নিহিত গোটা বনভূমিকে বিস্ফোরিত করে দেবে। আর বাতাসে অক্সিজেনের

অনুপাত যদি শতকরা দশ ভাগে নেমে আসে বা তার থেকেও যদি কমে যায় তাহলে তা এতো বেশী শীতল হয়ে যাবে যে সৃষ্টিকুলের সবাই প্রকৃতির মধ্যেই নিশেষে বিলীন হয়ে যাবে।

উক্ত লেখক তাঁর বইয়ের তৃতীয় অধ্যায়ে লিখছেন,

কী চমৎকার এই বিশ্ব ব্যবস্থা, যার অধীনে সকল জীবজন্তু নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। এরা যতোই বড়ো হোক, যতোই ছোট হোক, যতোই হিংস্র যতোই অপ্রিয় হোক– সব কিছু সেই মহা শক্তিধর কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছে, যার অধীনে সেই প্রস্তরযুগ থেকে নিয়ে সারাবিশ্বজগত চলছে, কিন্তু আফসোস যে মানুষকে বানানো হলো সৃষ্টির সেরা, যাকে ভূষিত করা হলো জ্ঞান-গরিমা ও স্বাধীনতা-রূপ নেয়ামত দ্বারা, যাকে খেলাফতের মহান মর্যাদা দান করা হলো, একমাত্র সেই মানুষ বৃক্ষ লতা-পাতা ও জীব জন্তুকে তাদের নিজ নিজ স্থান থেকে সরিয়ে অন্যত্র নিয়ে যায়, এর মাধ্যমে প্রকৃতির ভারসাম্য তারা নষ্ট করে ফেলে আর এর ফলে তারা অত্যন্ত দ্রুতগতিতে আজ তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া প্রত্যক্ষ করছে, জীব জন্তু, কীট পতংগ ও গাছ পালার ওপর নানা প্রকার বিপদ-আপদ নেমে আসছে।'

প্রকৃতির ভারসাম্য এভাবে নষ্ট করে দেয়াতে বাস্তবে মানুষ এর প্রতিক্রিয়ার শিকার হয়ে চলেছে। এ সব কিছুর সাথে মানুষের অস্তিত্ব অংগাংগিভাবে জড়িত। বেশ কয়েক বছর থেকে অস্ট্রেলিয়াতে ভারতীয় ডুমুর জাতীয় এক প্রকার গাছের চাষ করা হচ্ছে। এগুলো দ্বারা বেশ শক্ত বেড়া বানানো যায়, কিন্তু এগুলো আপনা থেকে এতো বেশী উৎপন্ন হতে শুরু করেছে যে অতি অল্প সময়ের মধ্যে প্রায় ইংল্যান্ডের মতো বিশাল এক প্রান্তর ব্যাপী এ গাছ ছেয়ে গেছে এবং এবং গোটা দেশের আবাদী জমির সমান জায়গা এরা দখল করে ফেলেছে, এর ফলে তাদের ফসলের প্রচুর ক্ষতি হতে শুরু করেছে, কিন্তু এ গাছের বৃদ্ধি অযত্ন অবহেলাতে এতো বেশী এগিয়ে চলেছে যে স্থানীয় অন্য কোনো গাছ এর সাথে কিছুতেই প্রতিযোগিতা করে পারছে না বা স্থানীয় জনগণ এর প্রসার থামাতেও সক্ষম হচ্ছে না। এর ফলে এর দ্রুত প্রসার গোটা দেশের ফসল উৎপাদনের বিরুদ্ধে এক কঠিন হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে, কেননা অপ্রতিরোধ্য গতিতে এর প্রসার এগিয়ে চলেছে।

'আবার দেখুন, কীটপতংগ-বিজ্ঞানীরা প্রচন্ড অনুসন্ধিৎসা নিয়ে দেশ বিদেশে ভ্রমণ করতে করতে এমন এক কীটের সন্ধান পেয়েছেন যারা উক্ত ভারতীয় ডুমুর বৃক্ষ বিশেষের ওপরে ছাড়া অন্য কোথাও বেঁচে থাকতে পারে না এবং সে গাছের পাতা ও ফল ছাড়া আর কিছুই তারা খায় না। অত্যন্ত দ্রুতগতিতে এ পোকার প্রসার ঘটে এবং আজ সমগ্র অস্ট্রেলিয়ায় এর বৃদ্ধি রোধ করার মতো শক্তি কারো নেই। এ পোকা সমগ্র গাছের ওপর ছড়িয়ে পড়ে, আবার তারা গুটিয়ে এসে এক স্থানে একত্রিত হয়ে যায় এবং অল্প কিছু সংখ্যক ছাড়া বাকি সবাই অল্প ক্ষণেই মরে যায়। আসলে একটি প্রজন্মের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্যেই আল্লাহ তায়ালা কিছু সংখ্যক পোকাকে বাঁচিয়ে রাখেন। আর তাঁরই অদৃশ্য ব্যবস্থার মাধ্যমে সে ডুমুর জাতীয় গাছকে সীমাহীনভাবে বাড়তে থাকা থেকে রোধ করার জন্যে এ পোকা মাকড়ের প্রসার ব্যবস্থাকে চালু রাখা হয়েছে।

'এভাবে প্রকৃতির সব কিছুর মধ্যে এমনভাবে ভারসাম্য রেখে দেয়া হয়েছে যার ফলে আল্লাহর দেয়া সব কিছু মানুষের জন্যে সদা-সর্বদা উপকারী বলে প্রমাণিত হয়েছে।'

'আবার চিন্তা করে দেখুন, অতীতে আমাদের বাপ-দাদারা ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাবে কি করুণভাবে মৃত্যুবরণ করতো, কিন্তু আজকে সেইভাবে ম্যালেরিয়া কেন ছড়াচ্ছে না? অথবা কেনই বা মানুষ প্রতিশেধক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে? এভাবে আরো বলা যায় যে মশা থেকে জনডিস (পান্ডুরোগ) বিস্তার লাভ করে যা অর্ধ শতাব্দীর মধ্যে ইউরোপের উত্তরাঞ্চলে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে, এমনকি আমেরিকার নিউইয়র্ক পর্যন্ত এ মারাত্মক ব্যাধি পৌঁছে যায়। এমনি করে

হিমাঞ্চলে অবস্থিত দেশগুলোতেও অতি অল্প সময়ের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে মশার উপদ্রব পরিলক্ষিত হয়। আজকে এমনও অনেক শীত প্রধান দেশ দেখতে পাওয়া যায়, যেখানে মাছি টিকতে পারে না, কিন্তু সে সব জায়গায় অজস্র মশার উপদ্রব জীবনকে অতিষ্ঠ করে তুলছে। বলা যায় এসবের অকল্পনীয় প্রাদুর্ভাব জীবনের অস্তিত্বকে যেন বিলীন করে দিতে চাইছে। এই কিছুদিন পূর্ব পর্যন্তও মশা-মাছির দ্বারা কলেরা, বসন্ত, প্লেগ ইত্যাদি মারাত্মক সংক্রামক ব্যাধিসমূহ যখন মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করলো তখন এ সবের কোনো চিকিৎসা না থাকায় জনপদের পর জনপদ ধ্বংস হয়ে যেতে লাগলো, কিন্তু আজ পর্যন্ত কিভাবে এবং কার ইচ্ছায় পৃথিবীতে মানব জাতি টিকে আছে তা চিন্তা করতে গেলেও দিশেহারা হয়ে যেতে হয়, মানুষের বুদ্ধি সেখানে খেই হারিয়ে ফেলে।

যে পৃথিবীতে অগনিত কীট পতংগ আমরা দেখতে পাই, পরীক্ষা করে দেখা গেছে মানুষের মতো সেগুলোর কিন্তু দুটো ফুসফুসে নেই। এগুলো শ্বাসনালীর মাধ্যমে নিশ্বাস প্রশ্বাস ছাড়ে এবং এভাবেই এসব কীট পতংগ ছাড়ায় ও বৃদ্ধি পায়, কিন্তু এসব শ্বাসনালীর সম্প্রসারণ ও সংকোচন ক্রিয়া এতো দ্রুত বেগে চলতে থাকে যে, এর সাথে তাল মিলিয়ে এদের নিশ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করা সম্ভব হয় না, আর সম্ভবত এজন্যেই কোনো কীট পতংগ কয়েক ইঞ্চির বেশী দীর্ঘ হতে পারে না এবং কোনো কীট বা পতংগের বাহু বা পাখনাগুলোও বেশী লম্বা হয় না। এটা আল্লাহ্ পাকেরই এক সূক্ষ্ম ব্যবস্থা, কীট পতংগের প্রজাতিকে তিনি এমনই এক গঠন প্রণালী দিয়েছেন যে তারা নির্দিষ্ট এক পরিমাণের বাইরে আর বড়ো হয় না। এটা শুধু কীট-পতংগের ব্যাপারই নয়, সকল প্রাণীর জন্যেই তিনি এক বিশেষ গঠন প্রণালী দিয়েছেন এবং সবার জন্যেই দিয়েছেন তাদের প্রত্যেকের পৃথক পৃথক নিয়ম, যার বাইরে কোনো গঠন গ্রহণ করার ক্ষমতা তাদের নেই এবং তাদের বৃদ্ধির যে সীমা তিনি নির্ধারণ করে দিয়েছেন তার থেকে বড়ো হওয়ার কোনো সাধ্য কারো নেই। এ সীমাবদ্ধতা ও প্রাকৃতিক নিয়ন্ত্রণ যদি না থাকতো তাহলে পৃথিবীর বুকে আজ সৃষ্টির কোনো অস্তিত্বই থাকতো না। মানুষ বোলতার ছবিটি কল্পনা নেত্রে একবার দেখুক ও চিন্তা করুক, যদি এটা আরো বড়ো হতে থাকতো তাহলে এক সময় এটা সিংহের আকৃতিতে পর্যন্ত পৌঁছে যেতো। এমনি করে মাকড়সা বাড়তে বাড়তে সে রকম অন্য কোনো প্রাণীর সমপর্যায়ে যেতে পারতো– যেমন করে বিড়াল বাড়তে বাড়তে বাঘের আকৃতি ধারণ করতো, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা নিজেই এদেরকে বিশেষ এক সীমার মধ্যে রাখার ব্যবস্থা করেছেন। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা চান চিন্তাশীল ব্যক্তিরা তার ক্ষমতা ও শক্তি বুঝতে সক্ষম হোক, তারা আল্লাহ রব্বুল আলামীনের সীমাহীন ক্ষমতা বুঝার জন্যে এসব জিনিসের প্রতি খেয়াল করুক।

জীব জন্তুর বাইরে প্রাকৃতিক জিনিসের এসব গঠন প্রক্রিয়ার মধ্যে দৃশ্যত যেসব পার্থক্য দেখা যায় এবং এসবের বাইরে সকল কিছুর মধ্যে আভ্যন্তরীণ মেযাজ ও রুচিগত যেসব বিস্ময়কর পার্থক্য রয়েছে সে বিষয়ে খুব কম জীব বিজ্ঞানীই এ পর্যন্ত মাথা ঘামাতে সক্ষম হয়েছেন। তারা প্রধানত জীব জগতের বাইরে উদ্ভিদ জগতের মধ্যেই তাঁদের পদচারণা সীমাবদ্ধ রেখেছেন। তাঁদের জ্ঞান গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে উদ্ভিদ জগত কিভাবে অস্তিত্বে এলো এবং কিভাবে এর অস্তিত্ব টিকে থাকতে পারে সে বিষয়ে জ্ঞান গবেষণা জারি রাখা .....।

মানব বিজ্ঞানীদের কাছে এমনি করে দিনে দিনে সৃষ্টি রহস্যের অত্যাশ্চর্য অনেক জট খুলতে শুরু করেছে। আজ তারা অনেকেই বুঝতে পারছে যে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের ইচ্ছা ও সিদ্ধান্ত সকল সৃষ্টির পেছনে নিশিদিন কাজ করে যাচ্ছে; তারা বুঝতে পারছে বিশ্ব-প্রকৃতির সব কিছুর মাঝে বয়ে যাচ্ছে, প্রচন্ড ও অপ্রতিরোধ্য এক মহাশক্তি, তিনিই সব কিছুর ব্যবস্থাপক ও পরিচালক, যাঁর মহাশক্তিমান হাত অদৃশ্যভাবে সকল কিছুকে নিয়ন্ত্রণ করছে– এই প্রভাব বলয় থেকে দূরে

সরে যাওয়া কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। এসব রহস্য নিয়ে যখন চিন্তা করা হয় তখনই সত্য মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়কারী ফোরকান নামটির তাৎপর্য বুঝতে সহজ হয়, যা তিনি তাঁর বান্দার ওপর নাযিল করেছেন,

'তিনি সৃষ্টি করেছেন সব কিছুকে, তারপর সব কিছুর তাকদীর বা পরিসমাপ্তির অবস্থাও বাতলে দিয়েছেন।'

এর সাথে আরো যে কথাটা স্পষ্ট হয়ে উঠছে তা হচ্ছে যে সে মোশরেকরা সৃষ্টি রহস্যের এসব সূক্ষ্ম কথা বুঝতে মোটেই সক্ষম নয়, যার জন্যে তারা রহস্য সাগরে হাবুডুবু খেয়ে বেড়াচ্ছে।

আল্লাহর নিরংকুশ সার্বভৌমত্ব

এরশাদ হচ্ছে, 'তারা তাঁকে বাদ দিয়ে বহু সত্ত্বাকে পূজনীয় বা আনুগত্য দানের যোগ্য এবং ক্ষমতাধর বলে গ্রহণ করেছে। তারা কোনো কিছু সৃষ্টি করে না, বরং তারাই সৃষ্ট হয়েছে, তারা নিজেদেরও কোনো ক্ষতি বা উপকার করতে পারে না, আর মৃত্যু, জীবন দান এবং পুনরায় জীবিত করে তোলার ব্যাপারেও তাদের কোনো হাত নেই।'

এভাবে 'উলুহিয়্যাৎ' বা পূজা উপাসনা এবং নিরংকুশ আনুগত্যের দাবীদার হওয়ার জন্যে যেসব যোগ্যতা ও গুণ বৈশিষ্ট্যের প্রয়োজন তার কোনোটাই তাদের মধ্যে নেই। এজন্যে স্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়েছে, তারা কোনো কিছু সৃষ্টি করতে পরে না।' আল্লাহ তায়ালাই সব কিছু সৃষ্টি করেছেন। 'বরং তারাই সৃষ্ট জীব' .... তাদের এই কাল্পনিক মাবুদদের অন্ধ অনুসারী (গোলাম) যারা, তারাই ওদেরকে সৃষ্টি(?) করেছে, না, বরং ওরা খড়-কুটো বা ইট পাথর দিয়ে তাদেরকে বানিয়েছে– পুতুল বা মূর্তি বানালে ইট পাথর বা খড় কুটো দিয়ে বানিয়েছে, কিন্তু তাদেরকে তো আল্লাহ তায়ালা 'না' থেকে 'হাঁ'-তে এনেছেন, মাটির দেহে রূহ প্রবেশ করে দিয়ে অস্তিত্বহীনতা থেকে অস্তিত্ব দান করেছেন। মানুষ, জ্বিন, গাছপালা, পাথর বা ফেরেশতাদেরকে যখন তারা পূজা অর্চনা করতে শুরু করেছে, যখন মানবরচিত আইনের আনুগত্য মেনে নিয়েছে তখন তাদের সম্পর্কে বলা হচ্ছে,এই দেবদেবী কিংবা আইন প্রণেতারা যখন নিজেদের ওপরেই কোনো কর্তৃত্বের অধিকারী নয়, তারা যখন নিজেদের কোনো ক্ষতি বা উপকার করতে পারে না, তখন স্বেচ্ছায় যারা নিজেদেরকে ওদের গোলাম বানিয়ে নিয়েছে তারা তাদের অপকার বা উপকার করবে কেমন করে? আর যে ব্যক্তি নিজেই উপকার করার ক্ষমতা রাখে না, তার ক্ষতি করা অতি সহজ কাজ, যেহেতু তারা অপরের আক্রমণ থেকে নিজেকে বাঁচাতে সক্ষম নয়– বাঁচাতে পারলে তো সে নিজের উপকার করতেই পারতো! এজন্যে ব্যাখ্যাতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সব থেকে সহজ কাজ হচ্ছে আত্মপক্ষ সমর্থন করা বা নিজের উপকার করা। এ কাজটাই যে করতে পারে না, সে অপরের উপকার করবে কি ভাবে? এরপর সেই সব গুণ বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হচ্ছে যেগুলো আল্লাহ ছাড়া কোনো সৃষ্ট জীবের মধ্যে থাকতে পারে না। এরশাদ হচ্ছে,

'তারা মৃত্যু, জীবন বা রোয হাশরের দিন জীবিত করে তোলার ব্যাপারেও কোনো কর্তৃত্ব রাখে না।'

এর অর্থ হচ্ছে, কোনো জীবিতকে মারার ক্ষমতা তাদের নেই, নেই তাদের কোনোই ক্ষমতা কোনো মরাকে বাঁচানোর। জীবিতদেরকে প্রতিপালনের ক্ষমতাও তাদের নেই, এর পর উলূহিয়্যাত বা পূজা আনুগত্য পাওয়ার কোনো যোগ্যতা তাদের থাকবে কিভাবে? নিজেকে সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক বলারই বা থাকলো কোনো যুক্তি? সুতরাং আইন রচনা করার অধিকার কিংবা আল্লাহর অন্য যে কোনো ক্ষমতা কোনো ব্যক্তি, বস্তু বা গোষ্ঠীর হাতে তুলে দিলে এটা যে প্রচ্ছন্ন শেরেক এবং এটা কেউ করলে সে সাথে সাথে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে। এটা সন্দেহাতিতভাবে সত্য। এতে সন্দেহের কি আছে?

আসলে এটা হচ্ছে নিছক হিংসার কারণেই মুখ ফিরিয়ে নেয়া। এসব কিছুর পেছনে কারণ এটা নয়, যে তারা বুঝে না, তারা সব কিছুই বুঝে তবুও নিজেদের প্রাধান্যকে টিকিয়ে রাখার জন্যে সম্পূর্ণ ইচ্ছাকৃতভাবেই আল্লাহর হুকুম থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। এরপর রসূল থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া এবং রসূলের ওপর নানাপ্রকার দোষারোপ করা কি অধিক বিচিত্র কিছু হতে পারে! ওরা আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে যেসব কঠিন কথা বলে তা আরো মারাত্মক, আরো কঠিন। রসূলের ওপর দোষারোপ করা থেকেও আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে অসম্মানজনক উক্তি আরো বহু বহু গুণে কঠিন অপরাধ। ছিঃ, আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে নানা প্রকার ভুল কথা বলার দরুণ কী জঘন্য অপরাধে লিপ্ত রয়েছে ওরা অথচ একবারও তারা ভাবে না যে তিনিই তো তাদের এবং অন্যান্য সবারও সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা, তিনিই সব কিছুর পরিচালক ও সবার পরিণতি নির্ধারণকারী। এর থেকে মানুষের নিকৃষ্ট কাজ আর কি হতে পারে যে তারা আল্লাহর ক্ষমতাকে অন্যের হাতে তুলে দিতে চায়, অধিকার অন্যকে দিয়ে দেয়, আল্লাহর সাথে শেরেক করে। রসূলুল্লাহ (স.)-কে একবার জিজ্ঞাসা করা হয়েছিলো, কোন গুনাহ সব থেকে বড়ো? তিনি বলেছিলেন, 'তাঁর সাথে অন্য কাউকে শরীক মনে করা, অথচ তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন।(১)

আল কোরআন ও মোহাম্মদ সম্পর্কে কাফেরদের মিথ্যাচার

সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ রব্বুল আলামীনের মহান মর্যাদা সম্পর্কে এই দীর্ঘ আলোচনা পর আমাদের প্রাণ প্রিয় নবী মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (স.)-এর স্থান সারা বিশ্বের মধ্যে কত মহীয়ান সে বিষয়ে আমরা কিছু আলোচনা করতে চাই, বলিষ্ঠ কণ্ঠে আমরা পৃথিবীবাসীকে জানিয়ে দিতে চাই যে, যেসব নির্বোধ বেওকুফ তাঁর সততা সত্যবাদিতা, জ্ঞান প্রজ্ঞা ও অন্যান্য সকল গুণাবলীর ওপর কটাক্ষপাত করার দুঃসাহস করেছে তারা সবাই কালের গহীন গহবরে চিরদিনের মতো ডুবে গেছে এবং ভবিষ্যতেও যারা তাঁর প্রতি কোনো তির্যক ইংগিত করবে তারাও একইভাবে মহাকালের অতলান্ত সাগরে ডুবে যাবে। তাই সে নির্বোধদের কথার উদ্ধৃতি দিতে গিয়ে এরশাদ হচ্ছে,

'কাফেররা বললো, নিশ্চয়ই এটা এক মনগড়া মিথ্যা কথা ......বলো, এ পাক কালাম পাঠিয়েছেন সেই মহান সত্ত্বা যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সকল গোপন তথ্য জানেন। নিশ্চয়ই তিনি মাফ করনেওয়ালা মেহেরবান।' (আয়াত ৪-৬)

কোরায়শদের মধ্যে যারা কাফের ছিলো তাদের বক্তব্যের মধ্যে সব থেকে কঠিন যে মিথ্যাটা তা ছিলো ওপরে বর্ণিত তাদের এই কথাটি, অথচ তারা গভীরভাবে এটা বিশ্বাস করতো যে তাদের একথাটা এক নির্জলা মিথ্যা, যার কোনোই ভিত্তি নেই, এতদসত্তেও কেমন করে তাদের সেসব মুরুব্বীদের সামনে সে বেওকুফদের কথার অসারতা বুঝে আসলো না, যারা নিজেরাই স্বীকারোক্তি দিয়েছে যে, মোহাম্মদ (স.)-এর ওপর যে বাণী নাযিল হয়েছে তা অবশ্যই কোনো মানুষের পক্ষে বানিয়ে আনা সম্ভব নয়– একথাটা তারা, এ মহাবানীর শব্দ শৈলী থেকে গভীরভাবে অনুভব করতো এবং তারা আল কোরআনের প্রবল আকর্ষণ থেকে নিজেদেরকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারছিলো না। তাছাড়া নবুওত লাভ করার পূর্বে মোহাম্মদ (স.) যে কতো বড়ো সত্যবাদী ছিলেন তা তারা জানতো এমনকি এভাবে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতো যে তিনি কখনো মিথ্যা কথা বলেন না এবং কখনো কোনো আমানতের খেয়ানত করেন না। সুতরাং এমন সত্যবাদী মানুষ আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে কেমন করে মিথ্যা বানিয়ে বানিয়ে বলবেন এবং আল্লাহর দিকে তিনি কেমন করে এমন কথার বরাত দেবেন যা বাস্তবে তিনি বললেননি।

---

(১) এ হাদীসটি বোখারী থেকে সংগৃহীত

কিন্তু কাফের মোশরেকদের ধর্মীয় মহলে রসূলুল্লাহ সম্পর্কে যে ঘৃণা বিদ্বেষ বিরাজ করছিলো এবং তাঁর আনীত ব্যবস্থার মূলোৎপাটনের জন্যে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে যেসব পরিকল্পনা তাদের মধ্যে গৃহীত হয়েছিলো তার পেছনে এই ভয় কাজ করছিলো যে, তাদের অলীক ও মিথ্যা ধোঁকাবাজির ব্যবস্থা হয়তো আর বেশীদিন টিকবে না। শনৈ শনৈ মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া এবং ইসলামের যুক্তিপূর্ণ আবেদন তাদেরকে অস্থির করে ফেলছিলো, তারা তাদের মিথ্যাচারের ও স্বার্থান্ধতার মৃত্যু ঘন্টা যেন প্রতি মুহূর্তেই শুনতে পাচ্ছিলো– ইসলাম সম্পর্কে এক ভয়-ভীতি সারা আরবের বুকে ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছিলো, সাধারণ লোকের অবস্থা ছিলো এই যে, তারা আল্লাহর কালাম ও মানুষের কথার মধ্যে পার্থক্য করতে পারতো না বা আল্লাহর কালামের মর্যাদাও তারা বুঝতো না। এজন্যে তাদের কথা উদ্ধৃত করতে গিয়ে বলা হচ্ছে,

'এতো হচ্ছে এক ডাহা মিথ্যা, যা সে বানিয়ে বলছে এবং তাকে অন্য কোনো এক দল, (লোক কাজে) সাহায্য করছে।'

কথিত আছে, তারা বলতো তিন জন বা ততোধিক আজমী (অনারব) ব্যক্তি এসব কথা তৈরী করার ব্যাপারে তাকে সাহায্য করে, অথচ এ ছিলো এমন এক বাজে কথা যা কোনো যুক্তির ধোঁপে টেকে না, কেননা প্রথম কথা হচ্ছে তারা আজমী ব্যক্তিদেরকে সাহায্যকারী বানাচ্ছে, অথচ আরবী সাহিত্য ভান্ডারে তারা নিজেরা এতো বড়ো বড়ো পারদর্শী কবি বর্তমান থাকা সত্ত্বেও আল কোরআনের মতো এমন একটি লাইনও তৈরী করতে পারেনি।

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, আল কোরআনের এসব জ্ঞান গর্ভ কথা রচনায় সে আজমী ব্যক্তি যদি সাহায্য করবে, তাহলে তারা নিজেরাই কেন এর রচয়িতা হিসাবে দাবী করে না? কেনই বা তাদেরকে যখন চ্যালেঞ্জ হলো তখন তারা একটি লাইনও তৈরী করে আনতে পারলো না?

এই কারণেই আল কোরআন তাদের সে সব বাজে কথার কোনো জওয়াব দিচ্ছে না, বরং তাদের মধ্যে যে অসততা ও অন্যায় পথে যুক্তিহীনভাবে জিদ বিরাজ করছে– সেই কথাগুলোকে তুলে ধরতে গিয়ে আল কোরআন বলছে,

'অবশ্যই তারা চরম যুক্তিহীন ও মিথ্যা তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে।' .....

তাদের যুলম ও যুক্তিহীন ব্যবহার ছিলো সত্যের বিরুদ্ধে, মোহাম্মদ (স.)-এর বিরুদ্ধে এবং স্বয়ং আল্লাহর বিরুদ্ধে। তাদের মিথ্যাচার ছিলো সুস্পষ্ট, প্রকাশ্যভাবে তারা অসত্য ও অন্যায়ের ওপর তাদের তৎপরতা চালাচ্ছিলো। এরপর তারা রসূলুল্লাহ (স.) ও আল কোরআন সম্পর্কে নানা প্রকার মিথ্যা ও অসদুদ্দেশ্য প্রণোদিত কথার জাল বুনেছিলো। দেখুন তাদের কথার উদ্ধৃতাংশ।

'ওরা বললো, এতো পুরাকালের অলীক কাহিনী, যা সে (কারো দ্বারা) লিখিয়ে নিয়েছে, আর সেই কথাগুলোকেই তার সামনে সকাল সন্ধা পড়ে পড়ে শোনানো হয়।'

এসব কথা তখনই তারা বলতো যখন তাদের উপদেশের জন্যে তাদের সামনে অতীতের বহু ঘটনাবলীকে, উদাহরণ স্বরূপ তুলে ধরা হতো।

মক্কাবাসী হঠকারী সে জনতার জন্যে উপদেশ ও তাদের প্রশিক্ষণের জন্যে অতীত ইতিহাসের এই সব ঘটনাবলী তাদের সামনে তুলে ধরা হয়েছে, যাতে তারা এগুলোর দিকে অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে তাকায় এবং চিন্তা করতে পারে। এসব কোনো অলীক কাহিনী নয়, বরং এগুলো ছিলো সব সত্য ঘটনা, পূর্ববর্তীদের (ঐতিহাসিক) কাহিনী। তারা ধারণা করতো ও প্রচার করতো যে রসূলুল্লাহ (স.) কাউকে এগুলো লিখে দেয়ার জন্যে আহ্বান জানিয়েছিলেন, যাতে সকাল সন্ধা তাঁর সামনে এগুলো পড়ে শোনানো হয়– যেহেতু তিনি ছিলেন নিরক্ষর, পড়তে লিখতে জানতেন না-এজন্যে ওরা বলতো

'তার কাছে পড়ে শোনানো হয় আর সে কিনা বলে, একথাগুলো আল্লাহর কাছ থেকে এসেছে।'

তাই আলোচ্য আয়াতে তাদের কথাগুলোকে রদ করতে গিয়ে বলা হচ্ছে, তাদের এসব দাবীর পেছনে কোনো যুক্তিই নেই। আলোচনা করলে তাদের কোনো কথাই প্রমাণিত হবে না। আল কোরআন এ প্রসংগের আলোচনায় এমন শব্দাবলী ব্যবহার করেছে এবং এ হঠকারী জাতির যুক্তিহীন কথাকে রদ করার জন্যে অতীতের ঘটনাবলীকে এমনভাবে তুলে ধরেছে যে, যে কোনো পাঠক এসব বর্ণনা থেকে সে পাপাচারী জাতির সত্যবিরোধিতা আঁচ করতে পারে, বুঝতে পারে যে ঐতিহাসিক সেসব কাহিনীর মধ্যে বর্ণিত শাস্তি যে সব অপরাধের কারণে এসেছিলো– এ জাতিও সেই একই অপরাধে অপরাধী হওয়ায় যে কোনো মুহূর্তে তাদের ওপর সে একই শাস্তি নেমে আসতে পারতো, যেহেতু শাস্তি নাযিলের জন্যে যেসব কারণ প্রয়োজন তা অতীতের জাতিদের মধ্যে এবং এই কোরায়শ জাতির মধ্যে একইভাবে বিরাজ করছিলো। অতীতের ঘটনাবলী যে বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে পেশ করা হচ্ছে তা হলো এই যে, মানুষ যেন সকল ঘটনাবলীকে সামনে নিয়ে চিন্তা করে এবং সঠিক শিক্ষা গ্রহণ করে, কিন্তু হঠকারী ও সত্য বিরোধীরা মনে করে আল কোরআনে উল্লেখিত কথাগুলো কল্প-কাহিনী মাত্র, এগুলো সুখ পাঠ্য হিসাবে পড়ার জন্যে অথবা এসব কাহিনী পড়ে সময় কাটানোর জন্যে এসেছে।

সে যালেম জাতির কথাগুলো ছিলো চরম নির্বুদ্ধিতাপূর্ণ ও যুক্তিহীন।

'এগুলো সব অতীতের অলীক কাহিনী'

তাদের একথাগুলো বলার মূল উদ্দেশ্য এটা প্রমাণ করা যে, মোহাম্মাদ একজন মিথ্যাবাদী। সে নিজে রচনা করে কথা বলছে, অথবা কিছু লোক যুগের পর যুগ ধরে চলে আসা এসব ঐতিহাসিক কাহিনী বলে তাকে এসব কথা রচনা করতে সাহায্য করে, আর সকাল সন্ধা বারবার তাকে কথাগুলো এতো বেশী পড়ে পড়ে শোনায় যে সে সুমধুরভাবে সে কথাগুলো উচ্চারণ করতে পারে– ইসলামের দুশমন সে চরম মূর্খরা আল্লাহর রসূল (স.) কে দোষ দিতে গিয়ে এটা হিসাব করলো না যে, যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ মোহাম্মদ (স.)-কে শেখাবে তাকে অবশ্যই জ্ঞান-বুদ্ধি প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার দিকে দিয়ে তাঁর [মোহাম্মাদ (স.) এর] থেকে বেশী হতে হবে, তাকে অবশ্যই হতে হবে গোপন রহস্যরাজি সম্পর্কে অধিক ওয়াকেফহাল, কিন্তু কে আছে এমন যে মোহাম্মদ (স.)-এর থেকে বেশী জ্ঞানী গুণী ও প্রজ্ঞাবান? তাদের বুঝা উচিত যে, এ পাক কালাম শিখিয়েছেন তিনি যিনি সকলের থেকে বেশী জ্ঞানী, সকল রহস্য সম্পর্কে ওয়াকেফহাল, যাঁর কাছে অতীত ও ভবিষ্যতের কোনো কিছুই গোপন নেই। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'বলো, তাঁর কাছে (এ বাণী) পাঠিয়েছেন তিনি, যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সকল রহস্য জানেন।' ......

এবারে, ওহে হঠকারী মূর্খের দল বলো, কোথায় এবং কে আছে এমন যে প্রাচীনকালের কাহিনীসমূহ জানে এবং এভাবে বর্ণনা করতে পারে? কোথায় আছে লিপিবদ্ধ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর গোপন রহস্য? আর কোথায় আছে সেই সূক্ষ্ম বিন্দুটি মহা বিশ্বের বুকে কুল কিনারাহীন ও অবিরত ঘূর্ণায়মান, যাকে আমরা পৃথিবী বলে জানি?

শোনো, রসূলুল্লাহ (স.) সম্পর্কে এসব বাজে কথা বলে ওরা খুবই বড়ো গুণাহ করছে। এসব কথা বলার সময় আর যে মহা অপরাধটি তারা করছে তা হচ্ছে তারা আল্লাহর সাথে শেরকের কাজ করার ব্যাপারে অনড় হয়ে রয়েছে, এতদসত্তেও তাওবার দরজা এখনও তাদের জন্যে খোলা এবং এসব বড়ো বড়ো গুনাহ থেকে এখনও তাদের ফিরে আসা সম্ভব। আর মহান আল্লাহ তায়ালাই একমাত্র সেই সত্ত্বা যিনি জানেন আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর রহস্য রাজিকে, আর তিনিই

জানেন সে মিথ্যা সম্পর্কে যা ওরা নিজেদের মন থেকে তৈরী করে বলছে এবং জানেন তাদের সকল চক্রান্ত সম্পর্কে। তিনি মাফ করনেওয়ালা-তিনিই মেহেরবাণ! তাই এরশাদ হচ্ছে,

'তিনিই মাফ করনেওয়ালা মেহেরবান।'

মানুষকে রসূল করে পাঠানোর রহস্য

রসূলুল্লাহ (স.) সম্পর্কে ওরা যা কিছু মনগড়া মিথ্যা ও বানাওটি কথা বলছে, তাঁর মানুষ হওয়া সম্পর্কেও যে সব জাহেলী কথাবার্তা বলছে এবং তাঁর রেসালাত সম্পর্কে তারা যেসব মিথ্যা আরোপ করছে সেসব কিছু রদ করতে গিয়ে আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাদের কথাগুলোর উদ্ধৃতি পেশ করছেন।

'ওরা বললো, এ আবার কেমন রসূল! খানা-দানা খায়, বাজার-ঘাটে বেড়ায় ......

আল্লাহ তায়ালা রসূলই যদি বানাতে চেয়েছিলেন তো এমন এতিম অনাথ ব্যক্তিকে কেন বানাবেন? তিনি কি রসূল বানানোর জন্যে আর মানুষ পাননি? তিনি চাইলে তো তোমাকে, যে অবস্থায় তুমি আছো, এর থেকে ভালো অবস্থা দান করতে পারতেন, দিতে পারতেন এমন জান্নাত, যার নীচু দিয়ে ছোট ছোট নদী প্রবাহিত হয়, আর তোমার জন্যে বড়ো বড়ো বালাখানা বানিয়ে দিতেন।

অর্থাৎ, কি হলো এ রসূলের, খানা-দানা খায়, বাজার ঘাটে চলে ফিরে বেড়ায়? তার কি এমন কেউ নেই যে তার মানবীয় প্রয়োজনগুলো মেটাতে পারে? এই হচ্ছে সেই প্রশ্ন যা সকল যামানার মানুষ নিজ নিজ এলাকার রসূলদেরকে জিজ্ঞাসা করেছে। অমুকের বেটা অমুক যাকে তারা চেনে, সে আবার রসূল হয় কেমন করে? যে লোক তদের জীবনের সাথে বেশ জড়িত, যে তাদেরই মতো খায় দায় এবং তাদেরই মতো জীবন যাপন করে .....সে কেমন করে আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন রসূল নিযুক্ত হবে যার কাছে ওহী নাযিল হয়? কেমন করে এজগতের বাইরের আর এক জগতের সাথে তার সম্পর্ক স্থাপিত হবে? অথচ তাকে তারা তাদেরই মতো একজন রক্ত মাংসের মানুষ বলে জানে! তাদের কাছে ওহী না আসলে, ওর কাছে ওহী আসে কেমন করে, যে জগত থেকে ওহী আসছে বলে সে দাবী করে, সে জগত সম্পর্কে তারা তো কেউ কোনো খবর রাখে না, তাদের থেকে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত এমন কিছু তো সে নয়! এহেন বিভিন্ন প্রশ্ন সকল যামানার মানুষই রসূলদের সম্পর্কে বরাবর করেছে!

এমনই সব আজব আজব ও অস্বাভাবিক প্রশ্ন সকল যামানার রসূলদের প্রতি করা হয়েছে, তাদের কাছে স্বভাবতই আর একটা কথাও গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি..... হাঁ আল্লাহ তায়ালা এই মাটির মানুষের মধ্যেই তো এক সময় রূহ ফুঁকে দিয়েছিলেন! মাটির ধড়ে সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রেরিত রূহ প্রবেশ করাতেই তো এই জড় পদার্থ এমন সচল ও জ্ঞানী-গুণী হয়ে গিয়েছিলো এবং পৃথিবীর বুকে আল্লাহর খলীফা নিযুক্ত হয়েছিলো! এই মানুষ, সে হতে পারে খুবই অল্প জ্ঞানের অধিকারী, সীমিত অভিজ্ঞতা সম্পন্ন, দুর্বল উপায় উপকরণের মালিক- এমতাবস্থায় আল্লাহ তায়ালা তাঁর সাহায্য ছাড়া তাকে তো অসহায় অবস্থায় ছেড়ে দেননি, তাকে সেই সুস্পষ্ট সমুজ্জ্বল হেদায়াতের আলো থেকে বঞ্চিত মানুষ হিসেবে ছেড়ে দেননি, যা তাকে পৃথিবীর ঘনান্ধকারের মধ্যে তাকে পথ দেখাতে পারে! অবশ্যই আল্লাহ সোবহানাহু তায়ালা তাকে তাঁর মহান সত্ত্বার সাথে মিলিত হওয়ার এবং সম্পর্কিত হওয়ার যোগ্যতা দান করেছেন, আর সে যোগ্যতা এসেছে তার মধ্যে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে এক অকল্পনীয় শক্তি সম্পন্ন রূহের আগমনে। যা তাকে অন্যান্য সকল প্রাণী থেকে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত ও পৃথক করেছে। সুতরাং তাদের মধ্যে কাউকে যদি তিনি তাঁর রসূলরূপে বাছাই করে নিয়ে থাকেন তাতে আশ্চর্য হওয়ার কী আছে! সে তো সে শক্তি সম্পন্ন রূহের অধিকারী। যখনই তিনি চেয়েছেন, তখনই তাদের মধ্যে কাউকে তিনি তাঁর ওহীর

ধারক বাহক বানিয়ে নিয়েছেন আর যখনই তাদের জীবন পথ জটিলতা ও ব্যথা বেদনায় ভরে গেছে এবং তারা সাহায্যের জন্যে আবেদন জানিয়েছে, তখনই তিনি তাদেরকে সাহায্য করেছেন।

আল্লাহ তাবারকা ওয়া তায়ালা মানুষকে যে মর্যাদার আসনে বসিয়েছেন তার কিছু অংশ এই নবুওত রূপে চমৎকার পদ্ধতিতে প্রকাশ পায়। সমগ্র মানবমন্ডলীর মধ্য থেকে কারো কারো প্রকৃতির মধ্যে এই মর্যাদা লাভের যোগ্যতা দান করা হয়েছে, কিন্তু বহু মানুষ তাদেরকে দেয়া এই সম্মানের মর্যাদা বুঝে না, উপলব্ধি করতে পারে না তাদেরকে প্রদত্ত ও মান-সম্ভ্রমের গুরুত্ব ও তাৎপর্য কি! এজন্যেই ওহী নাযিলের মাধ্যমে যাদেরকে সম্মানিত করা হয়েছে তাদেরকে, যাদের মান-মর্যাদাকে তারা অস্বীকার করে, তারা কিছুতেই স্বীকার করতে চায় না যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের মধ্যে কেউ একজন রসূল হয়ে আসতে পারে। তারা মনে করে, মানুষ রসূল হওয়া থেকে ফেরেশতাদের রসূল হওয়া বেশী ভাল এবং অধিক গ্রহণযোগ্য। তাই এ বিষয়ে তাদের কথার উদ্ধৃতি দিতে গিয়ে বলা হচ্ছে,

'তার কাছে কোনো ফেরেশতা কেন নাযিল হয় না, যে তার সাথে একজন (সহকারী নবী) বা সতর্ককারী হিসেবে যোগ দিতো।'

অথচ, তাদের একথা হিসাব করা উচিত ছিলো যে আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতা দ্বারা মানুষকেই তো সেজদা করিয়েছেন, এর কারণ আল্লাহ জাল্লা শানুহু মাটির পুতুলের মধ্যে মহান রূহ ফুঁকে দিয়ে তাকে মর্যাদাবান বানিয়েছেন এবং তারপর ভালো মন্দের জ্ঞান দান করে তাকে বানিয়েছেন আরো বেশী বৈশিষ্ট্যমন্ডিত, আর এর ফলে তার স্থান সৃষ্টির সকল কিছুর ওপর নিরূপিত হয়েছে। এটা আল্লাহ রব্বুল আলামীনের হেকমতের বিশেষ নিদর্শন যে তিনি বিশ্ব মানবতার দরবারে একই রেসালাতের পয়গামকে কালান্তরে অনেক অনেক মানুষের মাধ্যমে পাঠিয়েছেন। মানুষের মধ্যে রেসালাতপ্রাপ্ত এক মানুষ বাকি মানুষের অনুভূতির প্রতিনিধিত্ব করে, বুঝে যে এসব অনুভূতির উৎসগুলো কি কি তাদের অভিজ্ঞতাসমূহের প্রতিনিধি হিসাবে সে মানুষকে সাহায্য করে, তাদের ব্যথা-বেদনা ও আশা-আকাংখাকে সে বুঝতে পারে, সে জানতে পারে তাদের মনের কষ্ট কি এবং কি তাদের মনের চাহিদা, সে জানে তাদের প্রয়োজনসমূহ ও জীবনের বোঝাগুলো কি......... আর এই কারণেই তাদের দুর্বলতা ও ক্ষতিগুলো যখন সে দেখে তখন দয়া সহানুভূতিতে তার মন ভরে যায়, কাজেই তখন তাদের সেসব পুঞ্জীভূত দুঃখ-বেদনা নিরসনে তৎপর হয়ে ওঠে এবং এজন্যে তাদের সমস্ত শক্তি ও বড়ত্বকে উপেক্ষা করে আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত বলে বলীয়ান হয়ে কাজ করে, আর এই জন্যে পা পা করে সাফল্য ও বিজয়ের পথে সে এগিয়ে যায়। সে বুঝতে পারে মানুষের উৎসাহ উদ্দীপনা কোথায়, তাদের মনের প্রতিক্রিয়া ও তাদের গ্রহণ যোগ্যতা সম্পর্কেও জানতে পারে, একথা অবশ্য সত্য যে, সে তো তাদেরই একজন, তাদেরকে নিয়ে সে আল্লাহর পথেই চলতে চায়, তাঁর কাছে ওহী আসে আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং জীবনের কন্টকাকীর্ণ পথ পরিক্রমায় সে আল্লাহর সাহায্য লাভ করে!

দুনিয়ার মানুষ এই প্রেরিত পুরুষ- আল্লাহর রসূলের মধ্যে অনুকরণীয় এক চমকপ্রদ আদর্শ দেখতে পায়, কারণ তারা তাঁকে তাদেরই একজন হিসেবে দেখতে পায়। তিনি যদি শত দুঃখ জ্বালা সয়েও এই সত্য সুন্দর পথে চলতে পারেন তাহলে তারা কেন এ দুর্গম পথে পাড়ি জমাতে পারবে না? এজন্যে মানুষ ধীরে ধীরে হলেও আদর্শ মানুষটির অনুকরণ ও অনুসরণের মাধ্যমে অবশেষে এই উত্তম আদর্শকে গ্রহণ করে, এর ফলে এই উত্তম মানুষটি আজও অসংখ্য নিগৃহীত নিপীড়িত মানুষের অন্তরের মাঝে বেঁচে আছে এবং বেঁচে থাকবে আবহমানকাল ধরে, বেঁচে থাকবে তাদের মধ্যে তার নৈতিক চরিত্র, সুমধুর ব্যবহার, উত্তম কার্যাবলী এবং যেসব দায়িত্ব আল্লাহ তায়ালা তাকে দিয়েছেন ও চেয়েছেন যে তাঁর পয়গাম্বর নিজে সেগুলো যথাযথভাবে এগুলো

পালনের মাধ্যমে অনুশীলন করে দেখাক। প্রকৃতপক্ষে এভাবে আল্লাহর রসূল তাঁর আনীত আকীদা বিশ্বাসকে তাঁর নিজের জীবনের মাধ্যমে বাস্তব রূপে ফুটিয়ে তুলেছেন, তাঁর জীবন, তাঁর ব্যবহার এবং তাঁর কর্মসমূহকে এক উন্মুক্ত গ্রন্থরূপে তিনি বিশ্ববাসীর সামনে রেখে গেছেন, যার জীবন গ্রন্থের প্রতিটি লাইন মানুষরা স্থান থেকে স্থানান্তরে নিয়ে গেছে এবং কার্যত পৃথিবীর বহু স্থানে বাস্তবায়িত করে চলেছে। মানুষ রসূলুল্লাহ (স.)-কে তাঁর শিক্ষা ও কাজের মাধ্যমে আজও জীবন্ত দেখতে পাচ্ছে, যার কারণে তাঁর অনুকরণ ও অনুসরণ করাটা তেমন কোনো দুরূহ ব্যাপার বলে মনে হয় না, কারণ এই উন্নত আদর্শ তো পৃথিবীতে শুধু কথা আকারে নেই, আছে এ আদর্শ বাস্তবায়নের সোনালী নযির। কিন্তু আজ আমরা সেই আদর্শের বাস্তব রূপ কোথাও ফুটিয়ে তুলতে না পারায় অনেকাংশে হতাশ হয়ে পড়েছি। আজ যদি সেই সুমহান আদর্শ তার সম্মোহনী রূপ নিয়ে জেগে উঠতো, যদি পৃথিবীর কোনো প্রান্তরে কোনো একটু ভূখন্ডেও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ইসলাম পরিপূর্ণভাবে জীবনের সকল দিক ও বিভাগে কায়েম হয়ে যেতো, যদি কাজে, কথায় চিন্তায় ও ব্যবহারে মানুষ ইসলামের পুরোপুরি অনুসারী হয়ে যেতো তাহলে মানুষ তা দেখে 'এ শারাবান তহুরা' আকণ্ঠ পান করার জন্যে দলে দলে ঝাঁপিয়ে পড়তো। আর আল্লাহর নবী মানুষ না হয়ে যদি ফেরেশতা হতেন তাহলে তাঁর কাজ সম্পর্কে তারা কোনো চিন্তাই করতো না, আর তাকে অনুসরণ করারও কোনো চেষ্টা করতো না, কারণ শুরুতেই তারা বুঝতো যে ওদের প্রকৃতি থেকে তার প্রকৃতি ভিন্ন, অতএব তাঁর ব্যবহার অবশ্য অবশ্যই তাদের ব্যবহার থেকে ভিন্ন হবে, কাজেই তাঁর বিরুদ্ধে কোনো প্রকার ষড়যন্ত্রের প্রশ্নই আসে না– তার জন্যে কারো কোনো উপায় বের করারও প্রয়োজন নেই।

এটাই আল্লাহর কর্মকৌশলের এক বিশেষ রহস্য যে, তিনি সব কিছুকে সৃষ্টি করে তাদের প্রত্যেকের কাজ কি হবে তা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তাঁর তাৎপর্যবহ কাজগুলোর মধ্যে এটা এক বিশেষ জ্ঞানপূর্ণ কাজ যে তিনি তাঁর বার্তা মানুষ পর্যন্ত পৌঁছে দেয়ার জন্যে মানুষ-দূতকেই নিয়োগ দিয়েছেন, যাতে এই মানুষের নেতৃত্বেই আল্লাহর বিধানকে মানুষ বাস্তব জীবনে কার্যকর করতে পারে। যারা মানুষকে রসূল বানানোর ওপর প্রশ্ন তোলে, তারা খুব যে একটা চিন্তা ভাবনা করে কথা বলে, তা নয়। এর প্রথম কারণ হচ্ছে মানুষকে কতোটা সম্মান দেয়া হয়েছে তা ওরা বুঝে না। দ্বিতীয় কারণ, আল্লাহর হুকুম মানুষ কিভাবে পালন করবে তা একজন মানুষই আরেকজন মানুষকে দেখাতে পারে।

রসূলদের ব্যাপারে কাফেরদের অবাস্তর মন্তব্য

ওদের নির্বুদ্ধিতার আর এক নযির হচ্ছে, তারা যেসব প্রশ্ন করতো সেগুলোর মধ্যে একথাও ছিলো,

'এ আবার কেমন রসূল, সে হাটে বাজারে রুজি রোজগারের জন্যে যাতায়াত করে!'

রসূল ও আল্লাহর খাস ব্যক্তি এবং তাঁর নিজস্ব দূত, কাজেই কেন তিনি তার রুজি রোজগারের ব্যবস্থা করে দেন না? কেনই বা তাকে বিনা কষ্ট ও বিনা পরিশ্রমে বিত্তশালী বানিয়ে দেন না? তাদের কথাগুলোকে এইভাবে উদ্ধৃত করা হয়েছে,

'তার কাছে গুপ্ত ভান্ডারের চাবিকাঠি কেন দিয়ে দেয়া হয় না, অথবা ফুলে ফলে সুশোভিত কোনো বাগিচার মালিকই বা তাকে বানিয়ে দেয়া হয় না, যাতে করে নিশ্চিন্তে সেখান থেকে সে তার খাদ্য খাবার পেতে পারে।'

আপাত দৃষ্টিতে এসব আপত্তি বেশ যুক্তিসংগত মনে হয়, কিন্তু মুক্ত মন নিয়ে কেউ যদি বুঝতে চেষ্টা করতো তাহলে এসব কথার জওয়াব তারা নিজেদের মধ্যেই পেয়ে যেতো!

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন চাননি যে তাঁর রসূল কোনো গুপ্ত ভান্ডারের অধিকারী বা কোনো বাগ-বাগিচার মালিক হয়ে যাক, কারণ তাঁর রসূলকে তিনি তার উম্মতের জন্যে পরিপূর্ণ এক আদর্শ

মানুষ বানাতে চেয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন, তাঁর উম্মতের যে কোনো এক ব্যক্তির মতো নিজের খাদ্য খাবার, কষ্ট পরিশ্রম করে সে নিজেই যোগাড় করে নিক, যেন তার উম্মতের মধ্য থেকে কোনো শ্রমিক আল্লাহর হুকুম পালন করার ব্যাপারে এ ওজুহাত পেশ করতে না পারে যে, তিনি তো রসুল ছিলেন, তার কোনো কাজ কাম করা লাগে না, রুজি-রোজগারের তালাশে তাকে ব্যস্ত থাকতে হয় না। তাই তাঁর পক্ষে এসব হুকুম পালন করা সম্ভব হয়েছে, তার পক্ষে আকীদা বিস্তারের কাজ ও রেসালাতের দায়িত্ব আনজাম দেয়া সম্ভব হয়েছে,। তাকে তো জীবন পথে কোনো বাধা-বিঘ্নের সম্মুখীন হতে হয়নি, যার জন্যে তাঁর পক্ষে এসব কিছু সম্ভব হয়েছে এগুলো আমাদের জন্যে নয়। .... তাই, রসূল (স.)-কেও, তাঁর প্রতি অর্পিত সকল দায়িত্ব পালনের সাথে সাথে সাথে জীবিকা অর্জনের জন্যেও যে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে, তা অন্য কারো থেকে কোনো অংশে কম নয়! এভাবেই তাঁর আদর্শকে তিনি সামনে এগিয়ে দিয়েছেন। অবশ্য পরবর্তীতে তাঁকে জীবিকা আহরণের কাজ থেকে রেহাই দেয়া হয়েছে, যাতে করে তিনি, অন্যদিক থেকে আগত পরীক্ষার সঠিক মোকাবেলা করতে পারেন এবং তাঁর মিশনকে পূর্ণতা দান করতে পারেন। সাহাবায়ে কেরামরা প্রাণপ্রিয় নবীর পদপ্রান্তে হাদিয়া স্বরূপ যে ধন সম্পদ এনে দিতেন তা তিনি দুহাত দিয়ে ঝড়ো হাওয়ার মতো বিলিয়ে দিতেন। এভাবে তিনি সম্পদের মহব্বতের ওপর জয়লাভ করতেন এবং অন্তরের মধ্যে সম্পদের কোনো মূল্যই অনুভূত হতে দিতেন না, যাতে করে এরপর একথা আর কেউ বলতে না পারে, 'মোহাম্মদ তার রেসালাতের কারণে এতো এতো অর্থ সম্পদ গড়ে তুলেছিলো।' তিনি অভাব অভিযোগের মধ্যেই জীবন অতিবাহিত করতেন, কোনো সম্পদ তাঁকে বিলাসিতায় মগ্ন করে দিতে সক্ষম হতো না। তিনি বলতেন, 'আল ফাকরু ফাখরী' 'আমার দৈন্যই আমার গৌরব।' হাঁ, অবশ্যই তিনি সম্পদশালী ছিলেন, ধন সম্পদ আসতো এবং অল্পস্বল্প নয় প্রচুরই আসতো, কিন্তু এসব সম্পদ তিনি অকাতরে দাওয়াতী কাজের জন্যে ব্যয় করে ফেলতেন। এতো সম্পদ তাঁর কাছে আসা সত্তেও তিনি যেমন দরিদ্র ছিলেন, তেমনি দরিদ্রই থেকে যেতেন। ধন সম্পদ, পুঞ্জীকৃত অর্থ এসবের কী মূল্য আছে, কী স্থায়িত্ব আছে? নশ্বর দেহসর্বস্ব এই মানুষের দু চোখ যখন বুঁজে যাবে, যখন এই দুর্বল মানুষ চিরস্থায়ী ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর সাথে মিলিত হবে সে অবস্থা স্মরণ করলে মানুষ বুঝতে পারে এ জীবনের কী দাম আছে! পৃথিবী ও এর মধ্যস্থিত বিষয়াদিরই বা কী মূল্য আছে? এই বিশ্ব জগত গোটা এ সৃষ্টি, সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহর সাথে মিলিত হওয়ার পর এসবের আর কীইবা মূল্য থাকবে? তিনিই তো দেনেওয়ালা, কিন্তু হতভাগা সে জাতি এসব কিছুই হিসাব করতো না! এর শাদ হচ্ছে,

'যালেমরা বলতো, তোমরা একজন যাদু স্পর্শিত ব্যক্তির অনুসরণ করছ মাত্র' ছি, এ হচ্ছে সৃষ্টি ছাড়া, সীমাবহির্ভূত এক চরম নির্লজ্জ কথা, যার বর্ণনা এখানে এবং সূরায়ে বনি ইসরাঈল এ (বা ইসরাতে) প্রায় একই ভাষায় এসেছে এবং এখানে এবং ওখানে জওয়াবও একই ভাষায় দেয়া হয়েছে,

'দেখো, ওরা তোমার কেমন উদাহরণ দিলো, অতপর তারা গোমরাহ হয়ে গেলো, ফলে আর কোনো পথ তারা পাবে না।'

দুটি সূরাতে প্রায় একই বিষয় বর্ণিত হয়েছে, বর্ণনাকালে এ দুটির পরিবেশও প্রায় একই ছিলো। এসব সূরার মধ্যে রসূলুল্লাহ (স.)-এর জন্যে অপমানজনক যেসব কথা উচ্চারিত হয়েছে তার বর্ণনা পাওয়া যায়। যেসব কথা দ্বারা তাঁকে হেয় প্রতিপন্ন করা হয়েছে সেগুলো এ দুটি সূরার মধ্যে সমানভাবে পাওয়া যায়। আল আমীন মোহাম্মদ, বিশ্বস্ত- সবার প্রিয় মোহাম্মদ, আজ নবুওতের দায়িত্ব ঘাড়ে আসাতে কতো হীন, কতো অপমানজনক নামে তাঁকে আখ্যায়িত করা

হচ্ছে, যাদুকরদের সাথে তাকে তুলনা করা হচ্ছে, তুলনা করা হচ্ছে এমন এক ব্যক্তির সাথে যাদুর আছর হওয়ার কারণে যার আকল বুদ্ধি শেষ হয়ে গেছে। যাদুর কথা বলা হচ্ছে– এজন্যেই তো সে এমন আজব আজব কথা বলছে যা স্বাভাবিক মানুষরা বলে না, বলতে পারে না। আসলে এসব অস্বাভাবিক কথা যখন সে মূর্খের দল উচ্চারণ করছে তখন ওদের আভ্যন্তরীণ অবস্থা এমন ভোঁতা হয়ে গেছে যে তাদেরকে সে চেতনা আর সঠিক দিকনির্দেশ দিতে পারছে না। তাদের কাছে মনে হচ্ছে নবী (স.) অস্বাভাবিক কথা বলছেন, এমন কিছু তিনি বলছেন যার সাথে মানুষ পরিচিত নয়, বলছেন তাই যা মানুষের স্বভাব বিরুদ্ধ এবং মানুষের জন্যে কল্যাণকর নয় .... এর জওয়াবে বিস্ময় প্রকাশ করে আল্লাহর তরফ থেকে ওহী নাযিল হলো,

'দেখো তোমার জন্যে ওরা কেমন ধরনের উদাহরণ পেশ করছে।'

কখনো ওরা তোমার তুলনা করছে যাদুকরদের সাথে, কখনো বলছে মিথ্যাবাদী, কখনো বা তোমাকে দোষারোপ করছে পুরাতন কালের অলীক কাহিনী বর্ণনাকারী হিসাবে, অথচ এসব কিছু চরম ভ্রান্তি, বরং তারা সত্যই বুঝছে যে, এটা অবশ্যই সত্য কথা, সত্য কথা জানতে বুঝতে পারার পরও তারা নিছক দুনিয়াবী সাময়িক স্বার্থের কারণে এ মহা সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। এজন্যে তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা ফয়সালা শোনাচ্ছেন, 'ওরা আর কখনো সঠিক পথ পাবে না।'

এ কথার সাথে ওদের হঠকারিতাপূর্ণ বিতর্কের অবসান ঘটানো হচ্ছে যে, যা কিছু ওরা বলাবলি করছে এবং দুনিয়ার এ জীবন সম্পর্কে যতো যা কিছু ধারণা কল্পনা করছে সবই বে-ফায়দা হয়ে যাবে, তা ওরা যতোই এ দুনিয়াকে মূল্যবান বলে বুঝুক না কেন। আর দুনিয়া কেন্দ্রিক জীবন হওয়ার কারণে ওদের চিন্তা যে, সত্যিকার রসূলই যদি তিনি হবেন তাহলে তার কাছে প্রচুর সম্পদ থাকা উচিত ছিলো, এমন ফলের বাগ-বাগিচা থাকা প্রয়োজন ছিলো, যার থেকে নিশ্চিন্তে তাঁর খোরপোষের ব্যবস্থা হতো। হাঁ, আল্লাহ তায়ালা সর্বশক্তিমান, তিনি চাইলে অবশ্যই যা ওরা ধারণা করছে তার থেকেও অনেক বেশী দিতে পারতেন। তাই তিনি জানাচ্ছেন,

'মহা কল্যাণময় সেই সত্ত্বা যিনি চাইলে দিতে পারতেন, যা ওরা ধারণা করছে, তার থেকেও বেশী তোমাকে দিতে পারতেন, দিতে পারতেন তোমাকে এমন বাগ-বাগিচায় ভরা বাসস্থান যার নীচু দিয়ে প্রবাহিত হতে থাকত ছোট ছোট নদী, তোমার জন্যে বহু বালাখানাও বানিয়ে দিতে পারতেন।'

কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাঁর জন্যে ওদের কল্পনার অতীত, আরো আরো অনেক বেশী সুন্দর বাগ বাগিচা ও বাসস্থান বানাতে চেয়েছেন, আরো অনেক বেশী আরামদায়ক প্রাসাদ তাঁকে দিতে চেয়েছেন। মহান আল্লাহ তায়ালা তাকে তাঁর নিজের সাথে মহা মিলনের নিশ্চয়তা দিয়েছেন। যিনি সকল সহায় সম্পদ অট্টালিকা ও সকল ক্ষমতার মালিক তাঁর সান্নিধ্য পাওয়া কি সকল পাওয়ার বড়ো পাওয়া নয়! এর সাথে আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাঁকে পরম পুলকিত ও পরিতৃপ্ত হৃদয় দিয়েছেন। তিনি এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত যে তাঁর মালিক নিজেই তাঁকে চালাচ্ছেন এবং সদা সর্বদা তাঁকে তিনি নিজের হেফাযতে রেখেছেন, সর্বক্ষণ তাঁর প্রতি মালিকের মনোযোগ রয়েছে এবং তিনিই তাকে সর্বপ্রকার যোগ্যতা দিচ্ছেন যার কারণে শত চেষ্টা করেও বিরোধিরা তাঁকে তাঁর মিশনকে স্তব্ধ করে দিতে পারছে না, আর এসব কিছুর সাথে পরম প্রেমাস্পদের সাথে মহা মিলনের স্বাদ তাঁকে সারাক্ষণ বিমোহিত করে রেখেছে। এ স্বাদের অনুভূতি তাঁকে দান করছে এমন আরাম যা সকল নেয়ামতের বড়ো নেয়ামত। মানুষের জন্যে এর থেকে বড়ো অন্য সম্পদ হতে পারে না। হায়, ওরা যদি সময় ফুরানোর আগেই বুঝতো, যদি ওরা স্বাদ পেতো সেই মহা নেয়ামতের।

জাহান্নামের কিছু ভয়াবহ চিত্র

আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে ও রসূলুল্লাহ (স.)-এর বিরুদ্ধে কাফের মোশরেকদের সীমাহীন ঔদ্ধত্যপূর্ণ কথা এ পর্যন্ত যা পেশ করা হলো, তার সাথে তাদের অপর যে কঠিন সত্য বিরোধী চরিত্র প্রকাশ পেয়েছে তা হচ্ছে আখেরাত ও আখেরাতের অনন্ত জীবনকে অস্বীকার করা। তারা বিশ্বাস করতো না যে, মৃত্যুর পর আবার একসময় তাদেরকে যিন্দা করে তোলা হবে এবং দুনিয়ার জীবনের যাবতীয় কার্যকলাপ ও ব্যবহারের হিসাব নেয়া হবে, আর এজন্যেই তারা এতো বে-পরওয়া ছিলো। তাদের এই যুলুম নির্যাতনের কারণে একদিন তাদের শাস্তি পেতেই হবে, তাদের উপহাস-বিদ্রূপ ও নবীর সাথে দুর্ব্যবহারের জন্যে কারো কাছে কোনো দিন তাদের জওয়াবদিহি করতে হবে এবং কোনো দিন কারো কাছে তাদের হিসাব দিতে হবে– এসব বিশ্বাসের অভাবে তারা কোনো অন্যায় কাজ বা খারাপ আচরণ করতে কুণ্ঠিত হতো না। তাদের অত্যাচারের কোনো সীমা থাকতো না এবং তাদের আচার আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করার কোনো কিছুই ছিলো না। এজন্যে এখানে তাদের সামনে অত্যন্ত তেজোদ্দীপ্ত ও মর্মস্পর্শী ভাষায় কেয়ামতের দৃশ্যাবলীর মধ্য থেকে এমন একটি কঠিন দৃশ্য তুলে ধরা হচ্ছে, যা তাদের প্রস্তর কঠিন হৃদয়কে বিগলিত করছে, তাদের সুপ্ত চেতনাকে, প্রচন্ডভাবে নাড়িয়ে তুলছে তাদের অবচেতন মনকে ভীষণভাবে ভীত সন্ত্রস্ত করে তুলছে এবং একদিন তাদের মন্দ কাজ ও দুর্ব্যবহারের জন্যে অতি কঠিন পরিণতি ভোগ করতে হবে বলে তাদের মনে প্রত্যয় জাগিয়ে দিচ্ছে। এ পর্যায়ে মহা প্রলয়ংকর কেয়ামত সম্পর্কে আল কোরআনের সম্মোহনী বাণী মোমেনদেরকে যেমন করে আতংকিত করছে, তেমনি কাফেরদেরকেও ভীত সন্ত্রস্ত করে তুলছে। দেখুন, একবার আল্লাহ সোবহানাহু তায়ালার সেই ভীতি সৃষ্টিকারী বাণীর দিকে।

‘বরং ওরা কেয়ামতের বর্ণনাকে মিথ্যা বলে দাবী করলো এবং আমি, তাদের জন্যে দোযখের ডগডগে........ একটি ধ্বংসকে ডেকো না, বরং বহু বহু ধ্বংসকে ডাকো।’ (আয়াত ১১-১৪)

‘বলো, সে (পরিণতি)টিই ভালো, না চিরস্থায়ী সেই জান্নাত ভালো– যার ওয়াদা করা হয়েছে মোত্তাকী (আল্লাহভীরু) লোকদের সাথে, ওটাই হবে তাদের .... এক ওয়াদা– শুধু তার জন্যে যে ব্যক্তি আল্লাহর এ মহান ওয়াদা লাভের জন্যে আকাংখী থাকে! (আয়াত ১৫-১৬)

ওরা কেয়ামত সম্পর্কিত কথাগুলোকে মিথ্যা কথা বলে ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে। সত্যকে অস্বীকার করা এবং ভুল পথে দৃঢ়ভাবে টিকে থাকার জিদ তাদেরকে সত্য থেকে এতো বেশী দূরে পৌঁছে দিয়েছে, যেখান থেকে ফিরে আসা বড়োই কঠিন। এর ফল দাঁড়াচ্ছে এই যে, সত্য সমাগত হওয়ার পর তাকে প্রত্যাখ্যান করায় তাদের অবস্থা পূর্বের যে কোনো সময়ের তুলনায় আরো বেশী কঠিন আরো বেশী কষ্টকর হয়ে গেছে এবং সে কঠিন অবস্থা যেন এ আয়াতের মাধ্যমে আজ মূর্ত হয়ে উঠছে তাদের সামনে। এরশাদ হচ্ছে,

‘বরং ওরা কেয়ামতের কথাকে মিথ্যা বলে দাবী করলো।’

আর এই ঘৃণ্য ব্যবহার ও হঠকারিতার জন্যে তাদের সামনে সেই ভয়ানক আযাবের দৃশ্য তুলে ধরা হচ্ছে যা তাদের জন্যে অপেক্ষা করছে। সে ভয়ানক শাস্তি আসবে ডগডগে আগুন আকারে, যা পূর্ব থেকেই তাদেরকে গ্রাসের জন্যে প্রস্তুত থাকবে। তাই এরশাদ হচ্ছে, ‘আমি, সর্বশক্তিমান আল্লাহ, অস্বীকারকারী যে কোনো ব্যক্তির জন্যে ডগডগে আগুনের শাস্তি ঠিক করে রেখেছি।’

সুনির্দিষ্ট করে কথা বলতে গেলে বলতে হয় যে, আমরা জীবনকে অন্যায় অবিচার ও যাবতীয় আবিলতা থেকে মুক্ত করতে চাই এবং মনের মধ্যে যেসব দুশ্চিন্তা, কুপ্ররোচনা ও অন্যায়ের প্রতি আকর্ষণ এবং রয়েছে অন্যায়ের প্রতি যেসব ঝোঁক প্রবণতা রয়েছে তার থেকে আমরা আমাদের

গোটা সত্ত্বাকে পবিত্র করতে চাই। আল কোরআন এর মধ্যে যে বিজ্ঞান রয়েছে, তা বিভিন্ন উপায়ে এবং বিভিন্ন দৃশ্যের মধ্য দিয়ে এমনভাবে এখানে ফুটে ওঠে যা দেখে বিস্ময়ে আমরা হতবাক হয়ে যাই। সমগ্র জীবনটাই তো এক বিস্ময়, সুতরাং এ জীবন নিয়ে আল কোরআন যা কিছু বলেছে তা অবশ্যই তাদের কাছে বিস্ময়কর মনে হবে যারা এ মহাগ্রন্থকে গবেষণা করে এবং অন্তর প্রাণ দিয়ে এ পাক কালামকে বুঝার চেষ্টা করে।

আলোচ্য সূরার এই পর্যায়ে এসে আমরা উপনীত হয়েছি দোযখের আগুনের সামনে। এমন মর্মস্পর্শী বর্ণনার অবতারণা এখানে করা হয়েছে যে, আমাদের কল্পনা নেত্রে সে কঠিন আগুনের দৃশ্য ভেসে উঠছে। কতো কঠিন এ আগুন! এর বর্ণনা দিতে গিয়ে হাদীস শরীফে বলা হয়েছে (মরুভূমির বুকে) দুপুরের সময়ে যে উত্তপ্ত হাওয়া চলে, যার তাপে যে কোনো মানুষের শরীর ঝলসে যায়, সেই উত্তপ্ততা আসে জাহান্নামের তাপ থেকে। সে কঠিন আগুনের মধ্যে সাঁতার কেটে বেড়াবে মানুষরা। (হে রসূল) তুমি এ ভয়ানক দৃশ্য অনেক অনেক দূর থেকে দেখবে। সে আগুন প্রচন্ড আক্রোশে গর্জন করতে থাকবে এবং প্রলয়ংকরী ঢেউ তুলে তুলে জ্বলতে থাকবে। সে আগুনের শাঁ শাঁ শব্দ ও ক্রোধমত্ত ধ্বনি সে পাপাচারীরা শুনতে থাকবে। সে আগুন তাদের দারুণ আক্রোশে পোড়াতে থাকবে এবং তার লেলিহান শিখা গোল্লা মেরে মেরে তাদের ওপর উঠতে থাকবে– আর ওরা হবে সে আগুনের জ্বালানী, তাদেরকে কঠিন আগুনের দিকে এগিয়ে দেয়া হবে।' কল্পনা নেত্রে একবার সে দৃশ্যটি রাখুন এবং চিন্তা করুন কী ভয়ানক হবে সে দৃশ্য। বিশ্বাস হতে চায় না? দুনিয়ার বুকে কোনো অগ্নিকান্ডের দৃশ্য যদি দেখে থাকেন এবং যদি সেই লেলিহান শিখার মধ্যে কারো জ্বলতে থাকা নযরে পড়ে থাকে তাহলেই কখনো বুঝবেন, সেখানে সেভাবে পাপাচারী কেউ জ্বলতে পারে কিনা! কিন্তু সে দিন তো আজকের মতো মৃত্যু থাকবে না। জ্বলবে, চীৎকার করবে, জীবন বেরুবে না, জ্বলে পুড়ে একেবারে নিশেষও হয়ে যাবে না, যেমন করে পেটের ব্যথার রুগী ছটফট করে যন্ত্রণায়, তবু মরে না পৃথিবীতে এ দৃশ্য তো অনেকের চোখেই পড়ে। এসব ভয়ানক দৃশ্য চিন্তাশীল যে কোনো ব্যক্তিকে প্রকম্পিত করে, এমন কঠিন ব্যধিতে আক্রান্ত ব্যক্তি ছটফট করতে থাকে এবং থরথর করে কাঁপতে থাকে, তার দেহ মন এবং মুহুর্মুহু সে শিহরে উঠতে থাকে কেয়ামতের দিনে যালেম ও সত্যকে প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্যে যে আগুন নির্ধারিত রয়েছে তার বর্ণনা এখানে পেশ করা হয়েছে সে কঠিন আগুনের ভয় যখন মনের ওপর ছেয়ে যায়, তখন পায়ে বল থাকে না, হাঁটতে গেলে নড়বড় করে!

এরপর সত্য বিরোধী ও সত্যকে উপেক্ষাকারী প্রত্যেকটি ব্যক্তির জন্যে রয়েছে এ সম্বোধন, পাপাচারীরা সে ভয়ানক আগুনের মধ্যে পৌঁছে যাবে। সে ধ্বংসের গহ্বরে তাদেরকে একেবারে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেয়া হবে না যে, সে কঠিন আগুন থেকে পালিয়ে বেরিয়ে যেতে পারবে। যখন বিদ্রোহী ও পাপাচারী ব্যক্তিদেরকে হাঁকিয়ে আগুনের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে, তখন তারা বাঁচার চেষ্টা করতে থাকবে কিন্তু কিছুতেই বাঁচতে পারবে না, বরং ধাক্কা মেরে ওই কুন্ডলি পাকিয়ে জলতে থাকা আগুনের লেলিহান শিখার মধ্যে তাদেরকে ফেলে দেয়া হবে, তাদেরকে জিঞ্জিরে আবদ্ধ অবস্থায় এই ভীষণ আগুনে ফেলে দেয়া। তাদের হাতগুলো পায়ের সাথে শিকল দিয়ে বাঁধা থাকবে এবং ছুঁড়ে ফেলা হবে আগুন ভর্তি কোনো সংকীর্ণ স্থানে।

যারা বেড়ি পরা কয়েদীদের দেখেছেন, যারা দেখেছেন ফাঁসীর আসামীকে মৃত্যু দন্ড প্রাপ্তির পর মৃত্যু সেলে থাকতে, যারা দেখেছেন ষ্টীল মিলের ষ্টীল গালানো আগুনকে, যারা কল্পনা করতে পারেন আমাদের দেখা আগুন থেকে হাজার গুণ শক্তিশালী এটম বোমার আগুন সম্পর্কে– তাদের পক্ষে যালেমদের অবস্থা বুঝা সহজ হবে। যারা আল্লাহর রাজ্যে বাস করে তাঁকে মানতে চায় না, তাঁর বান্দাদের প্রতি নিজ স্বার্থের জন্যে অকথ্য নির্যাতন চালায়, যারা মানুষকে শেয়াল কুকুরের

মতো আছড়ে আছড়ে মারে, চরম নিষ্ঠুরতার সাথে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করে, পানিতে ডুবিয়ে মারে, পশু পাখীর মতো যবাই করে, যারা বুঝতে চায় না তাদের শক্তি ক্ষমতার ওপর আরো কারো ক্ষমতা আছে এবং যারা মানতে চায় না যে তাদের এই দাপটের একদিন পরিসমাপ্তি ঘটবে, তাদের জন্যেই সে লেলিহান শিখা বিশ্ব সম্রাটের হুকুমে অপেক্ষা করছে। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'যখন তাদেরকে ছুঁড়ে ফেলা হবে, শিকল দ্বারা হাত পা বাঁধা অবস্থায় সংকীর্ণ এক স্থানে, তখন (কষ্টের চোটে) তারা চূড়ান্ত ধ্বংসকে ডাকতে থাকবে (যেন এ আগুনের কষ্ট পরিসমাপ্তি ঘটে কিন্তু এ কষ্ট অবসানের জন্যে মৃত্যু আসবে না), এজন্যে তারা বহু বহু মৃত্যুকে ডাকতে থাকবে।'

সে সময়ে মৃত্যু বড়োই কাম্য বস্তু হবে, যেহেতু মনে করা হবে অসহ্য সে যন্ত্রণা থেকে বাঁচার জন্যে মৃত্যুই একমাত্র উপায়, কিন্তু মৃত্যুকে ডাকতে থাকার জওয়াবে তারা শুনতে থাকবে তীব্র উপহাস-বিদ্রূপ ও ভীষণ ঘৃণাব্যঞ্জক কথা, এজন্যে বলা হয়েছে,

'একটি মৃত্যুকে ডেকো না, বরং বহু মৃত্যুকে ডাকো' তোমরা–

দেখো, কোনো মৃত্যু তোমাদের এই কষ্টের অবসান ঘটাতে পারে কিনা! সেদিন মৃত্যু না থাকলেও মৃত্যু যাতনা তো থাকবেই, কাজেই বহু মৃত্যু যাতনা এসে দেখো না তোমাদের আগুনের কষ্ট লাঘব করাতে পারে কিনা (আসলে এটা বড়ো কঠিন বিদ্রূপ, যেহেতু মৃত্যু না আসলে যাতনা তো আরো বাড়তেই থাকেবে। এমনই কঠিন যাতনার পাশাপাশি মোত্তাকীদের জন্যে ওয়াদাকৃত সাফল্যের অবস্থাকে পেশ করা হচ্ছে। সেই সকল মোত্তাকীদের জন্যে রয়েছে ওয়াদা যারা তাদের মালিককে ভয় করে চলেছে। তাঁর ভয়েতেই কোনো সীমালংঘন করেনি। কারো ওপর যুলুম, অত্যাচার করেনি এবং তাঁর সাথে মোলাকাতের আশা পোষণ করতে থেকেছে, কেয়ামতকে বিশ্বাস করেছে। তাদের পুরস্কারপ্রাপ্তি ও শান্তির অবস্থাকে সামনে রেখে আবারও পাপাচারীদেরকে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে।

'বলো, সে অবস্থাটাই ভালো, না চিরস্থায়ী জান্নাত, মোত্তাকীদের সাথে যার ওয়াদা করা হয়েছে সেটা ভালো। তাদের জন্যে রয়েছে সে মহাপুরস্কার সে সুন্দর বাসস্থান। সেখানে তারা তাই পাবে যা তাদের মন চাইবে। সেখানে তারা চিরদিন থাকবে। তাদের রবের কাছে এটা হবে তাদের বড়ো পাওনা– এটা হবে তাদের বাঞ্ছিত দাবী, যা হবে বড়োই আশা-আকাংখা করা ও চাওয়ার বস্তু, হাঁ চাওয়ার বস্তুই বটে।

এখন হিসাব করে দেখো, হে পাপাচারীরা সে ঘৃণা ও দুঃখজনক অবস্থা ভালো? না চিরস্থায়ী জান্নাত ভালো? যার ওয়াদা আল্লাহ তায়ালা মোত্তাকীদের সাথে করেছেন? আল্লাহ রব্বুল আলামীন চেয়েছেন, তারা জান্নাত সম্পর্কে চিন্তা করুক এবং আরও চেয়েছেন যে তারা আল্লাহর কাছে তাঁর সেই ওয়াদা পূরণ করার জন্যে দোয়া করতে থাকুক, যার খেলাফ তিনি করেন না, তিনি তাদের এ অধিকারও মঞ্জুর করেছেন যে, তারা সে জান্নাতে যা চাইবে তাই পাবে। এ অবস্থায় জান্নাতী ও দোযখী অবস্থার মধ্যে কোনো তুলনা করা চলে কি? তবুও কেয়ামতের দিনে সেসব ব্যক্তির প্রতি যে বিদ্রূপবাণ নিক্ষেপ করা হবে সেই বিষয়ে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালা জানাচ্ছেন যারা আজ রসূলে করীম (স.)-এর সাথে ঠাট্টা মস্কারি করছে, তাদের জন্যে কঠিন শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে।

মোশরেক ও তাদের শরীকরা কিভাবে একে অপরকে অভিযুক্ত করবে

এরপর সে মিথ্যাবাদী ও হঠকারী নাদানরা কেয়ামত সংঘটিত হওয়া সম্পর্কে তাদের যে অবিশ্বাস প্রকাশ করছে, তার দৃশ্যসমূহের মধ্য থেকে মোশরেকদের শাস্তির দৃশ্যটি তুলে ধরে আল কোরআন চূড়ান্তভাবে তাদেরকে সতর্ক করছে, স্পষ্টভাবে তাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছে যে, তাদেরকে তাদের কল্পিত মাবুদদের সাথে একত্রিত করে সেদিন দোযখে হাযির করা হবে। সেখানে বান্দা ও তাদের কল্পিত মাবুদরা একত্রে থাকবে ও শাস্তি ভোগ করবে। তারা পরস্পরকে তাদের পরিণতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে থাকবে। .... দেখুন তাদের কথার উদ্বৃতি এখানে তুলে ধরা হয়েছে,

'যেদিন, তাদের এবং সে সব ব্যক্তি বা বস্তুদেরকে একত্রিত করা হবে, আল্লাহকে বাদ দিয়ে তারা যাদের আনুগত্য দাসত্ব করতো, তাদের সবাইকে একত্রিত করা হবে..... আর যে তোমাদের মধ্য থেকে যুলুম করবে, তাকে আমি সর্বশক্তিমান আল্লাহ বিরাট আযাবের স্বাদ গ্রহণ করাবো।' .....(আয়াত ১৭-১৯)

'আল্লাহকে বাদ দিয়ে ওরা দাসত্ব আনুগত্য করে তারা' বলতে কখনো বুঝানো হয়েছে ইট-পাথরের নির্মিত মূর্তিকে আবার কখনো জ্বিন ও ফেরেশতাদেরকে বুঝানো হয়েছে। তাদেরকেও বুঝানো হয়েছে যাদেরকে সার্বভৌম ক্ষমতা প্রদান করে তারা নিরংকুশ অনুগত্য দিতো এবং তাদের রচিত আইন কানুন দিয়ে জীবন ও সমাজ পরিচালনা করতো। কিন্তু আরও বৃহত্তর ক্ষেত্রে তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে যেখানে তাদের সবাইকে একত্রিত করা হবে, সেখানে তাদের অপরাধ সম্পর্কে ঘোষণা দেয়া হবে এবং তাদের ওপর উপর্যুপরি তিরস্কারবাণ নিক্ষিপ্ত হতে থাকবে। ভয়ানক আযাব দানের সাথে সাথে এ তিরস্কারও চলতে থাকবে। আল্লাহর যেসব নেক বান্দাদেরকে তাদের মৃত্যু পর তারা মাবুদ বানিয়ে নিয়েছে তাদের পক্ষ থেকে বলা হবে তারা একমাত্র মহাশক্তিমান আল্লাহরই এবাদাত করেছে এবং কখনো তারা কাউকে তাদের পূজা অর্চনা করতে বলেনি। আর যেসব নেতা নেতৃরা সাধারণ মানুষকে আল্লাহ তায়ালা ও তার রসূলের পথ থেকে সরিয়ে নিজেদের বানানো মতবাদ মানতে প্ররোচিত করেছে তারা বলবে, নবী (স.) মিথ্যা কথা বলছেন কিংবা নিজের কথাকে আল্লাহর কথা বলে চালিয়ে দিচ্ছেন কখনো তারা এমন কথা বলেনি– বা কাউকে বলতে শেখায়নি। তাছাড়া তাদের বানানো আইন কানুন বা মতবাদ কখনো তাদেরকে তারা বলেনি। এমনকি সেদিন আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কারও এবাদাত করার কথাও তারা অস্বীকার করবে; মানবরচিত মতবাদের ধারক বাহকরা সেদিন সে মূর্খ নাদানদের প্রতি ঘৃণায় নাক কুঞ্চন করবে।

'ওরা বলবে, পবিত্র তুমি হে মালিক, তোমাকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে আমরা বন্ধু বা অভিভাবকরূপে গ্রহণ করবো এ প্রশ্নই আসে না– আমাদের কল্পনাতেও কখনো একথা জাগেনি, বরং তাদেরকে ও তাদের বাপ-দাদাদের তুমি যেসব নেয়ামত দানে ভূষিত করেছিলে, এগুলো পেয়ে তারাই তোমাকে ভুলে গেছে এবং এইভাবে তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিতে পরিণত হয়েছে। (আয়াত ১৮)

অতপর, দেখুন তাদেরকে এসব নেয়ামত কে দিয়েছে। তাদের জ্ঞান বুদ্ধি, প্রজ্ঞা, স্মরণ শক্তি, শারীরিক সুস্থতা, অর্জিত ধন সম্পদ এবং সে সব সম্পদ সম্পত্তি যা তারা মৌরুসি সূত্রে পেয়েছে, তারা জানেনা কোত্থেকে এগুলো এলো, কেমন করে তারা পেলো। হায়, মূর্খের দল, এসব কিছুর জন্যে শোকরগোযারি না করে এবং যিনি এসব কিছুর মালিক, বড়ো মেহেরবানী করে তাদেরকে দিয়েছেন তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের পরিবর্তে এই নাফরমানী! এই না-শোকরীর কারণেই আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাদেরকে তাদের কর্তব্য ভুলিয়ে দিয়েছেন, ভুলিয়ে দিয়েছেন তাদেরকে তাদের মালিককে স্মরণ করার কথা। এভাবে তাদের অন্তর তাদেরকে হতাশাপূর্ণ অবস্থায়, অভাব অভিযোগ ও ধ্বংসের দিকে টেনে নিয়ে গেছে। যেমন শুষ্ক মরুভূমিতে কোনো সজীবতা থাকে না, কোনো ফসল ও ফলমূল হয় না। সেখানে যারা যায়, ধ্বংস, মৃত্যু ও হতাশার চিহ্নসমূহ দেখতে পায়। এখানে যে শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়েছে তাতে বুঝা যায়, অজন্মা ও সর্বাত্মক অভাব– এ অভাব অন্তরের, এ অভাব জীবনের সব কিছুর ব্যাপারে।

এই পর্যায়ে এসে সে মূর্খ, অপমানিত ও হতভাগা জনগোষ্ঠীকে সম্বোধন করে বলা হচ্ছে, '(যাদেরকে খুশী করার জন্যে তোমরা তাদের দাসত্ব আনুগত্য করেছো, আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদের সাহায্য কামনা করেছো) তোমাদেরকে এবং তোমাদের সেসব কথাকে যা তোমরা জীবন

ভর বলতে থেকেছো, তারা আজ প্রত্যাখ্যান করেছে। অতএব আজ সেকথাগুলোকে তোমরা বদলে দিতে পারবে না এবং আজ তোমরা কারো সাহায্য পাবে না।' ......

অর্থাৎ ওই সব কথা ও আচরণের দরুণ তোমাদের ওপর আজ যে আযাব নাযিল হওয়া অবধারিত হয়ে গেছে তা কিছুতেই তোমরা ফেরাতে পারবে না এবং কারো কাছ থেকে কোনো প্রকার সাহায্যও তোমরা আজ লাভ করতে পারবে না।

আমরা হাশরের দিনে আখেরাতের সেই চিরন্তন যিন্দেগীর দৃশ্যটি কল্পনার চোখে দেখতে পাচ্ছি। আমরা নিজেরাই যেন সেই ময়দানে হাযির। ঠিক এমনই এক মুহূর্তে মিথ্যাবাদী ও সত্যকে প্রত্যাখ্যানকারী গোষ্ঠীকে অকস্মাৎ লক্ষ্য করে আল্লাহর বাণী উচ্চারিত হচ্ছে, কারণ এখনো তারা পৃথিবীর বুকে আছে (এবং সংশোধনের এখনও কিছু সময় বাকি আছে),

'আর তোমাদের মধ্যে যে যুলুম করবে (সীমার বাইরে কাজ ও আচরণ করবে), আমি তাকে মহা শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করাবো।'

এ হচ্ছে কোরআনের মর্মস্পর্শী বর্ণনাভংগি। এই বর্ণাভংগির কল্যাণেই কোরআন এতো হৃদয়গ্রাহী হয় এবং মন মগয কোরআনকে গ্রহণ করার যোগ্যতা অর্জন করে। সেই সাথে উল্লেখিত ভয়াবহ দৃশ্য দ্বারাও তা প্রভাবিত হয়।

অবশেষে রসূল (স.)-কে মিথ্যুক সাব্যস্ত করা, তাঁর বিরুদ্ধে অপবাদ রটানো, তাঁকে ব্যংগ বিদ্রূপ করা, তিনি ফেরেশতা না হয়ে মানুষ হয়ে কেন এলেন এবং কেন তিনি পানাহার করেন ও বাজারে যান ইত্যাকার প্রশ্নবাণে জর্জরিত করার শেষ ফল সবাই প্রত্যক্ষ। তিনি নিজেও তা প্রত্যক্ষ করলেন, তার শত্রুরাও করলো। এরপর কোরআন তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে ও সমবেদনা জানিয়ে বলছে যে, তুমি কোনো নতুন রসূল নও। ইতিপূর্বে যতো নবী ও রসূল এসেছেন, তারা সবাই তোমার মতোই পানাহারও করতো, হাট বাজারেও যেতো।

'আমি তোমার পূর্বে যতো রসূলই পাঠিয়েছি। তারা সবাই পানাহারও করতো এবং হাট বাজারেও যেতো। আমি তোমাদের একজনকে অপরজনের জন্যে পরীক্ষাস্বরূপ বানিয়েছি। তোমরা কি ধৈর্যধারণ করবে? তোমার প্রতিপালক সব কিছুই দেখতে পান।'

অর্থাৎ তোমার এসব কার্যকলাপে যদি আপত্তি তোলা হয়ে থাকে তবে সেটা ব্যক্তিগভাবে শুধু তোমার বিরুদ্ধে নয়, বরং আল্লাহর একটা শাশ্বত রীতির বিরুদ্ধে তোলা হয়েছে। সেই রীতিটার উদ্দেশ্য হলো,

'আমি তোমাদের একজনকে অপরজনের জন্যে পরীক্ষাস্বরূপ বানিয়েছি।'

ফলে যে ব্যক্তি আল্লাহর মহৎ ও নিগূঢ় উদ্দেশ্য এবং তার কার্যকলাপের যৌক্তিকতা বুঝতে পারে না, সে আপত্তি তুলবেই। এই আপত্তিতে ধৈর্য হারালে চলবে না। যারা আল্লাহর ওপর ভরসা রাখে, তার কোনো কাজই অযৌক্তিক নয় বলে বিশ্বাস করে এবং তার সাহায্য একদিন আসবেই বলে আস্থা রাখে, তাদের ধৈর্যধারণ করে যেতে হবে, আর দাওয়াতের কাজ মানবীয় পদ্ধতি অনুসারে এবং মানবীয় উপায়-উপকরণের সাহায্যে চালিয়ে যেতে হবে। এই কঠিন পরীক্ষায় তাদেরকে দৃঢ়তা ও অটুট মনোবল প্রদর্শন করতে হবে।

'তোমরা কি ধৈর্যধারণ করবে। তোমার প্রভু সব কিছু দেখতে পান।'

অর্থাৎ মানুষের মনমানসিকতা, মেযাজ স্বভাব ও পরিণতি সবই জানেন। 'তোমার প্রভু' এই সম্বন্ধ পদটা দ্বারা বিশেষভাবে রসূলের প্রতি আল্লাহর মমত্ব ও সহানুভূতি প্রকাশ করা হয়েছে।

وَقَالَ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا لَوْلَآ أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلٰئِكَةُ أَوْ نَرٰى

رَبَّنَا ، لَقَدِ اسْتَكْبَرُوْا فِيْٓ أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًّا كَبِيْرًا ۝٢١ يَوْمَ يَرَوْنَ

الْمَلٰئِكَةَ لَا بُشْرٰى يَوْمَئِذٍ لِّلْمُجْرِمِيْنَ وَيَقُوْلُوْنَ حِجْرًا مَّحْجُوْرًا ۝٢٢

وَقَدِمْنَآ إِلٰى مَا عَمِلُوْا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنٰهُ هَبَآءً مَّنْثُوْرًا ۝٢٣ أَصْحٰبُ الْجَنَّةِ

يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَّأَحْسَنُ مَقِيْلًا ۝٢٤ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَآءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ

الْمَلٰئِكَةُ تَنْزِيْلًا ۝٢٥ اَلْمُلْكُ يَوْمَئِذِ ِالْحَقُّ لِلرَّحْمٰنِ ، وَكَانَ يَوْمًا عَلَى

الْكٰفِرِيْنَ عَسِيْرًا ۝٢٦ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلٰى يَدَيْهِ يَقُوْلُ يٰلَيْتَنِي

اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُوْلِ سَبِيْلًا ۝٢٧ يٰوَيْلَتٰى لَيْتَنِيْ لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيْلًا ۝٢٨

لَقَدْ أَضَلَّنِيْ عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَآءَنِيْ ، وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِلْإِنْسَانِ

২১. যারা আমার সাথে (তাদের) সাক্ষাতের আশা পোষণ করে না, তারা বলে, কতো ভালো হতো যদি আমাদের কাছে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে কোনো ফেরেশতা নাযিল করা হতো, অথবা আমরা যদি আমাদের মালিককে (নিজেদের চোখে) দেখতে পেতাম। তারা (এ সব বলে) নিজেদের বড়ো (অহংকারী) মনে করলো এবং (আল্লাহ তায়ালার নাফরমানীতেও) তারা মাত্রাতিরিক্ত সীমালংঘন করে ফেললো। ২২. যেদিন (সত্যি সত্যিই) তারা সে ফেরেশতাদের দেখবে, তখন (কিন্তু) অপরাধীদের জন্যে সেদিন কোনো সুসংবাদ থাকবে না, (বরং) তারা বলবে, (হে আল্লাহ, এই ফেরেশতাদের থেকে) আমরা পানাহ চাই– পানাহ চাই। ২৩. (এবার) আমি তাদের সে সব কর্মকান্ডের দিকে মনোনিবেশ করবো, যা তারা (দুনিয়ায়) করে এসেছে, তখন আমি তা উড়ন্ত ধূলিকণার মতোই (নিষ্ফল) করে দেবো। ২৪. সেদিন জান্নাতীদের বাসস্থান ও তাদের বিশ্রামের জায়গা হবে অত্যন্ত মনোরম। ২৫. (হে মানুষ, তোমরা সেদিনকে ভয় করো,) যেদিন আসমান তার মেঘমালা নিয়ে ফেটে পড়বে, আর (তারই মাঝ দিয়ে) দলে দলে ফেরেশতারা (যমীনে) নেমে আসবে। ২৬. সেদিন চূড়ান্ত বাদশাহী হবে দয়াময় আল্লাহ তায়ালার জন্যে; যারা অস্বীকার করেছে তাদের ওপর সেদিনটি হবে (বড়োই) কঠিন! ২৭. সেদিন যালেম ব্যক্তি (ক্ষোভে দুঃখে) নিজের হাত দুটো দংশন করতে করতে বলবে, হায়! আমি যদি দুনিয়ায় রসূলের সাথে (দ্বীনের) পথ অবলম্বন করতাম! ২৮. দুর্ভাগ্য আমার, আমি যদি অমুককে (নিজের) বন্ধু না বানাতাম! ২৯. আমার কাছে (দ্বীনের) উপদেশ আসার পর সে তা থেকে আমাকে বিচ্যুত করে দিয়েছিলো; আর শয়তান তো (হামেশাই) মানুষকে (বিপদের সময় একলা)

خَذُولًا ۝٢٩ وَقَالَ الرَّسُولُ يٰرَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هٰذَا الْقُرْاٰنَ

مَهْجُورًا ۝٣٠ وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِيْنَ ، وَكَفٰى

بِرَبِّكَ هَادِيًا وَّنَصِيْرًا ۝٣١ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْاٰنُ

جُمْلَةً وَّاحِدَةً ۚ كَذٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهٖ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنٰهُ تَرْتِيْلًا ۝٣٢ وَلَا

يَأْتُوْنَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنٰكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيْرًا ۝٣٣ اَلَّذِيْنَ

يُحْشَرُوْنَ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ إِلٰى جَهَنَّمَ ۙ أُولٰٓئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَّأَضَلُّ سَبِيْلًا ۝٣٤

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَجَعَلْنَا مَعَهٗٓ أَخَاهُ هٰرُوْنَ وَزِيْرًا ۝٣٥ فَقُلْنَا

اذْهَبَآ إِلَى الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ، فَدَمَّرْنٰهُمْ تَدْمِيْرًا ۝٣٦

ফেলে কেটে পড়ে। ৩০. সেদিন রসূল বলবে, হে মালিক, অবশ্যই আমার জাতি কোরআনকে (একটি) পরিত্যাজ্য (বিষয়) মনে করেছিলো। ৩১. (হে নবী,) এভাবেই আমি (প্রত্যেক যুগের) অপরাধীদের প্রত্যেক নবীর দুশমন বানিয়ে থাকি; অতএব (তুমি মনোক্ষুণ্ণ হয়ো না), তোমার পথ প্রদর্শন ও সাহায্য করার জন্যে তোমার মালিকই যথেষ্ট! ৩২. যারা (কোরআন) অস্বীকার করে তারা বলে, (আচ্ছা এই) পুরো কোরআনটা তার ওপর একবারে নাযিল হলো না কেন? (আসলে কোরআন তো) এভাবেই (নাযিল) হওয়া উচিত ছিলো, যাতে করে এ (ওহী) দ্বারা আমি তোমার অন্তরকে মযবুত করে দিতে পারি, (এ কারণেই) আমি একে থেমে থেমে নাযিল করেছি। ৩৩. (তা ছাড়া) ওরা তোমার কাছে যে কোনো ধরনের বিষয় (ও সমস্যা) নিয়েই আসুক না কেন, আমি (সাথে সাথেই) তোমার কাছে (এর একটা) যথার্থ সত্য (সমাধান) এনে হাযির করতে পারি এবং (প্রয়োজনে তার) একটা সুন্দর ব্যাখ্যাও বলে দিতে পারি; ৩৪. এরা হচ্ছে সে সব লোক যাদের (কেয়ামতের দিন) মুখের ওপর ভর দিয়ে জাহান্নামের সামনে জড়ো করা হবে, ওদের সে স্থানটি হবে অতি নিকৃষ্ট, আর ওরা নিজেরাও হবে অতিশয় পথভ্রষ্ট।

রুকু ৪

৩৫. অবশ্যই আমি মূসাকে (তাওরাত) গ্রন্থ দান করেছিলাম এবং তার ভাই হারূনকে তার সাথে তার সাহায্যকারী করেছিলাম, ৩৬. অতপর আমি তাদের বলেছিলাম, তোমরা উভয়েই (আমার হেদায়াত নিয়ে) এমন এক জাতির কাছে যাও, যারা আমার আয়াতকে অস্বীকার করেছে; অতপর (আমাকে অস্বীকার করায়) আমি তাদের সম্পূর্ণরূপে বিনাশ করে দিয়েছি;

وَقَوْمَ نُوحٍ لَّمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنٰهُمْ وَجَعَلْنٰهُمْ لِلنَّاسِ أٰيَةً ۚ
وَأَعْتَدْنَا لِلظّٰلِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ۚ ﴿٣٧﴾ وَعَادًا وَثَمُودَا۟ وَأَصْحٰبَ الرَّسِّ
وَقُرُونًۢا بَيْنَ ذٰلِكَ كَثِيرًا ﴿٣٨﴾ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ ۖ وَكُلًّا تَبَّرْنَا
تَتْبِيرًا ﴿٣٩﴾ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِىٓ أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ ۚ أَفَلَمْ
يَكُونُوا يَرَوْنَهَا ۚ بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا ﴿٤٠﴾ وَإِذَا رَأَوْكَ إِنْ
يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا ۖ أَهٰذَا الَّذِى بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا ﴿٤١﴾ إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا
عَنْ أٰلِهَتِنَا لَوْلَآ أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا ۚ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ
الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿٤٢﴾ أَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلٰهَهُۥ هَوٰىهُ ۚ أَفَأَنتَ تَكُونُ

৩৭. (একইভাবে) যখন নূহের সম্প্রদায়ও আমার রসূলদের মিথ্যা সাব্যস্ত করলো, তখন আমি তাদের সবাইকে (প্লাবনের পানিতে) ডুবিয়ে দিয়েছি এবং আমি ওদের (পরবর্তী) মানুষদের জন্যে শিক্ষণীয় বিষয় করে রেখেছি; আমি যালেমদের জন্যে মর্মন্তুদ আযাব ঠিক করে রেখেছি, ৩৮. (একই নিয়মে) আমি ধ্বংস করে দিয়েছি আদ, সামুদ ও 'রাস'-এর অধিবাসীদের এবং তাদের অন্তর্বর্তীকালীন আরো বহু সম্প্রদায়কেও, ৩৯. (তাদের) প্রত্যেকের কাছেই আমি (আগের ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিসমূহের) নিদর্শনসমূহ উপস্থাপন করেছি, (কিন্তু কেউই যখন সতর্কবাণী শোনলো না তখন) আমি তাদের সবাইকে চূড়ান্তভাবে নির্মূল করে দিয়েছি। ৪০. এরা তো সে জনপদ দিয়ে প্রতি নিয়ত আসা যাওয়া করে, যার ওপর আযাবের বৃষ্টি বর্ষণ করা হয়েছিলো; ওরা কি তা দেখছে না? (আসল কথা হচ্ছে,) এরা (পুনরায়) জীবিত হওয়ার কোনো আশাই পোষণ করে না। ৪১. (হে নবী,) এরা যখন তোমাকে দেখে তখন তোমাকে কেবল ঠাট্টা বিদ্রূপের পাত্ররূপেই গণ্য করে (বলে); এ কি সে লোক, যাকে আল্লাহ তায়ালা রসূল করে পাঠিয়েছেন! ৪২. এ ব্যক্তিই তো আমাদের দেবতাদের (এবাদাত) থেকে আমাদের সম্পূর্ণ বিচ্যুতই করে দিতো যদি আমরা তাদের ওপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত না থাকতাম; (হ্যাঁ,) তারা যখন (আল্লাহ তায়ালার) আযাব (স্বচক্ষে) দেখতে পাবে তখন ভালো করেই জানতে পারবে, কে তোমাদের মাঝে বেশী পথভ্রষ্ট ছিলো। ৪৩. (হে নবী,) তুমি কি সে ব্যক্তির (অবস্থা) দেখোনি যে তার কামনা বাসনাকে নিজের মাবুদ বানিয়ে নিয়েছে; তুমি কি তার (মতো ব্যক্তির) ওপর (অভিভাবক হতে

عَلَيْهِ وَكِيْلًا ۞ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُوْنَ أَوْ يَعْقِلُوْنَ ، إِنْ هُمْ إِلَّا

كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيْلًا ۞

পারো? ৪৪. (হে নবী,) তুমি কি সত্যিই মনে করো, তাদের অধিকাংশ লোক (তোমার কথা) শুনে কিংবা (এর মর্ম) বুঝে; (আসলে) ওরা হচ্ছে পশুর মতো, বরং (কোনো কোনো ক্ষেত্রে) তারা (আরো) বেশী বিভ্রান্ত।

তাফসীর

আয়াত-২১-৪৪

এ অধ্যায়টার সূচনা এবং প্রথম অধ্যায়টার সূচনা হয়েছে একইভাবে। উভয় ক্ষেত্রেই মোশরেকদের আপত্তি, অভিযোগ ও বাড়াবাড়ির জবাব দিয়ে রসূল (স.)-কে প্রবোধ ও সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে। পার্থক্য শুধু এই যে, এখানে মোশরেকদের বাড়াবাড়ির জন্যে আখেরাতে যে শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে, কেয়ামতের ধারাবাহিক দৃশ্যাবলী তুলে ধরতে গিয়ে সেই শাস্তির উল্লেখ অপেক্ষাকৃত দ্রুতগতিতে করা হয়েছে। আসলে এটা করা হয়েছে মোশরেকদের এই প্রশ্নের জবাবে যে, 'আমাদের কাছে ফেরেশতা আনা হলো না কেন বা আমরা আমাদের প্রভুকে দেখতে পাই না কেন?' এরপর কিস্তিতে কিস্তিতে কোরআন নাযিল হওয়া সম্পর্কে তাদের আপত্তির বিবরণ দেয়া হয়েছে, কোরআনকে পর্যায়ক্রমে নাযিল করার যৌক্তিকতা তুলে ধরা হয়েছে, এবং মোশরেকরা যে কোনো বিতর্কে রসূল (স.)-কে চ্যালেঞ্জ দিলেই আল্লাহ তায়ালা তাঁকে সাহায্য করবেন বলে আশ্বস্ত করা হয়েছে,

'তারা তোমার কাছে যখনই কোনো দৃষ্টান্ত পেশ করবে, অমনি আমি তোমার কাছে প্রকৃত সত্য ও উত্তম ব্যাখ্যা তুলে ধরবে।'..........

এক পর্যায়ে তাঁকে ও মোশরেকদেরকে পূর্বেকার কাফের ও মোশরেকদের ধ্বংসের কাহিনী শোনানো হয়েছে। বিশেষত হযরত লূত (আ.)-এর জাতির ধ্বংসের ইতিহাসের প্রতি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। কেননা তাদের এলাকা দিয়ে আরবের মোশরেকরা প্রতিনিয়ত চলাফেরা করে থাকে। তা সত্তেও সেই ধ্বংসের চিহ্নগুলো তাদের বিবেককে কিছুমাত্র আলোড়িত না করায় তাদের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়েছে। এ সবই মূলত রসূল (স.)-এর প্রতি তাদের ব্যংগ বিদ্রূপ ও ধৃষ্টতাপূর্ণ কটূক্তিগুলো উল্লেখ করার ভূমিকা হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। আর এই আলোচনারই শেষ পর্যায়ে তাদের সম্পর্কে নিম্নরূপ কঠোর মন্তব্য করা হয়েছে,

'তারা পশু ছাড়া আর কিছু নয়, বরং পশুর চেয়েও পথভ্রষ্ট।'

কাফেরদের ধৃষ্ঠতাপূর্ণ মন্তব্য ও তার পরিণতি

'যারা আমার সাথে সাক্ষাতের আশা করে না তারা বলে আমাদের কাছে ফেরেশতা আসে না কেন............... (আয়াত ২১-২৯)

মোশরেকরা আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের আশা করে না। অর্থাৎ সাক্ষাত করতে হবে বলে বিশ্বাস করে না, সে সাক্ষাতকে হিসাবে আনে না এবং তার ভিত্তিতে নিজেদের জীবন ও কর্মকান্ডকে পরিচালিত করে না। এ কারণে তাদের মনে আল্লাহর ভয় থাকে না এবং তারা মুখ দিয়ে এমন সব কথা উচ্চারণ ও এমন সব মনোভাব ব্যক্ত করে, যা আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করতে হবে এ কথা বিশ্বাস করলে কেউ উচ্চারণ করতে পারে না। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'যারা আমার সাথে সাক্ষাতের আশা করে না তারা বলে, আমাদের কাছে ফেরেশতা আসে না কেন?'

মানুষের রসূল হওয়াকে তারা অসম্ভব মনে করতো। আর যদি কোনো মানুষ রসূল হয়ে আসেই, তবে এই রসূল যে আকীদা ও আদর্শে বিশ্বাস স্থাপনের দাওয়াত দেন, তাতে বিশ্বাস

স্থাপনের জন্যে তারা শর্ত আরোপ করে যে, তাদের কাছে ফেরেশতারা এসে সাক্ষ্য দিক যে, রসূলের দাওয়াত সত্য, অথবা স্বয়ং আল্লাহকে দেখবার সুযোগ তাদেরকে দেয়া হোক। তাহলেই তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে, এটা আসলে আল্লাহর মহিমা ও মর্যাদার ওপর তাদের ঔদ্ধত্য প্রকাশেরই নামান্তর। আল্লাহর বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বকে অনুধাবন করে না এবং তার যথোচিত মূল্য দেয় না, এমন অজ্ঞ ও ধৃষ্ট লোকেই এ ধরনের ঔদ্ধত্য ও অহংকার প্রকাশ করতে পারে। অহংকার ও ঔদ্ধত্যের একমাত্র অধিকারী তো মহা প্রতাপান্বিত ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালা। তারা তো সেই আল্লাহরই সৃষ্টি এবং তারই দাসানুদাস। তাঁর মহাসাম্রাজ্য ও বিশাল সৃষ্টিজগতে অতি তুচ্ছ ও ক্ষুদ্র কণা মাত্র। তাদের কী অধিকার আছে সেই আল্লাহর সামনে অহংকার ও ঔদ্ধত্য প্রকাশ করার? তাদের একমাত্র করণীয় হলো আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার মাধ্যমে তাঁর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা এবং তাঁর কাছ থেকে যথোপযুক্ত মূল্য ও মর্যাদা লাভ করা। এ কারণেই আয়াতের শেষাংশে তাদের এই ধৃষ্টতার প্রকৃত উৎস ও কারণ চিহ্নিত করে তাদের জবাব দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে,

'তারা অহংকারে ও নিদারুণ বিদ্রোহে লিপ্ত হয়েছে।'

অর্থাৎ তাদের নিজেদের কাছে নিজেদেরকে খুবই বড় মনে হয়েছে। তাই তারা অহংকার করেছে ও মারাত্মক রকমের বিদ্রোহে লিপ্ত হয়েছে। নিজেদের সম্পর্কে তারা মাত্রাতিরিক্ত উচ্চ ধারণা পোষণ করেছে। ফলে নিজেদের প্রকৃত মূল্য ও মর্যাদা নিরূপণে তারা সক্ষম হচ্ছে না, তারা নিজেদেরকে এ মহাবিশ্বের এতো বড় সৃষ্টি ভেবেছে যেন তারা স্বয়ং আল্লাহর সাক্ষাত লাভের যোগ্য, যাতে তাঁর প্রতি তারা ঈমান আনতে পারে।

এরপর তাদের সাথে ন্যায়সংগতভাবেই বিদ্রূপাত্মক ভংগীতে বলা হয়েছে যে, তারা ফেরেশতাদেরকে একদিন যথার্থই দেখতে পাবে। তবে সে দিন হবে তাদের জন্যে খুবই ভয়ংকর। সেদিন তাদের জন্যে এমন আযাব প্রস্তুত থাকবে, যাকে প্রতিহত করা ও যা থেকে উদ্ধার পাওয়ার কোনো ক্ষমতাই তাদের থাকবে না। ওটা হবে হিসাব-নিকাশ ও শাস্তির দিন।

'যেদিন তারা ফেরেশতাদেরকে দেখবে, সেদিন অপরাধীদের জন্যে কোনো সুসংবাদ থাকবে না এবং তারা বলবে, আশ্রয় চাই, পানাহ চাই।' (আয়াত ২২)

অর্থাৎ যেদিন তাদের ফেরেশতা দেখার আবদার পূরণ করা হবে, সেদিন অপরাধীদেরকে কোনো সুংবাদ দেয়া হবে না, বরঞ্চ শাস্তি দেয়া হবে। সেদিন তারা যে, 'আশ্রয় চাই, পানাহ চাই' বলে ফরিয়াদ জানাবে, তাতে কেউ কর্ণপাতই করবে না। 'হেজরাম মাহজুরা' শব্দটার অর্থ আশ্রয় চাই, পানাহ চাই। সাধারণত শত্রুর আক্রমণ ও নির্যাতন থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে আরবরা এ কথাটা বলে থাকে। যেহেতু আকস্মিকভাবে শত্রুর আক্রমণে দিশেহারা হয়ে এ কথাটা বলতে তারা অভ্যস্ত, তাই এ কথাটা কেয়ামতের দিনও তাদের মুখ থেকে আপনা আপনিই বেরিয়ে পড়বে। কিন্তু তাতে কোনো লাভ হবে না। এ ফরিয়াদ তাদেরকে আযাব থেকে রক্ষা করতে পারবে না।(১)

'আর তাদের করা সকল সৎ কর্মের কাছে আমি আসবো এবং সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধুলোয় পরিণত করবো।' (আয়াত ২৩)

এক নিমেষেই এ সব ঘটনা ঘটে যাবে। মানুষের করা সৎ কর্মগুলোর কাছে আল্লাহ তায়ালা সেদিন কিভাবে আগমন করবেন, তা কল্পনার মানসপটে চিত্রিত করা হয়েছে কোরআনের সুনিপুণ

---

(১) 'হেজরাম মাহজুরান' শব্দ দু'টোর অর্থ অপ্রতিরোধ্য দেয়াল, চূড়ান্ত অস্বীকার, চূড়ান্ত নিষেধাজ্ঞাও হতে পারে। এই আয়াতের মূল অনুবাদ অংশ দ্রষ্টব্য।—সম্পাদক।

শৈল্পিক ভংগিতে। চিত্রিত করা হয়েছে কিভাবে তিনি মানুষের সৎকর্মগুলোকে বাতাসে বিক্ষিপ্ত করে দেবেন। এর ফলে সমস্ত সৎকর্ম উড়ন্ত ধূলি কনায় পরিণত হবে। কারণ তা ঈমানের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলো না। যা কিনা মানুষের মনকে আল্লাহর সাথে সংযুক্ত করে দেয় এবং সৎ কর্মগুলোকে উদ্দেশ্যহীন, লক্ষ্যহীন, ও সাময়িক আবেগ তাড়িত কাজের পরিবর্তে সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বিশিষ্ট কাজে পরিণত করে। বস্তুত উদ্দেশ্যহীন ও লক্ষ্যহীন কাজের কোনো মূল্য থাকতে পারে না।

ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষের অস্তিত্ব, জীবন ও কর্ম সবই মূলত এই মহা বিশ্বের স্রষ্টার ইচ্ছা ও আজ্ঞার অধীন এবং যে নিয়ম কানুনের অধীনে মহাবিশ্ব পরিচালিত হয়, তার আওতাধীন। এই নিয়ম-কানুনগুলো সবই আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক রচিত ও বাস্তবায়িত। স্বয়ং মানুষ এবং তার কার্যকলাপও এর আওতাধীন। কিন্তু মানুষ যখন আল্লাহর প্রতি কুফরী তথা তাঁর হুকুমের অবাধ্যতা দ্বারা আল্লাহর এই বিশাল সাম্রাজ্য ও তাঁর আইন কানুন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, তখন সে একটা মূল্যহীন ও গুরুত্বহীন বাজে জিনিসে পরিণত হয় এবং তার সৎ কাজের কোনোই কার্যকারিতা ও গ্রহণযোগ্যতা থাকে না, এমনকি তার কর্মকান্ডের অস্তিত্বই থাকে না।

একমাত্র ঈমানই মানুষকে তার প্রতিপালকের সাথে সম্পৃক্ত করে। আর এই সম্পর্কই তার কাজের গুরুত্ব ও গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টি করে এবং এই সৃষ্টি জগতে তার অবস্থান নিশ্চিত করে।

এভাবেই মোশরেকদের যাবতীয় সৎ কাজ নিষ্ফল প্রতিপন্ন হয়। এই নিষ্ফল হওয়ার ব্যাপারটাকে কোরআন এভাবে চিত্রিত করেছে,

'আমি তাদের করা সৎ কাজগুলোর কাছে আসবো এবং সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধুলোয় পরিণত করবো।' (আয়াত ২৩)

এরপর তাদের প্রতিপক্ষ জান্নাতবাসী মোমেনদের অবস্থার বিবরণ দেয়া হয়েছে, যাতে দৃশ্যটা পূর্ণাংগ হয়।

'সেদিন জান্নাতবাসীর বাসস্থান হবে সর্বোত্তম স্থিতিশীল এবং তাদের বিশ্রামাগারও হবে উৎকৃষ্টতম।' (আয়াত ২৪)

বস্তুত তারা তো ছায়াশীতল স্থায়ী বাসস্থানে পরম সুখে অবস্থান করবে। বাসস্থানের এই স্থিতি ও স্থায়িত্ব বিক্ষিপ্ত ধুলোর অস্থিতিশীলতার ঠিক বিপরীত। আর এ আয়াতে তাদের যে তৃপ্তিময় ও সুখময় বসবাসের দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়, তা জাহান্নামবাসীর দুর্দশা ও অস্থিরতার ঠিক বিপরীত।

কেয়ামতের ধ্বংসলীলা ও কাফেরদের করুন পরিণতি

কাফেররা দাবী জানাতো যে, আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদের সাথে নিয়ে সদল বলে মেঘমালার ভেতরে দৃশ্যমান হোক। ইসরাঈলী কেচ্ছা কাহিনীতে আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে এরূপ ধারণা দেয়া হতো যে, আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে মেঘমালার ভেতরে বা আগুনের শিখার ভেতরে দর্শন দিতেন। এসব কেসসা কাহিনী দ্বারা প্ররোচিত হয়েই তারা এরূপ দাবী করতো। এই পটভূমিতেই ২৫ ও ২৬ নং আয়াতে আরেকটা দৃশ্যের অবতারণা করা হয়েছে। তাদের কাছে ফেরেশতা আসুক এই মর্মে তারা যে দাবী তুলতো, সেটা এই দৃশ্যে পূর্ণ হয়েছে।

'যেদিন আকাশ মেঘমালাসহ ফেটে পড়বে এবং ফেরেশতাদেরকে নামানো হবে। সেদিন প্রকৃত রাজত্ব হবে করুণাময় আল্লাহর এবং কাফেরদের জন্যে সে দিনটা হবে খুবই কষ্টকর।'

এ আয়াত এবং অন্য বহুসংখ্যক আয়াত প্রমাণ করে যে, কেয়ামতের দিন মহাবিশ্বে বিরাট বিরাট ঘটনা ঘটবে। সে সব ঘটনার সার কথা এই যে, দৃশ্যমান এই মহাবিশ্বের বিভিন্ন জগত, আকাশ, কক্ষপথ, গ্রহ-নক্ষত্র সব কিছুই একেবারে এলোমেলো ও ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাবে। এগুলোর নিয়ম শৃংখলা, সংযোগ, সম্বন্ধ ও আকৃতি প্রকৃতি ওলট পালট হয়ে আজকের দৃশ্যমান এই সৃষ্টি জগতের সমস্ত নিয়মতান্ত্রিকতার অবসান ঘটবে। এই ওলট পালট ও বিপ্লব শুধু পৃথিবীতেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, বরং গ্রহ নক্ষত্র ও মহাকাশেও বিস্তৃত হবে। এই বিপ্লব সম্পর্কে বিভিন্ন সূরায় যে বিবরণ এসেছে, সেগুলো এ প্রসংগে তুলে ধরা যেতে পারে। যেমন, 'সূর্য যখন আলোহীন হয়ে পড়বে, নক্ষত্রসমূহ যখন খসে পড়বে, পর্বতমালাকে যখন উৎপাটিত করা হবে, ... সমুদ্রগুলোকে যখন উদ্বেলিত করা হবে'...... 'আকাশ যেদিন ফেটে যাবে, নক্ষত্রগুলো যেদিন বিক্ষিপ্ত হবে, সাগরগুলোকে যখন উত্তাল করা হবে এবং কবরগুলোকে যখন খোলা হবে'......'আকাশ যেদিন ফেটে যাবে। এবং নিজ প্রভুর আদেশ পালন করবে ....(সূরা তাকওয়ীর, ইনফেতার, ইনশেকাক, রহমান, ওয়াকেয়া, হাক্কাহ, মায়ারেজ, যিলযাল, কারেয়া, দুখান, মোযযাম্মেল, ফজর, কেয়ামাহ, মুরসালাত, তোয়াহা, নামল, কাহফ, ইবরাহীম ও আম্বিয়াতে কেয়ামত সংক্রান্ত আয়াতগুলো দেখুন)

এসব আয়াত থেকে জানা যায় যে, আমাদের এই বিশ্বজগতের ধ্বংসের ঘটনাটা হবে লোমহর্ষক। পৃথিবীতে ভূমিকম্প হবে এবং তাকে ভেংগে চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হবে। পাহাড় পর্বত ধূলিসাৎ হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। সমুদ্রগুলো উদ্বেলিত হবে। এটা সমগ্র পৃথিবী আলোড়িত হওয়ার কারণে হতে পারে, বা তার সমস্ত অণু পরমাণু বিস্ফোরিত হয়ে আগুনে পরিণত হবার কারণেই হতে পারে। নক্ষত্রমন্ডলি আলোহীন হয়ে খসে খসে পড়বে। আকাশ ফেটে চূর্ণ-বিচূর্ণ হবে। গ্রহ উপগ্রহ ধ্বংস হয়ে ছুটে পড়বে। পারস্পরিক দূরত্ব বিঘ্নিত হওয়ার ফলে সূর্য ও চন্দ্র একত্রিত হবে। আকাশ কখনো ধুমায়িত এবং কখনো আগুনে জ্বলতে জ্বলতে লাল হয়ে যাবে। এভাবে আরো বহু গা শিউরে ওঠা বিবরণ রয়েছে।

চলতি সূরা ফোরকানে আল্লাহ তায়ালা মোশরেকদেরকে হুমকি দিচ্ছেন যে, আকাশ ও মেঘমালা ভেংগে চুরমার হয়ে যাবে। এই মেঘমালা সেই ভয়ংকর বিস্ফোরণগুলোর গ্যাস থেকে সৃষ্ট পুঞ্জীভূত মেঘমালাও হতে পারে। সেদিন ফেরেশতারাও কাফেরদের কাছে আসবে, যেমনটি তারা দাবী করতো। কিন্তু এই আসা রসূলের দাওয়াতের সত্যতা প্রমাণের জন্যে নয়, বরং আল্লাহর হুকুম অনুসারে তাদেরকে আযাব দেয়ার জন্যে। এ জন্যেই বলা হয়েছে যে, 'সে দিনটা হবে কাফেরদের জন্যে কঠিন দিন।' কারণ ওই দিনে আযাব ও অনেক ভীতিপ্রদ ঘটনাবলী ঘটবে। যদিও তারা ফেরেশতা পাঠানোর দাবী জানাচ্ছিলো। কিন্তু ফেরেশতারা সেই কঠিন দিনে ছাড়া আসবে না।

এরপর সে দিনের একটা দৃশ্যও দেখানো হচ্ছে, যাতে অত্যাচারী অবাধ্য বান্দাদেরকে অনুতাপ ও অনুশোচনা করতে দেখা যাচ্ছে। এ দৃশ্য বেশ দীর্ঘ হয়েছে। এমনকি পাঠকের কাছে মনে হতে থাকে যেন এর কোনো শেষ নেই। দৃশ্যটা হলো, অপরাধীদের অনুশোচনায় হাত কামড়ানো।

'যেদিন অবাধ্য অত্যাচারী নিজের উভয় হাত কামড়াবে আর বলতে থাকবে যে, হায়, আমি যদি রসূলের অনুসারী হতাম, হায় আমি যদি 'অমুককে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ না করতাম, আমার কাছে কোরআন রূপী স্মারক আসার পরও তা থেকে সে আমাকে বিপথগামি করেছে। বস্তুত শয়তান মানুষের নিদারুণ অপমানকারী। (আয়াত ২৭, ২৮-২৯)

এ সময় তার চার পাশের সকল বস্তু থাকবে নীরব ও নিস্তব্ধ। এই পরিবেশে সে তার অনুশোচনাপূর্ণ গভীর প্রভাব বিস্তারকারী সুদীর্ঘ বক্তব্য পেশ করে। ফলে শ্রোতা ও পাঠক উভয়েই এই অনুশোচনায় শরীক বলে মনে হচ্ছে।

অত্যাচারী যেদিন তার উভয় হাত কামড়াবে? অর্থাৎ একখানা হাত কামড়ানোকে সে যথেষ্ট মনে করবে না, বরং হয় এক হাতের পর আর এক হাত কামড়াবে, নতুবা উভয় হাত এক সাথেই কামড়াবে। কেননা তীব্র অনুশোচনা তার বিবেককে দংশন করে তাকে অস্থির করে তুলবে। হাত কামড়ানো এমন একটা কাজ, যা একটা বিশেষ মানসিক অবস্থার ইংগিত দেয়া এবং তাকে শারীরিক অবস্থার আকৃতিতে তুলে ধরে।

'সে বলবে, হায়! আমি যদি রসূলের অনুসারী হতাম।'

অর্থাৎ যে রসূলের রেসালাতকে সে অস্বীকার করতো এবং আল্লাহ তায়ালা তাকে রসূল করে পাঠাতে পারেন বলেই মনে করতো না, সেই রসূলেরই অনুসারী না হওয়ার জন্যে আক্ষেপ করবে।

'হায় আক্ষেপ, আমি যদি অমুককে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ না করতাম।'

নাম উল্লেখ না করে 'অমুক' শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে যাতে এমন প্রত্যেক অসৎ সংগী এর আওতায় এসে যায়, যে মানুষকে রসূলের পথ থেকে দূরে সরায় এবং আল্লাহর স্মরণ থেকে বিপথগামী করে। (১)

'সে তো আমাকে (কোরআনের) উপদেশ আসার পর তা থেকে বিপথগামী করেছে।'

অর্থাৎ সে বিভ্রান্তকারী শয়তান অথবা তার চেলা ছিলো।

'শয়তান মানুষের জন্যে নিদারুণ অপমানকারী।'

অর্থাৎ অপমানিত হতে হয় এমন পথে টেনে নিয়ে যায় এবং অপমানিত করে। আর আতংকজনক ও কষ্টদায়ক পথে টেনে নিয়ে যায়।

এভাবেই কোরআন এসব ভয়ংকর দৃশ্য তুলে ধরে মানুষের মনকে সচকিত করে এবং তাদের শোচনীয় পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করে। এসব দৃশ্য কাফেরদের লোমহর্ষক পরিণতি তুলে ধরে এবং তাদেরকে একটা বাস্তব ঘটনা প্রদর্শন করায়। অথচ এর পরও তারা আল্লাহর সামনে উপস্থিতির সম্ভাবনাকে অস্বীকার করে, সর্বত্র সর্বক্ষণ আল্লাহর বিদ্যমানতাকে কিছুমাত্র সমীহ না করে চ্যালেঞ্জ করে এবং এমন সব ঔদ্ধত্যপূর্ণ দাবী জানায়, যা অত্যন্ত ভয়াবহ রূপ নিয়ে সময়োত্তীর্ণ অনুতাপ ও অনুশোচনা সহকারে তাদের জন্যে পরকালে অপেক্ষমান থাকবে।

কেয়ামতের সেই কঠিন দিন সংক্রান্ত এই বিবরণ দেয়ার পর রসূল (স.)-এর সাথে তাদের নীতি ও আচরণ এবং কোরআন অবতরণের পদ্ধতি সম্পর্কে তাদের আপত্তিগুলো নিয়ে আলোচনা

---

(১) এ আয়াতের নাযিল হওয়ার পটভূমি সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, কোরায়শ নেতা ওকবা ইবনে আবি মুইত রসূল (স.)-এর সাথে বেশ ঘন ঘন দেখা করতো। সে একবার রসূল (স.)-কে খাবার দাওয়াত দিলো। রসূল (স.) বললেন, তুমি ইসলাম গ্রহণ না করলে আমি তোমার খাবার গ্রহণ করবো না। ওকবা তৎক্ষণাত কলেমায়ে শাহাদাত পড়লো। এতে তার বন্ধু উবাই বিন খালফ তাকে তিরস্কার করলো এবং বললো, তুমি সাবী (নক্ষত্র পূজারী) হয়ে গেলে? ওকবা বললো, আল্লাহর কসম, আমি নক্ষত্র পূজারী হইনি, তবে মোহাম্মদ আমার বাড়িতে বসেই আমার খাদ্য খেতে অস্বীকার করায় কলেমা পড়েছি। উবাই বললো, তোমার কোনো অজুহাতে আমি সন্তুষ্ট হবো না যতক্ষণ মোহাম্মাদের মাথায় পা না রাখো এবং তাঁর মাথায় থুথু না দাও। এরপর ওকবা রসূল (স.)-কে কাবার চত্বরে সেজদারত পেয়ে তার মাথায় পা রাখলো ও থুথু দিলো। রসূল (স.) বললেন, আমি তোমাকে যখনই মক্কার বাইরে পাবো তখনই তরবারী দিয়ে তোমার মাথা কেটে শুন্যে উঁচু করবো। পরে বদরের যুদ্ধে সে বন্দী হয় এবং রসূল (স.) হযরত আলীকে আদেশ দিয়ে তাকে হত্যা করান।

করা হয়েছে। অতপর হাশরের ময়দানে তারা কিভাবে উপস্থিত হবে, সে দৃশ্যটাও এখানে দেখানো হচ্ছে।

'আর রসূল বলবে হে আমার প্রতিপালক, আমার জাতি এই কোরআনকে পরিত্যক্ত করে রেখেছিলো।' (আয়াত ৩০-৩৪)

বস্তুত যে কোরআনকে আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রিয় বান্দার ওপর নাযিল করেছিলেন এই উদ্দেশ্যে, যেন তা দিয়ে তিনি মানুষকে সতর্ক করেন ও সচেতন করেন, সেই কোরআনকে তারা পরিত্যক্ত করে রেখেছিলো। অর্থাৎ তা তারা শুনতো না। কেননা তারা জানতো যে, শুনলে হয়তো তাদের মন তার দিকে এমনভাবে আকৃষ্ট হবে যে, তা আর ফেরাতেই পারবে না। কোরআনের মর্মার্থ হৃদয়ংগম করার জন্যে এবং সত্যকে উপলব্ধি করার জন্যে তারা কোরআনকে মনোযোগ দিয়ে শুনতো না এবং তা নিয়ে গবেষণাও করতো না। যে কোরআন এসেছিলো মানুষের জীবন ব্যবস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবার জন্যে, সেই কোরআনকে তারা জীবন ব্যবস্থা বানানোর পরিবর্তে পরিত্যক্ত করে রেখে দিয়েছে। ৩০ নং আয়াতে এ কথাই বলা হয়েছে।

আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই এটা জানতেন। তথাপি আল্লাহর কাছে নিজের অন্তরের একাগ্রতা ও নিষ্ঠা প্রমাণ করার জন্যেই এ কথা বলবেন, যাতে আল্লাহ তায়ালা নিজেই সাক্ষ্য দেন যে, রসূল চেষ্টার কোনো ক্রটি রাখেননি। কিন্তু তাঁর জাতি এ কোরআনকে মনোযোগ দিয়ে শোনেইনি এবং তা দিয়ে কোনো চিন্তা-ভাবনাও করেনি।

বাধা বিপত্তি ইসলামী আন্দোলনকে গতিশীল করে

পরবর্তী আয়াতে (৩১ নং) আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবীকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন ও সমবেদনা জানাচ্ছেন এই বলে যে, প্রত্যেক নবীরই কিছু শত্রু থাকতো, যারা তার কাছে আগত হেদায়াতের বাণীকে পরিত্যাগ করতো এবং আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে দূরে ঠেলে দিতো। তবে আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবী ও রসূলদেরকে কিভাবে তাঁর শত্রুদের ওপর বিজয়ী হওয়া যায়, তা শিক্ষা দিয়েছেন তিনি বলেছেন,

'এভাবেই আমি প্রত্যেক নবীর জন্যে অপরাধীদের মধ্য থেকে একজন শত্রু তৈরী করে রেখেছি। তবে তোমার প্রভুই তোমার সুপথ প্রদর্শক ও সাহায্যকারী হিসেবে যথেষ্ট।'

সুক্ষ্ম ও অব্যর্থ কৌশল একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই প্রয়োগ করে থাকেন।

ইসলামের দাওয়াতের বিরুদ্ধে শত্রু সৃষ্টিও তার এক সুনিপুণ কৌশল। এসব শত্রুর আবির্ভাব দাওয়াতকে শক্তিশালী করে এবং তাকে সংকল্পের দৃঢ়তা দান করে। দাওয়াতে নিয়োজিত লোকেরা যখন এসব শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রামে লিপ্ত হয়, তখন এতে তাদের যতো কষ্টই হোক এবং দাওয়াত যতোই বাধাগ্রস্ত হোক, তখন এই সংগ্রামই সত্য দাওয়াতকে মিথ্যা ও মেকি দাওয়াত থেকে পৃথক করে। এই সংগ্রামই একনিষ্ঠ দাওয়াতদাতাদেরকে ভন্ড ও প্রতারকদের থেকে বাছাই করে আলাদা করে। ফলে সংগ্রামের পর মুসলমানদের মধ্যে কোনো লোভী ও ভন্ড থাকতে পারে না, সবাই একনিষ্ঠ ও খাঁটি মোমেন, হয়ে যায়, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া আর কিছু চায় না।

দাওয়াত যদি সহজ কাজ হতো, তার পথ যদি কুসুমাস্তীর্ণ হতো, তার পথে যদি শত্রু ও বিরোধী না থাকতো, তাকে প্রত্যাখ্যান ও তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ রচনা করার মতো লোক না থাকতো, তাহলে প্রত্যেক মানুষের পক্ষে দাওয়াতদাতা হয়ে যাওয়া সহজ হতো, হক ও বাতিলের মিশ্রিত হয়ে দাওয়াত একাকার হয়ে যেতো এবং সন্দেহ সংশয় ও ফেতনা বেড়ে যেতো। দাওয়াতের সামনে শত্রু ও বিরোধীর আবির্ভাব তার বিজয়ের সংগ্রামকে অনিবার্য করে তোলে এবং

তার জন্যে দুঃখ কষ্ট ও ত্যাগ তিতিক্ষাকে তার বিজয়ের সহায়কে পরিণত করে। এ জন্যেই একনিষ্ঠ, দৃঢ় সংকল্প ও আপোষহীন মোমেনরা ছাড়া সংগ্রাম করতে পারে না এবং দুঃখ কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করতে পারে না। কারণ তারা তাদের দাওয়াতকে আরাম আয়েশ ও ভোগ বিলাসের ওপর অগ্রাধিকার দেয়। এমনকি দাওয়াতের জন্যে যখন শাহাদাত লাভ অপরিহার্য হয়ে পড়ে, তখন তারা নিজেদের জীবনের ওপরও দাওয়াতকে অগ্রাধিকার দেয়। তিক্ত ও কষ্টকর সংগ্রামে টিকে থাকতে পারে শুধু তারাই, যারা সবচেয়ে দৃঢ় ও মযবুত ঈমানের অধিকারী, যারা সবচেয়ে কঠিন, অনমনীয় ও অবিচল মনোবলের অধিকারী, যারা আল্লাহর পুরস্কার লাভে অধিকতর আগ্রহী এবং মানুষের কাছ থেকে স্বার্থোদ্ধারে যাদের সর্বাধিক অনীহা। এভাবেই সত্যের দাওয়াত বাতিলের দাওয়াত থেকে পৃথক হয়ে যায়। এভাবেই দৃঢ় ঈমানধারী লোকেরা দুর্বল ঈমানধারী লোকদের থেকে পৃথক হয়ে যায়। এভাবেই ইসলামী দাওয়াত ও আন্দোলনে দুঃখ কষ্ট, বাধাবিপত্তি ও ত্যাগের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ দৃঢ়চেতা লোকদের মাধ্যমে ইসলামী আন্দোলন সামনে এগুতে থাকে। এসব লোকই ইসলামী দাওয়াত ও আন্দোলনের বিশ্বস্ত পতাকাবাহী। ইসলামী দাওয়াত ও আন্দোলনকে বিজয়ী করতে যা কিছু করা দরকার, তা তারাই করে থাকে এবং এর সুফলও তারাই ভোগ করে থাকে। অতীতে এ ধরনের অমিততেজা লোকেরা নিষ্ঠা ও আন্তরিকতাপূর্ণ চেষ্টা সাধনা ও ত্যাগ-তিতিক্ষার মাধ্যমে অনেক মূল্য দিয়ে বিজয় অর্জন করেছে। দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও অগ্নি পরীক্ষা তাদেরকে শিখিয়েছে পর্বত প্রমাণ বাধা ডিংগিয়ে কিভাবে আন্দোলনকে এগিয়ে নিতে হয়। ভয়ভীতি ও বাধা-বিপত্তি তাদের শক্তি ও মনোবলকেই শুধু নয়, তাদের জ্ঞানকেও বহুগুণ বৃদ্ধি করে। সঞ্চিত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত শক্তি ও জ্ঞানের এই পুঁজিই তাদের দাওয়াত ও আন্দোলনের প্রেরণার উৎস এবং এই প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়েই তারা সুখে দুঃখে সর্বাবস্থায় দাওয়াত ও আন্দোলনের পতাকা সমুন্নত রাখে।

বেশীরভাগ ক্ষেত্রে যা ঘটে থাকে তা এই যে, অপরাধীদের সাথে ইসলামী আন্দোলনের সাথীদের সংঘর্ষে অধিকাংশ মানুষ প্রথমে নীরব দর্শক হয়ে উপভোগ করে। পরবর্তী পর্যায়ে যখন ইসলামী শিবিরে ক্ষয়-ক্ষতি, কোরবানী ও দুঃখ কষ্টের মাত্রা বেড়ে যায় এবং তখনো তারা দাওয়াতের কাজে অবিচল থেকে সামনে এগুতে থাকে, তখন নীরব দর্শক জনতা বলে বা ধারণা করে যে, এতো ক্ষয়ক্ষতি ও দুঃখকষ্টের পর এরা আর দাওয়াতের ওপর টিকে থাকতে পারবে না। তবে এই পর্যায়ে তাদের এ বিশ্বাসও জন্মে যে, এই দাওয়াত ও আন্দোলনে লিপ্ত লোকেরা যা কিছু হারাচ্ছে, তার চেয়েও মূল্যবান একটা কিছু নিশ্চয়ই অর্জন করছে। যা তাদের কাছে দুনিয়ার যাবতীয় সহায় সম্পত্তি এমনকি তাদের জীবনের চেয়েও অগ্রগণ্য। অবশেষে তারা সেই আকীদা ও আদর্শের সন্ধান পেয়ে যায় যা জীবন ও সহায় সম্পদের চেয়ে মূল্যবান এবং দীর্ঘকাল নীরব দর্শক হয়ে লড়াই দেখার পর দলে দলে ইসলামী আকীদা ও আদর্শকে গ্রহণ করে।

এই উদ্দেশ্যেই আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক নবীর জন্যে অপরাধীদের মধ্য থেকে শত্রু সৃষ্টি করেছেন। এই উদ্দেশ্যেই অপরাধীদেরকে ইসলামী আন্দোলনের পথে প্রতিবন্ধক শক্তিতে পরিণত করেছেন, আর আন্দোলনকারীদেরকে অপরাধীদের বিরুদ্ধে করেছেন সংগ্রামমুখর। এতে তাদের ক্ষয়ক্ষতি ও দুর্ভোগ যতোই হোক দাওয়াতকে তারা এগিয়ে নিয়ে যাবে। ফলাফল আগে থেকেই নির্ধারিত ও পরিচিত। আল্লাহর ওপর যাদের অটুট আস্থা রয়েছে, তারা নির্ভুলভাবে জানে যে, এর ফলে তাদের আর যাই হোক, সত্যের পথের সন্ধান লাভ এবং বিজয় অর্জন তাদের জন্যে সুনিশ্চিত। আল্লাহ তায়ালা তাই বলেছেন,

'হেদায়াতকারী ও বিজয়দানকারী হিসেবে তোমার প্রভুই যথেষ্ট।'

নবীদের পথে অপরাধী গোষ্ঠীর বাধা হয়ে দাঁড়ানো একটা স্বাভাবিক ব্যাপার। কেননা ইসলামের দাওয়াত ঠিক এমন সময়ই আবির্ভূত হয়, যখন সমাজে বা সমগ্র মানব জাতির ভেতরে পুঞ্জীভূত বিকৃতি শোধরানোর জন্যে তার আগমন অনিবার্য হয়ে পড়ে। এই বিকৃতি তাদের মনমগয, চরিত্র ও গোটা সমাজ ব্যবস্থায় সংক্রমিত হয়। অপরাধীরাই এই বিকৃতির মূল সংগঠক। তারাই সমাজে বিকৃতি ও দুষ্কৃতির জন্ম দেয় এবং তাকে কাজেও লাগায়। সমস্ত বিকৃতি ও দুষ্কৃতির ধারক বাহকরা ঐক্যবদ্ধ ও সংঘবদ্ধ থাকে এবং দুষ্কৃতিতে ভরা নোংরা ও অসুস্থ সামাজিক পরিবেশেই জীবন ধারণ করে। কেননা এই সামাজিক পরিবেশেই তাদের বিকৃত মূল্যবোধ টিকে থাকে। আর সে বিকৃত মূল্যবোধ ও বাতিল ধারণা বিশ্বাসই তাদের অস্তিত্ব রক্ষার নিশ্চয়তা দেয়। কাজেই নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার খাতিরেই তাদের নবীদের বিরুদ্ধে ও নবীদের দাওয়াতের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ স্বাভাবিক। যে ধরনের সামাজিক পরিবেশ ছাড়া তারা জীবন ধারণ করতে অপারগ, সে পরিবেশকে টিকিয়ে রাখতে তারা যে সর্বাত্মক চেষ্টা করবে, তা মোটেই অপ্রত্যাশিত নয়। এটা সুবিদিত যে, কোনো কোনো পোকা-মাকড় ফুলের সুগন্ধে দম আটকে মরে যায় এবং ময়লা আবর্জনায় ছাড়া তারা জীবন ধারণই করতে পারে না। কোনো কোনো কীটপতংগ বহমান পবিত্র পানিতে মারা যায় এবং নোংরা নর্দমা বা আঁস্তাকুড়ে ছাড়া বাঁচে না। মানব সমাজে যারা পাপী ও অপরাধী, তারাও তদ্রূপ। তাই তারা যে ইসলামের দাওয়াতের শত্রু হবে এবং তার মরণপণ প্রতিরোধে লিপ্ত হবে,সেটা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। আর শেষ পরিণতিতে ইসলামের দাওয়াতই যে বিজয়ী হবে, তাও স্বাভাবিক। কেননা তা জীবনের স্বাভাবিক নিয়মের সাথে সামঞ্জস্যশীল। আল্লাহর সাথে তার মিলিত হওয়া এবং আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী তার সর্বোচ্চ উৎকর্ষ ও পূর্ণতা লাভ করা তার জন্যে অবধারিত।

'তোমার প্রভু হেদায়াতকারী ও সাহায্যকারী হিসাবে যথেষ্ট।' এ কথার মর্মার্থ এটাই।

পর্যায়ক্রমে কোরআন নাযিলের তাৎপর্য

এরপর আবার কোরআনের দাওয়াতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী অপরাধী গোষ্ঠীর বিভিন্ন কথার পর্যালোচনা করা ও জবাব দেয়া হয়েছে।

তন্মধ্যে একটা হলো,

'কাফেররা বলে মোহাম্মদের ওপর সমস্ত কোরআন একসাথে নাযিল হয় না কেন। এভাবেই নাযিল হবে যাতে আমি তোমার মনকে স্থির ও মযবুত করে দেই, আর (এ কারণেই) আমি কোরআনকে থেমে থেমে নাযিল করি।'এই কোরআন এসেছে একটা জাতি, একটা সমাজ ও একটা রাষ্ট্র গঠন করার উদ্দেশ্যে। আর এই গঠন প্রক্রিয়ায় দীর্ঘ সময় প্রয়োজন, গোটা সমাজ তার বাণী দ্বারা প্রভাবিত হওয়া প্রয়োজন এবং এই প্রভাবকে বাস্তবে রূপদান করতে পারে এমন একটা জোরদার আন্দোলনের প্রয়োজন। নতুন বিধানের ধারক একখানা পূর্ণাংগ পুস্তক পড়ে রাতারাতি নিজেকে পুরোপুরিভাবে বদলে ফেলা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। সে একটু একটু করে নতুন বিধানের এক এক অংশ প্রয়োগ করে পর্যায়ক্রমে নিজেকে তা দ্বারা প্রভাবিত ও পরিবর্তিত করতে পারে। এর দায়িত্ব বহনে সে ক্রমে ক্রমে অভ্যস্ত হয়ে থাকে। একটা বিশাল ও কঠিন কাজ সে সহসাই সম্পন্ন করতে পারে না। তাকে যদি প্রতিদিন একটা নির্দিষ্ট ও সহনীয় পরিমাণে 'ডোজ' দেয়া হয়,

তবে সে পরের দিন পরবর্তী ডোজ গ্রহণের যোগ্যতা অর্জন করে এবং পরবর্তী ডোজ তার কাছে অধিকতর সুস্বাদু লাগে। পবিত্র কোরআন সমগ্র মানব জীবনের জন্যে একটা পূর্ণাংগ বিধান নিয়ে এসেছে। সেই সাথে সে এমন একটা প্রশিক্ষণ পদ্ধতিও নিয়ে এসেছে যা মানুষের জন্মগত স্বভাব প্রকৃতির সাথে সংগতিশীল এবং স্রষ্টার কাছ থেকে সে মানুষকে যথাযথ জ্ঞান অর্জনও করে। এ জন্যে সে মুসলিম সমাজের দৈনন্দিন প্রয়োজন পূরণের উপযোগী জ্ঞানের ভান্ডার হয়ে এসেছে। তাদেরকে প্রশিক্ষণ পদ্ধতির অধীনে পর্যায়ক্রমিক আকারে মুসলমানদের যোগ্যতা অনুসারে নিরবচ্ছিন্ন উন্নতি ও অগ্রগতির পথে ধাবিত হওয়ার জন্যে এ কেতাব পথ প্রদর্শক হয়ে এসেছে। এ কেতাব মানুষের জীবন যাপনের ও প্রশিক্ষণের পদ্ধতি নিয়ে এসেছে যে, শুধু জ্ঞান ও আনন্দ লাভের উদ্দেশ্যে পড়ার জন্যেই আসেনি যে, কোরআন এসেছে তাকে অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়িত করার জন্যে। কোরআন এ জন্যে এসেছে। এর আয়াতগুলো মুসলমানদের জন্যে দৈনন্দিন নির্দেশরূপে পরিগণিত হবে এবং তারা তা তাৎক্ষণিকভাবে পালন করবে যেমন সৈনিক রণাংগনে বা সেনা শিবিরে করে থাকে। শুধু আদেশ পালনে নিজেকে বাধ্য মনে করে পালন করবে না বরং যথাযথভাবে বুঝে সুঝে, পূর্ণ আগ্রহ ও উদ্দীপনার সাথে করবে।

এ উদ্দেশ্যেই কোরআন থেমে থেমে ক্রমান্বয়ে নাযিল হয়েছে। সর্বপ্রথম সে রসূল (স.)-এর অন্তরে এর শিক্ষা বদ্ধমূল করে এবং পর্যায়ক্রমে এক অংশের পর আর এক অংশ প্রয়োজন অনুসারে শিক্ষা দেয়।

'এভাবেই নাযিল করা হয়েছে, যাতে এটা আমি তোমার অন্তরে বদ্ধমূল করি আর একে পর্যায়ক্রমে পড়ে শুনাই।'

এখানে 'তারতীল' শব্দটা দ্বারা পর্যায়ক্রমিক প্রক্রিয়া বুঝানো হয়েছে, যা আল্লাহর সুক্ষ্ম জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও মোমেনদের হৃদয়ের গ্রহণক্ষমতা ও যোগ্যতা অনুসারে কার্যকর করা হয়।

কোরআন তার এই পর্যায়ক্রমিক প্রশিক্ষণ পদ্ধতি প্রয়োগ করে অলৌকিক সাফল্যের সাক্ষর রেখেছে। মুসলমানরা এই পর্যায়ক্রমিক পদ্ধতিতে কোরআন শেখার কারণে নিজেদের জীবন কোরআনের সাথে এতো সংগতিশীল করতে পেরেছে যে, তাকে অলৌকিক সাফল্য বলা যায়। পরবর্তীকালে মুসলমানরা যখন এই পদ্ধতির কথা ভুলে গেছে এবং কোরআনকে নিছক সাংস্কৃতিক বিনোদন ও নিছক তেলাওয়াত কেন্দ্রিক এবাদাতের পুস্তক হিসেবে গ্রহণ করেছে, প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ও জীবন পদ্ধতির পুস্তক হিসেবে গ্রহণ করেনি, তখন তা দ্বারা তাদের উপকৃত হওয়ার সুযোগ তিরোহিত হয়ে গেছে। কেননা মহান আল্লাহ তায়ালা এ দ্বারা উপকৃত হওয়ার যে পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন, তাকে তারা উপেক্ষা করেছে।

পরবর্তী আয়াতে রসূল (স.)-কে আরো আশ্বাস দেয়া হয়েছে যে, মোশরেকরা যখনই নতুন করে কোনো বিতর্ক বা আপত্তি তুলবে, অমনি রসূল (স.)-কে অকাট্য প্রমাণাদি সরবরাহ করা হবে।

'তারা যখনই তোমার কাছে নতুন কোনো উদাহরণ নিয়ে আসবে, অমনি আমি তোমার কাছে অকাট্য সত্য ও উৎকৃষ্টতর ব্যাখ্যা পাঠাবো।'

এ কথা সুবিদিত যে, মোশরেকরা বাতিল ও অসত্য যুক্তি দিয়ে লড়াই করে থাকে। আর আল্লাহ তায়ালা সত্য দিয়ে তাদের সেই বাতিলকে খন্ডন করেন। কোরআন শুধু যে তর্কে রসূলের বিজয় লাভ নিশ্চিত করতে চায় তা নয়, বরং সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করাই হচ্ছে কোরআনের আসল লক্ষ্য। আর সত্য স্বতই শক্তিশালী ও সুস্পষ্ট, বাতিলের সাথে তার কখনো মিশ্রণ বা ভেজাল হয় না।

রসূল (স.)-এর সাথে তাঁর জাতির সকল তর্কযুদ্ধে আল্লাহ তায়ালা তাঁকে সাহায্য করবেন বলে যে ওয়াদা করেছেন, তার কারণ এই যে, তিনি নির্ভেজাল সত্যের ওপর বহাল রয়েছেন।

আল্লাহ তায়ালা তাঁকে সত্য দিয়ে সাহায্য করেন, যা বাতিলের ওপর বিজয়ী হয়ে থাকে। সুতরাং তাদের বিতর্ক আল্লাহর অকাট্য যুক্তির কাছে টিকতেই পারে না। আল্লাহর কাছ থেকে আগত সত্য তাদের বাতিলের সাথে সহাবস্থান করতেই পারে না, বরং তাকে খন্ডন করার জন্যেই সে এসে থাকে।

অতপর এ অধ্যায়টা শেষ হচ্ছে কেয়ামতের দিন কাফেরদেরকে উপুড় করে জাহান্নামের দিকে পাঠানোর দৃশ্য বর্ণনার মধ্য দিয়ে। এটা হবে তাদের পক্ষ থেকে সত্যকে প্রত্যাখ্যান ও তাদের নিষ্ফল বিতর্কে উল্টো যুক্তি পেশ করার শাস্তি,

'যাদেরকে উপুড় করে জাহান্নামের দিকে পাঠানো হবে, তারা হলো নিকৃষ্টতম স্থানের অধিবাসী এবং সবচেয়ে বিপথগামী।'

উপুড় করে জাহান্নামে পাঠানোটা আসলে তাদের সত্যকে উপেক্ষা করা ও অহংকার করার ঠিক বিপরীত অপমান ও তাচ্ছিল্যজনক শাস্তি। এ দৃশ্যটা রসূল (স.)-এর সামনে তুলে ধরার উদ্দেশ্য তাঁর সাথে তাদের অসদাচরণের জন্যে তাকে সান্ত্বনা দান। একই সাথে এ দৃশ্য কাফেরদেরকেও দেখিয়ে তাদেরকে হুশিয়ার করা হচ্ছে যে, তাদের জন্যে ভয়াবহ শাস্তি অপেক্ষমান। এ দৃশ্যটা তুলে ধরাই তাদের গর্ব ও অহংকারকে ধুলোয় মিশিয়ে দেয়ার জন্যে যথেষ্ট। হুশিয়ারী কাফেরদেরকে প্রচন্ডভাবে আতংকিত করতো। কিন্তু তারা তৎক্ষণাত নিজেদেরকে সামনে নিতো এবং তাদের জিদ ও হঠকারিতা অব্যাহত রাখতো।

ইসলাম প্রত্যাখ্যানকারী ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতি

এরপর তাদেরকে অতীতের সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের ধ্বংসযজ্ঞের কাহিনী শুনানো হচ্ছে,

'আমি মূসা (আ.)-কে কেতাব দিয়েছিলাম ....' (আয়াত ৩৫-৪০)

এখানে সংক্ষেপে অতীতের কাফেরদের শোচনীয় পরিণতির কিছু দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হচ্ছে।

যেমন একদিকে মূসা (আ.)-কে কেতাব দান এবং তার ভাই হারুনকে তাঁর সহযোগী ও উপদেষ্টা নিয়োগ, অতপর উভয়কে 'আল্লাহর নিদর্শনাবলী প্রত্যাখ্যানকারী একটা জাতিকে প্রতিহত করার আদেশ প্রদানের দৃষ্টান্ত। কারণ ফেরাউন ও তার অনুসারীরা আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে প্রত্যাখ্যান করে আসছিলো। তারা মূসা ও হারুনকে তাদের কাছে প্রেরণের আগে থেকেই এটা করে আসছিলো। আল্লাহর নিদর্শনাবলী সদাসর্বদা বিদ্যমান। যারা এই সব নিদর্শন সম্পর্কে উদাসীন থাকে, তাদেরকে স্মরণ ও সচেতন করার জন্যেই নবী ও রসূলরা আবির্ভূত হন। আয়াতের শেষাংশে তাদের শোচনীয় পরিণাম অত্যন্ত সংক্ষেপে ও জোরদার ভাষায় তুলে ধরা হয়েছে।

'ফলে তাদেরকে সর্বতোভাবে ধ্বংস করে দিয়েছিলাম।'

অপরদিকে উল্লেখ করা হয়েছে নূহের জাতির দৃষ্টান্ত।

'তারা যখন নবীদেরকে প্রত্যাখ্যান করলো, তখন আমি তাদেরকে ডুবিয়ে দিলাম।'

তারা শুধু নূহকেই প্রত্যাখ্যান করেছিলো। কিন্তু নূহ (আ.) যেহেতু সেই একই আকীদা বিশ্বাস নিয়ে এসেছিলেন, যা অন্যান্য নবীরা এনেছেন তাই তাকে প্রত্যাখ্যান সকল নবী ও রসূলকে প্রত্যাখ্যানের শামিল বলে গণ্য করা হয়েছে।

'আর তাদেরকে সমগ্র মানব জাতির জন্যে নিদর্শন বানিয়েছি।'

বস্তুত সেই ভয়াবহ বন্যার কথা মানব জাতি চিরকাল মনে রাখবে। আর প্রত্যেক সচেতন ও চিন্তাশীল মানুষ তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে।

'আর আমি অত্যাচারীদের জন্যে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।'

আসলে এ শাস্তি উপস্থিতই ছিলো, প্রস্তুত করার মুখাপেক্ষী ছিলো না। 'অত্যাচারীদের জন্যে শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।' এই 'অত্যাচারীদের' শব্দটা স্পষ্টতই জানিয়ে দিচ্ছে তাদের শাস্তির

কারণ কি। এরপর আসছে আদ, সামুদ, রসবাসী(১) ও এদের মধ্যবর্তী অন্যান্য জাতির প্রসংগ। সবার একই পরিণতি হয়েছে। কেননা তাদের সবাইকে সদুপদেশ দেয়া হয়েছিলো। কিন্তু কেউ তা শোনেনি এবং নিজেদের অনিবার্য ধ্বংস থেকে তারা আত্মরক্ষা করেনি।

এই দৃষ্টান্তগুলো হচ্ছে হযরত মূসা ও নূহের জাতি, আদ, সামুদ, 'রস'বাসী। মধ্যবর্তী অন্যান্য জাতি এবং হযরত লূতের জাতি সংক্রান্ত। সবারই ছিলো একই চরিত্র এবং সবারই একই পরিণতি হয়েছিলো। শিক্ষা ও উপদেশ লাভের জন্যে

'সকলকেই আমি উদাহরণ হিসেবে পেশ করেছি।' 'আর সবাইকে আমি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করেছি।'

অর্থাৎ নবীদের দাওয়াত প্রত্যাখ্যানের পরিণামেই তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছিলো। এই দৃষ্টান্তমূলক ধ্বংসের ঘটনাগুলোকে অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে। সবার শেষে এসেছে লূতের জাতির ঘটনা। এটা সদোম নামক স্থানে সংঘটিত হয়েছিলো। আরবের লোকেরা গ্রীষ্মকালে সিরিয়া সফরে যাওয়ার সময় এই এলাকার পাশ দিয়ে চলাচল করে থাকে। আল্লাহ তায়ালা সদোমকে আগ্নেয়গিরির গ্যাস ও পাথর বৃষ্টি দিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছেন। উপসংহারে মন্তব্য করা হয়েছে যে, যেহেতু তারা পরকালে বিশ্বাস করে না, তাই তাদের মন এ সব ঘটনা থেকে কোনোই শিক্ষা গ্রহণ করে না। কোনো শিক্ষামূলক ঘটনাতেই যে তাদের মন গলে না, তার কারণ এটাই। কোরআন ও রসূল সম্পর্কে তাদের সমস্ত আপত্তি, উপহাস ও খারাপ ধারণার উৎসও এখানেই নিহিত।

স্বার্থরক্ষার জন্যেই সমাজপতিরা বিরোধীতা করে

এই সংক্ষিপ্ত বিবরণগুলোর পর রসুল (স.)-এর প্রতি তাদের করা ব্যংগ বিদ্রূপের বর্ণনাও দেয়া হচ্ছে। ইতিপূর্বে তাদের দম্ভ, অহংকার ও কোরআন এক সাথে নাযিল না করে টুকরো টুকরো আকারে নাযিল করায় তাদের আপত্তি তুলে ধরা হয়েছে। কেয়ামতের ময়দানে তাদের কেমন শোচনীয় দশা হবে এবং তাদের মতো অন্যান্য কাফেরদের পরিণামই বা কেমন হবে, তাও বর্ণনা করা হয়েছে। এসব বর্ণনার উদ্দেশ্য শুধু রসূল (স.)-এর মনকে তার সাথে কৃত ব্যংগ বিদ্রূপের উল্লেখের আগেই প্রবোধ দান করা। অতপর তাদেরকে কঠোর হুঁশিয়ারী জ্ঞাপনের পাশাপাশি তাদেরকে পশুর চেয়েও নিম্নস্তরের প্রাণী র সাথে ব্যংগ বিদ্রূপ করে। ওরা বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। বলা হয়েছে,

'ওরা যখনই তোমাকে দেখতে পায় তখন ...., বরং পর তার চেয়েও বিপথগামী।' (আয়াত ৪১-৪৪)

এ কথা সুবিদিত যে, মোহাম্মদ (স.) নবুওত লাভের পূর্বে তার জাতির কাছে অতি প্রিয়পাত্র ছিলেন। বংশগতভাবে তিনি তাদের কাছে বিশেষ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি ছিলেন বনু হাশেমের শ্রেষ্ঠ সন্তান, আর তারা ছিলো কোরায়শের শ্রেষ্ঠ সন্তান নিষ্কলুষ চরিত্র। সততার জন্যেও তিনি ছিলেন বিশেষ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ও 'আল আমীন' খেতাবে ভূষিত। নবুওত লাভের অনেক আগে হাজরে আসওয়াদ স্থাপনের ব্যাপারে তাঁর মধ্যস্থতা ও মীমাংসায়ও তারা খুবই খুশী ছিলো। একদিন তিনি তাদেরকে সাফা পর্বতের ওপর ডাকলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন যে, এই পাহাড়ের অপর পার্শে একটা বাহিনী ওঁৎ পেতে আছে এ কথা যদি তিনি বলেন, তবে তারা বিশ্বাস করবে কিনা। তারা বললো, 'হাঁ তুমি আমাদের কাছে কখনো অভিযুক্ত ছিলে না।'

---

(১) অর্থাৎ একটা অদৃশ্য প্রাচীর বিশিষ্ট পুষ্করিনীর অধিবাসীরা। কেউ কেউ বলেন, এই পুষ্করিনীর অধিবাসীরা ইয়ামামার একটা গ্রামে বাস করতো। তারা তাদের নবীকে হত্যা করেছিলো। ইবনে জারীরের মতে, এরা হচ্ছে উখদুদবাসী, যাদের কথা সূরা 'বুরুজে' বর্ণনা করা হয়েছে। তারা একদল মোমেনকে পুড়িয়ে মেরেছিলো।

কিন্তু সেই কোরায়শই তাঁর নবুওত লাভের পর এবং তিনি কোরআন নিয়ে আসার পর তাকে উপহাস করে বলতে লাগলো, 'তিনিই কি সেই ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ তায়ালা রসূল বানিয়ে পাঠিয়েছেন? এটা আসলে প্রচন্ড বিদ্রূপাত্মক ও নিন্দাসূচক কথা ছিলো।

কিন্তু এ ধরনের বিদ্রূপাত্মক কথা বলার কারণ কি এই ছিলো যে, তারা তাঁর মতো মহৎ ব্যক্তিকে এ ধরনের ব্যংগ বিদ্রূপের উপযুক্ত বলে যথার্থই মনে করতো? অথবা তাঁর দাওয়াতকে যথার্থই বিদ্রূপের যোগ্য বলে তারা মনে করতো? না, কখনো নয়। এটা ছিলো আসলে জনসাধারণের ওপর রসূল (স.)-এর বিরাট ও বিশাল ব্যক্তিত্বের ও কোরআনের অপ্রতিরোধ্য প্রভাবকে কিছুটা কমানোর লক্ষ্যে শীর্ষস্থানীয় কোরায়শ নেতাদের তৈরী করা একটা পরিকল্পনা। যেহেতু রসূল (স.) পরিচালিত এই নতুন দাওয়াত ও আন্দোলন তাদের প্রচলিত সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের অস্তিত্বকে হুমকির সম্মুখীন করেছিলো এবং যে সব ভ্রান্ত ধ্যান ধারণা ও আকীদা বিশ্বাসের ওপর তাদের সমগ্র সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তি দাঁড়িয়েছিলো, সেগুলোকে ধ্বংস করে দিচ্ছিলো, তাই এই দাওয়াতকে প্রতিহত করার একটা উপায় ও মাধ্যম মনে করে তারা এর বিরুদ্ধে ব্যংগ বিদ্রূপ ও ঠাট্টা উপহাস চালাতো।

রকমারি ফন্দি ফিকির ও ষড়যন্ত্র উদ্ভাবনের জন্যে তারা নিয়মিত সলাপরামর্শও করতো এবং এ ধরনের কোনো না কোনো ফন্দি ফিকির তারা তৈরীও করতো। অথচ তারা সুনিশ্চিতভাবেই জানতো যে, তাদের এসব ফন্দি ফিকির সঠিক নয়।

ইবনে ইসহাক এমনি এক ফন্দি ফিকিরের বর্ণনা করেছেন একবার হজ্জের মওসুম সমাগত হলে প্রবীণ কোরায়শ নেতা ওলীদ ইবনুল মুগীরার কাছে কিছু লোক সমবেত হলো। ওলীদ তাদেরকে সম্বোধন করে বললো, হে কোরায়শ জনমন্ডলী, এবার হজ্জের মওসুম তো এসে পড়লো। এ সময় তোমাদের কাছে আরবের দূর দূরান্ত থেকে বহু হজ্জ প্রতিনিধি দল আসবে। ইতিমধ্যে তোমাদের স্বগোত্রীয় মোহাম্মদের কথা তারা শুনেছে। এ ব্যাপারে তোমরা একটা ঐক্যমতে উপনীত হও এবং মতভেদ সৃষ্টি করে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করো না যে, তোমাদের এক একজন এক এক রকম কথা বলবে এবং একজন যা বলবে, অন্যজন তা খন্ডন করবে। সমবেত সকলে বললো, 'ওহে আব্দুশ শামসের পিতা, আপনিই বলুন, আপনিই আমাদের জন্যে একটা মত ঠিক করে দিন, যা আমরা সবাই ধারণ ও প্রচার করবো।' ওলীদ বললো, 'বরঞ্চ তোমরাই বলো, আমি শুনি।' কয়েকজন বললো, 'আমরা তো মনে করি, সে একজন জ্যোতিষী।' ওলীদ বললো, 'না, আল্লাহর কসম, সে জ্যোতিষী নয়। আমরা বহু জ্যোতিষী দেখেছি। জ্যোতিষীরা যে ধরনের ছকবাধা ও সুরেলা কণ্ঠে কথা বলে থাকে, তা মোহাম্মদের মধ্যে নেই। এবার সবাই বললো, 'তাহলে আমাদের ধারণা, সে পাগল।' ওলীদ বললো, 'কত পাগলই তো দেখেছি এবং পাগলামী কী জিনিস, তা আমাদের কাছে সুপরিচিত। কিন্তু তার কোনো লক্ষণ মোহাম্মদের মধ্যে নেই।' সবাই বললো, 'তাহলে আমরা বলবো, সে কবি।' ওলীদ বললো, না, সে কবিও নয়। আমরা সব রকমের কবিতা ও তার রকমারি ছন্দ চিনি। মোহাম্মদ (স.) যা বলে তা কবিতা নয়।' তারা বললো, 'তাহলে আমরা বলবো, সে যাদুকর।' ওলীদ বললো, 'না সে যাদুকরও নয়। যাদুকর ও যাদু অনেক দেখেছি। যাদুর কোনো লক্ষণ এতে নেই।' সকলে বললো, 'ওহে আব্দুশ শামসের পিতা, তাহলে আপনি কী বলতে চান? ওলীদ বললো, মোহাম্মদ (স.)-এর কথা বড়ই মনোহর, তার মূল খেজুর গাছের মতো শক্ত এবং তার শাখা প্রশাখা ফলে ভর্তি।' তোমরা যেটাই বলবে, তা বাতিল বলে গণ্য হবে। তবে তোমরা তাকে যাদুকর বলতে পারো। এটাই প্রকৃত সত্যের কাছাকাছি হবে। কেননা সে এমন বাণী নিয়ে এসেছে, যা একজন মানুষকে তার পিতা, ভাই, স্ত্রী ও আত্মীয়স্বজন থেকে বিচ্ছিন্ন ও পর করে দেয়। এরপর সবাই ওলীদের কাছ থেকে চলে গেলো।

তারা হজ্জে আগত জনসাধারণের চলাচলের পথের পাশে বসে থাকতে লাগলো। তাদের কাছ থেকে যে ব্যক্তিই যাচ্ছিলো, তাকে মোহাম্মদ (স.) সম্পর্কে সতর্ক করে দিতে থাকলো এবং তাঁর কার্যকলাপ সম্পর্কে অবহিত করতে লাগলো।

রসূল (স.)-এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র পাকাতে তাঁর স্বজাতি কিভাবে মরিয়া হয়ে উঠেছিলো, এটা তার একটা দৃষ্টান্ত মাত্র। এ থেকে এ কথাও স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, তারা মোহাম্মদ (স.) কে সঠিকভাবেই চিনতে পেরেছিলো। তাঁর প্রতি বিদ্রূপ করে এ কথা বলা যে, 'এই কি সেই ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ তায়ালা রসূল করে পাঠিয়েছেন?' সেই সব ষড়যন্ত্রেরই অংশ। এ ষড়যন্ত্র তাদের অন্তরের কোনো সচেতন উপলব্ধির ফসল ছিলো না, বরং এর মাধ্যমে তারা স্রেফ জনগণের সামনে রসূল (স.)-কে হেয় করতে চেয়েছিলো। শীর্ষস্থানীয় কোরায়শ নেতারা ভেবেছিলো, এভাবে তাদের ধর্মীয় অভিভাবকত্ব চিরস্থায়ী হবে এবং এভাবে তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুবিধাগুলোও চিরস্থায়ী হবে। এতে কোরায়শের ভূমিকা সর্বকালের ও সকল জায়গার ইসলামী আন্দোলন ও আন্দোলনকারীদের শত্রুর ভূমিকার অনুরূপ।

ব্যংগবিদ্রূপ করার সময়েও তারা যে কথা বলতো, তা থেকেই বুঝা যেতো মোহাম্মদ (স.) তাঁর দাওয়াত ও কোরআনের বিরুদ্ধে তাদের মনে কী সাংঘাতিক বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব বিরাজ করতো।

'আমরা ধৈর্যধারণ না করলে সে তো আমাদেরকে আমাদের দেব-দেবী থেকে বিপথগামী করেই ফেলতো।'

বস্তুত তাদের স্বীকারোক্তি থেকে স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে যে, রসূল (স.)-এর বিপ্লবী দাওয়াত ও কোরআনের হৃদয়গ্রাহী আবেদন তাদের অন্তরাত্মাকে ঝাঁকুনির পর ঝাকুনি দিয়ে এতোটা নড়বড়ে করে দিয়েছিলো যে, তারা তাদের দেব-দেবী ও তাদের পূঁজা অর্চনা প্রায় ছেড়ে দেয়ারই উপক্রম করেছিলো- যদি তাদের ভেতরে তাদের ধর্ম ও তার তীর্থস্থানগুলোকে সংরক্ষণ করার প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে তাদের দেব-দেবীর ওপর ধৈর্যধারণ করা ও অবিচল থাকার মনোভাব না জেগে উঠতো এবং ইসলামী দাওয়াতের প্রভাব প্রতিরোধ করার ইচ্ছা সৃষ্টি না হতো তাহলে হয়তোবা তারা ছেড়েই দিতো। কোনো দিক দিয়ে প্রবল আকর্ষণের সৃষ্টি হলে সেই আকর্ষণের বিরুদ্ধে জোরদার প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্যেই ধৈর্যের প্রয়োজন হয়। মোশরেকরা চিরন্তন সত্যের ও শাশ্বত মূল্যবোধের অবমূল্যায়ন করতো বলেই হেদায়াতকে বিপথগামিতা বলে আখ্যায়িত করেছিলো। কিন্তু তাদের হৃদয় জগতে রসূল (স.)-এর দাওয়াত, তাঁর ব্যক্তিত্ব ও তাঁর আনীত কোরআনের প্রভাবে যে কম্পন, অস্থিরতা ও আলোড়ন শুরু হয়ে গিয়েছিলো, সেটা তারা লুকাতে পারেনি। এমনকি নিছক হঠকারিতা ও জিদের বশে তারা যখন তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রতি তাচ্ছিল্য ও অবজ্ঞা প্রদর্শন করছিলো, তখনো এটা লুকাতে সক্ষম হয়নি। এ জন্যেই আয়াতটার শেষাংশে তাদেরকে তাৎক্ষণিকভাবে ধমক দিয়ে শাসিয়ে দেয়া হয়েছে যে,

'ওরা যখন আযাব দেখবে, তখনই বুঝতে পারবে, কারা বেশী বিভ্রান্ত।'

অর্থাৎ তখন তারা জানতে পারবে যে, রসূল (স.) তাদের কাছে যে জিনিস নিয়ে এসেছেন তাই হচ্ছে হেদায়াত- গোমরাহী নয়। তবে আযাব দেখার পর তা জেনে তাদের আর কোনো লাভ হবে না। এই আযাব দুনিয়াতেই দেখুক, যেমন বদরের যুদ্ধের সময় দেখেছে, অথবা আখেরাতে দেখুক যেমন কেয়ামতের দিন দেখবে।

প্রবৃত্তির দাসত্ব মানুষকে পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট করে দেয়

এরপর রসূল (স.) কে সম্বোধন করে তাদের হঠকারিতা, গোয়ার্তুমি ও ঠাট্টা-বিদ্রূপের ব্যাপারে তাঁকে সান্ত্বনা ও সমবেদনা জানানো হয়েছে। কেননা তিনি তো তাঁর দাওয়াত ও প্রচারের

কাজে কোনো ক্রটি রাখেননি। যুক্তি প্রমাণ পেশ করতে কোনো কসুর করেননি। তিনি এমন কিছু করেননি, যার জন্যে তাদের দুর্ব্যবহার ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণের কোনো যৌক্তিকতা থাকতে পারে। এই ঔদ্ধত্যের কারণ একান্তভাবে তাদের নিজস্ব। তারা তাদের খেয়ালখুশী ও ভাবাবেগকেই দেবতার আসনে বসিয়ে রেখেছে। কোনো যুক্তি প্রমাণের ধার ধারেনি। আর যারা নিজের ভাবাবেগের গোলাম হয়ে যায়, তাদের ব্যাপারে নবী রসূলের কিছুই করার থাকে না।

'তুমি কি সেই ব্যক্তির ব্যাপারটা ভেবে দেখেছো, যে নিজের ভাবাবেগকে নিজের ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে? তুমি কি তার কোনো দায় দায়িত্ব নিতে পারবে?'

এটা একটা চমকপ্রদ জিজ্ঞাসা। এ জিজ্ঞাসার মধ্য দিয়ে একটা বিশেষ মানসিক অবস্থার সুগভীর অভিব্যক্তি ঘটেছে। কোনো মানুষ যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা যাবতীয় রীতিনীতি, আইন কানুন ও যাবতীয় যুক্তি প্রমাণকে অগ্রাহ্য করে নিরেট নিজের ভাবাবেগ ও কামনা বাসনার দাসত্ব করতে থাকে এবং নিজেকে ও নিজের খেয়াল খুশীকে মাবুদের আসনে বসায়। তখনকার অবস্থাই এখানে ফুটে উঠেছে।

এ অবস্থায়ও মহান আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাকে পরম স্নেহ, মমতা ও সহানুভূতির সাথে এই শ্রেণীর মানুষের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছেন, 'তুমি কি ভেবে দেখেছো?' অতপর এর পরবর্তী অংশে সে শ্রেণীর মানুষের একটা চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এ শ্রেণীটির সামনে কোনো যুক্তি প্রমাণ পেশ করা একেবারেই নিরর্থক ও বৃথা। তার কাছে কোনো যুক্তি, তত্ত্ব বা তথ্যের কোনো গুরুত্ব বা মূল্য নেই এবং এসব তাকে হেদায়াতের পথে আনতে সাহায্য করে না। এ শ্রেণীটি হেদায়াতের অযোগ্য। আর এ কারণে রসূল (স.)-এর পক্ষে তার দায় দায়িত্ব গ্রহণও অসম্ভব। বলা হয়েছে,

'তুমি কি তার দায় দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারবে?'

অতপর এসব প্রবৃত্তির গোলামদের নিন্দায় আরো একধাপ এগিয়ে গিয়ে তাদেরকে বিবেক বিবেচনা বর্জিত পশুর সমান বলা হয়েছে। তারপর আরো একধাপ এগিয়ে তাদেরকে পশুর চেয়েও অধম ও বিপথগামী বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে,

তুমি কি মনে করো যে, তাদের অধিকাংশই বিবেকবান ও শ্রবণশক্তি সম্পন্ন? তারা তো পশুর সমান। বরঞ্চ তারা পশুর চেয়েও বিপথগামী।' (আয়াত ৪৪)

আয়াতের ভাষায় যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা ও সুবিচার করা হয়েছে। বলা হয়েছে 'তাদের অধিকাংশ'। সবাইকে পাইকারিভাবে দোষারোপ করা হয়নি। কেননা তাদের একটা ক্ষুদ্র অংশ হেদায়াতের পথে চালিত হয়েছিলো, অথবা সে ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করেছিলো। পক্ষান্তরে তাদের অধিকাংশ ছিলো প্রবৃত্তির দাস তারা যুক্তি প্রমাণের ধার ধারতো না। সুতরাং তারা পশুর সমান। কেননা বিচার বিবেচনা ও সত্যোপলব্ধি, সেই সত্যোপলব্ধির ভিত্তিতে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং যুক্তি প্রমাণের আলোকে যাবতীয় কাজ করা এগুলোই মানুষকে পশু থেকে পৃথক ও স্বতন্ত্র প্রাণী রূপে চিহ্নিত করে। শুধু তাই নয়, এসব গুণাবলী থেকে বঞ্চিত মানুষ পশুর চেয়েও অধম। কেননা পশু আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে জীবনের সঠিক পথের সন্ধান পায় এবং নিজের যা যা করণীয়, তা যথাযথভাবে সম্পাদন করে। অথচ মানুষ আল্লাহর দেয়া ক্ষমতা ও যোগ্যতাকে কাজে না লাগিয়ে নিষ্ক্রিয় করে রাখে এবং পশু যেমন তা দ্বারা উপকৃত হয়, সেভাবে সে উপকৃত হয় না। তাই তাদের 'পশুর চেয়েও 'অধম' বলা হয়েছে। এভাবে রসূল (স.)-কে যারা উপহাস ও ব্যংগবিদ্রূপ করে, তাদেরকে এতো ঘৃণ্য ও তুচ্ছ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে যে, তারা মানুষই নয়, পশুর সমান, এমনকি পশুর চেয়েও অধম। এভাবে সূরার দ্বিতীয় অধ্যায়টা শেষ হলো।

اَلَمْ تَرَ اِلٰى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ ۚ وَلَوْ شَآءَ لَجَعَلَهٗ سَاكِنًا ۚ ثُمَّ جَعَلْنَا
الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيْلًا ﴿٤٥﴾ ثُمَّ قَبَضْنٰهُ اِلَيْنَا قَبْضًا يَّسِيْرًا ﴿٤٦﴾ وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَ
لَكُمُ الَّيْلَ لِبَاسًا وَّالنَّوْمَ سُبَاتًا وَّجَعَلَ النَّهَارَ نُشُوْرًا ﴿٤٧﴾ وَهُوَ الَّذِىْٓ
اَرْسَلَ الرِّيٰحَ بُشْرًاۢ بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهٖ ۚ وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً
طَهُوْرًا ﴿٤٨﴾ لِّنُحْيِۦَ بِهٖ بَلْدَةً مَّيْتًا وَّنُسْقِيَهٗ مِمَّا خَلَقْنَآ اَنْعَامًا وَّاَنَاسِىَّ
كَثِيْرًا ﴿٤٩﴾ وَلَقَدْ صَرَّفْنٰهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوْا ۖ فَاَبٰٓى اَكْثَرُ النَّاسِ اِلَّا كُفُوْرًا ﴿٥٠﴾
وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِىْ كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيْرًا ﴿٥١﴾ فَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَجَاهِدْهُمْ
بِهٖ جِهَادًا كَبِيْرًا ﴿٥٢﴾ وَهُوَ الَّذِىْ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَّهٰذَا
مِلْحٌ اُجَاجٌ ۚ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَّحِجْرًا مَّحْجُوْرًا ﴿٥٣﴾ وَهُوَ الَّذِىْ خَلَقَ

রুকু ৫

৪৫. (হে নবী,) তুমি কি তোমার মালিকের (কুদরতের) দিকে তাকিয়ে দেখো না? কি ভাবে তিনি ছায়াকে (সর্বত্র) বিস্তার করে রেখেছেন, তিনি ইচ্ছা করলে তা তো (একই স্থানে) স্থায়ী করে রাখতে পারতেন, অতপর আমি (কিন্তু) সূর্যকে তার ওপর একটি স্থায়ী নির্ঘন্ট বানিয়ে রেখেছি, ৪৬. পরে আমি ধীরে ধীরে তাকে আমার দিকে গুটিয়ে আনবো। ৪৭. আল্লাহ তায়ালাই তোমাদের জন্যে রাতকে আবরণ, ঘুমকে আরাম ও দিনকে জেগে ওঠার সময় করে দিয়েছেন। ৪৮. তিনি তাঁর (বৃষ্টিরূপী) রহমতের আগে সুসংবাদবাহী বায়ু প্রেরণ করেন, অতপর আসমান থেকে (তার মাধ্যমে) বিশুদ্ধ পানি বর্ষণ করেন, ৪৯. যেন তা দিয়ে তিনি মৃত ভূখন্ডে জীবনের সঞ্চার করতে পারেন এবং তা দিয়ে তাঁর সৃষ্ট অসংখ্য জীবজন্তু ও মানুষের পিপাসা নিবারণ করতে পারেন। ৫০. আমি বার বার এ (ঘটনা)টি তাদের মাঝে সংঘটিত করি, যাতে করে তারা (এ বিষয়টি থেকে) শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই আমার অকৃতজ্ঞতা ছাড়া অন্য কিছু করতে অস্বীকার করলো। ৫১. আমি ইচ্ছা করলে প্রতিটি জনপদে এক একজন সতর্ককারী (নবী) পাঠাতে পারতাম, ৫২. অতএব, তুমি কাফেরদের (এ অভিযোগের) পেছনে পড়ো না, তুমি (বরং) এ (কোরআন) দিয়ে তাদের প্রচন্ড মোকাবেলা করো। ৫৩. তিনি (একই জায়গায়) দুটো সাগর এক সাথে প্রবাহিত করে রেখেছেন, একটি হচ্ছে মিষ্ট ও সুপেয়, আরেকটি লোনা ও ক্ষারবিশিষ্ট, উভয়ের মাঝখানে তিনি একটি সীমারেখা বানিয়ে রেখেছেন, (সত্যিই) এটি একটি অনতিক্রম্য ব্যবধান। ৫৪. তিনিই সেই মহান সত্তা, যিনি মানুষকে (এক বিন্দু)

مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَّصِهْرًا ۚ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ۝٥٤ وَيَعْبُدُونَ
مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ ۚ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ
ظَهِيرًا ۝٥٥ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۝٥٦ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ
أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ۝٥٧ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ
الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ ۚ وَكَفَىٰ بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا ۝٥٨
الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ
عَلَى الْعَرْشِ ۚ الرَّحْمَٰنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا ۝٥٩ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا
لِلرَّحْمَٰنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَٰنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا ۩ ۝٦٠

সাজদা

পানি থেকে পয়দা করেছেন, অতপর তিনি তাকে (রক্ত সম্পর্ক দ্বারা) পরিবার (বন্ধন) ও (বৈবাহিক বন্ধন দ্বারা) জামাইয়ে (শ্বশুরে) পরিণত করেছেন; তোমার মালিক প্রভূত ক্ষমতাবান, ৫৫. (এসব কিছু সত্ত্বেও) তারা আল্লাহর বদলে এমন সবকিছুর এবাদাত করে যা– না তাদের কোনো উপকার করতে পারে, না তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারে; (আসলে প্রতিটি) কাফের ব্যক্তি নিজের মালিকের মোকাবেলায় (বিদ্রোহীরই বেশী) সাহায্যকারী (হয়)। ৫৬. (হে নবী,) আমি তো তোমাকে কেবল (জান্নাতের) সুসংবাদদাতা ও (জাহান্নামের) সতর্ককারীরূপেই পাঠিয়েছি। ৫৭. তুমি (এদের) বলো, আমি তো তোমাদের কাছ থেকে এ জন্যে কোনো পারিশ্রমিক দাবী করছি না, (হ্যাঁ, আমি চাই তোমাদের) প্রতিটি ব্যক্তিই যেন তার মালিক পর্যন্ত পৌঁছার (সঠিক) রাস্তাটি অবলম্বন করে। ৫৮. (হে নবী,) তুমি সেই চিরঞ্জীব সত্তার ওপর নির্ভর করো, যাঁর মৃত্যু নেই। তুমি তাঁর সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো; তিনি তাঁর বান্দাদের গুনাহখাতা সম্পর্কে সম্যক ওয়াকেফহাল, ৫৯. তিনিই মহান আল্লাহ তায়ালা, যিনি আকাশমন্ডলী, পৃথিবী ও ওদের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছু ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন, অতপর তিনি (তাঁর) আরশে সমাসীন হন, (তিনি) অতি দয়াবান আল্লাহ, তাঁর (মর্যাদা) সম্পর্কে সে লোককে তুমি জিজ্ঞেস করো যে (এ সম্পর্কে) অবগত আছে। ৬০. যখন ওদের বলা হয়, তোমরা দয়াময় (আল্লাহ তায়ালা)-এর প্রতি সাজদাবনত হও, তখন তারা বলে, দয়াময় (আল্লাহ আবার) কে? যাকেই তুমি সাজদা করতে বলবে তাকেই কি আমরা সাজদা করবো? (বস্তুত তোমার এ আহ্বান) তাদের বিদ্বেষকে বরং আরো বাড়িয়ে দিয়েছে।

تَبٰرَكَ الَّذِیْ جَعَلَ فِی السَّمَآءِ بُرُوْجًا وَّجَعَلَ فِیْهَا سِرٰجًا وَّقَمَرًا مُّنِیْرًا ۝٦١ وَهُوَ الَّذِیْ جَعَلَ الَّیْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ اَرَادَ اَنْ یَّذَّكَّرَ اَوْ اَرَادَ شُكُوْرًا ۝٦٢

রুকু ৬

৬১. কতো মহান সেই সত্তা, যিনি আসমানে অসংখ্য গম্বুজ বানিয়েছেন, এরই মাঝে তিনি (আবার) পয়দা করেছেন প্রদীপ (-সম একটি সূর্য) এবং একটি জ্যোতির্ময় চাঁদ। ৬২. তিনি রাত ও দিনকে (পরস্পরের) অনুগামী করেছেন– (তাদের জন্যে), যারা এসব কিছু থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে কিংবা (সে জন্যে) আল্লাহর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে চায়।

তাফসীর

আয়াত ৪৫-৬২

এ অধ্যায়টাতে মোশরেকদের কথাবার্তা ও রসুল (স.)-এর সাথে তাদের তর্ক-বিতর্কের প্রসংগ বাদ দিয়ে প্রকৃতির দৃশ্যাবলীর দিকে রসূল (স.)-এর মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে। প্রকৃতির সাথে তাঁর এই যোগাযোগ স্থাপিত হওয়া মোশরেকদের বিব্রতকর আচরণ ভুলিয়ে দেয়ার জন্যে যথেষ্ট। এটা তাঁর মনকে এতো উদার ও উঁচু করে যে, সেখান থেকে ষড়যন্ত্রকারীদের ষড়যন্ত্র ও অপরাধীদের শত্রুতা নিতান্তই তুচ্ছ মনে হয়।

প্রত্যেক মানুষের মন ও বিবেককে আল্লাহর বিশাল সৃষ্টি জগতের দিকে আকৃষ্ট ও যুক্ত করা এবং তাকে নবতর আবেগ ও অনুভূতি সহকারে পর্যবেক্ষণ করার জন্যে অনুপ্রাণিত করা কোরআনের তাওবা চিরন্তন রীতি। এভাবে সৃষ্টির প্রতি মনোযোগ আকৃষ্ট করার পর তার মন ও বিবেক প্রকৃতির প্রতিটি বিষয় পর্যবেক্ষণ ও তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে। বিশ্বের সর্বত্র আল্লাহর যে অসংখ্য নিদর্শন ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে, সেগুলোকে পর্যবেক্ষণ করার জন্যে সে বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করে। সে প্রতিটি সৃষ্টির পেছনে আল্লাহর সৃজনশীল হাত সক্রিয় দেখতে পায়। আর এভাবে সৃষ্টির সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে স্রষ্টা সম্পর্কে তার চিন্তা-গবেষণা ও তার সাথে যোগাযোগ গড়ে ওঠে।

আর মানুষ যখন মুক্ত চোখ ও মুক্ত মন নিয়ে জাগ্রত বিবেক ও সতেজ চেতনা নিয়ে এবং সুসংহত চিন্তা ও সক্রিয় অনুভূতি নিয়ে বাস করতে শুরু করে, তখন তার জীবন পৃথিবীর ছোটো খাটো সমস্যাবলীর উর্ধে উঠে যায় এবং জীবন সম্পর্কে তার অনুভূতি অত্যন্ত উন্নত হয় ও বহুগুণ বেড়ে যায়। সে প্রতি মুহূর্তে অনুভব করে যে মহাবিশ্বের মুক্ত দিগন্ত এই পৃথিবীর সীমিত গন্ডির চেয়ে বহুগুণ বেশী প্রশস্ত। সে এও অনুভব করে যে, মহাবিশ্বে সে যা কিছুই দেখতে পায়, সব একই ইচ্ছা ও সিদ্ধান্ত দ্বারা সৃজিত হয়েছে। সব একই প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন। একই স্রষ্টার ইচ্ছাধীন। সে স্বয়ং মহান আল্লাহর অসংখ্য সৃষ্টির মধ্য থেকেই একটা সৃষ্টি। তার চার পাশে যা কিছু বিরাজ করে, যা কিছুর ওপর তার দৃষ্টি পড়ে এবং যা কিছু সে হাত দিয়ে স্পর্শ করে, সব কিছুর ওপরই আল্লাহর হাত তথা নিরংকুশ কর্তৃত্ব বিদ্যমান।

মানুষ যখন এভাবে আল্লাহর সৃষ্টি করা এই বিশ্বে জীবন যাপন করে, তখন এক ধরনের আল্লাহভীতি, সম্প্রীতি ও আত্মবিশ্বাসের মিশ্র মনোভাব তার সমগ্র চেতনায়, অন্তরাত্মায় ও সমগ্র সত্ত্বায় ছড়িয়ে পড়ে। আর এর ফলে সে যতোদিন এই গ্রহে বেঁচে থাকে, এক বিশেষ ধরনের স্বচ্ছতা, ভালোবাসা ও স্বস্তি তার ব্যক্তিত্বকে অনন্য রূপ দান করে এবং সে সৃষ্টির সেরা জীবে পরিণত হয়।

প্রাকৃতিক দৃশ্যের মাঝে আল্লাহকে খুঁজে পাওয়া

এই অধ্যায়ে প্রথমে পৃথিবীতে শান্ত সুশীতল ছায়ার বিস্তৃতি ও আল্লাহর হাত দিয়ে তাকে সহজে ও শান্তভাবে ছোট ও বড় করার বিষয়টা আলোচিত হয়েছে। অতপর রাত ও রাতের বেলার ঘুম, দিনের বেলার কর্মব্যস্ততা, দয়া ও অনুগ্রহের শুভ আভাস দানকারী বাতাস এবং মৃত ভূমিকে পুনরুজ্জীবনকারী পানি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তারপর আলোচনা করা হয়েছে মিঠে পানি ও লোনা পানির দুই সমুদ্র সম্পর্কে। এই দুটো সমুদ্র পাশাপাশি অবস্থান করলেও একটার সাথে অপরটার কোনোই মিশ্রণ ঘটে না। তারপর আকাশের পানি থেকে শুরু করে বীর্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এই বীর্য থেকে বিশ্ব পরিচালনাকারী মানুষের সৃষ্টি হয়েছে। তারপর ছয় দিনে সৃষ্টি হয়েছে আকাশ ও পৃথিবী। তারপর আকাশের বুরুজ তথা রাশি চক্র, দীপ্তিমান সূর্য ও চন্দ্র এবং রাত ও দিনের আবর্তন সম্পর্কে আলেচনা করা হয়েছে।

এসব বিষয় আলোচনার মাঝে মাঝে আল্লাহর সৃষ্টি নৈপুণ্য নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করার জন্যে মন ও বিবেককে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে, তাঁর শক্তি ও পরিকল্পনার প্রশংসা করা হয়েছে, তার সাথে অন্যান্য বস্তুকে শরীক করার যে রীতি মোশরেকরা অনুসরণ করে চলেছে, যে বস্তু তাদের লাভ ক্ষতি কিছুই করতে পারে না। তার দাসত্ব ও পূজা এবং আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতা, ঔদ্ধত্য ও অস্বীকৃতির কঠোর নিন্দা ও সমালোচনা করা হয়েছে। এ সমালোচনার মাধ্যমে স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহর এতো সব নিদর্শন ও তাঁর এতো সব বিচিত্র সৃষ্টি দেখার পরও তাদের এসব আচরণ অত্যন্ত বিস্ময়কর।

এবার আল্লাহ তায়ালা তার যে বিচিত্র সৃষ্টিজগত নিয়ে সারা জীবন চিন্তা গবেষণা করার আহ্বান জানিয়েছেন, আসুন, অন্তত কিছুক্ষণ তা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করি।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'তুমি কি দেখনি, তোমার প্রভু কিভাবে ছায়াকে প্রলম্বিত করেছেন? .....' (আয়াত ৪৫-৪৬)

শীতল ছায়া একজন শ্রান্ত ক্লান্ত মানুষের মনে যে শান্তি, নিরাপত্তা ও স্বস্তি এনে দেয়, তা সত্যিই অবর্ণনীয়। কিন্তু কাফেরদের বিদ্রূপ ও উপহাসে জর্জরিত হওয়ার পর বান্দাকে আল্লাহ তায়ালা যে ছায়ার কথা স্মরণ করিয়েছেন, তার মর্ম কি এটাই? আল্লাহর দ্বীনের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার প্রাণান্তকর সংগ্রামে শ্রান্ত-ক্লান্ত বান্দার মনকে তিনি যে সান্ত্বনা দিচ্ছেন, সংখ্যাগরিষ্ঠ মোশরেক ও সংখ্যালঘু মোমেনদের অধ্যুষিত মক্কায় মোশরেকদের কুফরী, অহংকার, ঔদ্ধত্য ধোঁকা ও হঠকারিতায় বিব্রত বান্দাকে তিনি যে প্রবোধ দিচ্ছেন, তার অর্থ কি শুধু এতোটুকুই? যে বান্দাকে তখনো পর্যন্ত মোশরেকদের আক্রমণাত্মক আচরণ, বিদ্রূপ ও উপহাসের জবাবে একই ধরনের আচরণের অনুমতি দেয়া হয়নি। তাকে এই ছায়ার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আসলে তিনি কী বুঝাতে চাইছেন? আসলে রসূল (স.)-এর কাছে নাযিল হওয়া এই কোরআনই হচ্ছে সেই শান্তিদায়ক, সুশীতল ছায়া। এই কোরআনই কুফরী ও নাফরমানীর উষর মরুতে প্রাণ সঞ্চারক পানি। তাই সমগ্র সূরার বক্তব্য ও মর্মবাণীর সাথে এই ছায়ার অপূর্ব সামঞ্জস্য রয়েছে-বিশেষত আরবের মরু প্রধান দেশে।

আয়াতের ভাষায় ছায়ার পাশাপাশি আল্লাহর কুশলী হাতের ছবিও এঁকে দেয়া হয়েছে, যা অতি সংগোপনে ছায়াকে ছোট ও বড় করে থাকে।

দিনের বেলায় সূর্যের কিরণ বিভিন্ন বস্তুর আড়ালে গেলে যে হালকা অন্ধকারের সৃষ্টি হয়, তাকেই ছায়া বলে। সূর্যের সামনে থেকে পৃথিবী যতোখানি দূরে সরে, ছায়াও ততোখানি সরে ও লম্বা হয়। সূর্য নিজের আলো ও উত্তাপ দিয়ে তাকে পথ প্রদর্শন করে এবং তার আকৃতি, প্রসার ও প্রত্যাবর্তনকে নিয়ন্ত্রণ করে। আর ছায়ার ক্রম-বৃদ্ধি ও ক্রমহ্রাস মানুষের মনে যেমন এক ধরনের স্বস্তি ও স্নিগ্ধতার বিস্তার ঘটায়, তেমনি এক ধরনের সুক্ষ্ম ও স্বচ্ছ চেতনাও উজ্জীবিত করে। এর মধ্য দিয়ে মানুষের মন মহাশক্তিশালী ও অতীব সুক্ষ্মদর্শী স্রষ্টার সৃষ্টি নৈপুণ্য প্রত্যক্ষ করে। ছায়া ও সূর্য কিরণ কখনো একই অবস্থায় থাকে না বরং ক্রমেই অদৃশ্য হতে থাকে। ছায়া ক্রমেই লম্বা হতে থাকে। অবশেষে এক সময়ে তাকালে তা আর মোটেই দেখা যায় না। এক সময় সূর্য ও ছায়া দুটোই অদৃশ্য হয়ে যায়। কোথায় যায়? সেই গোপন হাতই তাকে মুঠোর মধ্যে গুটিয়ে নেয়, যা এক সময় তাকে প্রসারিত করেছিলো। রাতের গভীর ছায়ায় ও ঘন তমসায় এক সময় তা হারিয়ে যায়। এ হচ্ছে অসীম শক্তিধর স্রষ্টার সুনিপুণ হাত। মানুষের চারপাশে বিরাজমান সৃষ্টিজগতে এই হাতের যে তৎপরতা আবহমান কাল ধরে চলছে, কখনো তাতে স্থবিরতা আসে না।

'তিনি যদি চাইতেন তবে এই ছায়াকে স্থির করে দিতে পারতেন।'

অর্থাৎ গোটা বিশ্ব নিখিলের বর্তমান অবস্থা ও অবকাঠামো এবং সৌরমন্ডলের চলমান সমন্বয় প্রক্রিয়াই ছায়াকে এরূপ মৃদুভাবে সচল রেখেছে। এই সমন্বয় প্রক্রিয়ায় যদি সামান্যতম বৈকল্য বা ব্যত্যয় ঘটতো, তাহলে দৃশ্যমান ছায়াতে তার প্রভাব পড়তো। পৃথিবী যদি স্থির থাকতো, তাহলে তার ওপরের সকল ছায়াও স্থির থাকতো এবং ছোট বড় হতো না। আর যদি পৃথিবীর গতি আরো ধীর বা দ্রুত হতো, তাহলে ছায়াও বর্তমানের চেয়েও ধীর কিংবা দ্রুতগতিতে কমতো ও বাড়তো। মোট কথা, বর্তমান প্রাকৃতিক নিয়মে বিশ্ব ব্যবস্থা পরিচালিত হওয়ার কারণেই ছায়ার আকৃতিতে সেসব তারতম্য ঘটে, যা আমরা প্রতিনিয়ত দেখতে পাই।

আমাদের প্রতিনিয়ত দেখতে পাওয়া এই প্রাকৃতিক দৃশ্য, যা আমরা দেখেও না দেখার ভান করে উদাসীনভাবে চলে যাই। এটাকে আমাদের বিবেকে জাগরূক করাই কোরআনের অন্যতম লক্ষ্য। এ দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে সে পারিপার্শ্বিক জগত সম্পর্কে আমাদেরকে সচেতন ও সচকিত করে, আমাদের সেই সুপ্ত ও অচেতন অনুভূতিকে জাগিয়ে তোলে। কেননা দীর্ঘদিন ক্রমাগতভাবে প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী দেখতে দেখতে তার বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্যগুলো আমাদেরকে আর বিমোহিত করে না এবং এ সবের মধ্যে কোনো চিন্তা-ভাবনার ও শিক্ষার বিষয় আছে বলে আমাদের মনে হয় না। তাই এভাবেই কোরআন এই বিস্ময়কর প্রকৃতির সাথে আমাদের বিবেক ও মনের যোগাযোগ পুনস্থাপন করে।

ছায়া সংক্রান্ত আলোচনার পর আচ্ছাদনকারী রাত, স্বস্তিদায়ক ঘুম এবং কর্মব্যস্ত দিন সম্পর্কে আলোচনা আসছে,

'তিনিই সেই সত্ত্বা, যিনি রাতকে পোশাক, ঘুমকে বিশ্রাম ও দিনকে প্রাণ চাঞ্চল্যের আধার বানিয়েছেন।'

রাত পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু ও প্রাণীকে এমনভাবে ঢেকে দেয় যে, তখন মনে হয়, গোটা পৃথিবীই যেন রাতকে পোশাক হিসেবে গ্রহণ করে পরিধান করেছে এবং তার অন্ধকারে নিজেকে আবৃত করেছে। এভাবে রাত একটা পোশাকে রূপান্তরিত হয়ে যায়। আর সাধারণত রাতে সমস্ত

কর্মব্যস্ততা ও চলাচল বন্ধ হয়ে যায় এবং মানুষ ও পশু পাখী ঘুমায়। ঘুম প্রকৃতপক্ষে চলাচল, কর্মকান্ড ও অনুভূতি উপলব্ধির বিরতি। তাই এটা বিশ্রামের নামান্তর। তারপর সকাল হওয়ার সাথে সাথেই আবার শুরু হয় কর্মচাঞ্চল্য ও চলাচল। তাই দিন যেন রাতের ক্ষুদ্র ও সাময়িক মৃত্যুর পর নব জীবনের সূচনা স্বরূপ এই সাময়িক মৃত্যু এবং তারপর পুনরুজ্জীবন পৃথিবীতে জীবনের পর্যায়ক্রমিক স্থিতি নিয়ে আসে এবং এখনো তাতে স্থবিরতা আসে না। অথচ এ জিনিসটা যে আল্লাহর অতুলনীয় পরিচালনা নৈপুণ্য ও ব্যবস্থাপনা-দক্ষতার প্রমাণ বহণ করে। মানুষ তা অবজ্ঞার সাথে এড়িয়ে যায়। মহান আল্লাহ তায়ালা এর মাধ্যমে শুধু নিজের নৈপুণ্যেরই স্বাক্ষর রাখেননি, বরং তিনি যে এক মুহূর্তের জন্যেও ঘুমান না বা নিজ সৃষ্টির তত্ত্বাবধান থেকে উদাসীন হন না, তারও প্রমাণ দিয়েছেন।

এরপরে বৃষ্টির আভাস বহনকারী বাতাস এবং তা থেকে জীবনের ব্যাপক বিস্তার সম্পর্কে বলা হয়েছে।

'তিনিই সেই আল্লাহ তায়ালা যিনি তার রহমতের সুসংবাদবাহী হিসেবে বাতাসকে পাঠিয়েছেন, আর আমি আকাশ থেকে পবিত্র পানি বর্ষণ করি, যাতে তা দ্বারা মৃত দেশকে পুনরুজ্জীবিত করি এবং তা আমার সৃষ্টি করা বহু প্রাণী ও মানুষকে পান করাই।'

এই পৃথিবীর সকল প্রাণীরই জীবন বৃষ্টির পানির সাথে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত, চাই প্রত্যক্ষভাবেই হোক কিংবা পৃথিবীর বিভিন্ন জলাশয়, নদ নদী, কিংবা ভূগর্ভস্থ পানির উৎসের মাধ্যমেই হোক। তবে যারা সরাসরি বৃষ্টির পানির ওপর জীবন ধারণ করে, তারাই পানির আকারে আল্লাহর রহমতকে সঠিকভাবে ও পূর্ণাংগভাবে লাভ করে। যেহেতু তাদের জীবন পুরোপুরিভাবে বৃষ্টির ওপর নির্ভরশীল, তাই তারা সব সময় বৃষ্টির জন্যে উন্মুখ ও উদগ্রীব হয়ে থাকে। আর একই কারণে তারা মেঘ পরিচালনাকারী বাতাসের অপেক্ষায় থাকে, বাতাস দেখলে বৃষ্টি হবে বলে আশান্বিত হয় এবং তাতেই আল্লাহর রহমত অনুভব করে– যদি তারা পরিপক্ক ঈমানের অধিকারী হয়ে থাকে।

আয়াতের বক্তব্য থেকে পবিত্রতা ও পবিত্রকরণের প্রকৃত তাৎপর্য বুঝা যায়। বলা হয়েছে,

'আকাশ থেকে আমি পবিত্র পানি বর্ষণ করেছি।' অতপর পানিতে নিহিত জীবনের কথা বলা হয়েছে!

'যাতে আমি মৃত দেশকে পুনরুজ্জীবিত করি এবং তা আমার সৃষ্টি করা বহু মানুষ ও পশুকে পান করাই।'

এ উক্তি থেকে স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে যে, পবিত্রতাকে জীবনের একটা অবিচ্ছেদ্য বৈশিষ্ট্যে পরিণত করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা এই পৃথিবীতে যতো জীবনের উদ্ভব ঘটিয়েছেন, মূলত পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করেই তার উদ্ভব ঘটাতে চেয়েছেন এবং কার্যত তদ্রূপই ঘটিয়েছেন। তিনি পৃথিবীকে বিধৌতও করেছেন আকাশ থেকে বর্ষিত পবিত্র পানি দিয়ে, মৃত মাটিতে প্রাণের উদ্ভবও ঘটিয়েছেন সেই পবিত্র পানি দিয়ে, আর এই পৃথিবীতে বসবাসকারী মানুষ ও প্রাণীকূলকে পানও করান সেই পবিত্র পানি। সুতরাং পবিত্রতাই জীবনের ভিত্তি ও উৎস।

প্রাকৃতিক উপকরণসমূহের পর্যালোচনার এই পর্যায়ে অবতারণা করা হয়েছে কোরআনের প্রসংগ। কেননা আকাশ থেকে বর্ষিত পবিত্র পানির মতোই মানুষের অন্তরাত্মাকে পবিত্র ও বিশুদ্ধ করার মহৎ উদ্দেশ্যে এই কোরআন ও আকাশ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'আর আমি তা(১) তাদের মধ্যে বন্টন করে দিয়েছি, যাতে তারা স্মরণ করে। আর যদি আমি চাইতাম তবে প্রত্যেক গ্রামে এক একজন সতর্ককারী পাঠাতাম। সুতরাং তুমি আল্লাহর অবাধ্য লোকদের আনুগত্য করো না এবং তা দ্বারা তাদের সাথে জোরদার সংগ্রাম চালিয়ে যাও।'

'আমি তা (অর্থাৎ কোরআনকে) তাদের মধ্যে বন্টন করেছি।'

অর্থাৎ নানাভাবে ও নানা পন্থায় তাদের কাছে কোরআনকে উপস্থাপন করেছি। নানারকম আকর্ষণীয় পন্থায় কোরআনের প্রতি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। নানা রকম ভংগিতে তাদের বিবেক, মন ও অনুভূতিকে সম্বোধন করেছি, সকল সম্ভাব্য পন্থায় তাদের হৃদয়কে জয় করার পদক্ষেপ নিয়েছি এবং তাদের বিবেককে জাগানোর সকল পন্থাই প্রয়োগ করেছি।

'যাতে তারা স্মরণ করে।'

কেননা স্মরণ করার চেয়ে বেশী কিছুর প্রয়োজন নেই। যে সত্য হৃদয়ে বদ্ধমূল করতে কোরআন সচেষ্ট, তা তাদের অন্তরাত্মার গভীরে জন্মসূত্রেই প্রোথিত রয়েছে। কেবল তাদের প্রবৃত্তিই তাদেরকে সে সত্য ভুলিয়ে রেখেছে। কেননা এই প্রবৃত্তিকে তারা মাবুদের আসনে বসিয়ে রেখেছে। কেননা এই প্রবৃত্তিকে তারা খোদার আসনে বসিয়ে রেখেছে। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ কেবল কুফরী করতেই সম্মত হয়েছে।'

এমতাবস্থায় রসূল (স.)-এর দায়িত্ব খুবই বড় ও কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। কেননা তিনি সমগ্র মানব জাতিকে সুপথ প্রদর্শনের দায়িত্বে নিযুক্ত। অথচ অধিকাংশ মানুষই নিজ প্রবৃত্তি দ্বারা বিভ্রান্ত। তাই ঈমানের অকাট্য প্রমাণ উপস্থিত থাকা সত্তেও তারা ঈমান আনতে নয়, বরং কুফরী করতেই সম্মত।

কোরআনের সম্মোহনী শক্তি

'আমি যদি ইচ্ছা করতাম, তবে প্রত্যেক গ্রামে এক একজন সতর্ককারী পাঠাতাম।'

এতে রসূলের পরিশ্রমটা বিভক্ত ও দায়িত্বটা হালকা হয়ে যেতো। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা এ কাজের জন্যে একজন মাত্র বান্দাকেই মনোনীত করেছেন। তিনি শেষ নবী। তাই তাকে সারা দুনিয়াবাসী একক সতর্ককারী বানিয়েছেন। দুনিয়ার সকল গ্রামের জন্যে তিনিই একমাত্র রসূল। এক এক গ্রামে এক একজন রসূল পাঠালে তাদের বক্তব্যে কিছু না কিছু বিভিন্নতা থাকতো। কিন্তু একমাত্র রসূলের ভাষায় ও বার্তায় কোনো বিভিন্নতা নেই। তাকে কোরআন দিয়েছেন, যাতে তা দ্বারা তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ করতে পারেন,

'অতএব আল্লাহর অবাধ্যদের আনুগত্য করো না, বরং কোরআন দ্বারা তাদের বিরুদ্ধে তুমুল জেহাদ চালাও।'

---

(১) কোনো কোনো মোফাসসেরের মতে এই 'তা' সর্বনাম দ্বারা পানিকে বুঝানো হয়েছে। কারণ পানিই নিকটতম উল্লেখিত জিনিস এবং এ জায়গায় কোরআনের কোনো উল্লেখ নেই। তবে আমার মতে, এ দ্বারা পানি নয়, কোরআনকেই বুঝানো হয়েছে। কেননা পরবর্তী আয়াতে যেখানে বলা হয়েছে, 'তা' দ্বারা অবাধ্যদের বিরুদ্ধে জোরদার সংগ্রাম কর' সেখানে 'তা' সর্বনাম দ্বারা কোরআনকেই বুঝানো হয়েছে। কেননা পানি কোনো সংগ্রামের উপকরণ হয় না। দ্বিতীয় সর্বনাম দিয়ে যদি কোরআনকে বুঝানো হবে থাকে, তবে প্রথম সর্বনাম দ্বারাও কোরআনকে বুঝানো হবে– এতে কোনো সন্দেহ নেই। এটা আসলে কোরআনের একটা বহুল প্রচলিত বাকরীতি। যাতে এটা প্রাসংগিক বিষয়ের সাথে সংযোগ থাকার কারণে সর্বনামের লক্ষ্যবস্তু উহ্য রাখা হয়। এই প্রাসংগিক বিষয়টা হলো জীবনদায়ীনী পবিত্র পানি বর্ষণ, যা মনকে জীবনদায়ীনী ও বিশুদ্ধকারী কোরআনের দিকে আকৃষ্ট করে। আর এই সূরাটা সামগ্রিকভাবে কোরআনকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত।

বস্তুত এই কোরআনে এতো শক্তি ও প্রতাপ রয়েছে এবং এতো গভীর প্রভাব ও এতো মোহনীয় আকর্ষণ রয়েছে, যাকে প্রতিহত করা যায় না, যা তাদের মনকে প্রচন্ডভাবে কাঁপিয়ে, ঝাঁকিয়ে ও নাড়িয়ে দেয়। ফলে তার প্রভাব প্রতিপত্তি সর্বজয়ী হয় এবং কুফরী শক্তি কোনোভাবেই তাকে ঠেকাতে পারে না।

শীর্ষস্থানীয় কোরায়শ নেতারা সাধারণ মানুষকে বলতো, 'এই কোরআন তোমরা শুনো না, বরং তা পাঠকালে হৈ চৈ করো। হয়তো তোমরা বিজয়ী হবে।' তাদের এই উক্তিই প্রমাণ করতো কোরআনের প্রভাব তাদের ও তাদের অনুসারীদের হৃদয়ে কি সাংঘাতিক আতংকের সৃষ্টি করতো। তারা দেখতো, তাদের অনুসারীরা আব্দুল্লাহর ছেলে মোহাম্মদ (স.)-এর মুখ থেকে একটা দুটো আয়াত কিংবা একটা দুটো সূরা শুনে ক্ষণেকের মধ্যেই যেন যাদু প্রভাবিতের ন্যায় প্রভাবিত হয়ে যায় এবং মোহাম্মদ (স.)-এর অনুগত হয়ে যায়।

কোরায়েশ নেতারা তাদের অনুসারীদেরকে কোরআন পাঠের সময় হৈ চৈ করার যে নির্দেশ দিয়েছিলো, সেটা তাদের কোরআনের প্রভাব থেকে মুক্ত থাকা অবস্থায় নয়। নেতারা যদি অন্তরের অন্তস্থল থেকে অনুভব না করতো যে, জনগণ কোরআনের প্রভাবে অস্থির ও দিশেহারা অবস্থায় রয়েছে, তাহলে এমন নির্দেশ কখনো দিতো না এবং এই সতর্কবাণী কখনো উচ্চারণ করতো না। কেননা খোদ এই সতর্কবাণী অন্য যে কোনো কথার চেয়ে অধিকতর অকাট্যভাবে প্রমাণ করে যে, কোরআনের প্রভাব অপ্রতিরোধ্য।

ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন যে, একদিন গভীর রাতে আবু সুফিয়ান, আবু জাহল ও আখনাস বিন শোরায়ক– এই তিনজন শীর্ষস্থানীয় নেতা আলাদা আলাদাভাবে রসূল (স.)-এর কোরআন পাঠ শুনতে বের হলো। তিনি রাতের বেলা নিজের বাড়ীতে বসে নামাযে কোরআন পাঠ করতেন। এই তিনজনের প্রত্যেকে সুবিধাজনক জায়গা দেখে বসে পড়লো। তিনজনের কেউই অপর দু'জনের কথা জানতো না। এভাবে সারা রাত কোরআন শোনার পর ফজরের সময় যখন তারা ফিরে যেতে যাগলো, তখন পথে তাদের পরস্পরের সাথে দেখা হয়ে গেলো। প্রত্যেকে প্রত্যেককে তিরস্কার করলো এবং বললো, খবরদার, আর কখনো এখানে এসোনা। তোমাদের নির্বোধ অনুসারীদের কেউ যদি তোমাদেরকে দেখে ফেলে, তাহলে তাদের মনে খুবই খারাপ ধারণা জন্ম নেবে। তারপর তারা চলে গেলো, পরের দিন রাতে আবার তারা এলো এবং রাতভর কোরআন শুনে সকালে বাড়ী ফেরার পথে আবার তাদের দেখা হয়ে গেলো। আবারো আগের দিনের মতো কথাবার্তা হলো এবং সবাই চলে গেলো। তৃতীয় দিনও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হলো। তারা সারা রাত কোরআন শুনে সকালে পথে আবার মিলিত হলো। এবার তারা বললো, আর এখানে আসবো না– এই মর্মে অংগীকারাবদ্ধ না হয়ে এবার আমরা যাবো না। অতপর তারা অংগীকারে আবদ্ধ হলো এবং ফিরে গেলো।

সকালে বাড়ীতে গিয়ে আখনাস বিন শোরায়ক নিজের লাঠিতে ভর করে বের হলো। প্রথমে আবু সুফিয়ানের বাড়ীতে গিয়ে তাকে বললো, 'মোহাম্মদ-এর ওখানে গিয়ে যা শুনলে, সে সম্পর্কে তোমার মতামত জানাও।' আবু সুফিয়ান বললো, 'ইতিপূর্বে যা যা শুনেছি, তা তো আমার জানা ছিলো এবং তার অর্থ ও মর্ম কিছুই বুঝলাম না। আখনাস বললো, আমার অবস্থাও তদ্রূপ।

এরপর সে আবু সুফিয়ানের কাছ থেকে বেরিয়ে আবু জাহলের কাছে গেলো। তাকে বললো, ওহে আবুল হেকাম (প্রাজ্ঞ ব্যক্তি) মোহাম্মদ (স.)-এর কাছে যা শুনলে, সে সম্পর্কে তোমার মত কী?

আবু জাহল বললো, কী আর শুনবো? আমরা ও বনু আবদ মানাফ সব সময়ই সুনাম কুড়ানোর প্রতিযোগিতা করতাম। তারা যদি লোকজনকে দাওয়াত করে খাওয়াতো, আমরাও খাওয়াতাম। তারা যদি দান করতো, আমরাও করতাম। তারা যদি পরোপকার করতো, আমরাও করতাম। এক সময় তারা বলে বসলো, আমাদের মধ্যে একজন নবী আছে যার কাছে আকাশ থেকে ওহী আসে।

এ ধরনের জিনিস আমরা কোথা থেকে পাবো? আল্লাহর কসম, তার ওপর কখনো ঈমান আনবো না এবং তাকে কখনো বিশ্বাস করবো না।' এরপর আখনাস সেখান থেকে বিদায় হলো।'

এভাবেই তারা নিজেদের মনকে জোর করে কোরআন থেকে ফিরিয়ে রাখতো। তারা পরস্পরে অংগীকারাবদ্ধ না হলে তাদের নেতৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করে এমন জিনিস কোরআনের মধ্য থেকে আবির্ভূত হবে বলে তারা আতংকগ্রস্ত ছিলো। অথচ কোরআন তাদেরকে যাদুর মতো প্রভাবিত ও সম্মোহিত করে ফেলেছিলো।

কোরআনে এমন সহজ সরল সত্য রয়েছে, যা সরাসরি অন্তরের অন্তস্থলে প্রবেশ করে এবং যাকে প্রতিহত করার শক্তি কারো নেই। এতে উপস্থাপিত কেয়ামতের দৃশ্য, প্রাকৃতিক দৃশ্য, কেসসা কাহিনী, ধ্বংসপ্রাপ্ত অতীত জাতিগুলোর ইতিহাস, এবং সমস্যা চিহ্নিতকরনের শক্তি মানুষের মনকে এমনভাবে নাড়া দেয় যে, তা আর স্থির থাকতে পারে না। একটা মাত্র সূরা মানুষের সমগ্র সত্ত্বাকে এমনভাবে আলোড়িত ও আন্দোলিত করতে পারে যা একটা প্রবল শক্তিধর সশস্ত্র সেনাবাহিনীও করতে পারে না।

সুতরাং আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবীকে কাফেরদের আনুগত্য না করতে, তাঁর দাওয়াতের কাজে শৈথিল্য প্রদর্শন না করতে এবং তাদের সাথে এই কোরআনের সাহায্যে জেহাদ করতে যে আদেশ দিয়েছেন, তাতে অবাক হবার কিছু নেই। কেননা কোরআনের সাহায্যে জেহাদ করার অর্থ এমন শক্তির সাহায্যে জেহাদ করা, যার সামনে কোনো মানুষ বা অন্য কোনো শক্তি টিকে থাকতে পারে না।

আল্লাহর ক্ষমতার নিদর্শন

এরপর পুনরায় প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। প্রথমে সৃষ্টির সুসংবাদবাহী বাতাস সম্পর্কে ও পবিত্র পানি সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়েছে মিষ্টি ও লবণাক্ত পানি এবং তার মধ্যবর্তী প্রতিবন্ধকের দৃশ্য উপস্থাপনের মাধ্যমে। বলা হয়েছে,

'তিনি সেই সত্ত্বা, যিনি দুই সমুদ্রকে পৃথক করে রেখে দিয়েছেন, একটা মিষ্টি এবং অপরটা লবণাক্ত ও তিক্ত। দুটোই পাশাপাশি সমান্তরালভাবে প্রবাহিত হয়, অথচ একটা অপরটার সাথে মিশ্রিত হয় না।'

উভয়ের মাঝখানে একটা আড়াল অবস্থা বিরাজ করে এবং আল্লাহ তায়ালা একটা বিশেষ প্রকৃতি দিয়েই তা সৃষ্টি করেছেন। যেমন নদ নদীকে আল্লাহ তায়ালা প্রধানত সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে উচ্চস্তরে সৃষ্টি করেছেন। এ জন্যে মিষ্টি পানির নদী লবনাক্ত সাগরে গিয়ে পড়ে— লবনাক্ত সাগরের পানি মিষ্টি নদীতে গিয়ে পড়ে না। এর ব্যতিক্রম অত্যন্ত বিরল। এই প্রাকৃতিক নিয়মের কারণেই সাগর অনেক বড় ও শক্তিধর হওয়া সত্তেও নদীর ওপর আগ্রাসন চালায় না। কেননা এই নদীর পানিই মানুষ পশু ও উদ্ভিদের জীবন রক্ষা করে। তাই আল্লাহ তায়ালা প্রাকৃতিক নিয়মের অধীনে স্থায়ীভাবে এই ব্যবস্থা করেছেন।

মহাবিশ্ব যে প্রাকৃতিক নিয়মের অধীনে চলে, তাতে এ ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে যে, লবণাক্ত সাগর মহাসাগরের পানি নদ নদীতে ও [illegible] না। এমনকি জোয়ার ভাটার সময়েও যখন ভূ-পৃষ্ঠের পানি চাঁদের আকর্ষণে স্ফীত হয়ে অত্যধিক উঁচু হয়ে বইতে শুরু করে তখনও নয়।

'মানুষ একা জীবনধারণ করতে পারে না, শীর্ষক গ্রন্থের লেখক বলেন, 'চাঁদ আমাদের পৃথিবী থেকে দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার মাইল দূরে অবস্থান করে। প্রতিদিন দু'বার নদীতে ও সমুদ্রে যে জোয়ার আসে,তা মৃদুভাবে চাঁদের অস্তিত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। মহা সাগরে যে জোয়ার আসে, তা স্থান বিশেষে ষাট ফুট পর্যন্ত উঁচু হয়। এমনকি চাঁদের আকর্ষণে ভূ-পৃষ্ঠ প্রতিদিন দু'বার বাইরের দিকে কয়েক ইঞ্চি পরিমাণ বেঁকে যায়। অথচ আমাদের কাছে মনে হয় সব কিছু যথাযথভাবে বহাল রয়েছে। এমনকি সেই প্রচন্ড শক্তিও আমরা টের পাই না, যা সমগ্র মহাসাগরের আয়তন কয়েক ফুট বাড়িয়ে দেয়। আর যে পৃথিবীকে নিদারুণ শক্ত মনে হয়, তার পৃষ্ঠদেশও বেঁকে যায়।

'মংগল গ্রহের ছোট একটা চাঁদ আছে। এই চাঁদ মংগল গ্রহ থেকে মাত্র ছয় হাজার মাইল দূরে অবস্থিত। আমাদের চাঁদটা যদি আমাদের কাছ থেকে মাত্র পঞ্চাশ হাজার মাইল দূরে থাকতো এবং এখন যতো দূরে রয়েছে অতোটা দূরে না থাকতো, তাহলে জোয়ার এতো শক্তিশালী হতো যে, পানির স্তরের নীচে অবস্থিত সকল ভূখন্ড প্রতিদিন দু'বার অথৈ পানির নীচে ডুবে যেতো। আর সেই প্লাবনের জোরে পাহাড় পর্যন্ত বিলুপ্ত হয়ে যেতো। এমতাবস্থায় সম্ভবত পৃথিবীতে এমন একটা মহাদেশও থাকতো না যা প্রয়োজনীয় দ্রুততার সাথে সমুদ্রের তলদেশ থেকে ওপরে উঠে আসতে পারতো। আর এরূপ পরিস্থিতিতে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ভূপৃষ্ঠ সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়ে যেতো এবং বাতাসের জোয়ারের কারণে প্রতিদিনই ঝড় হতো। এমতাবস্থায় আমরা যদি ধরে নেই যে, মহাদেশগুলো পানিতে ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যাবে, তাহলে একথাও নিশ্চিত মনে করতে হবে যে, ভূপৃষ্ঠের ওপর পানির গড় উচ্চতা দাঁড়াবে প্রায় দেড় মাইল। সেরূপ পরিস্থিতিতে জীবনের সম্ভাব্য অবস্থান একমাত্র সমুদ্রের গভীরতম তলদেশে।'

কিন্তু যে সুনিপুণ হাত এই মহাবিশ্বকে পরিচালনা করে, তা উভয় সমুদ্রকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে এবং উভয়ের মাঝখানে ভারসাম্যপূর্ণ আড়াল স্থাপন করেছে। এই দুই সমুদ্রে, তাদের মধ্যবর্তী আড়ালে এবং সমগ্র বিশ্বে যে সমন্বয় ও ভারসাম্য স্থাপিত হয়েছে, তার মাত্রা ও অনুপাত নির্ধারণ করেছেন সুদক্ষ, সুনিপুন ও প্রাজ্ঞ স্রষ্টা মহান আল্লাহ।

অতপর আকাশের পানি, সমুদ্রের পানি ও নদ নদীর পানির সূত্র ধরে বীর্য নামক পানির প্রসংগ তোলা হয়েছে যা থেকে সরাসরি মানব জীবনের উদ্ভব ঘটে থাকে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'তিনিই সেই আল্লাহ, যিনি পানি থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছেন, অতপর তাকে পরিণত করেছেন জ্ঞাতিগোষ্ঠীতে ও আত্মীয় পরিজনে। তোমার প্রতিপালক খুবই শক্তিশালী।'

এই পানি থেকেই ভ্রূণের জন্ম হয়। আর এই ভ্রূণ থেকে পুরুষ সন্তান জন্ম নিলে তা বংশধরের সূচনা করে, আর নারী সন্তান জন্ম নিলে তা থেকে সূচনা হয় আত্মীয় স্বজনের। এই পানি থেকে জাত মানব জীবন আকাশের পানি থেকে জাত জীবনের চেয়ে ঢের বেশী বিস্ময়কর ও বৃহত্তর। পুরুষের এক ফোঁটা বীর্যে যে লক্ষ লক্ষ শুক্রকীট থাকে, তা থেকে একটা মাত্র কীট নারীর জরায়ুতে অবস্থানরত ডিম্বাণুর সাথে মিলিত হয় এবং তা থেকে মানুষ নামক জটিল, বহুমুখী ও সৃষ্টি জগতের সবচেয়ে বিস্ময়কর সৃষ্টির জন্ম হয়।

সম স্বভাবের শুক্রকীটসমূহ ও সম স্বভাবের ডিম্বানুসমূহ থেকে এমন বিস্ময়করভাবে পুরুষ ও নারী সন্তানের জন্ম হয়, যার রহস্য মানুষের অজানা। মানুষের আবিষ্কৃত বিজ্ঞান এর কোনো ব্যাখ্যাও দিতে পারে না। এর নিয়ন্ত্রণেরও ক্ষমতা রাখে না। হাজার হাজার শুক্রকীটের মধ্যে এমন একটা শুক্রকীটও নেই, যার ভেতরে নারী বা পুরুষ সন্তান জন্মানোর উপযুক্ত সুপরিচিত বৈশিষ্ট্যগুলো দেখা যেতে পারে। অনুরূপভাবে কোনো একটা ডিম্বাণুর মধ্যেও সেই ধরনের বৈশিষ্ট্যাবলী পরিলক্ষিত হয় না। তথাপি শেষ পর্যন্ত একটা পুরুষে ও অপরটা নারীতে পরিণত হয়।

'আর তোমার প্রতিপালক খুবই শক্তিশালী।'

তার সীমাহীন ক্ষমতার একটা অংশ এই বিস্ময়কর কীর্তির মধ্যে প্রতিফলিত।

যে বীর্য থেকে মানুষের উৎপত্তি তা নিয়ে মানুষ যদি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুসন্ধান চালায়, তাহলে সে তার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অংশসমূহের মধ্যে সেই পূর্ণাংগ মানবীয় বৈশিষ্ট্যসমূহ খুঁজে পাবে, যার মধ্যে সমগ্র মানব জাতির উত্তরাধিকারের উপকরণগুলো নিহিত রয়েছে এবং পিতামাতা ও তাদের নিকটতম পরিবারদ্বয়ের উত্তরাধিকারের উপাদানগুলো রয়েছে। এসব উপকরণ পুরুষ ভ্রুণে ও নারী ভ্রুণে আল্লাহর নির্ধারিত মাত্রা অনুসারে বিদ্যমান থাকবে।

এ প্রসংগে 'মানুষ একা জীবন ধারণ করতে পারে না' গ্রন্থে রয়েছে 'প্রতিটা কোষে চাই তা পুরুষ কোষ হোক বা নারী কোষ হোক বহুসংখ্যক ক্রোমোজম (১) ও জিন (উত্তরাধিকারের উপাদান) থাকে। আর ক্রোমজম থেকেই উৎপন্ন হয় সেই অতি ক্ষুদ্র ও অস্পষ্ট বীজ, যার ভেতরে 'জিন' নিহিত থাকে। আর জিনই হলো প্রতিটা মানুষ ও প্রাণীর অস্তিত্বের নিয়ামক সর্ব প্রধান উপাদান। আর সেটোপ্লাজম (২) হচ্ছে সেসব বিস্ময়কর রাসায়নিক যৌগিক পদার্থ, যা ক্রোমজম ও জিনকে পরিবেষ্টিত করে রাখে। 'জিন' এতো সূক্ষ্ম পদার্থ, যে তার সবগুলোকে যদি একত্রিত করে এক জায়গায় রাখা হয়, তবে তার আয়তন সেলাই করার সময় সুঁচের আঘাত এড়ানোর জন্যে আংগুলে যে আবরণ পরা হয় সেই অংগষ্ঠানের সমানও হয় না। অথচ পৃথিবীতে বিদ্যমান সকল প্রাণীর ব্যক্তিগত গুণাগুণ, মনস্তাত্বিক অবস্থা, বর্ণগত ও প্রজাতিগত বৈশিষ্ট্য এই জিনের ওপরই নির্ভরশীল।

এই অতি সূক্ষ্ম অণুবিক্ষণী জিনই হচ্ছে সকল মানুষ, জীব ও উদ্ভিদের গুণ বৈশিষ্ট্যের চাবিকাঠি। আর যে অংগুষ্ঠানটা দুই বিলিয়ন মানুষের ব্যক্তিগত গুণাবলী ধারণ করতে সক্ষম, তা নিসন্দেহে একটা অতি ক্ষুদ্রাকৃতির আধার। তথাপি এটা একটা অবিসংবাদি সত্য।

আর ভ্রুণ তার ক্রমবিকাশের ধারায় বীর্যরূপী প্রোটোপ্লাজমের শৃংখলমুক্ত হয়ে উপ-প্রজাতির পর্যায়ে উত্তীর্ণ হওয়ার পর কেবল একটা রেকর্ডকৃত ইতিবৃত্তই বর্ণনা করে। সে ইতিবৃত্ত সংরক্ষিত থাকে এবং জিন ও সেটোপ্লাজমের আকারে আণবিক সংঘবদ্ধকরণের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে।

আমরা দেখেছি যে, জিনগুলো অণুবীক্ষণের সাহায্যে দর্শনযোগ্য অণুসমূহের চেয়েও ক্ষুদ্র, সকল প্রাণীর দেহের প্রাণ কোষের মধ্যে বর্তমান এবং তা নকসা, পূর্বপুরুষদের রেকর্ড এবং প্রত্যেক প্রাণীর বৈশিষ্ট্যসমূহ সংরক্ষণ করে, সে ব্যাপারে কোনো দ্বিমতের অবকাশ নেই। আর এই জিন বিশদভাবে প্রত্যেক উদ্ভিদের বীজে, কান্ডে, পাতায়, ফুলে ও ফলে পূর্ণ কর্তৃত্ব চালায়। অনুরূপভাবে তা মানুষসহ সকল প্রাণীর আকৃতি, বহিরাবরণ, চুল ও ডানা কেমন হবে তাও স্থির করে।

---

(১) 'ক্রোমজম' হচ্ছে জীব বা উদ্ভিদ কোষস্থিত সেই তন্তু সদৃশ বস্তু, যা বংশীয় গুণাবলীর ক্রম বিস্তারে সক্রিয় অবদান রাখে। – সম্পাদক

(২) সেটোপ্লাজম হচ্ছে প্রোটোপ্লাজম ঘটিত সেই উপাদান, যা প্রাণকোষের বীজের পার্শ্বে বিরাজ করে। – সম্পাদক

সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালা জীবন জগতকে যে বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্যসমূহ দান করেছেন, তার আলোচনার আপাতত এখানেই ইতি টানছি। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

'তোমার প্রভু সর্বশক্তিমান।'

বিপুল ক্ষমতাবান আল্লাহর বিরুদ্ধে দুর্বল মানুষের বিদ্রোহ

সৃষ্টি ও সৃষ্টিজগত পরিচালনার এই প্রেক্ষাপটে, আকাশ থেকে আগত পানি ও বীর্যের পানি থেকে সৃষ্ট জীবনের এই সব তথ্যের প্রেক্ষাপটে, বিশেষত বীর্যের পানির সেসব বৈশিষ্ট্যের প্রেক্ষাপট-যা বিশেষ বিশেষ কোষকে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় বৈশিষ্ট্য ও উত্তরাধিকারসহ পুরুষে ও বিশেষ বিশেষ কোষকে একইভাবে নারীতে পরিণত করে– আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কিছুর বা অন্য কারো এবাদাত ও দাসত্ব করা একটা চরম ঘৃণ্য ও ধিক্কারযোগ্য কাজ বলে প্রতীয়মান হয়। এটা যে কোনো সুস্থ বিবেকের কাছে অসহনীয় ও অবাঞ্ছিত ব্যাপার। এই প্রসংগেই মোশরেকদের আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্যান্য বস্তু বা প্রাণীর এবাদাতের বিষয়টা আলোচনা করা হচ্ছে,

'তারা আল্লাহ ছাড়া এমনসব বস্তু বা প্রাণীর এবাদাত করে, যা তাদের উপকারও করতে পারে না, ক্ষতিও করতে পারে না। আর যে ব্যক্তি কাফের, সে তো তার প্রতিপালকের প্রতি বিদ্রোহী।' (আয়াত ৫৫)

এখানে প্রত্যেক কাফেরের কথাই বলা হয়েছে। মক্কার মোশরেকরা এবং আইন রচনার অধিকার মানুষের ওপর ন্যস্ত করার মধ্যে দিয়ে যারা আল্লাহর সাথে শেরেক করে তারা সবাই তাদের অন্তর্ভুক্ত। তারা আল্লাহর সাথে যুদ্ধরত। অথচ তিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাদেরকে সুঠাম গঠন দান করেছেন ও ভারসাম্যপূর্ণ করেছেন। এটা কিভাবে সম্ভবপর হতে পারে? সে তো আল্লাহর সামনে এতো ক্ষুদ্র নগণ্য যে, 'আল্লাহর সাথে তার যুদ্ধ করার প্রশ্নই ওঠে না। সে যে বিদ্রোহী সুলভ আচরণ করে, সেটা তার ধর্মের বিরুদ্ধে, তার জন্যে আল্লাহ তায়ালা যে জীবন ব্যবস্থা মনোনীত করেছেন তার বিরুদ্ধে। আসলে এ কথা দ্বারা তার অপরাধের বিশালত্বই ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এবং তার অপরাধকে আল্লাহর সাথে যুদ্ধ করার সমতুল্য আখ্যায়িত করা হয়েছে।

বস্তুত কোনো ব্যক্তি যখন আল্লাহর রসূলের সাথে শত্রুতা করে, আল্লাহর রসূলের আনীত জীবন ব্যবস্থা বাদ দিয়ে অন্য কোনো মতবাদে বিশ্বাসী হয়। তখন সে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর সাথেই শত্রুতা করে। সুতরাং তার ব্যাপারে রসূলের উদ্বিগ্ন হবার প্রয়োজন নেই। তার যুদ্ধ তো আল্লাহর সাথে। কাজেই তিনিই তাকে দেখে নেবেন এবং তিনিই এজন্যে যথেষ্ট।

নবীর দায়িত্ব ও কর্তব্য

এরপর আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবীকে প্রবোধ ও আশ্বাস দিচ্ছেন পরবর্তী আয়াতে। তাঁর বোঝা হালকা করে দিচ্ছেন এই বলে যে, তিনি যখন সুসংবাদ দান ও সতর্কীকরণের মাধ্যমে এবং কোরআনের সাহায্যে কাফেরদের সাথে সংগ্রাম করার মাধ্যমে নিজের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন, তখন তাঁর বিরুদ্ধে কাফেরদের শত্রুতায় তার উদ্বিগ্ন হবার কোনোই কারণ নেই। কেননা তাঁর শত্রুদের সাথে তাঁর পক্ষ হয়ে লড়াই করার দায়িত্ব আল্লাহ তায়ালা নিজেই গ্রহণ করেছেন। অতএব তাঁর উচিত আল্লাহর ওপর ভরসা করা। তিনিই তাঁর বান্দাদের গুনাহ সম্পর্কে অবহিত। আল্লাহ তায়ালা বলছেন,

'আমি তোমাকে কেবল সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে পাঠিয়েছি। ....' (আয়াত ৫৬, ৫৭ ও ৫৮)

এভাবে রসূল (স.) এর দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্দিষ্ট করে দেয়া হচ্ছে। সেটা হলো সুসংবাদ দান ও সতর্কীকরণ। মক্কায় থাকাকালে মোশরেকদের সাথে যুদ্ধ করার নির্দেশ তখনো তাকে দেয়া হয়নি। বরং সুসংবাদ দান ও সতর্কীকরণের মধ্যেই দাওয়াতী কাজ সীমাবদ্ধ করা হয়েছিলো।

যুদ্ধের নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো মদীনায় যাওয়ার পর। এর পেছনে যে কী মহৎ উদ্দেশ্য রয়েছে, তা একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন। আমার ধারণা, ইসলামের একনিষ্ঠ অনুসারীরা যাতে সংঘবদ্ধ হয়ে একটা স্থিতিশীল ইসলামী রাষ্ট্র ও সমাজ গড়ে তুলতে পারে, তারা এমন খুনের প্রতিশোধের চক্রে জড়িয়ে না পড়ে, যা কোরায়শদেরকে ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে রাখে এবং ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের দীর্ঘস্থায়ী বিদ্বেষ সৃষ্টি না করে, সে জন্যেই মক্কায় জেহাদ ফরয করা হয়নি। বিশেষত আল্লাহ তায়ালা তো জানেন, কোরায়শদের অনেকেই হিজরতের আগে এবং তাদের সবাই মক্কা বিজয়ের পরে ইসলামে প্রবেশ করবে। আর তখন আল্লাহর ইচ্ছায় তারাই হবে ইসলামের শাশ্বত আকীদা বিশ্বাসের রক্ষক ও অভিভাবক।

তবে রেসালাতের মূল কাজ মদিনায়ও যথারীতি বহাল ছিলো। সেই মূল কাজ হলো সুসংবাদ দান ও সতর্কীকরণ। যুদ্ধের অনুমতি শুধু দাওয়াতের বাধা অপসারণের, দাওয়াতের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার ও মুসলমানদেরকে তাদের শত্রুদের পক্ষ থেকে সৃষ্টি করা যাবতীয় বাধাবিপত্তি থেকে মুক্ত করার জন্যেই দেয়া হয়েছিলো। সুতরাং, 'তোমাকে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসাবেই পাঠিয়েছি' এই কথাটা মক্কা ও মদীনা উভয় জায়গাতেই সমভাবে প্রযোজ্য ও কার্যকর।

'তুমি বলো, আমি এ কাজের জন্যে তোমাদের কাছে কোনো পারিশ্রমিক চাই না, তবে যে ইচ্ছা করে, সে তার প্রভুর পথ অবলম্বন করুক।' (আয়াত ৫৭)

অর্থাৎ ইসলামের পথ অবলম্বনকারীদের কাছ থেকে কোনো পারিশ্রমিক বা পার্থিব স্বার্থ অর্জনের মোহে রসূল আক্রান্ত নন। একজন মুসলমানকে ইসলামের কালেমা উচ্চারণ ও তাতে বিশ্বাস স্থাপনের জন্যে কোনো নযর নেয়ায, কোরবানী বা ভেট দিতে হয় না। এটাই ইসলামের বৈশিষ্ট্য। এখানে কোনো ব্রাহ্মণ বা পুরোহিত নেই, যে তার পৌরহিত্যের মজুরি আদায় করবে। এখানে কোনো 'ভর্তি ফি' নেই, যা কোনো বরকত বা ফয়েয লাভের জন্যে দেয়া লাগে। মনমগয যখন ঈমান আনতে প্রস্তুত, তখন ঈমান আনার পথে কোনো বাধা থাকে না– এটাই ইসলামের বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর বান্দার মাঝে কোনো পীর পুরোহিত আড় হয়ে দাঁড়াতে পারে না। রসূল (স.) কেবল একটা মজুরীই পান। সেটা হলো, একজন মানুষের আল্লাহর পথ অবলম্বন তথা ইসলাম গ্রহণ ও স্বতস্ফূর্তভাবে তাঁর নৈকট্য লাভে সচেষ্ট হওয়া।

'তবে যে ইচ্ছা করে, সে আপন প্রভুর পথ অবলম্বন করুক।'

এটাই তাঁর একমাত্র পারিশ্রমিক। তাঁর পবিত্র মন এতেই সন্তুষ্ট এবং তাঁর মহানুভব হৃদয় এতেই খুশী যে, আল্লাহর একজন বান্দাকে তিনি হেদায়াত লাভ করতে দেখেন, তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনে সচেষ্ট হতে দেখেন এবং তাঁর পথ অবলম্বন করতে দেখেন।

'আর সেই চিরঞ্জীব সত্ত্বার ওপর নির্ভর করো, যিনি কখনো মারা যান না এবং তার প্রশংসা সহকারে তাসবীহ করো।' (আয়াত ৫৮)

বস্তুত আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর সব কিছুই মৃত, কেননা সবাই মরণশীল ও ধ্বংসশীল। একমাত্র তিনিই চিরঞ্জীব, অমর ও অক্ষয়। তিনি ছাড়া আর কেউ বা কিছুই টিকে থাকবে না। কোনো মরণশীল চাই সে দীর্ঘজীবী হোক বা ক্ষণজীবী হোক তার ওপর নির্ভর করা একটা ভংগুর খুঁটির ওপর ভর দেয়ারই শামিল। নির্ভর করা যায় শুধু চিরঞ্জীব মাবুদের ওপর।

'এবং তার প্রশংসা সহকারে তাসবীহ করো।'

কেননা তিনিই সীমাহীন নেয়ামত দাতা। আর সেই সব কাফেরকে চিরঞ্জীব আল্লাহর হতে সমর্পণ কর, যাদেরকে সতর্কীকরণ ও সুসংবাদ দানে কোনো লাভ হবে না। কেননা তিনিই তাদের পাপের খবর রাখেন।

'তিনিই তাঁর বান্দাদের গুণাহ সম্পর্কে যথেষ্ট অবগত।'

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا وَّاِذَا خَاطَبَهُمُ
الْجٰهِلُوْنَ قَالُوْا سَلٰمًا ﴿٦٣﴾ وَالَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّقِيَامًا ﴿٦٤﴾
وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ق اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ
غَرَامًا ﴿٦٥﴾ اِنَّهَا سَاۤءَتْ مُسْتَقَرًّا وَّمُقَامًا ﴿٦٦﴾ وَالَّذِيْنَ اِذَاۤ اَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا
وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾ وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا
اٰخَرَ وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُوْنَ ج
وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا ﴿٦٨﴾ يُّضٰعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ
وَيَخْلُدْ فِيْهِ مُهَانًا ﴿٦٩﴾ اِلَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَاُولٰۤئِكَ
يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِهِمْ حَسَنٰتٍ ط وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٧٠﴾ وَمَنْ تَابَ

৬৩. দয়াময় (আল্লাহ তায়ালা)-এর বান্দা তো হচ্ছে তারা, যারা যমীনে নেহায়াত বিনম্রভাবে চলাফেরা করে এবং যখন জাহেল ব্যক্তিরা (অশালীন ভাষায়) তাদের সম্বোধন করে, তখন তারা নেহায়াত প্রশান্তভাবে জবাব দেয়। ৬৪. যারা তাদের মালিকের উদ্দেশে সাজদাবনত হয়ে ও দন্ডায়মান থেকে (তাদের) রাতগুলো কাটিয়ে দেয়। ৬৫. যারা বলে, হে আমাদের মালিক, তুমি আমাদের থেকে জাহান্নামের আযাব দূরে রেখো, কেননা তার আযাব হচ্ছে নিশ্চিত বিনাশ, ৬৬. (তদুপরি) আশ্রয় ও থাকার জন্যে তা হবে একটি নিকৃষ্ট জায়গা! ৬৭. তারা যখন ব্যয় করে তখন অপব্যয় (যেমন) করে না, (তেমনি কোনো প্রকার) কার্পণ্যও তারা করে না; বরং তাদের ব্যয় (সব সময় এ দুয়ের) মধ্যবর্তী (একটি ভারসাম্যমূলক) অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকে। ৬৮. যারা আল্লাহ তায়ালার সাথে অন্য কোনো মাবুদকে ডাকে না, যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে যাকে হত্যা করতে আল্লাহ তায়ালা নিষেধ করেছেন তাকে যারা হত্যা করে না, (উপরন্তু) যারা ব্যভিচার করে না, যে ব্যক্তিই এসব (অপরাধ) করবে সে (তার গুনাহের) শাস্তি ভোগ করবে, ৬৯. কেয়ামতের দিন তার জন্যে এ শাস্তি আরো বাড়িয়ে দেয়া হবে, সেখানে সে অপমানিত হয়ে চিরকাল পড়ে থাকবে, ৭০. কিন্তু যারা (এসব থেকে) তাওবা করেছে, আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে, আল্লাহ তায়ালা এমন সব লোকদের (পেছনের) গুনাহসমূহ তাদের নেক আমল দ্বারা বদলে দেবেন; আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। ৭১. যে ব্যক্তি

وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهٗ يَتُوْبُ إِلَى اللّٰهِ مَتَابًا ﴿٧١﴾ وَالَّذِيْنَ لَا يَشْهَدُوْنَ

الزُّوْرَ ۙ وَإِذَا مَرُّوْا بِاللَّغْوِ مَرُّوْا كِرَامًا ﴿٧٢﴾ وَالَّذِيْنَ إِذَا ذُكِّرُوْا بِاٰيٰتِ

رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوْا عَلَيْهَا صُمًّا وَّعُمْيَانًا ﴿٧٣﴾ وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا

مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ إِمَامًا ﴿٧٤﴾ أُولٰٓئِكَ

يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوْا وَيُلَقَّوْنَ فِيْهَا تَحِيَّةً وَّسَلٰمًا ﴿٧٥﴾ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ

حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَّمُقَامًا ﴿٧٦﴾ قُلْ مَا يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّيْ لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ ۚ فَقَدْ

كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُوْنُ لِزَامًا ﴿٧٧﴾

তাওবা করে এবং নেক আমল করে, সে (এর দ্বারা সম্পূর্ণত) আল্লাহ অভিমুখীই হয়ে পড়ে। ৭২. (দয়াময় আল্লাহ তায়ালার নেক বান্দা তারাও,) যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না, (ঘটনাচক্রে) যদি কোনো অযথা বিষয়ের তারা সম্মুখীন হয়ে যায় তাহলে একান্ত ভদ্রতার সাথে তারা (সেখান থেকে) সরে পড়ে। ৭৩. (এরা হচ্ছে এমন কিছু লোক,) তাদের কাছে যখন তাদের মালিকের কোনো আয়াত পড়ে (কোনো কিছু) স্মরণ করানো হয়, তখন তারা তার ওপর অন্ধ ও বধির হয়ে (দাঁড়িয়ে) থাকে না। ৭৪. (নেক বান্দা তারাও) যারা বলে, হে আমাদের মালিক, তুমি আমাদের (স্বামী) স্ত্রী ও সন্তান সন্ততিদের থেকে আমাদের জন্যে চোখের শীতলতা দান করো, (উপরন্তু) তুমি আমাদের পরহেযগার লোকদের ইমাম বানিয়ে দাও। ৭৫. এরাই হচ্ছে সেসব লোক, তাদের কঠোর ধৈর্যের বিনিময় স্বরূপ যাদের (সুরম্য) বালাখানা দেয়া হবে, (ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে) তাদের (সম্মানজনক) অভিবাদন ও সালামসহ অভ্যর্থনা জানানো হবে, ৭৬. সেখানে তারা চিরকাল থাকবে; কতো উৎকৃষ্ট সে জায়গা আশ্রয় নেয়ার জন্যে, (কতো সুন্দর সে জায়গা) থাকার জন্যে। ৭৭. (হে নবী,) তুমি (এদের) বলো, তোমরা যদি (তাঁকে) না ডাকো তবু আমার মালিক তোমাদের মোটেই পরোয়া করবেন না, যদি তোমরা তাঁকে ডাকো তবে তা তোমাদেরই কল্যাণ বয়ে আনবে, কিন্তু তোমরা তো (তাঁকে) অস্বীকার করেছো, (তাই) অচিরেই (এটা) তোমাদের জন্যে কাল হয়ে দেখা দেবে।

তাফসীর

আয়াত ৬৩-৭৭

'রহমানের বান্দা তারাই যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং তাদের সাথে যখন মূর্খরা কথা বলতে থাকে, তখন তারা বলে সালাম ....। (আয়াত ৬৩)

আলোচ্য সূরার শেষ পর্বে 'আল্লাহর বান্দাদের' গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হচ্ছে। কারণ, এই বান্দারাই হচ্ছে সত্য ও মিথ্যার মধ্যকার দীর্ঘ লড়াইয়ের পরবর্তী মানবতার সারবত্তা, হেদায়াত

ও গোমরাহীর মধ্যকার কঠিন জেহাদের ফলাফল। এই বান্দারাই হচ্ছে হেদায়াতের সেসব মশাল বরদারদের জন্যে সান্ত্বনাস্বরূপ যারা আল্লাহদ্রোহী গোষ্ঠীর নানা ধরনের অবজ্ঞা, অবহেলা ও অগ্রাহ্যতার শিকার হয়েছেন।

আগের আয়াতে সেই সব লোকদের কথা বলা হয়েছিলো, যারা 'দয়াময় আল্লাহ'কে চিনেনা বলে জানিয়েছিলো। আর এখন বলা হচ্ছে সেসব লোকদের কথা যারা 'দয়াময় আল্লাহর বান্দা' এবং যারা 'দয়াময় আল্লাহ'কে চিনে ও জানে। কাজেই তাদেরকে 'আল্লাহর বান্দা' বলেই আখ্যায়িত করা হয়েছে। এই বিশেষণে বিশেষিত হওয়ার উপযুক্তই তারা। এখানে তাদের আচার আচরণ ও স্বভাব-চরিত্রের কিছু বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হচ্ছে। তাদেরকে আদর্শ হিসেবে তুলে ধরা হচ্ছে। কারণ, তাদের মতো লোকজনই হচ্ছে ইসলামের কাম্য, এরাই হচ্ছে ইসলামী নৈতিকতার মানদন্ড। পৃথিবীর বুকে একমাত্র এরাই আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ ও নেকদৃষ্টির উপযুক্ত। পৃথিবীর বুকে এরা যদি না থাকতো, এরা যদি আল্লাহকে না ডাকতো তাহলে আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীর কারো প্রতি দৃষ্টিপাত করতেন না।

আল্লাহর নেক বান্দাদের গুণাবলী

'দয়াময় আল্লাহর' বান্দাদের প্রথম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তারা পৃথিবীর বুকে নম্রভাবে ও বিনয়ীভাবে চলাফেরা করে। তাদের চলাফেরায় কোনো অহঙ্কার নেই, দাম্ভিকতা নেই, উন্নাসিকতা নেই, কৃত্রিমতা নেই, জড়তা নেই, ভনিতা নেই এবং নেই কোনো শিথিলতা। কারণ, হাটা-চলার মধ্যেও মানুষের ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পায়, তার মন-মানসিকতা প্রকাশ পায়। কাজেই সহজ, সরল, শান্ত, প্রত্যয়ী ও প্রত্যাশী মনের অধিকারী ব্যক্তির হাটা-চলার মাঝে এসব গুণের বহিপ্রকাশ ঘটবে সেটাই স্বাভাবিক। তাই তার চলাফেরার মাঝে থাকে গাম্ভীর্য ও ধিরস্থিরতা। তার মাঝে থাকে প্রত্যয় ও শক্তি। নম্রভাবে চলার অর্থ এই নয় যে, মাথা নুইয়ে, শরীর ঢিলেঢালা করে রোগীর মতো করে হাঁটতে হবে। অনেকেই তাকওয়া পরহেযগারী দেখাতে গিয়ে এভাবে হাঁটেন। অথচ এটা ঠিক নয়। কারণ, খোদ রসূলুল্লাহ (স.) এভাবে হাঁটতেন না। তিনি বেশ দ্রুত হাঁটতেন। কিন্তু তারপরও তাঁর চলার ভংগি ছিলো শান্ত ও সুন্দর। এ সম্পর্কে বিশিষ্ট সাহাবী আবু হোরায়রা (রা.) বলেন, 'আমি রসূলুল্লাহ (স.)-এর তুলনায় সুন্দরতম কোনো কিছু দেখিনি। মনে হতো যেন সূর্যটা তাঁর চেহারার মধ্যে ভেসে বেড়াচ্ছে। আমি রসূলুল্লাহ (স.)-এর চেয়ে দ্রুত কাউকে হাঁটতে দেখিনি। মনে হতো যেন জমিটা তাঁর জন্যে ভাজ হয়ে আসতো। আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়তাম অথচ তাঁর কোনো কষ্টই হতো না। হযরত আলী (রা.) বলেন, 'রসূলুল্লাহ (স.) যখন হাঁটতেন তখন বীরদর্পে হাঁটতেন। মনে হতো যেন তিনি কোনো উচু জায়গা থেকে নামছেন।' এই বর্ণনার ব্যাখ্যায় বিশিষ্ট মোহাদ্দেস আল্লামা ইবনুল কায়্যিম আল জাউযিয়া (র.) বলেন, 'অর্থাৎ রসূলুল্লাহ (স.)-এর চলা ফেরার মাঝে শৌর্য বীর্য ও বীরত্বের ভাব প্রকাশ পেতো।' (যাদুল মা'আদ)

'দয়াময় আল্লাহর' বান্দারা যখন চলাফেরা করে তখন তাদের মনযোগ নিবদ্ধ থাকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদির প্রতি। তাই চলার পথে নির্বোধ ও মূর্খরা কী বললো বা কী মন্তব্য ছুঁড়ে দিলো সে দিকে তাকাবার মত সময় ও সুযোগ তাদের থাকে না। তারা কখনো এসব মূর্খদের সাথে অহেতুক তর্ক বিতর্ক ও ঝগড়া-ঝাটিতে লিপ্ত হয় না। এদের খপ্পর থেকে বাঁচার জন্যে 'সালাম' বলে পাশ কাটিয়ে চলে যায়। তবে এ পাশ কাটিয়ে যাওয়া দুর্বলতার কারণে নয়, অক্ষমতার কারণে নয়, বরং অনর্থক ঝগড়া ফ্যাসাদ থেকে বাঁচার জন্যে এবং মূল্যবান সময়ের অপচয় রোধ করার জন্যে। কারণ একজন ভদ্র ও দায়িত্বশীল লোক কখনো অনর্থক ঝগড়া-ফ্যাসাদে লিপ্ত হয়ে নিজের গুরুত্বপূর্ণ কাজের ক্ষতি করতে পারে না।

দিনের বেলায় মানুষের সাথে তাঁদের আচরণ ও চলাফেরা থাকে এ রকমই। আর রাতের বেলায় তাদের আচরণ কি হয়, সে সম্পর্কে নিচের আয়াতে বলা হয়েছে,

'এবং যারা রাত্রি যাপন করে পালনকর্তার উদ্দেশ্যে সেজদাবনত হয়ে ও দন্ডায়মান হয়ে .... । (আয়াত ৬৪-৬৬)

মানুষ যখন গভীর নিদ্রায় মগ্ন থাকে তখন 'আল্লাহর বান্দারা' নিজেদের মালিক ও প্রভুর এবাদাতে একান্তভাবে মগ্ন থাকে। একমাত্র তাঁর প্রতিই মনোনিবেশ করে, তাঁর উদ্দেশেই দাঁড়ায় এবং তাঁর উদ্দেশেই মাথা নত করে। আরামদায়ক বিছানা আর সুখকর নিদ্রার তুলনায় গভীর রাতের এবাদাতই তাদের জন্যে অধিক সুখকর ও আরামদায়ক। নিজেদের প্রভুর প্রতি দেহ-মন সহ সর্বাংগ সঁপে দিয়েই তারা অনাবিল সুখ পায়, শান্তি পায়। মানুষ সহ গোটা প্রকৃতি যখন নিদ্রায় বিভোর, তখন তারা নীরবে ও একাকী এবাদাতে মশগুল থাকে। মানুষ যখন মাটিকেই আপন করে নেয়, তখন তারা পরম দয়ালুর মহান আরশের প্রতি মনোনিবেশ করে।

দাঁড়িয়ে হোক বা সেজদায় হোক, ধ্যানে হোক বা যেকেরে হোক সর্ব অবস্থায় এদের মন থাকে আল্লাহভীতিতে পরিপূর্ণ এবং জাহান্নামের আযাবের ভয়ে সদা সন্ত্রস্ত। সে কারণেই তারা বলে, 'হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের কাছ থেকে জাহান্নামের শাস্তি হটিয়ে দাও।' ...... (আয়াত ৬৫-৬৬)

অথচ এরা কখনো জাহান্নাম দেখেনি, কিন্তু এর অস্তিত্বে তারা দৃঢ় বিশ্বাসী। কারণ, তারা এর বর্ণনা পবিত্র কোরআনে পেয়েছে, রসূলের মুখনিসৃত বাণীতে পেয়েছে। কাজেই তাদের এই ভয় তাদের গভীর ঈমান ও বিশ্বাসেরই পরিচয় ও ফলস্বরূপ।

এবাদাত বন্দেগীতে লিপ্ত থেকেও তারা জাহান্নামের শাস্তির ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হতে পারে না। তারা নিজেদের এবাদাত বন্দেগীকেই যথেষ্ট মনে করে না এবং এটাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি ও রেহাই পাওয়ার গ্যারান্টি হিসেবেও দেখে না। তাদের বিশ্বাস যে, আল্লাহর রহমত, দয়া, ক্ষমা ও করুণা ব্যতীত জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা পাওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই তারা অত্যন্ত ভয় ও ভক্তি নিয়ে আল্লাহর দরবারে জাহান্নামের শাস্তি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে কাকুতি মিনতি জানায়।

জাহান্নামের বর্ণনা এমনভাবে দেয়া হয়েছে যা পড়লে মনে হয় যেন জাহান্নামের লেলিহান অগ্নি শিখা প্রতিটি মানুষকে গ্রাস করার জন্যে ধেয়ে আসছে। এমতাবস্থায় 'আল্লাহর বান্দারা' আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে ও সেজদায় পড়ে কান্নাকাটি করছে, ফরিয়াদ জানাচ্ছে যেন এই জাহান্নামের আযাব তাদের কাছ থেকে সরিয়ে নেয়া হয়। এর লেলিহান শিখার ছোবল থেকে সবাইকে রক্ষা করা হয়।

তারা যে ভাষায় জাহান্নামের বর্ণনা দিচ্ছে তা পড়লে ভয়ে শরীর কেঁপে উঠে। কারণ তাদের বর্ণনায় জাহান্নাম হচ্ছে, 'নিশ্চয়ই এর শাস্তি নিশ্চিত বিনাশ'

অর্থাৎ এর ছোবলে কেউ আক্রান্ত হলে তার আর রক্ষা নেই। তার ধ্বংস অনিবার্য। আর সে কারণেই আল্লাহর নেক বান্দারা এর ভয়ে এতো সন্ত্রস্ত ও আতংকিত। আর সে কারণেই তারা বলে,

'নিশ্চয়ই বসবাস ও অবস্থানস্থল হিসেবে তা অতি নিকৃষ্ট জায়গা' ....

তারা যথার্থই বলে। কারণ, অগ্নিকুন্ডে বসবাস কি মানুষের জন্যে কাম্য হতে পারে? জাহান্নামের লেলিহান অগ্নি শিখার মাঝে অবস্থান করা কি মানুষের পক্ষে সম্ভব? প্রতি মুহূর্তে তপ্ত অঙ্গারে গড়াগড়ি খেয়ে টিকে থাকা কি কারো পক্ষে সম্ভব?

আল্লাহর নেক বান্দাদের জীবনে কোনো বাড়াবাড়ি নেই, কোনো অসঙ্গতি নেই এবং কোনো অতিরঞ্জন নেই। তাদের জীবন হয় ভারসাম্যপূর্ণ, সংগতিপূর্ণ ও মধ্যমপন্থী। এ কথাই নিচের আয়াতে বলা হয়েছে।

'এবং তারা যখন ব্যয় করে, তখন অযথা ব্যয় করে না, কৃপণতাও করে না এবং তাদের পন্থা হয় এই দুয়ের মধ্যবর্তী।' (আয়াত ৬৭)

এটাই হচ্ছে ইসলামী আদর্শের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ও গুণ। এই গুণই ইসলাম তার অনুসারীদের ব্যক্তি জীবনে ও সমাজ জীবনে সৃষ্টি করতে চায়। এই গুণের ওপরই প্রতিষ্ঠিত ইসলামের শিক্ষা নীতি ও বিচারনীতি। বস্তুত ইসলামী আদর্শের গোটা ভিত্তিই হচ্ছে এই মধ্যমপন্থা ও ভারসাম্যতার ওপর প্রতিষ্ঠিত।

নিয়ন্ত্রিত ব্যক্তি মালিকানা ইসলাম স্বীকার করলেও পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার ন্যায় অথবা মানব রচিত আইন দ্বারা পরিচালিত কোনো সমাজ ব্যবস্থার ন্যায় ইসলাম কখনো তার কোনো অনুসারীকে নিজ মালিকানাধীন সম্পদ ব্যবহারে অবাধ স্বাধীনতা বা স্বেচ্ছাচারিতার অনুমতি দেয় না। বরং ইসলাম তার সকল অনুসারীকে নিজস্ব সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে অপচয় ও কৃপণতার মাঝামাঝি পন্থা অবলম্বন করতে উৎসাহিত করে থাকে। কারণ, অপচয় ব্যক্তির জন্যে ক্ষতিকর, সম্পদের জন্যে ক্ষতিকর এবং সমাজের জন্যেও ক্ষতিকর। অপরদিকে কার্পণ্যও ব্যক্তি ও সমাজের জন্যে ক্ষতিকর। কারণ, এর ফলে সম্পদের সদ্ব্যবহার থেকে ব্যক্তি ও সমাজ বঞ্চিত হয়। অথচ সম্পদ হচ্ছে সামাজিক উপকরণ যা সমাজের সেবা ও উপকারেই ব্যবহৃত হওয়া বাঞ্ছনীয়। মোটকথা, অপচয় ও কৃপণতা দুটোই সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিমন্ডলের ভারসাম্য নষ্ট করে দেয়। তাছাড়া এর ফলে ব্যক্তির নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতার ওপরও বিরূপ প্রভাব পড়ে।

এই অবস্থার সংশোধন করতে গিয়ে ইসলাম প্রথমেই ব্যক্তিগত জীবনকে বেঁছে নেয় এবং মধ্যমপন্থাকে ঈমানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসেবে গণ্য করে।

আল্লাহর নেক বান্দাদের আর এক গুণ হচ্ছে, তারা কখনো আল্লাহর সাথে শেরক করে না, অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করে না এবং ব্যাভিচারে লিপ্ত হয় না। কারণ, এসব হচ্ছে গুরুতর পাপের কাজ যা কঠিন শাস্তিযোগ্য। একথাই নিচের আয়াতে বলা হচ্ছে,

'এবং যারা আল্লাহর সাথে অন্য কোনো ইলাহকে ডাকে না, আল্লাহ তায়ালা যার হত্যা অবৈধ করেছেন, সংগত কারণ ব্যতীত তাকে হত্যা করে না ......। (আয়াত ৬৮)

বলাবাহুল্য, তৌহীদই হচ্ছে ইসলামী আকীদা বিশ্বাসের ভিত্তি। এই তাওহীদই হচ্ছে আকীদা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে ব্যক্তি কতোটুকু স্বচ্ছতার অধিকারী, সততার অধিকারী ও সরলতার অধিকারী, তা জানার মাপকাঠি। এর মাধ্যমেই ধরা পড়ে বিশ্বাসের ক্ষেত্রে ব্যক্তির অস্বচ্ছতা, বক্রতা ও দুর্বোদ্ধতা যা একটি সুষ্ঠু ও সুশৃংখল জীবন গঠনে কখনো সহায়ক হতে পারে না।

ন্যায়সংগত কারণ ব্যতীত কাউকে হত্যা করাকে পাপ মনে করাও এমন একটি গুণ যা নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ সামাজিক জীবনের জন্যে অপরিহার্য কেননা এই সমাজে মানুষের জীবনের নিরাপত্তা থাকবে, মানুষের জীবনের মূল্য থাকবে। এই জীবন বন্য জীবন ও গুহার জীবন থেকে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন, যে জীবনে মানুষের জানমাল ও ইযযত আবরুর কোনো নিরাপত্তা থাকে না।

ব্যাভিচারকে পাপ মনে করার অর্থ হচ্ছে একটি নিষ্কলুষ ও নির্মল জীবনকে বেছে নেয়া যে জীবনের অধিকারী ব্যক্তিরা স্থুল পাশবিক কামনা-বাসনার অনেক উর্ধে অবস্থান করে এবং বিপরীত লিংগের সাথে দৈহিক মিলনের মাঝে একটা উচ্চ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আছে বলে তারা বিশ্বাস করে। এই উদ্দেশ্য অবশ্যই স্থুল উপায়ে ও পাশবিক পন্থায় যৌন পিপাসা নিবারণের চেয়ে অনেক উর্ধে।

এই তিনটি গুণ দ্বারা যেহেতু সুন্দর ও সুস্থ মানবিক জীবন এবং পশুর স্তরে নেমে যাওয়া স্থূল জীবনের মাঝে পার্থক্য নির্ণয় করে, এই কারণেই আল্লাহ তায়ালা সেগুলোকে তাঁর নেক বান্দাদের গুণ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এই গুণের অধিকারী হওয়ার ফলেই তারা আল্লাহর কাছে সর্বাধিক মর্যাদাবান ও সম্মানিত বান্দা হিসেবে গণ্য।

এসব গুণাবলী বর্ণনা করার পর এর বিপরীত গুণের অধিকারীদের জন্যে কঠিন হুঁশিয়ার বাণী উচ্চারণ করে বলা হচ্ছে,

'যারা এ কাজ করে তারা শাস্তির সম্মুখীন হবে। কেয়ামতের দিন তাদের শাস্তি দ্বিগুণ হবে এবং তথায় লাঞ্ছিত অবস্থায় চিরকাল বসবাস করবে'

অর্থাৎ নিছক শাস্তিই নয়, বরং দ্বিগুণ শাস্তি। আবার নিছক দ্বিগুণ শাস্তিই নয়, বরং শাস্তির সাথে সাথে চিরকাল লাঞ্ছনা ভোগ করতে হবে যা দ্বিগুণ শাস্তির চেয়েও কঠিন।

তবে যারা এই মর্মান্তিক পরিণতি থেকে রক্ষা পেতে চায় তাদের জন্যে তাওবার দরজা খোলা রাখা হচ্ছে। ইচ্ছা করলে তারা সঠিক ঈমান, নেক আমল ও তাওবার মাধ্যমে নিজেকে রক্ষা করতে পারে। তাই বলা হচ্ছে,

'কিন্তু যারা তাওবা করে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ তায়ালা তাদের গোনাহকে পুণ্য দ্বারা পরিবর্তিত করে দেবেন ....। (আয়াত ৭০)

তাওবা করার ফলে আল্লাহ তায়ালা বান্দার অতীতের পাপ কাজগুলো সৎ কাজে রূপান্তরিত করে দেন। এই যে বিরাট প্রতিদান যার কোনো তুলনা হয় না এটা কেবল তখনই আল্লাহ তায়ালা বান্দাকে দান করেন যখন সে ভুল পথ থেকে সরে এসে সঠিক পথে পা বাড়ায় এবং তাঁরই দরবারে আশ্রয় নেয়। কারণ, 'আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল দয়ালু',

তাওবার দরজা সব সময়ই খোলা আছে। কারো বিবেক যদি জাগ্রত হয় এবং পুনরায় সঠিক পথে ফিরে আসতে চায় তাহলে তার পথে কেউ বাধার সৃষ্টি করবে না তার গোনাহ যাই হোক না কেন এবং তার পরিচয়ও যাই থাকুক না কেন? তাবরানী কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদীসে বলা হয়েছে যে, আবু ফারওয়াহ নামক জনৈক সাহাবী রসূলুল্লাহ (স.)-এর কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন, 'এমন ব্যক্তির ব্যাপারে আপনি কী বলেন সে সব রকমের গোনাহর কাজেই লিপ্ত হয়েছে, তার জন্যে কি কোনো তাওবার বিধান আছে?' রসূল বললেন, 'তুমি কি ইসলাম গ্রহণ করেছো?' সে উত্তরে বললো, 'জী'। তিনি বললেন, 'তাহলে ভালো কাজ করবে আর মন্দ কাজ ছেড়ে দেবে, এর ফলে আল্লাহ তায়ালা ওই সব গোনাহগুলোকে তোমার জন্যে সৎ কাজে পরিণত করে দেবেন।' সে বললো, 'আমার বিশ্বাসঘাতকতা ও অপকর্মগুলোকেও?' তিনি বললেন, 'হাঁ', তখন লোকটি 'আল্লাহু আকবার' বলতে বলতে চলে গেলো।

তবে এই তাওবার কিছু নিয়ম আছে, কিছু শর্ত আছে। এ সম্পর্কে আয়াতে বলা হয়েছে, 'সে তাওবা করে ও সৎ কর্ম করে ....। (আয়াত-৭১)

অর্থাৎ তাওবার প্রথম শর্ত হলো, অনুশোচনা এবং গোনাহর কাজ পরিহার করা। এর দ্বিতীয় শর্ত হলো, সৎ কাজে আত্মনিয়োগ করা, যখন কোনো ব্যক্তি গোনাহর কাজ ত্যাগ করে সৎকাজে আত্মনিয়োগ করবে তখনই বুঝা যাবে, লোকটি সত্যিকার অর্থে তাওবা করেছে। ফলে এই সৎ কাজগুলো তার পাপাচারের ইতিবাচক বিকল্প হিসেবে তার সামনে প্রকাশ পাবে। এটা সকলেরই জানা যে, গোনাহ বা পাপাচার মানুষের এক প্রকারের কর্মকান্ড যা তার দৈনন্দিন জীবনের একটা অনুষংগ। যদি কেউ এসব নেতিবাচক কর্মকান্ড ত্যাগ করার পর ইতিবাচক কোনো কর্মকান্ডের

সাথে জড়িত হতে না পারে তাহলে অবসর মুহূর্তগুলো তার জন্যে অস্বস্তিকর ও পীড়াদায়ক হয়ে উঠবে। ফলে এর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে সে পুনরায় গোনাহর কাজে লিপ্ত হয়ে পড়বে। তাই, একথা বলা যায় যে, তাওবার পর সৎ কাজের নির্দেশ যে পবিত্র কোরআনে এসেছে তা সত্যিই বিস্ময়কর। এই নির্দেশ কেবল সেই মহান সত্ত্বাই দিতে পারেন যিনি মানব চরিত্র ও মানসিকতা সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকেফহাল। স্রষ্টা অপেক্ষা সৃষ্টি সম্পর্কে অধিক ওয়াকেফহাল আর কে হতে পারে? তিনি কতোই না মহান!

আল্লাহর নেক বান্দাদের আর একটি বৈশিষ্ট্যের কথা এখানে বলা হচ্ছে। আর তাহলো, 'এবং যারা মিথ্যা কাজে যোগদান করে না ....। (আয়াত ৭২)

মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান না করার দুটো অর্থ হতে পারে, এক, সরাসরি কোনো মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান না করা। কারণ এর দ্বারা অন্যের অধিকার খর্ব হয় এবং অন্যায় কাজে সহযোগিতা করা হয়। দুই, যে বৈঠকে কোনো মিথ্যা কথা বলা হয় অথবা মিথ্যা কর্মকান্ড পরিচালিত হয় তা থেকে দূরে সরে থাকা। এই শেষোক্ত অর্থই হচ্ছে অধিক তাৎপর্যপূর্ণ। মিথ্যা কর্মকান্ড থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করার সাথে সাথে তারা বেহুদা ও অনর্থক কাজ কাম ও কথাবার্তা থেকেও নিজেদেরকে রক্ষা করে থাকে। তাই বলা হয়েছে,

'এবং যখন অসার ক্রিয়াকর্মের সম্মুখীন হয়, তখন মান রক্ষার্থে ভদ্রভাবে চলে যায়'........

অর্থাৎ বেহুদা কথাবার্তা ও কাজ-কাম নিয়ে তারা মাথা ঘামায় না, নিজের কানকে কলুষিত করে না, বরং এর অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্যে নীরবে পাশ কেটে চলে যায়। কারণ একজন মোমেনের এসব বিষয় নিয়ে মাথা ঘামানোর সময়ই বা কোথায়? তার তো নিজের কাজ থেকেই ফুরসত নেই। তার গোটা জীবনটাই তো ঈমান, আমল ও দাওয়াতী কাজ নিয়ে ব্যস্ত। সে অন্য সব ফালতু কাজ নিয়ে মাথা ঘামাবে কখন?

আল্লাহর নেক বান্দাদের আর একটি গুণ হচ্ছে, তারা দ্রুত উপদেশ গ্রহণ করে থাকে। তারা আল্লাহর আয়াত দ্রুত বোঝার চেষ্টা করে। তাদের হৃদয় মন এ ব্যাপারে পুরোপুরি উন্মুক্ত। সে কথাই নিচের আয়াতে বলা হচ্ছে,

'এবং যাদেরকে তাদের পালনকর্তার আয়াতসমূহ বোঝানো হলে তাতে অন্ধ ও বধির সদৃশ আচরণ করে না। (আয়াত ৭৩)

আলোচ্য আয়াতের বর্ণনাভংগির মাঝে মোশরেকদের আচরণের প্রতি ইংগিত রয়েছে। কারণ, ওরা চোখ, কান বন্ধ করে নিজেদের ভ্রান্ত ও অলীক বিশ্বাসকে নিয়েই আঁকড়ে পড়ে থাকে। তাদের গুরুদের বানানো আইন কানুন ও মতবাদ নিয়ে পড়ে থাকে কিংবা মনগড়া দেব-দেবীদের চরণেই মাথা ঠেকিয়ে পড়ে থাকে। ওরা কিছু শুনতেও চায় না এবং দেখতেও চায় না। ওরা সত্যের আলোর দিকেও যেতে চায় না। নিজেদের ভ্রান্ত বিশ্বাস ও মতবাদের ব্যাপারে এভাবে চোখ-কান বন্ধ করে পড়ে থাকাটা গোড়ামী, মূর্খতা ও অন্ধ বিশ্বাস নয় তো কি? কিন্তু আল্লাহর নেক বান্দাদের মাঝে সে জাতীয় স্বভাব নেই। কারণ, তারা নিজেদের আকীদা বিশ্বাসের সত্যতার ব্যাপারে এবং আল্লাহর আয়াতের যথার্থতার ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন। তারা জেনে-বুঝেই ঈমান গ্রহণ করে। তাদের মাঝে অন্ধ বিশ্বাসের কোনো অবকাশ নেই। নিজেদের আদর্শের ব্যাপারে আবেগ উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলে তা যুক্তিসংগতভাবেই করে এবং জেনে-শুনেই করে।

আল্লাহর বান্দাদের দোয়া ও তাদের সফলতা

মোটকথা, যারা প্রকৃত আল্লাহর নেক বান্দা তারা কেবল নফল নামাযেই রাত কাটায় না। বরং তাদের মাঝে ওপরে বর্ণিত সবগুলো গুণই বিদ্যমান থাকে। শুধু তাই নয়, বরং তারা একান্তভাবে কামনা করে যেন তাদের সন্তানরাও তাদের পদাংক অনুসরণ করে, তাদের স্ত্রীরাও যেন তাদের অনুরূপ আদর্শের অনুসারী হয়। এর ফলে যেন তাদের চক্ষু শীতল হয়, তাদের মন শান্ত হয় এবং 'আল্লাহর নেক বান্দাদের' সংখ্যা দ্বিগুণ হয়। তারা আরো কামনা করে যেন আল্লাহভীরু লোকদের জন্যে তাদেরকে আদর্শরূপে গ্রহণ করা হয়। সে কথাই নিচের আয়াতে বলা হয়েছে।

'এবং যারা বলে, হে আমাদের মালিক, আমাদের স্ত্রীদের পক্ষ থেকে এবং আমাদের সন্তানদের পক্ষ থেকে আমাদের জন্যে চোখের শীতলতা দান করো ......। (আয়াত ৭৪)

এটাই হচ্ছে স্বভাবজাত অনুভূতি যা গভীর ঈমান থেকে উৎসারিত। একজন প্রকৃত মোমেন স্বভাবতই কামনা করবে যেন আল্লাহর পথের পথিকদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাক। আর এই পথিকদের প্রথম সারিতে তার স্ত্রী ও সন্তান-সন্তুতিরা থাকুক। কারণ তারা হচ্ছে তার একান্ত আপনজন ও আমানতস্বরূপ। তাদের ব্যাপারে তার কাছ থেকে অবশ্যই কৈফিয়ত তলব করা হবে। একজন প্রকৃত ও খাঁটি মোমেন এটাও কামনা করবে সে যেন সত্য ও মঙ্গলের দিশারী হতে পারে এবং আল্লাহর পথের পথিকদের নেতৃত্ব দান করতে পারে। এই কামনার মাঝে নিজেকে বড়ো মনে করার কিছুই নেই এবং এতে আত্মগরিমারও কিছুই নেই। কারণ তারা সবাই তো একই কাফেলার লোক। তারা সবাই আল্লাহর পথেরই যাত্রী।

এখন আলোচনা করা হচ্ছে আল্লাহর নেক বান্দাদের উত্তম পরিণতির ব্যাপারে। আয়াতে বলা হয়েছে,

'তাদেরকে তাদের সবরের প্রতিদানে জান্নাতে কক্ষ দেয়া হবে এবং তাদেরকে সেখানে দোয়া ও সালাম সহকারে অভ্যর্থনা জানানো হবে। (আয়াত ৭৫-৭৬)

কক্ষ বলতে এখানে খুব সম্ভবত জান্নাতই বুঝানো হয়েছে অথবা জান্নাতে অবস্থিত বিশেষ কোনো স্থানকে বুঝানো হয়েছে। পৃথিবীর নিয়ম অনুসারে গুরুত্বপূর্ণ মেহমানদেরকে মানুষ বাড়ীর আংগিনার পরিবর্তে অন্দর মহলের খাস কামরায় নিয়েই বসায়। আল্লাহ তায়ালাও তাঁর নেক বান্দাদেরকে তাদের ধৈর্য ও সহ্যের বিনিময়ে এবং তাদের সৎ গুণাবলীর পুরস্কারস্বরূপ জান্নাতের বিশেষ কক্ষে সালাম সহকারে অভ্যর্থনা জানাবেন, স্বাদর সম্ভাষণ জানাবেন। এই বর্ণনাভংগি অত্যন্ত অর্থপূর্ণ। এর দ্বারা এ কথাই বুঝা যায় যে, ওইসব উচ্চাংগের সৎ গুণাবলী অর্জন করতে গিয়ে আল্লাহর নেক বান্দাদেরকে অনেক কামনা বাসনা বিসর্জন দিতে হয়েছে, জীবনের অনেক ভোগ বিলাসিতা ত্যাগ করতে হয়েছে এবং নিজেদেরকে পতনের কারণ থেকে রক্ষা করতে হয়েছে। সৎ জীবন সাধনা ব্যতীত লাভ করা যায় না। আর এই সাধনার জন্যে প্রয়োজন হয় পরম ধৈর্য ও সহ্য। এমন ধৈর্য যা পবিত্র কোরআনে স্থান পাওয়ার মতো উপযুক্ত। আর সে কারণেই তাদের স্থান হবে জাহান্নামের পরিবর্তে জান্নাতে। যে জান্নাত হচ্ছে বসবাসের জন্যে সুন্দরতম স্থান, চিরস্থায়ী স্থান। এখান থেকে আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত অন্য কেউ তাদেরকে বের করতে পারবে না। এখানে তারা স্থায়ীভাবে এবং পরম শান্তিতে বসবাস করতে থাকবে।

আল্লাহর বান্দাদের সকল গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করার পর আলোচ্য সূরার শেষে আল্লাহ তায়ালা জানিয়ে দিচ্ছেন গোটা মানব জাতি তাঁর সামনে কিছুই নয়। তিনি ইচ্ছা করলে সবাইকে

ধ্বংস করে দিতে পারেন। তবে নেক বান্দাদের অস্তিত্ব পৃথিবীতে আছে বলে তিনি তা করেন না। তবে যারা আল্লাহকে অস্বীকার করে তাদের জন্যে কঠিন শাস্তি অনিবার্য। সে কথাই নিচের আয়াতে বলা হয়েছে,

'বলো, আমার পালনকর্তা তোমাদের পরওয়া করেন না।' (আয়াত-৭৭)

সূরার শেষের এই বক্তব্যটি বিষয়বস্তুর সাথে অত্যন্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ। এর দ্বারা রসূলুল্লাহ (স.)-কে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে। তাঁকে সমবেদনা জানানো হয়েছে, তিনি যেন কাফের মোশরেকদের কঠোর ও নিষ্ঠুর আচরণে ব্যথিত না হন। অথচ এসব কাফের মোশরেকদের দল রসূলুল্লাহ (স.)-এর মান-মর্যাদার কথা ভালোভাবেই জানে। তা সত্তেও কেবল গোড়ামী ও গোয়ার্তুমীর বশবর্তী হয়ে তারা এ ধরনের আচরণ করে থাকে। তাদের জানা উচিত, আল্লাহর সামনে শুধু তারাই নয়, বরং গোটা মানব জাতিই কিছুই নয়। যদি এই অল্পসংখ্যক ঈমান্দার বান্দাদের দোয়া-দরূদ ও কান্নাকাটি না হতো তাহলে পৃথিবীর বুকে ওদের কি কোনো অস্তিত্ব থাকতো?

এই যে পৃথিবী– এরই বা কী মূল্য আছে? এই বিশাল সৃষ্টিজগতে পৃথিবী একটা ছোট্ট কনা বৈ আর কি? আর মানব জাতি? সেও তো পৃথিবীর বুকে বিচরণকারী অসংখ্য প্রাণী জগতেরই একটা ক্ষুদ্র অংশ এবং এক বিশাল গ্রন্থের অসংখ্য পৃষ্ঠার মাঝে একটি পৃষ্ঠা মাত্র।

এরপরেও মানুষ আত্মগর্বে ফুলে-ফেঁপে উঠে। দাম্ভিকতা দেখাতে দেখাতে সে এক সময় নিজ স্রষ্টার ওপরও বাহাদুরী ফলাতে আরম্ভ করে। অথচ একটা নগন্য, দুর্বল ও অক্ষম জীব ব্যতীত মানুষের আর কী পরিচয় আছে স্রষ্টার সামনে। এই স্রষ্টার কাছ থেকেই সে শক্তি অর্জন করে, সঠিক পথের সন্ধান পায়। আর তখনই নিজ স্রষ্টার কাছে তার একটা মূল্য হয়। এমন কি সে এক্ষেত্রে ফেরেশতাদেরকেও ডিঙ্গিয়ে যেতে পারে। এটা আল্লাহরই অশেষ মেহেরবানী যে, তিনি এই মানুষ নামী প্রাণীকে বিশেষ মর্যাদা দান করেছেন এবং ফেরেশতাদের দ্বারা তাদেরকে সেজদা করিয়েছেন, উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, তারা যেন সেই মহান স্রষ্টাকে চিনতে পারে, জানতে পারে এবং তাঁরই এবাদাত বন্দেগী করতে পারে। এর ফলে তারা নিজেদের সেই সকল বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলীগুলো রক্ষা করতে সক্ষম হবে যার কারণে ফেরেশতারা তাদেরকে সম্মানার্থে সেজদা করেছিলো। অন্যথায় তার কোনোই মূল্য নেই। এমনকি গোটা মানব জাতিকেও যদি এক পাল্লায় রাখা হয় তাতেও পাল্লা ভারী হবে না।

'বলো, আমার প্রভু তোমাদের পরোয়া করেন না' ....

এই বর্ণনাভংগি রসূলকে উৎসাহিত করে এবং তাঁর মাঝে শক্তি যোগায়, মনোবল যোগায়। এর অর্থ হচ্ছে, রসূল (স.) ঘোষণা দিয়ে জানিয়ে দেবেন, 'আমি আমার প্রভুর সান্নিধ্যে আছি, তাঁর হেফাযতে আছি। তিনিই আমার পালনকর্তা ও রক্ষক, আর আমি তাঁর বান্দা। তোমরা হচ্ছো, বেঈমানদের দল, তোমরা তাঁর নেক বান্দাদের দলে নও। কাজেই তোমরা হচ্ছো জাহান্নামের ইন্ধন, তোমাদের জন্যে জাহান্নামের আযাব অনিবার্য।'

সূরা আশ শোয়ারা

আয়াত ২২৭ রুকু ১১

মক্কায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

طٰسٓمٓ ۝ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ۝ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ اَلَّا
يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ ۝ اِنْ نَّشَاْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَآءِ اٰيَةً فَظَلَّتْ اَعْنَاقُهُمْ
لَهَا خٰضِعِيْنَ ۝ وَمَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمٰنِ مُحْدَثٍ اِلَّا كَانُوْا عَنْهُ
مُعْرِضِيْنَ ۝ فَقَدْ كَذَّبُوْا فَسَيَاْتِيْهِمْ اَنْۢبٰٓؤُا مَا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ۝
اَوَلَمْ يَرَوْا اِلَى الْاَرْضِ كَمْ اَنْۢبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيْمٍ ۝ اِنَّ فِيْ
ذٰلِكَ لَاٰيَةً ؕ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝ وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ۝

রুকু ১

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে—

১. ত্বা-সীম, মীম। ২. এগুলো হচ্ছে সুস্পষ্ট গ্রন্থের (কতিপয়) আয়াত। ৩. (হে নবী,) কেন তারা ঈমান আনছে না (সে দুঃখে) মনে হচ্ছে তুমি তোমার জীবনটাই ধ্বংস করে দেবে। ৪. (অথচ) আমি চাইলে এদের ওপর আসমান থেকে (এমন) একটি নিদর্শন নাযিল করতে পারি, (যা দেখে) তাদের গর্দান তার দিকে ঝুঁকে পড়বে। ৫. যখনি দয়াময় আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে এদের কাছে কোনো (নতুন) উপদেশ আসে তখনি তারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। ৬. এরা যেহেতু (আল্লাহর আযাব) অস্বীকার করেছে, (তাই) অচিরেই তাদের কাছে সে (আযাবের) প্রত্যক্ষ বিবরণ এসে হাযির হবে, যা নিয়ে তারা ঠাট্টা বিদ্রূপ করতো! ৭. এরা কি যমীনের দিকে নযর করে দেখে না! আমি কতো কতো ধরনের উৎকৃষ্ট জিনিসপত্র তাতে উৎপাদন করাই। ৮. নিশ্চয়ই এর মাঝে (ছড়িয়ে) আছে (আমার সৃষ্টি কৌশলের নানা) নিদর্শন; কিন্তু তাদের অধিকাংশ মানুষ তা বিশ্বাসই করে না। ৯. তোমার মালিক অবশ্যই পরাক্রমশালী ও পরম দয়ালু।

তাফসীর

আয়াত-১-৯

তা-সীন-মীম, এগুলো সুস্পষ্টভাবে বর্ণনাকারী আয়াতসমূহ ....আর অবশ্যই তোমার রব বড়ই শক্তিমান মেহেরবান।

এই মৌলিক সূরাটির আলোচ্য বিষয় সবটুকুই হচ্ছে মক্কী যিন্দেগী কেন্দ্রিক, অর্থাৎ সূরাটিতে আকীদা সম্পর্কেই আলোচনা এসেছে। আকীদা বা অন্তরের মধ্যে আগত মৌলিক গভীর বিশ্বাসের প্রধান কথা হচ্ছে, আল্লাহ তায়ালা একা এবং একাই তিনি সকল ক্ষমতার মালিক, 'অতএব,

আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শক্তি ক্ষমতার মালিক (ইলাহ) রূপে ডেকো না, তাহলে তুমি শাস্তিপ্রাপ্তদের মধ্যে একজন হয়ে যাবে।' (আয়াত ২১৩) ....

এরপর আলোচনা এসেছে আখেরাতের ভয় সম্পর্কে,

'হে আল্লাহ তায়ালা কেয়ামতের দিন আমাকে অপমান করো না, যেদিন সম্পদ সন্তানাদি কোনো কিছুই কোনো কাজে লাগবে না, তবে সেই ব্যক্তিই নাজাত পাবে যে সেদিন শেরক মুক্ত মন নিয়ে আসবে।

আকীদার অন্তর্গত তৃতীয় বিষয়টি হচ্ছে, মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (স.)-এর ওপর যে ওহী নাযিল হয়েছে একথাকে বিশ্বাস করা, এরশাদ হচ্ছে,

'এ পবিত্র ওহী নাযিল হয়েছে রব্বুল আলামীনের কাছ থেকে। এ পাক পবিত্র বাণী নিয়ে রুহুল আমীন (বিশ্বস্ত ঐশী দূত) জিবরাঈল (আ.) নাযিল হয়েছেন।'

আকীদার মধ্যে চতুর্থ বিষয় হচ্ছে, সত্যকে প্রত্যাখ্যান করার পরিণতি সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করা, কেননা সত্য বিরোধীরা হয় দুনিয়াতে আযাবে পতিত হয়ে ধ্বংস প্রাপ্ত হবে, নতুবা আখেরাতের আযাবে পতিত হবে, যা তাদের জন্যে অপেক্ষা করছে। এরশাদ হচ্ছে,

'ওরা (সত্যকে) প্রত্যাখ্যান করলো, অতপর ওরা সত্য সম্পর্কে যেসব উপহাস বিদ্রূপ করলো, সে পরিণতির সংবাদ শীঘ্রই তাদের কাছে পৌছে যাবে।'

আল কোরআন এক জীবন্ত নিদর্শন

'শীঘ্রই জানতে পারবে তারা যারা যুলুম করেছে– কোন পরিণতির দিকে তারা ফিরে যাচ্ছে। 'মনে হচ্ছে (ওদের সম্পর্কে চিন্তা করতে করতে) তুমি নিজেকে ধ্বংস করে ফেলবে! এজন্যে যে ওরা ঈমান আনছে না। যদি আমি চাইতাম তাহলে আকাশ থেকে এমন কোনো নিদর্শন নাযিল করতাম, যার কারণে বিনয়াবনতভাবে তাদের গর্দান ঝুঁকে পড়তো।' (আয়াত ৩-৪)

এ আয়াতের ব্যাখ্যা থেকে জানা যায়, কাফেরদের না-ফরমানীর কারণে রসূলুল্লাহ (স.) খুব বেশী কষ্ট বোধ করতেন, দুঃখে তাঁর মন ফেটে চৌচির হয়ে যেতো। এ কথাটাই এখানে বলা হচ্ছে,

'বোধ হয় ওরা ঈমান না আনার কারণে (চিন্তা করতে করতে) তুমি নিজেকে হালাক করে ফেলবে।' ......

'বাখেউন্নাফসা' অর্থ নাফসকে হত্যা করা। এই জন্যে রসূল (স.)-এর এই অবস্থা এমন হতো যে, যারা এতোদিন 'আল আমীন' (একান্ত বিশ্বস্ত মানুষ) বলে তাঁকে ডেকেছে, তারাই তার আহবানকে মিথ্যা কথা বলে ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে। তাদের এই কঠিন আচরণের কারণে অবশ্যই তাদের ওপর আল্লাহর আক্রোশ এসে পড়বে বলে তাঁর নিশ্চিত বিশ্বাস– আর এই কারণেই তিনি পেরেশান হয়ে যাচ্ছেন। তারা তো তাঁরই দেশবাসী, তাঁরই পরিবার, গোত্রের লোক ও তাঁরই জাতি। এজন্যে তাঁর বুকটা সঙ্কুচিত হয়ে যাচ্ছে তাদের ওপর নিশ্চিত বিপদ আসার আশংকায়। এজন্যে তাঁর প্রতি স্নেহমাখা ভাষায় মহান আল্লাহ কথা বলছেন এবং তাঁকে এত বেশী দুঃখ করতে মানা করছেন যা তাঁর জন্যে চরম ক্ষতিকর হয়ে যাবে, বরং তিনি ধ্বংস হওয়ার পর্যায়ে পৌছে যাচ্ছেন। তাই তিনি তাঁকে জানাচ্ছেন তারা ঈমান আনুক আর না আনুক তাঁকে তো সেজন্যে দায়ী করা হবে না, আল্লাহ তায়ালা চাইলে তাদেরকে ঈমান আনতে বাধ্য করতে পারতেন, কিন্তু তিনি বলছেন, আর যদি আমি তাদেরকে ঈমান আনার জন্যে বাধ্য করতে চাইতাম তাহলে অবশ্যই বাধ্য করতে পারতাম এবং অবশ্যই আকাশ থেকে এমন কিছু নিদর্শন নাযিল করতে পারতাম যা দেখে তারা ঈমান আনতে বাধ্য হয়ে যেতো এবং কোনো টাল বাহানা করার সুযোগ পেতো না– ঈমান আনা থেকে মুখ ফিরিয়েও চলে যেতে পারতো না। এরপর তারা এই আয়াতের প্রতি বা সে নিদর্শনের প্রতি এতোই দুর্বল হয়ে পড়তো যে, তাদের অন্তর গলে যেতো; ফলে '

বিনয়ের কারণে তাদের ঘাড় ঝুঁকে পড়ত।'

অর্থাৎ, আমি চাইলে সত্যকে তাদের কাছে এতোই গ্রহণ যোগ্য করে তুলতে পারতাম যে সত্য থেকে তারা দূরে সরে যেতে পারতো না এবং অবশ্যই তারা এর ওপর কায়েম হয়ে যেতো।

কিন্তু পাক পরওয়ারদেগার এই শেষ রেসালাতের সাথে এমন কোনো নিদর্শন পাঠাতে চাননি যার কারণে মানুষ সত্যকে গ্রহণ করার ব্যাপারে মজবুর হয়ে যায়। হাঁ, সত্যকে জানা ও বুঝার জন্যে আল্লাহ রব্বুল আলামীন আল কোরআনকে জীবন্ত নিদর্শন বানিয়ে পাঠিয়েছেন, যা গভীরভাবে অধ্যয়ন করলে যে কোনো মানুষের মন সত্য সচেতন হয়ে যাবে, সত্যের দিকে আকৃষ্ট হবে এবং তার মনের মধ্যে সত্যকে গ্রহণ করার জন্যে একটি প্রবল প্রেরণা অনুভব করবে, অর্থাৎ এ পাক কালামের মধ্যে অবর্ণনীয় এক সৌন্দর্য আছে। ভাষার এমন আকর্ষণ, এমন গাঁথুনি, অনস্বীকার্য যুক্তি, অভাবনীয় তথ্য ও তত্ত্ব যা মানুষকে সত্য থেকে আর দূরে সরে যেতে দেয় না এবং সকল দিক থেকে তাদের মনকে সরিয়ে এনে সত্যকে গ্রহণ করতে বাধ্য করে ফেলে।

প্রিয় পাঠক পাঠিকা, দিল ও দেমাগ দিয়ে আল কোরআন বুঝার চেষ্টা করুন, দেখতে পাবেন ওপরের এ কথাটা কতটা সত্য, দেখবেন এর বৈচিত্র্যময় বর্ণনাভংগী এবং আলোচ্য বিষয়াবলীর মধ্যে বিদ্যমান পারস্পরিক সংগতিপূর্ণ তত্ত্ব ও তথ্যের অবতারণা আপনাকে মুগ্ধ করবে। দেখবেন এর মধ্যে একটি বিশেষ বিষয়ের প্রতি মনকে কেন্দ্রীভূত করার মতো প্রবল শক্তি রয়েছে, যার মধ্যে কোনো বিভিন্নতা নেই, নেই পারস্পরিক কোনো বিরোধ এবং এর বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে একের সাথে অন্যের কোনো পার্থক্য নেই। আরো দেখতে পাবেন এর মধ্যে উপস্থাপিত মানুষের জন্যে কল্যাণকর কাজগুলোর মধ্যেও কোনো বৈপরীত্ব নেই। আল কোরআনের এসব বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্টভাবে তখনই মানুষের কাছে ধরা পড়ে, যখন সে কোনো এক ব্যক্তির কাজকে পর্যবেক্ষণ করে এবং তার কাজের মধ্যে এসব কিছু দেখতে পায়। অগ্রগতি, অধগতি, মজবুরী ও দুর্বলতা সবই সে দেখে এবং তার মধ্যে বিভিন্ন অবস্থাও লক্ষ্য করে। এমনই এক ব্যক্তির জীবন ও তার সকল কাজের মধ্যে আল কোরআন সামঞ্জস্য, ভারসাম্য এবং সুনির্দিষ্ট এক শৃংখলা এনে দেয়; তাকে এমন নীতির ওপর দাঁড় করিয়ে দেয়– যার মধ্যে কোনো ভাংগন বা বিভিন্নতা থাকে না, তা তাকে এমন এক উৎসের দিকে এগিয়ে দেয়, যার মধ্যে কোনো পরিবর্তন হয় না।

আল কোরআন এর আয়াতগুলো বা এ পাক কালামের মধ্যে উপস্থাপিত নিদর্শনগুলোর সংস্পর্শে যখন মানুষ আসে তখন তার চিন্তার মধ্যে এক অভাবিত বিপ্লব সৃষ্টি হয়, কিন্তু লক্ষ্য করলে এখানেও দেখবেন এ বিপ্লবের ধারা উপধারার মধ্যে পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য রয়েছে। আরোও দেখতে পাবেন, আল কোরআনে পেশকৃত চিন্তাধারার মধ্যে কোনো শূন্যতা বা দিশেহারা ভাব নেই, অথবা প্রথম দিককার চিন্তার সাথে পরবর্তী চিন্তার কোনো অসংগতি বা অসামঞ্জস্য নেই। মানুষকে আল কোরআন যতো প্রকার চিন্তার দিকেই এগিয়ে দিয়েছে, দিয়েছে যতো প্রকার নিয়ম ও বিধানের দিকে, তার প্রত্যেকটির মধ্যে দেখতে পাবেন পারস্পরিক এক অবিচ্ছেদ্য যোগসূত্র, যা একটা আরেকটার পরিপূরক ও সম্পূরক হিসাবে কাজ করে, এতে বুঝা যায় যে, গোটা সৃষ্টিজগতের প্রত্যেকটি বস্তু অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে পরস্পরের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে। আর এর ব্যাপ্তি গোটা মানব জীবনকেই ঘিরে রেখেছে, যতো প্রকার বস্তু বিশ্ব জগতে ছড়িয়ে আছে, তার প্রত্যেকটির সাথে প্রত্যেকটিরই ঘনিষ্ঠ একটা যোগাযোগ রয়েছে। একটি আর একটির জন্যে সহায়ক এবং একটি আর একটির ওপর নির্ভরশীল; একটি আর একটির সাথে কোনোভাবেই এবং কোনো দিক দিয়েই সংঘর্ষশীল নয়। আপনি দেখতে পাবেন, এ বিশাল সৃষ্টির সবাই সবার সাথে এক অমোঘ নিয়মে বাঁধা রয়েছে। বিশ্ব জগতের সকল সৃষ্টির মধ্যে মানুষও একটি সৃষ্টি, যে বৃহত্তর সৃষ্টির নিয়মের মধ্যে সে গড়ে উঠেছে এবং নিত্য এখানে প্রতিপালিত হচ্ছে। আর সুবিশাল এ সৃষ্টিরাজ্যের সব কিছুই একটি নির্দিষ্ট কেন্দ্রবিন্দুর সাথে আবদ্ধ হয়ে আছে, সবাই মিলেও একটি মাত্র সুদৃঢ় ও অভংগুর রশি ধরে আছে। যতো দিন মানবজাতির অস্তিত্ব এই সীমাবদ্ধ জগতে

বর্তমান রয়েছে ততোদিন সব কিছুর সাথে তার এই অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক আছেই, এ সম্পর্ক কিছুতেই ছিন্ন হবার নয়। এসব কিছুর পেছনে এমন অসীম জ্ঞান ভান্ডার থাকতে হবে যে, যার বাইরে কিছু থাকবে না এবং এসব কিছুকে পরিচালনার জন্যেও নিশ্ছিদ্র এক শৃংখলা বা পূর্ণাংগ ব্যবস্থাপনা থাকতে হবে।

অন্তরসমূহে নিহিত চিন্তাধারা ও মানুষের বাহ্যিক মনের মধ্যে যেসব কথা নিশিদিন আনাগোনা করে সেগুলো অতি সহজভাবে আল কোরআন পেশ করেছে- এটা এ অত্যাশ্চর্য ব্যাপার। মানুষের জন্যে এসব রহস্য ভান্ডারের সন্ধান রয়েছে সেগুলোকে মানুষের জন্যে খুলে দেয়া হচ্ছে। বিষয়গুলোকে খুঁজে বের করা, এ সবের জট ও জটিলতাগুলোকে খুলে দেয়া এবং সাধারণ মানুষের জন্যে সব কিছুকে বোধগম্য করে দেয়া- এসবই আল কোরআনের মোজেযা। জ্ঞানান্বেষণের জন্যে আল কোরআন যেভাবে মানুষকে উৎসাহিত করেছে এবং যতো কিছুর তথ্য সরবরাহ করেছে ইতিপূর্বে কখনও কোনো গ্রন্থ তা করেনি। পৃথিবীর রহস্য ভান্ডারের দরজা মানুষের জন্যে খুলে দেয়ার জন্যে আল কোরআন সম্ভাব্য সকল খেদমত আনজাম দিয়েছে, যা এর আগে কোনো দিন সম্ভব হয়নি।

শেষ রসূল (স.)-কে মোজেযা হিসাবে আল্লাহ তায়ালা আল কোরআন দান করেছেন। যা চির দিন দুনিয়ার সকল মানুষের জন্যে মোজেযা হিসাবে থাকবে। এ গ্রন্থের ওপর মানুষ যতো বেশী গবেষণা চালাতে থাকবে ততো বেশী এর থেকে নতুন নতুন তথ্য তারা পেতে থাকবে এবং দিনে দিনে এ পবিত্র গ্রন্থ মানুষের জীবনকে আরো সহজ এবং আরো সুন্দর করতে সাহায্য করতে থাকবে। খেয়াল করার বিষয় হচ্ছে এই যে, আল্লাহ রব্বুল আলামীন এমন কোনো আয়াত নাযিল করেননি যা বস্তুগত কোনো জিনিস ব্যবহার করার জন্যে মানুষকে বাধ্য করবে এবং জোর করে কোনো কিছু গ্রহণ করাবে অথবা কোনো কিছু মেনে নেয়ার জন্যে তাকে মজবুর করে ফেলবে। এটা এজন্যে যে রেসালাতে মোহাম্মাদী হচ্ছে বিশ্ব মানবের জন্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত শেষ পয়গাম। এ পয়গাম সবার জন্যে। এ মহাগ্রন্থকে কুক্ষিগত করে রাখার অধিকার কাউকে দেয়া হয়নি, সকল যামানার সকল মানুষের জন্যে এ কেতাব অধ্যয়ন করা, এর ওপর গবেষণা করা এবং এ কেতাব থেকে জীবন পথের নির্দেশনা লাভ করার অধিকার রয়েছে। কোনো বিশেষ যামানা বা বিশেষ এলাকায় এ কেতাবকে সীমাবদ্ধ করে রাখার জন্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কখনও বলা হয়নি। আল্লাহ তায়ালা দূর ও নিকটের সকল মানুষের জন্যে এ কেতাবের মোজেযা বুঝবার পথকে সুগম করেছেন, প্রত্যেক যুগের সকল মানুষের জন্যেই রয়েছে এ মহাগ্রন্থের দ্বার অবারিত ও উন্মুক্ত।

এসব অলৌকিক ও অত্যাশ্চর্য ঘটনাবলী তাদের মনকে আল্লাহর দিকে ঝুঁকিয়ে দেয় যারা সূক্ষ্ম দৃষ্টি দিয়ে এগুলোর দিকে তাকায়; এর ফলে এসব দৃশ্য তাদের অন্তরে এত গভীরভাবে রেখাপাত করে যার তুলনা অন্য কোনো জিনিসের সাথে হয় না .... অবশ্যই এই মহা গ্রন্থ আল কোরআন চৌদ্দশত বছরের বেশী সময় ধরে বিশ্ববাসী সবার জন্যে উন্মুক্ত হয়ে রয়েছে, এর বৈশিষ্ট্যসমূহ এবং এর মধ্যে বর্ণিত তথ্যসমূহ সবার অধ্যয়ন ও গবেষণার জন্যে অবারিত রয়েছে। এর মধ্যে মানুষের বাস্তব জীবনকে পরিচালনার জন্যে যে জীবন ব্যবস্থা পেশ করা হয়েছে তা কতোটুকু বাস্তবসম্মত এবং মানব জীবনের জন্যে তা কতোখানি কল্যাণকর, সকল শ্রেণীর বিদগ্ধ মানুষই তা দেখতে পারছে। যদি সত্যিকারে তারা মানবজাতির কল্যাণকামী হয় এবং তারা এ পাক কালাম থেকে পথ পেতে চায় তাহলে অবশ্যই এর থেকে তারা সকল বিষয়েই দিক-নির্দেশনা লাভ করবে, উন্নততর পৃথিবী গড়তে পারবে। সুন্দরতর জীবন, মনোরম পরিমন্ডল এবং আদর্শ ও সুন্দরতম পরিণতি অর্জিত হবে। আল কোরআনের অধ্যয়ন ও অনুসরণের মাধ্যমে হয়তো আগামী প্রজন্ম আমাদের পরে এমন বহু কিছু গড়ে তুলতে সক্ষম হবে যার আমরা কিছুই কল্পনা করতে পারি না। যেসব তত্ত্ব ও তথ্যের সন্ধান আমরা এ পর্যন্ত পেয়েছি তার থেকেও বেশী দৃঢ় প্রত্যয়

নিয়ে যখন মানুষ এ গ্রন্থ অধ্যয়ন করবে এবং আরো গভীর গবেষণায় আত্মনিয়োগ করবে তখন এ পাক কালাম তাদের সামনে অনাগত ভবিষ্যতের নবতর দিগন্ত খুলে দেবে।

কোরআনের নির্দেশনা থেকে সরে যাওয়ার পরিণতি

আল্লাহ রব্বুল আলামীনের নিয়ম হচ্ছে, যারা প্রকৃতপক্ষে এ মহা ভান্ডারের কাছে প্রার্থী হয়ে যথাযোগ্য সাধনা করে তিনি তাদেরকে তারা যতোটা চায়, ততোটা তো দেনই– বরং তার থেকেও অনেক বেশী দান করেন এবং তার প্রাপ্তিযোগ এমনভাবে ঘটে যা কখনো ফুরাতে চায় না, আল্লাহর অসীম ভান্ডারের নতুন নতুন দ্বার তাদের সামনে তখন উন্মোচিত হতেই থাকে। এরশাদ হচ্ছে, যারা সাধনা করে অসীম ভান্ডারের মালিকের কাছে কিছু পাওয়ার জন্যে তাদের জন্যে আমার ওয়াদা, অবশ্যই আমি তাদের আমার বহুতর পথ দেখাবো। কিন্তু, আফসোস, আজকের মুসলমানেরা এই মহাজ্ঞান ভান্ডারের সন্ধান করার সময় যখন কোনো কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হয় তখন হাল ছেড়ে দেয়; আল কোরআন পর্যায়ক্রমে তাদেরকে যেসব কাজ করার নির্দেশ দিয়েছে তা বাস্তবায়ন করতে গিয়ে যখনই তারা কোনো কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হয়েছে, তখনই তারা পিছপা হয়ে গেছে। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'আর যখনই মহা দয়াময় আল্লাহর পক্ষ থেকে নতুন কোনো নির্দেশ বা উপদেশ আসে তখন তারা তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।'

আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাঁর এই উপদেশমালা নাযিল করার সময় তাঁর বান্দার প্রতি কতোবড় রহমত বর্ষণ করেছেন এখানে তাঁর 'রহমান' নামটি ব্যবহার করে সেই দিকেই ইংগিত করেছেন। একথাটি বলতে গিয়ে প্রথমেই তিনি তাদের ঘৃণাভরে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার কথা উল্লেখ করছেন। এতে ক্ষতি তো তাদেরই হচ্ছে, তারা দূরে সরে যাচ্ছে, আল্লাহর অপার রহমতের বারিধারা থেকে যা তিনি বড় মেহেরবানী করে তাঁর বান্দাদের জন্যে বর্ষণ করেছেন। এ রহমতকে তারা অস্বীকার করছে এবং তাদের অবজ্ঞার কারণে তারা নিজেদেরকে আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত করছে, অথচ তাদের জীবনের এই কঠিন অবস্থায় আল্লাহর রহমতের প্রয়োজন তাদেরই বড় বেশী।

এভাবে আল্লাহর স্মরণ থেকে দূরে সরে যাওয়ায় এবং তাঁর রহমতকে উপেক্ষা করার কারণে সে হতভাগাদেরকে এর কঠিন পরিণতি ও ভীষণ শাস্তি ভোগ করতে হবে বলে ও তাদের ধমক দেয়া হচ্ছে। বলা হচ্ছে,

'হাঁ ওরা প্রত্যাখ্যান করলো অতএব তাদের কাছে তাদের উপহাস বিদ্রূপের দরুণ কঠিন পরিণতির খবর শীঘ্রই আসছে।'

এ আয়াতের মধ্যে ইংগিতের মাধ্যমে তাদের জন্যে ভয়ানক আযাবের ধমকি দেয়া হয়েছে। আয়াতাংশটি ব্যাখ্যা করলে একথাটা আসে যে, ওরা যেমন সত্যকে উপেক্ষা করার সাথে সাথে সত্য খবর দাতার সাথে ঠাট্টা মস্কারি করছে, তার জওয়াবে ওদেরকেও বিদ্রূপাত্মক ভাষায় আযাবের খবর দেয়া হচ্ছে, 'শীঘ্রই আসছে ওদের কাছে, তাঁর সাথে ওদের বিদ্রূপের কারণে, ওদের জন্যে যথোপযুক্ত খবর .... অর্থাৎ, তাঁর সাথে ওদের উপহাস বিদ্রূপের শাস্তি স্বরূপ শীঘ্রই ওরা আযাবের খবর পাবে! আসলে কথা আকারে তাদের কাছে কোনো খবর আসবে না, হাযির হবে সে খবর বাস্তব আযাবের রূপ নিয়ে, যার কঠিন স্বাদ তারা ভোগ করবে! তারপর তাদের অধস্তন প্রজন্মে তা পরিণত হবে এক করুন খবর হিসাবে– যা মানুষ বংশ পরম্পরায় বর্ণনা করতে থাকবে। ওরা সত্যকে বিদ্রূপ করছে, ফলে আল্লাহ তায়ালাও ভয়ানক আযাবের 'সুসংবাদ'(?) দিয়ে তাদেরকে বিদ্রূপ করছেন!!

'চোখ' থাকলে স্রষ্টাকে খুঁজে পাওয়া যায়

ওরা আল্লাহর নবীর কাছে মোজেযা দেখানোর জন্যে বারবার দাবী করছে, অথচ ওদের আশে পাশে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের শক্তি ক্ষমতা বুঝার জন্যে হাজারো দৃষ্টান্ত যে ছড়িয়ে রয়েছে– সেদিকে ওরা তাকায় না। একবার যদি ওরা ওদের হৃদয়ের দ্বার খুলে দিতো এবং বিশ্ব প্রকৃতির দিকে খোলা চোখ দিয়ে তাকাতো, তাহলে দেখতে পেতো চতুর্দিকে ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য নিদর্শনগুলো যেন এক একটি উন্মুক্ত কেতাব, যার প্রত্যেকটি পাতা তাদের সামনে আল্লাহর শক্তি ক্ষমতার অসংখ্য নিদর্শন। এরশাদ হচ্ছে,

'ওরা কি তাকিয়ে দেখছে না পৃথিবীর দিকে, সেখানে কতো রকমের জোড়া জোড়া মনোরম গাছপালা ও ফলমূল, আমি (ওদের জন্যে) উৎপাদন করেছি? অবশ্যই এর মধ্যে (আল্লাহকে জানার জন্যে) সুস্পষ্ট নিদর্শন রয়েছে, কিন্তু এসব দেখেও ওদের অধিকাংশই বিশ্বাস স্থাপনকারী হয়নি।'

জীবন্ত গাছপালা, টাটকা ফলমূল ও শাক সব্জি এসব কিছু (মৃত) থেকে উৎপন্ন হওয়া এবং এদের প্রত্যেকটির মধ্যে পুরুষ ও স্ত্রী জাতীয় অস্তিত্ব থাকা– এটা কি অলৌকিক ব্যাপার নয়? পর্যবেক্ষণ দ্বারা এটা প্রমাণিত হয়েছে, এদের মধ্যে কোনো কোনো প্রজাতি তো এমনও আছে যাদের মধ্যে পুরুষ ও স্ত্রী জাতীয় সত্ত্বা পৃথক পৃথকভাবে থাকতে দেখা যায়, আর কোনো কোনোটার মধ্যে একের মধ্যে দুইয়ের অবস্থান সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। 'এক স্রষ্টার' সৃষ্টি সবাই– এই 'এক' নিয়মের অধীনে গোটা বিশ্বের বুকে বিরাজ করছে। প্রতি মুহূর্তেই আমরা এটা দেখছি, এর মধ্যে কোনো ব্যতিক্রম কেউ দেখাতে পারে না, এ সত্য কি বিশ্বস্রষ্টার অস্তিত্বের পক্ষে আশ্চর্যজনক নিদর্শন হিসাবে আমাদের মধ্যে বিস্ময় সৃষ্টি করে না? এটা কি আল কোরআনে বর্ণিত এক বিশেষ মোজেযা নয়? সাধারণভাবে মানুষ এগুলোর দিকে তাকায় না বলেই তাদের কাছে এগুলো কোনো বিস্ময়কর ব্যাপার বলে মনে হয় না। এজন্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এগুলোর দিকে খেয়াল করে তাকানোর আহ্বান জানাচ্ছেন না বলছেন,

'ওরা কি দেখছে না?'

এই দেখার জন্যে আহ্বান জানানোতে বুঝা যাচ্ছে, এটা এমন কোনো সূক্ষ্ম বিষয় বা বস্তু নয় যে, খুব গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। শুধুমাত্র নযর ফেললেই তারা দেখতে পাবে প্রতিটি জিনিসের মধ্যে রয়েছে পুরুষ ও স্ত্রী জাতীয় অস্তিত্ব ধনাত্মক ও ঋণাত্মক শক্তির সমন্বয়! এজন্যে দেখার থেকে বেশী কিছু করার নেই বলে আলোচ্য আয়াতে শুধু 'দেখা'র কথাই বলা হয়েছে।

মানুষকে প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্যে আল কোরআনের মধ্যে অবলম্বিত পদ্ধতি মানুষের অন্তর ও সৃষ্টি রাজ্যের দৃশ্যাবলীর মধ্যে এক অবিচ্ছেদ্য বন্ধনের কথা জানাচ্ছে। অনুভূতিকে জাগিয়ে তুলছে, মানুষের সুপ্ত চেতনাকে উজ্জীবিত করছে। ভ্রান্তির মধ্যে পড়ে থাকা চিন্তাধারাকে আবিলতামুক্ত করছে, তার হৃদয়ের বন্ধ দুয়ারকে খুলে দিচ্ছে, যাতে করে সে সারা বিশ্বের বুকে ছড়িয়ে থাকা এবং তার চতুর্দিকে সবখানে অবস্থিত আশ্চর্যজনক বিষয়াদির দিকে মুগ্ধ নয়নে তাকায় এবং তার জাগ্রত হৃদয় দিয়ে জীবন্ত এ বিশ্বকে উপলব্ধি করতে পারে, তার হৃদয়ের চোখ দিয়ে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের বিস্ময়কর কীর্তিসমূহ দেখতে পায়; যতোবারই দেখে ততোবারই যেন সে তাঁকে উপলব্ধি করতে পারে, যতোবার তাঁর বিস্ময়কর সৃষ্টিসমূহের দিকে তার নযর পড়ে, সে যেন তাঁর সাথে তাঁর সৃষ্টির মাধ্যমে একটা সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে, দিবারাত্রির মধ্যে যে কোনো মহূর্তে সে যেন একান্তভাবে মশগুল হয়ে যেতে পারে। তাঁর ধ্যানে সেই মুহূর্তেই যেন তাঁকে সে তার হৃদয়ের চোখ দিয়ে দেখতে পায়, সে যেন এসব কিছুর মাধ্যমে বুঝতে পারে যে, তিনি এক ও একমাত্র শক্তিমান এবং সকল ক্ষমতার মালিক। আল্লাহ তায়ালা চান যে মানুষ যেন অনুভব করে যে তিনি বান্দাদের মধ্যে এক ও একক শক্তি হিসাবে সদা-সর্বদা বর্তমান রয়েছেন, তিনি ওৎপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত রয়েছেন তাঁর সৃষ্টির সাথে, তিনি বিরাজ করছেন সারা বিশ্ব জুড়ে পরিব্যাপ্ত

তাঁর বিধানাবলীর মধ্যে, যার মধ্যে কোনো পরিবর্তন আনার ক্ষমতা কারো নেই। পাঠক-পাঠিকাকে বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে বিরাজমান সে আবর্তন ধারার দিকে একবার গভীরভাবে তাকাতে, যা তাঁরই হুকুমে এক বিশেষ নিয়মে সদা-সর্বদা চলছে এবং যে আবর্তন ধারা বিশ্বের সব কিছুকে পরস্পর সংঘবদ্ধ করে রেখেছে– তার দিকে গভীরভাবে তাকাতে বিশেষভাবে আমরা অনুরোধ করবো। তাহলে গভীরভাবে অনুভব করতে পারবো যে মহা-বিশ্বের সব কিছুর সাথে এ পৃথিবী নামক গ্রহটিও একান্তভাবে সম্পৃক্ত এবং এর মধ্যে প্রাণ প্রবাহ ও সজীবতা বর্তমান থাকার পেছনে চাঁদ সূর্য ও গ্রহ নক্ষত্রাদির আবর্তন ধারার এক অনস্বীকার্য অবদান রয়েছে। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'ওরা কি তাকিয়ে দেখছে না এই পৃথিবীর দিকে, আমি এদের সবাইকে জোড়া জোড়া অবস্থায় সৃষ্টি করেছি কত রকমের উৎকৃষ্ট জিনিষ সৃষ্টি করেছি!'

এসবের মধ্যে জীবনের স্পন্দন থাকাতে এগুলো সজীব মনোরম ও সুদৃশ্য হয়ে উঠেছে। এরা পরম মর্যাদাবান আল্লাহ রব্বুল আলামীন থেকে তাদের অনাবিল সুষমা পেয়েছে ......এই 'কারীম' শব্দটি সেই ব্যক্তি বা বস্তুর জন্যে যথাযোগ্য শব্দ হিসাবে আল্লাহ তায়ালা এখানে বর্ণনা করেছেন যে, মহান স্রষ্টার সৃষ্টিরাজিকে তাঁরই মহাদান হিসেবে সে বুঝতে পেরেছে এবং পরওয়ারদেগারে হাকীমের এসব নেয়ামত লাভে নিজেদেরকে ধন্য জ্ঞান করেছে সে বুঝতে পারবে, যে সে এসব কিছুর কোনোটিকে অবহেলা করেনি, তুচ্ছ জ্ঞান করেনি; এগুলো ব্যবহারের সময় এদের প্রতি কোনো অবজ্ঞা-ভাব প্রদর্শন করেনি এবং এগুলো থেকে উদাসীনও হয়ে যায়নি ....তাই এরশাদ হচ্ছে,

'অবশ্যই এর মধ্যে (আল্লাহকে চেনার জন্যে) নিদর্শন রয়েছে।'

ওরা চাচ্ছে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী দেখতে, ওরা দাবী করছে (পূর্ববর্তী নবীদের প্রদত্ত মোজেযাসমূহের মতোই) বিভিন্ন মোজেযা দেখাতে, অথচ আল কোরআনে উল্লেখিত সৃষ্টির বুকে ছড়িয়ে থাকা এসব রহস্যরাজির দিকে তারা তাকায় না। এজন্যেই তাদের সম্পর্কে বলা হচ্ছে,

'ওদের অধিকাংশই বিশ্বাসী নয়।'

আলোচ্য সুরার ভূমিকাটিতে আল্লাহর সেই মহিমা ব্যঞ্জক আয়াতাংশটি তুলে ধরে কথাগুলো শেষ করা হচ্ছে যা এই সূরায় বারবার উচ্চারিত হয়েছে,

'তোমার রব অবশ্যই মহাশক্তিমান, বড়ই করুণাময়।'

'আল আযীয' বলতে বুঝায় একমাত্র শক্তিমান তিনি, তিনিই কোনো নিদর্শন বা মোজেযা প্রদর্শন করার অধিকারী, যখনই তিনি চেয়েছেন তখনই তিনি কোনো নবীর হাত দিয়ে বিশেষ কোনো শক্তির প্রকাশ ঘটিয়েছেন,এবং তিনিই মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদের শাস্তি দেয়ার উদ্দেশ্যে পাকড়াও করেছেন। 'আর রহীম' মহা দয়াবান করুণাময়, যিনি তাঁর নিদর্শনগুলোর প্রতি দয়া প্রকাশ করেন। অতপর যার অন্তর হেদায়াতকে গ্রহণ করবে তিনি মেহেরবানী করে তাকে এসব মোজেযার মাধ্যমে তাকে নিরাপত্তা দান করবেন এবং প্রত্যাখ্যানকারীদেরকে শোধারানোর জন্যে সুযোগ ও সময় দেবেন। কাজেই তাদের কাছে সতর্ককারী কোনো ব্যক্তি না আসা পর্যন্ত তিনি তাদেরকে আযাব দেবেন না। আর এটাও খেয়াল করুন, সৃষ্টিজগতের মধ্যে বিদ্যমান নিদর্শনাবলীর মধ্যে মানুষের সচ্ছলতা লাভ এবং প্রাচুর্যের অধিকারী হওয়া আল্লাহর শক্তি ক্ষমতারই বিশেষ নিদর্শন, কিন্তু সত্যকে ভাস্বর ও সমুজ্জ্বল করার জন্যে রসূলদেরকে প্রেরণ করা এটা তাঁর রহমতেরই দাবী। এই রসূলদের মাধ্যমেই তিনি মানুষকে তাঁর নেয়ামতের সুসংবাদ দেন এবং তাঁর আযাবের ব্যাপারে সতর্ক করেন। এরশাদ হচ্ছে,

'স্মরণ করে দেখো সে সময়ের কথা, যখন মূসাকে তাঁর রব ডেকে বললেন, তুমি যালেম জাতির কাছে যাও........অবশ্যই তোমার রবই হচ্ছেন একক শক্তি ক্ষমতার অধিকারী তিনিই মেহেরবান।' (আয়াত ১০-৬৮)

وَاِذْ نَادٰى رَبُّكَ مُوْسٰٓى اَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٠﴾ قَوْمَ فِرْعَوْنَ ؕ اَلَا

يَتَّقُوْنَ ﴿١١﴾ قَالَ رَبِّ اِنِّيْٓ اَخَافُ اَنْ يُّكَذِّبُوْنِ ﴿١٢﴾ وَيَضِيْقُ صَدْرِيْ وَلَا

يَنْطَلِقُ لِسَانِيْ فَاَرْسِلْ اِلٰى هٰرُوْنَ ﴿١٣﴾ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْۢبٌ فَاَخَافُ اَنْ

يَّقْتُلُوْنِ ﴿١٤﴾ قَالَ كَلَّا ۚ فَاذْهَبَا بِاٰيٰتِنَآ اِنَّا مَعَكُمْ مُّسْتَمِعُوْنَ ﴿١٥﴾ فَاْتِيَا فِرْعَوْنَ

فَقُوْلَآ اِنَّا رَسُوْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٦﴾ اَنْ اَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيْٓ اِسْرَاۤءِيْلَ ﴿١٧﴾ قَالَ

اَلَمْ نُرَبِّكَ فِيْنَا وَلِيْدًا وَّلَبِثْتَ فِيْنَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِيْنَ ﴿١٨﴾ وَفَعَلْتَ

فَعْلَتَكَ الَّتِيْ فَعَلْتَ وَاَنْتَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿١٩﴾ قَالَ فَعَلْتُهَآ اِذًا وَّاَنَا مِنَ

الضَّاۤلِّيْنَ ﴿٢٠﴾ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِيْ رَبِّيْ حُكْمًا وَّجَعَلَنِيْ

রুকু ২

১০. (হে নবী, তুমি তাদের সে সময়কার কাহিনী শোনাও,) যখন তোমার মালিক মূসাকে ডাকলেন (ইসলামের দাওয়াত নিয়ে) সে যেন যালেম জাতির কাছে যায়– ১১. ফেরাউনের জাতির কাছে; তারা কি (আমার ক্রোধকে) ভয় করে না? ১২. সে বললো, হে আমার মালিক, আমি আশংকা করছি তারা আমাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করবে; ১৩. (তা ছাড়া) আমার হৃদয়ও সংকীর্ণ হয়ে আসছে, আমার জিহ্বাও (ভালো করে) কথা বলতে পারে না, এমতাবস্থায় (আমার সাহায্যের জন্যে) তুমি হারুনের কাছেও নবুওত পাঠাও। ১৪. (তা ছাড়া) আমার ওপর তাদের (আগে থেকেই একটা) অপরাধ (জনিত অভিযোগ) আছে, তাই আমি ভয় করছি, এখন তারা (সে অভিযোগে) আমাকে মেরেই ফেলবে, ১৫. আল্লাহ তায়ালা বললেন, না, (তা) কখনো হবে না, আমার আয়াত নিয়ে তোমরা উভয়েই (তার কাছে) যাও, আমি তো তোমাদের সাথেই আছি, আমি সবকিছুই শুনতে পাই। ১৬. তোমরা দু'জন যাও ফেরাউনের কাছে, অতপর তোমরা তাকে বলো, আমরা সৃষ্টিকুলের মালিক আল্লাহ তায়ালার প্রেরিত রসূল, ১৭. তুমি বনী ইসরাঈলদের আমাদের সাথে যেতে দাও! ১৮. (ফেরাউন এসব শুনে) বললো, হে মূসা, আমরা কি তোমাকে আমাদের তত্ত্বাবধানে রেখে লালন পালন করিনি? তুমি কি তোমার জীবনের বেশ কয়টি বছর আমাদের মধ্যে অতিবাহিত করোনি? ১৯. (তখন) তোমার যা কিছু করার ছিলো তা তুমি (ঠিকমতোই) করেছো, তুমি তো (দেখছি ভারী) অকৃতজ্ঞ মানুষ! ২০. সে বললো (হ্যাঁ), আমি তখন সে কাজটি একান্ত না জানা অবস্থায় করে ফেলেছি; ২১. অতপর যখন আমি তোমাদের কাছ থেকে (প্রতিশোধের ব্যাপারে) ভয় পেয়ে গেলাম তখন আমি তোমাদের এখান থেকে পালিয়ে গেলাম, তারপর আমার মালিক আমাকে (বিশেষ) জ্ঞান দান করলেন

مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٢١﴾ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَىَّ اَنْ عَبَّدْتَّ بَنِىْٓ اِسْرَاۤءِيْلَ ﴿٢٢﴾
قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٢٣﴾ قَالَ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا
بَيْنَهُمَا ؕ اِنْ كُنْتُمْ مُّوْقِنِيْنَ ﴿٢٤﴾ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهٗٓ اَلَا تَسْتَمِعُوْنَ ﴿٢٥﴾ قَالَ رَبُّكُمْ
وَرَبُّ اٰبَاۤئِكُمُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿٢٦﴾ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَكُمُ الَّذِىْٓ اُرْسِلَ اِلَيْكُمْ
لَمَجْنُوْنٌ ﴿٢٧﴾ قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا ؕ اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿٢٨﴾
قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ اِلٰهًا غَيْرِىْ لَاَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُوْنِيْنَ ﴿٢٩﴾ قَالَ اَوَ
لَوْ جِئْتُكَ بِشَىْءٍ مُّبِيْنٍ ﴿٣٠﴾ قَالَ فَاْتِ بِهٖٓ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿٣١﴾ فَاَلْقٰى
عَصَاهُ فَاِذَا هِىَ ثُعْبَانٌ مُّبِيْنٌ ﴿٣٢﴾ وَّنَزَعَ يَدَهٗ فَاِذَا هِىَ بَيْضَاۤءُ لِلنّٰظِرِيْنَ ﴿٣٣﴾

এবং আমাকে রসূলদের দলে শামিল করলেন। ২২. আর তুমি তোমার (রাজপরিবারের) সে অনুগ্রহ, যা তুমি (আজ) আমার ওপর রাখার প্রয়াস পেলে, (তার মূল কারণ এটাই ছিলো) যে, তুমি বনী ইসরাঈলদের নিজের গোলাম বানিয়ে রেখেছিলে; ২৩. ফেরাউন বললো, সৃষ্টিকুলের মালিক (আবার) কে? ২৪. সে বললো, তিনি হচ্ছেন আসমানসমূহ ও যমীনের এবং এ উভয়ের মধ্যবর্তী স্থানে যা কিছু আছে তার সব কিছুর মালিক; (কতো ভালো হতো) যদি তোমরা (এ কথাটা) বিশ্বাস করতে! ২৫. ফেরাউন তার আশেপাশে যারা (বসা) ছিলো তাদের বললো, তোমরা কি শোনছো (মূসা কি বলছে)? ২৬. সে বললো, তিনি তোমাদের মালিক এবং তোমাদের পূর্বপুরুষদেরও মালিক। ২৭. ফেরাউন (তার দলবলকে) বললো, তোমাদের কাছে পাঠানো তোমাদের এ রসূল হচ্ছে (আসলেই) এক বদ্ধ পাগল। ২৮. সে বললো, তিনি পূর্ব পশ্চিম উভয় দিকের মালিক, আরো (মালিক) এদের উভয়ের মাঝখানে যা কিছু আছে সেসব কিছুরও; (কতো ভালো হতো) যদি তোমরা (তা) অনুধাবন করতে! ২৯. সে বললো (হে মূসা), যদি তুমি আমাকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে মাবুদ হিসেবে গ্রহণ করো, তাহলে আমি অবশ্যই তোমাকে জেলে ভরবো। ৩০. সে বললো, আমি যদি তোমার সামনে (নবুওতের) সুস্পষ্ট কোনো দলীল প্রমাণ হাযির করি তবুও কি (তুমি এমনটি করবে)? ৩১. সে বললো, (যাও) নিয়ে এসো সে দলীল প্রমাণ, যদি তুমি (তোমার দাবীতে) সত্যবাদী হও! ৩২. অতপর সে তার লাঠি (যমীনে) নিক্ষেপ করলো, তৎক্ষণাৎ তা একটি দৃশ্যমান অজগর হয়ে গেলো। ৩৩. (দ্বিতীয় নিদর্শন হিসেবে) সে (বগল থেকে) তার হাত বের করলো, (সাথে সাথেই) তা দর্শকদের সামনে চমকাতে লাগলো।

قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ عَلِيمٌ ﴿٣٤﴾ يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُم
بِسِحْرِهِ ۖ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴿٣٥﴾ قَالُوٓا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَابْعَثْ فِى الْمَدَآئِنِ
حٰشِرِينَ ﴿٣٦﴾ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ ﴿٣٧﴾ فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقٰتِ يَوْمٍ
مَّعْلُومٍ ﴿٣٨﴾ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنتُم مُّجْتَمِعُونَ ﴿٣٩﴾ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِن
كَانُوا هُمُ الْغٰلِبِينَ ﴿٤٠﴾ فَلَمَّا جَآءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَئِنَّ لَنَا لَأَجْرًا
إِن كُنَّا نَحْنُ الْغٰلِبِينَ ﴿٤١﴾ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿٤٢﴾ قَالَ
لَهُم مُّوسَىٰٓ أَلْقُوا مَآ أَنتُم مُّلْقُونَ ﴿٤٣﴾ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا
بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغٰلِبُونَ ﴿٤٤﴾ فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِىَ تَلْقَفُ

রুকু ৩

৩৪. ফেরাউন তার আশেপাশে উপবিষ্ট দরবারের বড়ো আমলাদের বললো, এ তো (দেখছি) আসলেই একজন সুদক্ষ যাদুকর! ৩৫. সে তার যাদু (-র শক্তি) দিয়ে তোমাদের দেশ থেকে তোমাদেরই বের করে দিতে চায়, বলো, এখন তোমরা আমাকে (এ ব্যাপারে) কি পরামর্শ দেবে? ৩৬. তারা বললো, (আমাদের মতে) তুমি তাকে ও তার ভাইকে (কিছু দিনের) অবকাশ দাও এবং (এ সুযোগে) তুমি শহরে বন্দরে (যাদুকরদের নিয়ে আসার ফরমান দিয়ে) সংগ্রাহকদের পাঠিয়ে দাও। ৩৭. (তাদের বলে দাও, তারা) যেন প্রতিটি সুদক্ষ যাদুকরকে তোমার সামনে এনে হাযির করে। ৩৮. অতপর একটি নির্দিষ্ট দিনে একটি নির্দিষ্ট সময়ে (সত্যি সত্যিই দেশের) সব যাদুকরদের একত্রিত করা হলো, ৩৯. সাধারণ মানুষদের জন্যেও বলা হলো, তারাও যেন (সেখানে তখন) একত্রিত হয়, ৪০. এ আশা (নিয়েই সবাই আসবে) যে, যদি যাদুকররা (আজ) বিজয়ী হয় তাহলে আমরা (মূসাকে বাদ দিয়ে) তাদের অনুসরণ করতে পারবো। ৪১. তারা ফেরাউনের সামনে (এসে) বললো, আমরা যদি (আজ) জয় লাভ করি তাহলে আমাদের জন্যে (পর্যাপ্ত) পুরস্কার থাকবে তো? ৪২. সে বললো, হাঁ (তা তো অবশ্যই), তেমন অবস্থায় তোমরাই তো (হবে) আমার ঘনিষ্ঠ জন! ৪৩. (মোকাবেলা শুরু হয়ে গেলে) মূসা তাদের বললো (হাঁ), তোমরাই (আগে) নিক্ষেপ করো যা কিছু তোমাদের (কাছে) নিক্ষেপ করার আছে! ৪৪. অতপর তারা তাদের রশি ও লাঠি (মাটিতে) ফেললো এবং তারা বললো, ফেরাউনের ইযযতের কসম, আজ অবশ্যই আমরা বিজয়ী হবো। ৪৫. তারপর মূসা তার (হাতের) লাঠি (যমীনে) নিক্ষেপ করলো, সহসা তা (এক বিশাল অজগর হয়ে) তাদের (যাদুর)

مَا يَأْفِكُوْنَ ﴿٤٥﴾ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سٰجِدِيْنَ ﴿٤٦﴾ قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٤٧﴾
رَبِّ مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ﴿٤٨﴾ قَالَ اٰمَنْتُمْ لَهٗ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ ۚ اِنَّهٗ لَكَبِيْرُكُمُ
الَّذِيْ عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ ۚ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۚ لَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ
مِّنْ خِلَافٍ وَّلَاُصَلِّبَنَّكُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٤٩﴾ قَالُوْا لَا ضَيْرَ ۫ اِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا
مُنْقَلِبُوْنَ ﴿٥٠﴾ اِنَّا نَطْمَعُ اَنْ يَّغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطٰيٰنَآ اَنْ كُنَّآ اَوَّلَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٥١﴾
وَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰٓى اَنْ اَسْرِ بِعِبَادِيْٓ اِنَّكُمْ مُّتَّبَعُوْنَ ﴿٥٢﴾ فَاَرْسَلَ فِرْعَوْنُ
فِي الْمَدَآئِنِ حٰشِرِيْنَ ﴿٥٣﴾ اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيْلُوْنَ ﴿٥٤﴾ وَاِنَّهُمْ لَنَا
لَغَآئِظُوْنَ ﴿٥٥﴾ وَاِنَّا لَجَمِيْعٌ حٰذِرُوْنَ ﴿٥٦﴾ فَاَخْرَجْنٰهُمْ مِّنْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ﴿٥٧﴾

অলীক সৃষ্টিগুলো গ্রাস করতে লাগলো, ৪৬. অতপর (ঘটনার আকস্মিকতা) যাদুকরদের সাজদাবনত করে দিলো, ৪৭. তারা বললো, আমরা সৃষ্টিকুলের মালিকের ওপর ঈমান আনলাম, ৪৮. (ঈমান আনলাম) মূসা ও হারুনের মালিকের ওপর। ৪৯. (এতে ক্রোধান্বিত হয়ে) সে (ফেরাউন) বললো, (একি!) আমি তোমাদের (কোনো রকম) অনুমতি দেয়ার আগেই তোমরা তার (মালিকের) ওপর ঈমান এনে ফেললে! (আমি বুঝতে পারছি, আসলে) এই হচ্ছে তোমাদের সবচাইতে বড়ো (গুরু), এ-ই তোমাদের সবাইকে যাদু শিক্ষা দিয়েছে, অতিসত্বর তোমরা (তোমাদের অবস্থা) জানতে পারবে; আমি তোমাদের হাত ও পা-বিপরীত দিক থেকে কেটে দেবো, অতপর আমি তোমাদের সবাইকে (একে একে) শূলে চড়াবো, ৫০. তারা বললো, (এতে) আমাদের কোনোই ক্ষতি নেই, (তুমি যাই করো) আমরা তো একদিন আমাদের মালিকের কাছেই ফিরে যাবো, ৫১. আমরা আশা করবো (সেদিন) আমাদের মালিক আমাদের (যাদু সংক্রান্ত) সব গুনাহ খাতা মাফ করে দেবেন, কেননা আমরাই (এ দলের মাঝে) সবার আগে ঈমান এনেছি।

রুকু ৪

৫২. অতপর আমি মূসার কাছে ওহী পাঠিয়ে বললাম, রাত থাকতে থাকতেই তুমি আমার বান্দাদের নিয়ে (এ জনপদ থেকে) বেরিয়ে যাও, (সাবধান থেকো, ফেরাউনের পক্ষ থেকে) তোমাদের অবশ্যই অনুসরণ করা হবে। ৫৩. ইতিমধ্যে ফেরাউন (সৈন্য জড়ো করার জন্যে) শহরে বন্দরে সংগ্রাহক পাঠিয়ে দিলো, ৫৪. (সে বললো,) এরা তো হচ্ছে একটি ক্ষুদ্র দল মাত্র, ৫৫. এরা আমাদের (অনেক) ক্রোধের উদ্রেক ঘটিয়েছে, ৫৬. (এদের মোকাবেলায়) আমরা হচ্ছি একটি সম্মিলিত সেনাবাহিনী; ৫৭. আমি (ধীরে ধীরে এবার) তাদের উদ্যানমালা ও ঝর্ণাধারাসমূহ থেকে বের করে আনলাম,

وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ﴿٥٨﴾ كَذَٰلِكَ ۖ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿٥٩﴾ فَأَتْبَعُوهُم مُّشْرِقِينَ ﴿٦٠﴾ فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ﴿٦١﴾ قَالَ كَلَّا ۖ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴿٦٢﴾ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ ۖ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ ﴿٦٣﴾ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ ﴿٦٤﴾ وَأَنجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ ﴿٦٥﴾ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ ﴿٦٦﴾ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٦٧﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٦٨﴾

৫৮. (বের করে আনলাম) তাদের (সঞ্চিত) ধনভান্ডারসমূহ ও সুরম্য প্রাসাদ থেকে, ৫৯. এভাবেই আমি বনী ইসরাঈলদের (ফেরাউন ও তাদের) লোকজনদের (ফেলে আসা) সে সবের মালিক বানিয়ে দিলাম; ৬০. তারা সূর্যোদয়ের প্রাক্কালেই তাদের পশ্চাদ্ধাবন করলো। ৬১. (এক পর্যায়ে) যখন একদল আরেক দলকে দেখে ফেললো, তখন মূসার সাথীরা বলে ওঠলো, আমরা (বুঝি এখনি) ধরা পড়ে যাবো, ৬২. সে বললো, না কিছুতেই নয়, আমার সাথে অবশ্যই আমার মালিক রয়েছেন, তিনি অবশ্যই আমাকে (এ সংকট থেকে বেরিয়ে যাবার একটা) পথ বাতলে দেবেন। ৬৩. অতপর আমি (এই বলে) মূসার কাছে ওহী পাঠালাম, তুমি তোমার লাঠি দ্বারা সমুদ্রে আঘাত হানো, (আঘাতের পর) তা ফেটে (দু'ভাগ হয়ে) গেলো এবং এর প্রতিটি ভাগ (এতো বড়ো) ছিলো, যেমন উঁচু উঁচু (একটা) পাহাড়, ৬৪. (এবার) আমি অপর দলটিকে (এ জায়গার) কাছে নিয়ে এলাম, ৬৫. (ঘটনার সমাপ্তি এভাবে হলো,) আমি মূসা ও তার সকল সাথীকে (ফেরাউন থেকে) উদ্ধার করলাম, ৬৬. অতপর আমি অপর দলটিকে (সাগরে) ডুবিয়ে দিলাম; ৬৭. অবশ্যই এ ঘটনার মাঝে (শিক্ষার) নিদর্শন আছে; কিন্তু তাদের অধিকাংশ মানুষ তো আল্লাহ তায়ালার ওপর ঈমানই আনে না। ৬৮. তোমার মালিক অবশ্যই পরাক্রমশালী ও পরম দয়ালু।

তাফসীর

আয়াত-১০-৬৮

ওপরের আয়াতসমূহে যা কিছু বলা হয়েছে তা প্রধানত মূসা (আ.)-এর কাহিনীকে কেন্দ্র করেই বর্ণিত হয়েছে। সূরাটির মূল আলোচ্য বিষয়ের সাথে সংগতি রেখে এবং সেই বিষয়বস্তুকে শানিত করার জন্যেই এ কাহিনীর অবতারণা। এ কাহিনীর মধ্যে মূসা (আ.)-এর রেসালাতকে অস্বীকারকারী এবং যারা তাঁকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করার জন্যে আদা-পানি খেয়ে লেগেছিলো, তাদের বিভীষিকাময় চূড়ান্ত পরিণতির খবরও পেশ করা হয়েছে; সাথে সাথে মূসা (আ.)-এর

জন্যে এখানে সান্ত্বনার বাণী রয়েছে ও অস্বীকারকারী ও মিথ্যাবাদী সাব্যস্তকারীদের জন্যে শাস্তির হুঁশিয়ারী সংকেত রয়েছে!

এ অধ্যায়ের মধ্যে আরও জানানো হয়েছে যে, আল্লাহর নিজ পরিচালনাতেই তাঁর দাওয়াতকে মানুষের কাছে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ দাওয়াতে সাড়া-দানকারী মোমেনদের কাছে এ দাওয়াতকে গ্রহণযোগ্য বানানোর জন্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে, যদিও তারা ছিলো শক্তিহীন এবং দুশমনরা ছিলো শক্তি ক্ষমতার অধিকারী এবং পৃথিবীর বুকে জবরদস্তিমূলক নিজেদের প্রাধান্য বিস্তারকারী। এরা মোমেনদের জীবনকে অত্যাচার নিপীড়নের মাধ্যমে দুর্বিষহ করে রেখেছিলো। এ সূরাটি নাযিল হওয়ার সময় মোমেনরা মক্কার জীবনে এতোই অসহায় অবস্থায় ছিলো যে, তাদের ওপর যতোই যুলুম নির্যাতন করা হোক না কেন, তাদের পক্ষে কথা বলার কেউ ছিলো না। এই কঠিন দুঃসময়ে তাদের কাছে আলোচ্য সূরার মাধ্যমে তাদেরই পূর্বসুরিদের এমন এক ইতিহাস পেশ করা হচ্ছে যার দ্বারা মোমেনদেরকে চরম সংকটের মধ্যেও ধৈর্য অবলম্বনের ট্রেনিং দেয়া হচ্ছে।

ইতিমধ্যে সূরায়ে বাকারা, মায়েদা, আ'রাফ, ইউনুস, ইসরা, কাহাফ এবং সূরায়ে ত্বাহার মধ্যে মূসা (আ.)-এর নবুওতের কর্মধারা ও তার প্রতিক্রিয়ায় যে সব অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিলো সে বিষয়ে অনেক ঘটনাই পেশ করা হয়েছে, তাছাড়া আরও অনেক সূরাতেও বনী ইসরাঈল জাতি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে মূসা (আ.)-এর অবস্থা সম্পর্কে কিছু কিছু কথা এসেছে।

আর প্রত্যেকবারেই দেখা গেছে, যখন কোনো পূর্ণাংগ আলোচনা এসেছে অথবা মূসা (আ.)-এর জীবন ও শিক্ষা সম্পর্কে কোনো ইংগিত দেয়া হয়েছে, সূরাটির কেন্দ্রীয় বিষয়ের সাথে সংগতি রেখেই সে কথাগুলোকে পেশ করা হয়েছে, আবার কখনও সূরাটিতে যে মুখ্য বিষয়টি বলতে চাওয়া হয়েছে সেই কথাটিকে জোরদার করার জন্যেও মূসা (আ.)-এর প্রসংগ টানা হয়েছে। এইভাবে বিষয়বস্তুর সাথে সংগতি রেখেই আলোচ্য বিষয়টিকে তার লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে নেয়া হয়েছে। (১)

এখানে যে আলোচনাটি পেশ করা হয়েছে তা হচ্ছে রেসালাত এবং একে মিথ্যা সাব্যস্ত করার অপচেষ্টাকে কেন্দ্র করে। আরো আলোচনা এসেছে ফেরাউনের ভূমিকা, মূসা (আ.)কে প্রত্যাখান করা এবং তার শাস্তি স্বরূপ ফেরাউন ও তার পারিষদ দলের ডুবে মরা প্রসংগে। মূসা (আ.) ও মোমেনদের বিরুদ্ধে ফেরাউন ও তার জাতির লোকজনের সম্মিলিত চক্রান্তের শাস্তিস্বরূপ তাদের ওপর যে আযাব নেমে এলো তার একটি পূর্ণাংগ চিত্র এখানে আঁকা হয়েছে, আঁকা হয়েছে যালেমদের চক্রান্ত জাল ছিন্ন করে মূসা (আ.) ও তার জাতির পরিত্রাণ লাভের ইতিকথাকে। এই সূরার বর্ণনাতে মোশরেকদের সম্পর্কে আল্লাহর কথার সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে। এরশাদ হচ্ছে, 'ওরা মূসা (আ.)-কে প্রত্যাখ্যান করলো এবং তাকে মিথ্যাবাদী বানানোর চেষ্টা করলো; অতএব শীঘ্রই সেই খবর আসবে যার সম্পর্কে তারা ঠাট্টা মস্কারি ও উপহাস বিদ্রূপে লিপ্ত হয়ে গিয়েছিলো।'

এ ভাষণটিকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা যায়, প্রত্যেকটি ভাগের মধ্যে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, যার দ্বারা এক ভাগকে আর একভাগ থেকে আলাদা করা যায়। আলোচনার মধ্যে দেখা যায়, একটি পর্যায় শেষ হতে না হতে আর একটি পর্যায় এসে গেছে; কিন্তু এ পর্যায়গুলোর মধ্যে

(১) 'আত্তাসওয়ীরুল ফাননিউ ফিল কোরআন' গ্রন্থের 'আল কেসসাতু ফিল কোরআন' অধ্যায়টি দেখুন।

এমন ঘনিষ্ঠ পারস্পরিক সম্পর্ক রয়েছে যার কারণ একভাগকে আর একভাগের ওপর নির্ভরশীল বলেও বুঝা যায়। এটা আল কোরআনের এক বিশেষ বাচন ভংগী।(২)

এই ভাগগুলোকে বর্ণনা করতে গিয়ে আমরা সাতটি দৃশ্যের সাক্ষাত পাই। প্রথম দৃশ্যের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি, মূসা (আ.) অন্য মানুষকে সত্য সঠিক ব্যবস্থার দিকে ডাকছেন, মৃত্যুর পর আবার জীবিত হতে হবে বলে তিনি তাদের সংবাদ দিচ্ছেন, বিশ্ব পালকের তরফ থেকে তাঁর কাছে ওহী আসার কথা জানাচ্ছেন এবং মূসা (আ.) ও তাঁর রব-এর মধ্যে গোপন আলোচনার কথাও এখানে আসছে। দ্বিতীয় দৃশ্যের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি, মূসা (আ.) ফেরাউন ও তার সভাসদদের সাথে মোলাকাত করছেন, তাদেরকে তাঁর রেসালাতের কথা জানাচ্ছেন এবং তাদেরকে তাঁর দাবীর প্রমাণস্বরূপ দুটি মোজেযা প্রদর্শন করছেন। তৃতীয় দৃশ্যে দেখা যাচ্ছে, এক বিশাল সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছে এবং সেখানে সারা দেশের প্রধান প্রধান যাদুকররা হাযির হয়েছে, বিরাট এক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। চতুর্থ দৃশ্যের মধ্যে দেখা যাচ্ছে, যাদুকররা তাদের সর্বপ্রকার যোগাড়যন্ত্রসহ মহাসমারোহে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হওয়ার জন্যে তাদের প্রস্তুতি এবং বিজয়ের ব্যাপারে তাদের পুরোপুরি নিশ্চিন্ততা; ফলে তাদের বুকভরা আশা যে রাজকীয় মজুরি ও পুরস্কার অবশ্যই তাদের জন্যে অপেক্ষা করছে। পঞ্চম সেই দৃশ্য, যার মধ্যে দেখা যাচ্ছে, মূসা (আ.)-এর লাঠি ফেলে দেয়ায় তা বিরাট অজগরের রূপ ধারণ করে যাদুকরদের যাদুর সাপগুলোকে গলধঃকরণ করে ফেলছে। ফলে যাদুকররা আত্মসমর্পণ করে ঈমান আনছে মূসা (আ.)-এর প্রতি। এতে ফেরাউন ক্ষিপ্ত হয়ে তাদেরকে চরম শাস্তি দেয়ার ভয় দেখাচ্ছে। এতে দেখা যাচ্ছে, মিসরের গোটা জনপদ দু'ভাগে ভাগ হয়ে যাচ্ছে; প্রথম ভাগে, আল্লাহ রব্বুল আলামীন মূসা (আ.)-কে উৎসাহিত করছেন, যেন সে আল্লাহর (অনুগত) বান্দাদেরকে নিয়ে রাত্রিতে মিসর ছেড়ে চলে যায়, আর পাশাপাশি সে দৃশ্যটি পাঠক-পাঠিকার মানস চোখে ভেসে উঠছে যে, পলায়ন পর বনী ইসরাঈল জাতিকে ধরার জন্যে ফেরাউনের লোকদেরকে একত্রিত করা হচ্ছে এবং এ জন্যে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করা হচ্ছে। সপ্তম দৃশ্যটিতে দেখা যাচ্ছে সাগরের সামনে দুটি দল হাযির। সাগরের পানি ভাগ হয়ে দু'দিকে দাঁড়িয়ে গিয়ে মাঝখান থেকে একটি পথ বের হয়ে আসছে। এরপর যালেমদের ডুবে যাওয়ার ও মোমেনদের পরিত্রাণ পাওয়ার দৃশ্য ভেসে উঠছে।

এই দৃশ্যগুলোকে ইতিপূর্বে সূরায়ে আ'রাফ, ইউনুস ও ত্বা-হা-র মধ্যেও পেশ করা হয়েছে; কিন্তু সেসব জায়গায় পর্যায়ক্রমে ঘটনার ততোটুকুই পেশ করা হয়েছে যতোটুকু সেসব স্থানের প্রাসংগিক আলোচনার জন্যে প্রয়োজন ছিলো এবং সেই পদ্ধতিতেই সে সকল স্থানে ঘটনাগুলোকে উল্লেখ করা হয়েছে যে পদ্ধতি সে জায়গায় জন্যে উপযোগী ছিলো; তবে কোথাও অযথা নয় বরং প্রতিটি ক্ষেত্রেই এই ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে এক বিশেষ উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে– শুধু গল্প বলার ছলে এগুলো কোথাও বলা হয়নি।

দেখুন সূরায়ে আল আ'রাফে অতি সংক্ষেপে মূসা (আ.) ও ফেরাউনের মুখোমুখি হওয়ার দৃশ্যটি তুলে ধরা হয়েছে এবং খুব দ্রুততার সাথে যাদুকরদের আগমন ও তাদের সাথে প্রতিযোগিতার ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। এর পরে দেখা যায়, ফেরাউন ও তার দরবারিদের সমাবেশে মূসা (আ.)-এর উপস্থিতি এবং এরপর ফেরাউন ও তার লোক-লস্করদের ডুবে মরার পূর্ব

---

(২) একই কেতাবের 'আল কিসসাতু ফিল কোরআন' অধ্যায়টি দেখুন।

পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে তাদের সামনে তার মোজেযা প্রদর্শনের দৃশ্য। এরপর দেখা যায়, মূসা (আ.) তার জাতি বনী ইসরাঈলদেরকে নিয়ে সাগর পাড়ি দিয়ে সাইনা মরুভূমিতে উপনীত হওয়ার ঘটনা এবং তাদেরকে বিভিন্ন ঘটনার প্রেক্ষাপটে নানাভাবে প্রশিক্ষণ দেয়ার দৃশ্য। এসব স্থানেও ঘটনা সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে– তেমন বড় ও গুরুত্বপূর্ণ কোনো ইংগিত এখানে পাওয়া যায় না। এখানে আল্লাহ রব্বুল আলামীন এক এবং তিনি সর্বময় ক্ষমতার মালিক একথা নিয়ে মূসা (আ.) ও ফেরাউনের মধ্যে বিতর্ক হয়েছিলো। আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূল মূসা (আ.)-এর কাছে যে ওহী প্রেরণ করেছিলেন তার বিবরণের মধ্যে যথেষ্ট প্রশস্ততা আছে; অর্থাৎ এই বিবরণের মধ্যে বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের জন্যে অনেক কিছু শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। এ সূরার মধ্যে বর্ণিত প্রধান আলোচ্য বিষয়ই হচ্ছে, আল্লাহ তায়ালা এক, সকল শক্তি ক্ষমতার অধিকারী একমাত্র তিনি এবং সারাবিশ্বের সার্বিক মালিকানা একমাত্র তাঁরই– এ বিষয়টিই ছিলো নবী (স.) ও মোশরেকদের মধ্যে বিরোধের প্রধান কারণ।

সূরায়ে ইউনুসের মধ্যে ফেরাউনের সাথে মূসা (আ.)-এর মোকাবেলা এতো সংক্ষেপে দেখানো হয়েছে যে, সেখানে মূসা (আ.)-এর মোজেযা, লাঠি ও হাতের উজ্জ্বলতা এ দুটির উল্লেখ আসেনি; আর এমনি করে প্রতিযোগিতার দৃশ্যটি তুলে ধরতে গিয়ে সংক্ষেপ করা হয়েছে; কিন্তু এ সূরাটির মধ্যে উপরোল্লিখিত বিষয় দুটির ওপর বিস্তারিত আলোচনা এসেছে।

সূরায়ে ত্বা-হা-তে মূসা (আ.) ও তাঁর রবের মধ্যে অনুষ্ঠিত গোপন আলোচনার দৃশ্যটির বিস্তারিত বিবরণ এসেছে। উক্ত দুটি দৃশ্য তুলে ধরা এবং প্রতিযোগিতার বিবরণ পেশ করার পর জানানো হয়েছে যে মূসা (আ.) বনী ইসরাঈল জাতিকে সুদীর্ঘ এক সফরে তাদের সাহায্য দিয়েছিলেন এবং ফেরাউন ও তার জাতির সলিল সমাধি ও বনী ইসরাঈল জাতির মুক্তি সম্পর্কে কোনো উল্লেখ আবার এখানে আসেনি।

অনুরূপভাবে, আল কোরআনে বর্ণিত অন্যান্য ঘটনাবলীর মধ্যে এ সূরার মধ্যে একই কথার বারবার উল্লেখ আমরা দেখতে পাই না।

মূসার দাওয়াতের প্রস্তাবপর্ব

এরশাদ হচ্ছে, 'আর স্মরণ করে দেখো সেই সময়ের কথা, যখন তোমার রব মূসা-কে ডেকে বললেন, যালেম জাতির কাছে যাও ....যাও তোমরা দু'জনা ফেরাউনের কাছে এবং বলো; আমরা রব্বুল আলামীনের প্রেরিত দূত (রসূল), যেন তুমি আমাদের সাথে বনী ইসরাঈল জাতিকে পাঠিয়ে দাও।' (আয়াত ১১-১৭)

এখানে আল্লাহর রসুল মোহাম্মদ (স.)-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে। ইতিপূর্বে সূরার শুরুতে বলা হয়েছে, সম্ভবত ওরা ঈমান আনছে না বলে তুমি নিজেকে ধ্বংস করে ফেলবে ....ওরা অবশ্যই তোমাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করার চেষ্টা করেছে; যার কারণে যে উপহাস বিদ্রূপ ওরা করছে তার ফলস্বরূপ শীঘ্রই ওদের উপযুক্ত খবর আসবে।' এরপর আল্লাহ তায়ালা মিথ্যা সাব্যস্তকারী, অস্বীকারকারী ও বিদ্রূপকারীদের পরিণতি কী হবে, সে খবর বলতে শুরু করেছেন, শুরু করেছেন সেই আযাবের খবর দিতে যা তাদেরকে ঘিরে ফেলেছে। এরশাদ হচ্ছে,

'স্মরণ করে দেখো, যখন তোমার রব মূসাকে ডেকে বললেন, যাও যালেম জাতির কাছে, তারা হচ্ছে ফেরাউনের জাতি, ওরা কি ভয় করে চলবে না (আল্লাহর কাছে হিসাব দিতে হবে– এই ভয়ে কি তারা জীবনে বাছ বিচার করে চলবে না?')

এটা হচ্ছে এ ভাষণটির মধ্যে প্রথম কথা, অর্থাৎ মূসা (আ.)-কে রেসালাতের যে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে এটাই তার প্রথম কথা। এখানে আল্লাহ তায়ালা সে জাতির প্রথম গুণটির ঘোষণা দ্বারা তাঁর বক্তব্য শুরু করছেন, আর তা হচ্ছে, 'যালেম জাতি' যারা নীতি-নৈতিকতা ও মানবতার কোনো সীমা মেনে চলেনা এবং নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করতে গিয়ে যারা অপরকে কষ্ট দিতে কোনো প্রকার দ্বিধা করে না, এমনকি বিচার ফয়সালার ব্যাপারেও তারা নিজেদের স্বার্থ ক্ষুণ্ন হওয়ার ভয়ে সঠিক ফয়সালা করে না, এরা সত্যকে অস্বীকার করা ও ভুল পথে চলার দ্বারা নিজেদের ওপর অত্যাচার করেছে, এভাবে যুলুম করেছে বনী ইসরাঈল জাতির ওপর যে তারা তাদের ছেলেদেরকে হত্যা করছে এবং মেয়েদেরকে অব্যাহতি দিচ্ছে মৌখিক ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও শারীরিক নির্যাতন-দ্বারা তাদেরকে কষ্ট দিচ্ছে ....এজন্যে তাদের ওই অত্যাচারী স্বভাবের কথাটাকেই প্রথম উল্লেখ করা হয়েছে এবং তারপরই নির্দিষ্ট করে বলা হয়েছে যে ওরা হচ্ছে, 'ফেরাউনের জাতি।' তারপর তাদের এসব কাজ কারবারের ওপর মূসা বিস্ময় প্রকাশ করছেন এবং যে কোনো মানুষ এগুলো প্রত্যক্ষ করছে তাদের কাছেও তাদের এসব আচরণ আশ্চর্যজনক মনে হয়েছে, এজন্যে আল্লাহ তায়ালা উচ্চারণ করছেন,

'তারা কি পরহেয করবে না?'

অর্থাৎ ওরা কি ভয় করবে না তাদের রবকে? ভয় কি করবে না ওরা তাদের অত্যাচারের পরিণতিকে? ভ্রান্তি থেকে কি ওরা ফিরে আসবে না? শোনো, ওদের বিষয়টা বড়ই অদ্ভুত, পদে পদে ওদের ব্যবহারগুলো বিস্ময় জাগায়। আর এমনি করে বিস্ময় জাগায় সেসব অত্যাচারী লোকের ব্যবহারও, যারা ওদেরই মতো যুলুম অত্যাচার দ্বারা নিজেদের জীবনকে ভরে রেখেছে এবং তাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থানমূহকে দুর্বিষহ করে ফেলেছে।

ফেরাউন ও তার সভাসদবর্গের বিষয়টি মূসা (আ.)-এর জন্যে কোনো নতুন জিনিস ছিলো না, তিনি ওদের সব কিছু জানতেন! তিনি ফেরাউনের যুলুম সম্পর্কে ভালোভাবে ওয়াকেফহাল ছিলেন এবং ভালোভাবেই জানতেন যে, সে নিজের প্রভুত্ব-কর্তৃত্ব কায়েম রাখার জন্যে যে কোনো অত্যাচার করতে কুণ্ঠিত হয় না। তিনি গভীরভাবে অনুভব করেন যে এই অহংকারী, বলদর্পী ও সীমাহীন উদ্ধত ব্যক্তির কাছে সঠিক কথা বলা কতো ঝুঁকিপূর্ণ, কতো বিপজ্জনক এবং কতো বড় বিরাট কাজ, আর এই কারণেই তিনি তাঁর রবের কাছে নিজের সকল-ব্যথা-বেদনা পেশ করে তাঁর কাছেই সাহায্যের জন্যে আবেদন জানাচ্ছেন, তাঁর দুর্বলতার কথা জানিয়ে তাঁর কাছেই শক্তি-সাহস ও সকল দুরূহতা অতিক্রম করার সক্ষমতা কামনা করছেন। আলোচ্য অধ্যায়ে মূসা (আ.)-এর সেই আবেদনকে উদ্ধৃত করা হচ্ছে,

'সে বলল, হে আমার রব, আমার ভয় হয় যে ওরা আমাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করবে, আমার বুক সংকুচিত হয়ে আসছে এবং আমার জিহ্বা যেন আর চলছে না। হারুনের কাছেও রেসালাত প্রেরণ কারো, আমার বিরুদ্ধে তাদের একটি অপরাধ করার অভিযোগ আছে, এজন্যে আমার ভয় হয় যে, ওরা আমাকে হত্যা করবে।'

মূসা (আ.)-এর এ কথাটিতে বাহ্যত বুঝা যায় যে, তাঁর ভয় শুধু এটাই ছিলো না যে ওরা তাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করার চেষ্টা করবে, এ ভয়ও তাঁর হচ্ছিলো যে, অনিচ্ছাসত্তেও যে একটি অপরাধ তার দ্বারা অতীতে হয়ে গিয়েছিলো, এজন্যে তারা তাঁকে হত্যা করবে। অবশ্য এ আশংকা তার হচ্ছিল বিশেষ করে এ জন্যেও বটে যে তার জিহ্বা-তে কিছু দুর্বলতা থাকায় আত্মপক্ষ সমর্থন করতে গিয়ে তার মুখ দিয়ে তার কথা স্পষ্টভাবে বেরুবে না। তিনি তোতলা ছিলেন, নিজের কথা

পরিস্কার করে বলতে তার কষ্ট হতো, একথা সূরায়ে ত্ব-হা-তেও বলা হয়েছে আমার জিহ্বা থেকে জড়তাকে দূর করো যেন ওরা আমার কথা বুঝতে পারে। জিহ্বার এই আড়ষ্টতার কারণে বুক সংকীর্ণ হওয়াটা স্বাভাবিক, যেহেতু নিজের কথাটি যুক্তিসহকারে এবং বলিষ্ঠ কণ্ঠে তুলে ধরতে না পারলে অবশ্যই তাঁর মনটা ছোট হয়ে যাবে, হৃদয় দুর্বল হয়ে পড়বে, এটা সবাই সহজে বুঝতে পারে। এই কারণে অত্যাচারী ও অহংকারী এক শাসকের সামনে এগিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে স্বাভাবিকভাবেই তাঁর মধ্যে কিছু দ্বিধা-সংকটের সৃষ্টি হয়েছিলো। এজন্যে তিনি তাঁর রবের কাছেই তাঁর দুর্বলতা দূর করে দেয়ার জন্যে আবেদন জানাচ্ছিলেন, তার রেসালাত পেশ করার দুরূহতাকে পেশ করছিলেন এবং আবেদন জানাচ্ছিলেন যেন, তার ভাই হারুনের কাছে রেসালাত পাঠিয়ে তাকে তার সহযোগী বানিয়ে দেয়া হয়, যাতে করে রেসালাতের দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে তিনি তাকে সহায়তা করতে পারেন। এর দ্বারা সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, তার আবেদন-নিবেদন এজন্যে ছিলোনা যে তিনি দায়িত্ব পালনে গড়িমসি করছিলেন অথবা পিছিয়ে যাচ্ছিলেন। হারুন (আ.)-এর ভাষা ছিলো অত্যন্ত প্রাঞ্জল এবং তার উচ্চারণ ছিলো পরিস্কার, যে কারণে সহজে তিনি উত্তেজিত হতেন না। যেখানে মূসা (আ.)-এর কণ্ঠ থেমে যেতো বা তোতলা ভাব এসে যেতো সেখানেই হারুন (আ.) এগিয়ে এসে কথাটিকে পরিষ্কার করে দিতেন এবং যুক্তিপূর্ণ কথা দ্বারা পুরো বক্তব্যকে জোরালোভাবে তুলে ধরতেন। এজন্যেই মূসা (আ.) হারুন (আ.)-কে তার সংগী ও সহকারী হিসাবে পাওয়ার উদ্দেশ্যে আল্লাহর কাছে দোয়া করেছিলেন, যার বিস্তারিত বর্ণনা সূরায়ে ত্বা-হা-তে পাওয়া যায়। এই দোয়াতে তার জিহ্বার জড়তা দূর করার জন্যে তিনি আল্লাহর সাহায্য চেয়েছিলেন এবং হারুন (আ.)-কে তার বিশ্বস্ত সহকারী হিসাবে পেতে চেয়েছিলেন, আরও তিনি চেয়েছিলেন, যেন ভাই হারুন তার পাশে প্রধান মন্ত্রণাদাতা ও উযির হিসাবে সদাসর্বদা উপস্থিত থাকেন এবং সকল কাজে তাকে সাহায্য করেন।

এইভাবে তার এ কথায় আর একটি অবস্থা সামনে আসছে;

'আমার একটি অপরাধ তাদের কাছে ধরার মত রয়েছে, এজন্যে আমার ভয় হয় যে, তারা আমাকে হত্যা করবে।'

একথা দ্বারা বুঝা গেলো যে মূসা (আ.) তাদের সাথে মুখোমুখী হতে অথবা দায়িত্ব পালনের তকলীফ স্বীকার করতে অপারগতা প্রকাশ করছিলেন- তা নয়, বরং তিনি চাইছিলেন যে রেসালাতের দায়িত্ব পালনে হারুন তার সাথে শরীক হোক, যাতে করে যদি তারা তাকে কতল করে ফেলে, সে অবস্থায়ও যেন রেসালাতের কাজ বন্ধ না হয়, তার কাজটা যেন হারুন চালিয়ে যেতে পারে এবং যে গুরুদায়িত্ব তাকে দেয়া হয়েছে সে কাজটা যেন অব্যাহতভাবে চলতে পারে।

দাওয়াতী-কাজের প্রয়োজনে এটা ছিলো সতর্কতা অবলম্বনের তাগিদ- দাওয়াত দানকারীর জীবন বাচানোর প্রয়োজনে তার এটা কোনো অজুহাত ছিলো না; ছিলো না এটা আত্মরক্ষার কোনো প্রচেষ্টা, বরং তিনি চাইছিলেন, তার জিহ্বাতে জড়তা থাকার কারণে দাওয়াতী কাজের অসুবিধাটা হারুণের দ্বারা পূরণ হয়ে যাক এবং তার বক্তব্য পেশ করার ত্রুটির কারণে আল্লাহর বাণী যেন দুর্বল বলে মনে না হয়। তিনি চাইছিলেন, যদি তিনি নিহত হন সে অবস্থাতেও যেন মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকার কাজটি থেমে না যায় এবং আল্লাহর বাণী প্রচারের কাজ যেন অবিরতভাবে চলতে থাকে, এটাই ছিলো তার কামনা! এটাই ছিলো মূসা (আ.)-এর আসল ভূমিকা, যাকে আল্লাহ তায়ালা তার নিজ তত্ত্বাবধানে লালন পালনের ব্যবস্থা করেছিলেন এবং যাকে আল্লাহ তায়ালা নিজেই তাঁর নিজের কাজে নিয়োজিত করেছিলেন।

স্বয়ং আল্লাহ তায়ালাই নবীদের সাথে রয়েছেন

যখন আল্লাহ রব্বুল আলামীন তার প্রয়োজনটি বুঝলেন, তাঁর সতর্কতা ও দাওয়াতী কাজকে অগ্রসর করার একান্ত কামনাকে জানতে পারলেন তখন মেহেরবান মালিক তার দোয়া কবুল করলেন এবং সেই বিষয়ে তাকে নিশ্চিন্ত করলেন যে বিষয়ে তিনি আশংকা করছিলেন। এখানে তার দোয়া কবুল হওয়ার ব্যাপারটিকে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে এবং হারুনের কাছে রেসালাত পাঠানোর ব্যাপারটিকেও অত্যন্ত অল্প কথায় পেশ করা হয়েছে। এরপর দেখা যায় মূসা (আ.)-এর মিসরে ফিরে যাওয়া এবং হারুনের সাথে তার সাক্ষাতের বিষয়টিকেও সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করা হয়েছে; তারপর দেখা যাচ্ছে, মূসা ও হারুন (আ.) এমন যৌথভাবে রেসালাতের দায়িত্ব পালন করছেন যে আল্লাহ রব্বুল আলামীন মূসা (আ.)-এর ওপর পুরোপুরি সন্তুষ্ট তা বুঝা যাচ্ছে। তারপর আল্লাহ তায়ালা 'কাল্লা' শব্দটি ব্যবহার করে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে জানাচ্ছেন যে, না কিছুতেই তার ক্ষতি কেউ করতে পারবে না। দেখুন, আল্লাহর বাণী,

'তিনি বললেন, না, অবশ্যই কেউ (তোমাদের ক্ষতি করতে); পারবে না, আমি বলছি, তোমরা দু'জনে আমার নিদর্শন (মোজেযা)-গুলোসহ এগিয়ে যাও, আমি আছি তোমাদের সাথে কে কি (বলছে সবই) আমি শুনছি, তোমরা ফেরাউনের কাছে যাও, গিয়ে বল, আমরা আল্লাহ রব্বুল আলামীনের (কাছ থেকে) প্রেরিত রসূল (হিসাবে এসেছি) যাতে করে তুমি বনী ইসরাঈল জাতিকে আমাদের সাথে পাঠিয়ে দিতে পারো।'

অর্থাৎ অবশ্যই তোমাদের কেউ কোনো ক্ষতি করতে পারবে না, সুতরাং কিছুতেই তোমার বুককে কোনো বিপদ আপদ সংকীর্ণ করে দিতে পারবে না এবং তোমার জিহ্বা কোনো কিছুই আড়ষ্ট করতে পারবে না, আর তোমাকে কেউ হত্যাও করতে পারবে না। সুতরাং তোমার মনমগয থেকে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে এসব কথাকে দূর করে দাও এবং তুমি ও তোমার ভাই এগিয়ে যাও। তোমরা দু'জনে আমার নিদর্শনগুলো নিয়ে যাও। ইতিমধ্যে মূসা (আ.) লাঠি ও তার শুভ্র ঝলমলে হাতের মোজেযা দেখে নিয়েছিলেন, এ দুটো মোজেযা সম্পর্কে অত্যন্ত সংক্ষিপ্তভাবে এখানে কিছু কথা এসেছে, কারণ এখানে আলোচ্য প্রসংগের প্রধান কথা হচ্ছে ফেরাউনের সাথে সাক্ষাত ও মুখোমুখি আলোচনা, যাদুকরদের হাযির করার প্রসংগ এবং লয়লস্কর সহ ফেরাউনের ডুবে মরা ও মূসা (আ.) সহ বনী ইসরাঈলদের পরিত্রান লাভ। দেখুন বলা হচ্ছে, 'তোমরা দু'জনে এগিয়ে যাও আমি তোমাদের সাথে আছি, আমি সব কিছু শুনছি।'

ফেরাউনের মুখোমুখি

এখানে কোন সে শক্তি কথা বলছে ? কোন ক্ষমতাবান সম্রাট? আর কোন সাহায্য, কোন পরিচালনা এবং কোন মহা ক্ষমতাবানের পক্ষ থেকে আসছে এ নিরাপত্তার আশ্বাস? হাঁ অবশ্যই আল্লাহ সোবহানাহু তায়ালা রয়েছেন তাদের সাথে এবং সকল সত্যনিষ্ঠ মানুষের সাথে, প্রতিটি মুহূর্তে ও প্রতিটি স্থানে, কিন্তু এই সাথে থাকার উদ্দেশ্য হচ্ছে সমর্থন করা ও সর্বোতভাবে সাহায্য দান। আল্লাহ তায়ালা শোনেন– এ কথার মাধ্যমেই বুঝা যায় তিনি বান্দার সাহায্যে তখনই এগিয়ে আসেন যখন সে কায়মনোবাক্যে তাঁকে ডাকতে থাকে। একথা থেকে আরো বুঝা যায় যে, তিনিই তাঁর বান্দাকে পরিচালনা করেন এবং সদা-সর্বদা তিনি সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত রয়েছেন। আর এ সাহায্য তখনই আসবে যখন সে আল কোরআন-প্রদর্শিত পথে পুরোপুরিভাবে অবস্থান করতে থাকবে। এজন্যে আল্লাহ তায়ালা তাঁর মনোনীত ও অনুগত বান্দাদ্বয়কে বললেন

'তোমরা দু'জন ফেরাউনের কাছে যাও'

অতপর তাকে তোমরা নির্দ্বিধায় ও নির্ভিক চিত্তে তোমাদের দায়িত্ব সম্পর্কে জানাও।

'তাদেরকে বলো, আমরা রব্বুল আঁলামীনের পক্ষ থেকে দূত হয়ে এসেছি।'

তারা দু'জন মানুষ মাত্র, কিন্তু একই দায়িত্ব নিয়ে তারা উভয়ে আল্লাহর দূত হিসাবে ফেরাউনের দরবারে যাচ্ছেন। দু'জন হলেও তাদের মনের মধ্যে একথা দৃঢ়বদ্ধ হয়ে রয়েছে যে, বিশ্বজগতের মালিক স্বয়ং আল্লাহর প্রতিনিধি তাঁরা, তাঁরা দাঁড়াচ্ছেন সেই বলদর্পী অহংকারী ফেরাউনের সামনে যে নিজেকে সর্বশক্তিমান বলে দাবী করছে, সে তার জাতিকে বলছে, আমি নিজেকে ছাড়া অন্য কাউকে ইলাহ বলে জানি না। কাজেই ফেরাউনের সাথে তাঁর সংঘর্ষ শুরু হয় সাক্ষাতের প্রথম মুহূর্ত থেকেই, যেহেতু তাকে সর্বশক্তিমান মানা তো দূরে থাকুক, মুসা (আ.) তাকে সামান্যতম কোনো ক্ষমতার মালিক বলে স্বীকৃতি দিতেও প্রস্তুত নন। যেহেতু সকল শক্তি-ক্ষমতার মালিকের প্রতিনিধি হিসাবে এখানে তাঁর আগমন, এজন্যে কারও কোনো পরওয়া না করে বলিষ্ঠ কণ্ঠে তিনি ফেরাউনের সামনে তার কথা পেশ করছেন, বিশ্বপ্রভুর আহ্বানকে সে বলদর্পী সম্রাটের কাছে এবং তার সভাসদ ও সারা-দেশের মানুষের কাছে পৌছে দিচ্ছেন। তাঁর কথাকে উদ্ধৃত করতে গিয়ে আল্লাহ তায়ালা জানাচ্ছেন।

'আমরা রব্বূল আলামীনের রসূল, তোমার কাছে এসেছি আমরা, যেন আমাদের সাথে তুমি বনী ইসরাঈল জাতিকে যেতে দাও।.......

'এখানে এসব কথা থেকে এবং কোরআন মজীদের মধ্যে উল্লেখিত আরও বহু আলোচনা থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, মূসা ও হারুন (আ.) ফেরাউন ও তার জাতিকে ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার জন্যে যেমনি প্রেরিত হয়েছিলেন তেমনি বনী ইসরাঈল জাতিকে ফেরাউনের কবল থেকে মুক্ত করে তাদেরকে প্রকৃত পক্ষে আল্লাহর বান্দা বানানোও ছিলো তাদের দায়িত্ব, যাতে তারা পুরোপুরিভাবে আল্লাহর দাসত্ব করতে পারে। তারা এতো দিন থেকে তাদের পূর্বপুরুষ ইউসুফ (আ.)-এর পিতা ইয়াকুব (আ.)-এর প্রদর্শিত জীবন ব্যবস্থার ওপর টিকে ছিলো। ইয়াকুব (আ.)-এর এক নামই ছিলো ইসরাঈল, যার কারণে তার বংশধরদেরকে 'বনী ইসরাঈল' বলা হয়ে থাকে। তাদের এই পৈত্রিক জীবন পদ্ধতি তাদের প্রাণে খোদিত ছিলো; কিন্তু পরবর্তীতে তাদের বিশ্বাস বা আকীদার মধ্যে কিছুটা বিশৃঙ্খলা এসে গিয়েছিলো। একারণেই আল্লাহ তায়ালা তাদের কাছে মূসা (আ.)-কে তাঁর রসূল বানিয়ে পাঠালেন, যেন তিনি তাদেরকে ভুল পথ থেকে সঠিক পথে নিয়ে আসেন এবং তাদেরকে ফেরাউনের অত্যাচার ও দাসত্বের নিগড় থেকে মুক্ত করেন, অতপর তাদেরকে তাওহীদের প্রশিক্ষণ দিয়ে এর ভিত্তিতে গঠিত জীবন ব্যবস্থার দিকে পুনরায় ফিরিয়ে আনেন।

এ পর্যন্ত এসে আমরা তিনটি জিনিস দেখতে পাচ্ছি, নবুওত লাভ, ওহীর আগমন এবং দায়িত্ব পালন, কিন্তু এতোটুকু বলার পর প্রসংগ পরিবর্তন করা হচ্ছে যে, আমরা ফেরাউনের সাথে মোকাবেলার দৃশ্যটি ভালোভাবে অবলোকন করতে পারি। নবুওত লাভের আগের ও নবুওত প্রাপ্তির পরের অবস্থাকে আল কোরআন তার নিজস্ব বর্ণনা ভংগীতে সংক্ষেপে পেশ করতে গিয়ে বলছে,

'সে বললো, আমরা কি তোমাকে বাচ্চা বয়সে আমাদের মধ্যে লালন পালন করিনি এবং তোমার জীবনের অনেকগুলো বছর কি তুমি আমাদের মধ্যে কাটাওনি? আর তুমি আমাদের এসব উপকারের কথা ভুলে গিয়ে যা করার তা করেছো (এটা কি)– ঠিক না?' ....

হাঁ, হাঁ, ওইসব উপকারের কথা বলে তুমি আমার প্রতি এহসান প্রদর্শন করছো, এই কারণেই তুমি গোটা বনী ইসরাঈল জাতিকে গোলাম বানিয়ে রেখেছো।

ফেরাউন আশ্চর্য হয়ে দেখছে, মূসা কেমন করে তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এমন বিরাট দাবী করে কথা বলছে। সে কতো বড়ো সাংঘাতিক দাবী করছে,

'আমি তাঁর রসূল, যিনি সমগ্র বিশ্ব জগতের মালিক'।

এই সেই মূসা যাকে নদী থেকে তুলে আনার পর থেকে সে তারই প্রাসাদে তার পালক ছেলে হিসাবে লালিত-পালিত হয়েছে। একজন ইসরাঈলীর সাথে জনৈক কিবতীর ঝগড়া বাঁধলে সেখানে মূসা হাযির হন এবং মীমাংসা করতে গিয়ে তার আক্রমণে কিবতী ব্যক্তিটি নিহত হলে তিনি মিসর ছেড়ে পালিয়ে যান।(৩) নিহত সে ব্যক্তি ফেরাউনের সেনাবাহিনীর একজন সদস্য ছিলো বলে বর্ণনা পাওয়া যায়। ফেরাউনের সাথে তার বাড়ীতে মূসার শেষ সাক্ষাত ও বারো বছর পর মূসা (আ.)-এর এখানে আগমন ও তার মুখোমুখি হওয়ার মধ্যে সময়ের খুব বেশী ব্যবধান ছিলো না! এই কারণেই ফেরাউন বড়ই বিস্মিত হচ্ছিলো এবং সে হতবুদ্ধি হয়ে যাচ্ছিলো তার সেই আদরের মূসা আজকে তার সাথে কি উদ্ধতভাবে কথা বলছে; কিভাবে অস্বীকার করছে তার ক্ষমতাকে এবং কেমন করেই বা সে তার ক্ষমতার ওপর অন্য কারো ক্ষমতার প্রাধান্য দিচ্ছে। তাই সে মহা বিস্ময়ের সাথে জিজ্ঞাসা করছে,

'তোমাকে কি আমরা বাল্যাবস্থায় লালন পালন করিনি, তুমি কি তোমার জীবনের বেশ কয়েকটি বছর আমাদের মধ্যে কাটাওনি? আর তাই করেছ তুমি যা করতে চেয়েছিলে।'

এ কথার দ্বারা ফেরাউন বলতে চাচ্ছে যে তোমার এই আচরণ দ্বারা তুমি প্রমাণ করেছ যে, তুমি আমার উপকারকে অস্বীকার করেছো; তাই না?

অর্থাৎ তোমার শিশু থাকা অবস্থায় আমাদের কাছে থাকাকালীন আমরা যে তোমাদের আদর মহব্বতের সাথে লালন পালন করেছিলাম– এটাই কি তার পুরস্কার? আমাদের স্নেহ মহব্বতের প্রতিদান কি তুমি এইভাবে দিচ্ছ যে আমরা যে জীবন ব্যবস্থার ওপর আছি, আজকে তুমি তার বিরোধিতা করছো? আর সেই বাদশাহকেই তুমি উৎখাত করতে চাইছো যার ঘরে তুমি লালিত পালিত হয়েছো? আর তাকে ছাড়া অন্য কাউকে সর্বময় ক্ষমতার মালিক বলে দাবী করছো এবং তাঁর দিকে আমাদেরকেও আহবান জানাচ্ছো?

তোমার কী হয়েছে বলো দেখি, অথচ তুমি তো তোমার জীবনের বেশ কয়েকটি বছর আমাদের মধ্যে কাটিয়েছো। যে কথা আজকে তুমি বলছো, কই সে সময় তো এর কোনো কিছু বলোনি, আর এত বড় এক বিরাট ব্যাপারের সামান্যতম পূর্বাভাসও তো তখন তুমি দাওনি?

এতোগুলো বছর পরও ফেরাউন মূসা (আ.)-এর অনিচ্ছাকৃত সেই অপরাধের কথা ভুলতে পারেনি; তাই সেই নিহত কিবতির কথা উল্লেখ করে সে বলছে,

'তুমি সেই (মারাত্মক) কাজটি করেছো, যা তুমি করতে চেয়েছিলে'

অর্থাৎ এতোবড় জঘন্য অন্যায় কাজ তুমি করেছো যা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। আমার শক্তি ক্ষমতাকে অস্বীকারকারী হওয়ার কারণে এবং আমার প্রতি অকৃতজ্ঞ হওয়ার ফলেই তো আজকে তুমি এই কথাগুলো বলতে পারছো। আজকে রব্বুল আলামীন সম্পর্কে তুমি যে সব কথা শোনাচ্ছ, কই আগে তো এসব কথা কখনও বলনি!

এইভাবে, ফেরাউন, যতো কথা তার পেটে ছিলো সবই সে বললো এবং সেসব কথা সে এক নিঃশ্বাসে বলে ফেললো যার কোনো জবাব মূসা (আ.)-এর কাছে ছিলো না, বিশেষ করে

(৩) বিস্তারিত জানার জন্য 'ফী যিলালিল কোরআন' এ সূরায়ে 'তা-হা'-র তাফসীরে দেখুন।

কিবতিকে হত্যা করার কথা; এসব কথার মধ্যে তার ধমক ও প্রচ্ছন্ন ছিলো যে কিবতীর হত্যার দায়ে তাকে এখনও পাকড়াও করা হয়নি, কিন্তু এখনও তো তাকে শাস্তি নিতে হতে পারে।

কিন্তু এসময়ে যে মূসা (আ.)-এর দোয়া আল্লাহ তায়ালা কবুল করে নিয়েছিলেন, তার তোতলা অবস্থাটা তিনি ভালো করে দিয়েছিলেন, যার কারণে তিনি অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে তার কথার জবাব দিলেন। দেখুন কি জবাব তিনি দিলেন,

'সে বললো হাঁ, যখন আমি একাজ করেছিলোম তখন আমি সঠিক পথ পাওয়া থেকে দূরে ছিলেম, এজন্যেই যখন তোমাদের ভয় আমাকে পেয়ে বসলো তখন আমি পালিয়ে গেলাম, তারপর আল্লাহ তায়ালা আমাকে জ্ঞান দান করলেন এবং একজন রসূল বানালেন।'

অর্থাৎ যখন আমি সে কাজটা করেছিলাম তখন আমি সঠিক জ্ঞান থেকে বঞ্চিত ছিলাম, তখন আমার মধ্যে ছিলো অন্ধ একটি আবেগ। আজকে যে সঠিক আকীদা-বিশ্বাসের সন্ধান আমি পেয়েছি এবং আমার জাতির জন্যে আমার রব আমাকে যে জ্ঞান দান করেছেন তাতে আমি এখন বুঝতে পারছি, সে সময়ে আমার দ্বারা মারাত্মক এক অন্যায় কাজ সংঘটিত হয়ে গিয়েছিলো। এজন্যে আজ আমি অবশ্যই অনুতপ্ত। অবশ্য সে ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরপরই আমি বুঝতে পেরেছিলোম যে আমার দ্বারা একটা সাংঘাতিক অন্যায় কাজ হয়ে গেছে এবং এজন্যে আমি ভীত হয়ে পড়েছিলাম যে ধরা পড়ে গেলে আমার কোনো ওযর কবুল করা হবে না, তাই আমি পালিয়ে গিয়েছিলাম। তারপর আল্লাহ তায়ালা আমাকে কল্যাণ দান করবেন বলে তাঁর শপথ বাণী শোনালেন এবং আমাকে জ্ঞান দান করলেন। তার কথাটা উদ্বৃত করতে গিয়ে এরশাদ হয়েছে

'তিনি আমাকে একজন রসূল বানালেন।'

সুতরাং আমি নিশ্চয়তা দিয়ে বলছি যে, আজ আমি যা কিছু বলছি তা আমি নিজে উদ্ভাবন করিনি। অবশ্যই আমি রসূলদের মধ্যে একজন 'প্রেরিতদের অন্যতম' অর্থাৎ মানবমন্ডলীকে জীবন পথে পরিচালনা করার জন্যে যাদের আল্লাহ তায়ালা পথ প্রদর্শক হিসাবে পাঠিয়েছেন সেই রসূলদের বাহিনীর আমি একজন সদস্য।(৪)

তারপর তির্যকভাবে তার জওয়াব দিতে গিয়ে মূসা (আ.) সঠিক কথাটি বলছেন, 'আর সেই সব উপকারের প্রতিদানেই কি তাহলে তুমি বনী ইসরাঈল জাতিকে এমনি করে গোলাম বানিয়ে রেখেছিলে? তাহলে এটাই কি সত্য, যে বনী ইসরাঈল জাতিকে তুমি গোলাম বানিয়ে রেখেছিলে বলেই কি তার প্রতিদান দিতে গিয়ে তুমি আমাকে ছোট বেলায় লালন করেছিলে! শোন হে মিসর অধিপতি, এটা কি সত্য নয় যে, তুমি বনী ইসরাঈল জাতির ছেলেদেরকে হত্যা করে চলেছিলে বলেই তো আমার মা তোমার এ চরম নিষ্ঠুর আচরণে ঘাবড়ে যান এবং আমাকে একটি বাক্সের মধ্যে রেখে দরিয়ায় ভাসিয়ে দেন; তারপর আমাকে সেখান থেকে তুলে আনার কারণে আমার পিতামাতার মায়া মমতাপূর্ণ বাড়ীতে না হয়ে তোমার বাড়ীতে আমি লালিত-পালিত হই, তাই তো আজকে তুমি আমাকে তোমার এই এহসানটাই প্রদর্শন করছ। এটা কি তোমার আসলেই মেহেরবানী!

---

(৪) এ কথার ব্যাখ্যার জন্যে সূরার মধ্যে চূড়ান্ত যে কথাটি বলা হয়েছে তা হচ্ছে, মীম ও নূন এ অক্ষরগুলোর পূর্বে রয়েছে মদ্দ; যেমন বলা হয়েছে 'মিনাল মুরসালীন' (প্রেরিত রসূলদের অন্যতম) এতে সূরের যে ঝংকার উঠেছে তা 'জায়ালানী রসূলান' আমাকে তিনি রসূল বানিয়েছেন, বলাতে আসতো না; কিন্তু এ ছাড়াও অন্য আরও যে অর্থ উপরোক্ত কথায় বেরিয়ে আসে তা হচ্ছে, তিনি বলতে চেয়েছেন এ কাজটি কোন এক ব্যক্তির বিচ্ছিন্ন কোনো কাজ নয় বা এটা অভিনব কোনো কাজও নয়। যারা এ দায়িত্ব নিয়ে দুনিয়ায় প্রেরিত হয়েছেন তিনি সেই দলেরই একজন সদস্য।

এসব কথা শোনার পর কোনো জওয়াব দিতে না পেরে ফেরাউন ভিন্ন প্রসংগ তুললো এবং তাঁর দাওয়াতের মূল কথা কি সে বিষয়ে নির্বোধের মতো নানা কথা জিজ্ঞাসা করতেই তার মূর্খতা ও নির্বুদ্ধিতার কারণে তাচ্ছিল্য ভরে সে স্বয়ং মহান আল্লাহ সম্পর্কেই জিজ্ঞাসা করে বসল, এরশাদ হচ্ছে, 'ফেরাউন বললো, রব্বুল আলামীন আবার কি জিনিস? এমন তাচ্ছিল্যের সাথে জিজ্ঞাসা করায় সে আল্লাহকে তুচ্ছ জ্ঞান করলো। দেখুন তার প্রশ্নের ধরনটা কি? সে বলছে, তুমি যে রব্বুল আলামীন এর কথা বলছো তা কেমন জিনিস? তুমি আবার কার কাছ থেকে রসূল হয়ে এসেছ? মূলত এ প্রশ্নের মধ্যে চরম ঘৃণা ও তাচ্ছিল্য প্রকাশ পাচ্ছে; এ কথাটি দ্বারা যে বলছে এবং যা বলছে আসলে তার প্রতি টিটকারীই করা হচ্ছে। এ প্রশ্নগুলো করতে গিয়ে এমন অট্টহাসি সে হাসছিলো যে তাতে পরিস্কার বুঝা যাচ্ছিলো যে তার কাছে এটা একটা অকল্পনীয় কথা বলেই মনে হচ্ছিলো, সে মনে করছিলো যে এটা একটা মনগড়া কথা মাত্র; কাজেই এটা মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়।

তাই দেখা যাচ্ছে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের বিভিন্ন গুণাবলীর উল্লেখ করে মূসা (আ.) তার জবাব দিচ্ছেন যে, তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্য জগতের সবকিছুর মালিক ও পরওয়ারদেগার। সবাইকে পয়দা করা, বাঁচিয়ে রাখা এবং তাদেরকে লালন পালন করা-এসব কিছু কাজ একা মহান আল্লাহ তায়ালাই করেন। এসব কাজে অন্য কারো কোনো হাত নেই। তার কথার উদ্ধৃতি দিতে গিয়ে আল কোরআন জানাচ্ছে,

'সে বললো, আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীর মধ্যে এবং এ দু'য়ের মধ্যখানে যা কিছু আছে, সে সব কিছুর প্রতিপালক তিনি, তোমরা বুঝতে পারবে তখন যখন এ কথাগুলোর প্রতি তোমাদের দৃঢ় বিশ্বাস পয়দা হবে।'

যে মূর্খতাপূর্ণ প্রশ্ন ফেরাউন করছিলো এই ছিলো তার উপযুক্ত জবাব। আল্লাহ তায়ালা এ বিশাল সৃষ্টিজগতের মালিক ও প্রতিপালক। তাঁর রাজ্যের পরিমাপ করার ক্ষমতা তোমার নেই। হে ফেরাউন, তাঁর রাজ্যের পরিধি সম্পর্কেও তুমি কোনো জ্ঞান রাখো না, আর বাস্তবে ফেরাউন সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করেছিলো তার জাতির দন্ডমুন্ডের কর্তা হয়ে বসে থাকতে এবং নীল উপত্যকার সকল অধিবাসীকে তার দাসত্ব শৃংখলে আবদ্ধ করে রাখতে, কিন্তু এটা সে কিছুতেই বুঝতে পারেনি যে সে ছোট্ট এবং তুচ্ছ একটি রাষ্ট্রের কর্তা মাত্র, যা আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী জুড়ে যে মহাবিশ্ব রয়েছে এবং এ দুই এর মাঝে যা কিছু রয়েছে তার তুলনায় একটি ক্ষুদ্র বালুকণা অথবা একটি বিন্দুসমও নয়। মূসা (আ.) ও তাঁর জবাবে তাকে অত্যন্ত তুচ্ছ জ্ঞান করে কথা বলছিলেন, যাতে সে নির্বোধ ফেরাউন তার দুর্বলতা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পারে এবং তার দাবীর অসারতা বুঝতে পেরে সে তাকাতে বাধ্য হয় এ মহাবিশ্বের দিকে এবং চিন্তা করে যে তার রবের অবস্থান কোথায় থাকতে পারে .... হাঁ এ অকল্পনীয় বিশাল জগৎ, যার পরিমাপ করা কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়, রব্বুল আলামীন তারই তো সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা! এরপর এ ব্যাখ্যার পেছনে যে মূল কথাটি রয়েছে সেইদিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

'যদি তোমরা নিশ্চিত বিশ্বাসী হতে পারো।' আসলে এই একটি ঘটনাই নিশ্চিত বিশ্বাস ও সত্যকে গ্রহণ করার যোগ্যতা গড়ে তোলার জন্যে যথেষ্ট।

এখানে প্রণিধানযোগ্য যে, মূসা (আ.) নির্ভিক চিত্তে ও বলিষ্ঠ কণ্ঠে এবং অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় যেসব তথ্যের দিকে ফেরাউনের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন তার ফলে সে নিজের অজান্তে চতুর্দিকের

পারিপার্শিক অবস্থার দিকে তাকাতে শুরু করল। আসলে মূসা (আ.)-এর এসব কথায় সে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলো অথবা এমনও হতে পারে, যেমন করে চিরদিন শক্তি-দর্পী অহংকারী ব্যক্তিরা সত্যকে দেখেও দেখে না এবং বিশ্বরহস্য তাদের হৃদয়ে কোনো আলোড়ন সৃষ্টি করে না, তাদের মতোই ফেরাউন সাময়িকভাবে প্রভাবিত হলেও তার সেই মনোভাবটাকে সে বেশীক্ষণ ধরে রাখতে পারে না। তাই

'সে তার আশে পাশের লোকদেরকে বললো, তোমরা কি শুনছো না?'

অর্থাৎ, এই অদ্ভুত ও অভিনব কথাগুলো কি তোমরা শুনছো না! এমন কিছু করতে হবে বলে তো কারো সাথে আমাদের ইতিপূর্বে কোনো কথা হয়নি, অথবা কেউ তো আমাদেরকে এসব কথা ইতিপূর্বে বলেনি যে আমরা ওর কথাগুলো সঠিক বলে বুঝবো!

এরপর, রব্বুল আলামীনের অন্যান্য গুণাবলী সম্পর্কে আলোচনা বাড়ানো এবং পরস্পরের ওপর পুনরায় চাপ সৃষ্টি করার জন্যে এ বিষয় নিয়ে মূসা (আ.) আর কোনো বাদানুবাদ করলেন না বরং তিনি অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভাষায় বললেন।

'তিনি তোমাদের রব এবং তোমাদের পূর্ববর্তী বাপ-দাদাদেরও রব।'

ওপরের এ কথাটি এমন এক শক্ত ও হৃদয়গ্রাহী কথা যা ফেরাউনের মনের ওপর ও তার হৃদয়ের গভীর অনুভূতির ওপর ভীষণ এক চাপ সৃষ্টি করলো। তার সামনে এ সত্যটা জীবন্ত হয়ে ফুটে ওঠে যে, হাঁ সারা বিশ্বের যিনি রব-প্রতিপালক-মালিক-মনিব ও পরিচালক, অবশ্য অবশ্যই তার রবও তিনিই; অতএব, তাঁর অন্যান্য গোলামদের মতো সেও তো একজন সাধারণ গোলাম আসলে, তারই ঘরে লালিত-পালিত তার পালক ছেলের মুখে এমন বলিষ্ঠ কথা শোনার সাথে সাথে তার মধ্যে এক প্রচন্ড কম্পন সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিলো, এক এক করে তার মনে পড়তে লাগলো, বিভিন্ন সময়ে আগত তার মধ্যে নানাপ্রকার দুর্বলতার কথা এবং তখন সে বুঝতে পারছিলো যে সে নিজে নিজের মালিক নয়। অবশ্যই তার মালিক সেই মহান সত্ত্বা যার নিয়ন্ত্রণে একই নিয়মে গোটা বিশ্ব সাম্রাজ্য পরিচালিত হচ্ছে- যেখানে অন্য কারো কোনো ক্ষমতা চলে না। তার হৃদয় তাকে বলতে শুরু করেছিলো। সে যে তার জাতির সর্বময় কর্তা ও মালিক হওয়ার দাবী করে, বাস্তবে এটা তো মোটেই সঠিক নয়। কারণ তাহলে তার পূর্ববর্তী বাপ-দাদাদের রব কে ছিলো? নিশ্চয়ই সে ছিলো না, কারণ তখন তো তার অস্তিত্বই ছিলো না। তাহলে ছিলো অন্য কেউ, কে সে? অবশ্যই তারই মতো আর কোনো একজন হবে? তার পূর্বে? না, না, সবার রব তো তিনি- যিনি চিরদিন আছেন, চিরদিন থাকবেন, যাঁর কর্তৃত্ব সবার ওপর সব সময় একইভাবে ছেয়ে রয়েছে। হাঁ, তাহলে সেই মহান সত্ত্বাই রব্বুল আলামীন-তিনিই কি মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তায়ালা? তিনিই কি বিশ্বসমূহের প্রতিপালক?

এটা ছিলো ফেরাউনের জন্যে এক মারাত্মক আঘাত, যার কারণে সে আর চুপ থাকতে পারেনি, চারপাশে অপেক্ষমান তার পরিষদদের সম্বোধন করে সে বলে উঠলো তোমরা কি শুনছো না? হাঁ ওরা তো এসব আলাপ-আলোচনা শুনছিলোই। এ জন্যে তাদের সামনে নবী মূসাকে হেয় করার উদ্দেশ্যে ফেরাউন তাঁকে পাগল বলে আখ্যায়িত করলো। দেখুন এখানে তার কথার উদ্ধৃতিটি; 'সে বললো, তোমাদের যে রসূলটিকে তোমাদের কাছে পাঠানো হয়েছে সে অবশ্যই একজন বদ্ধ পাগল।'

ওপরের কথাটির মধ্যে যেসব শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলোর দিকে একবার খেয়াল করে দেখুন। বলা হচ্ছে, অবশ্যই তোমাদের যে রসূলটিকে তোমাদের কাছে পাঠানো হয়েছে সে একটি বদ্ধ পাগল ....

এ কথার মধ্যে এক দারুণ কটাক্ষ রয়েছে, মূল রেসালাতের প্রশ্নেই সমালোচনা করতে চেয়েছে সে হতভাগা আল্লাহর দুশমন। অতপর এই বিদ্রূপের দ্বারাতেই সে মানুষের অন্তরকে সত্য থেকে দূরে সরিয়ে নিতে চেয়েছে, অস্বীকার করেছে এর সত্যতাকে-সত্যকে মানা তো দূরের কথা, একথা সত্য হতে পারে বলে সে অনুমান করতেও প্রস্তুত নয়। বরং সে মূসা (আ.)-কে পাগল বলে আখ্যায়িত করছে, যেন তার রাজনৈতিক ও ধর্মীয় কথার যুক্তি কারো হৃদয়ে রেখাপাত করতে না পারে এবং মানুষকে যেন তাদের ও তাদের বাপ দাদাদের আসল প্রতিপালক আল্লাহ তায়ালা থেকে দূরে সরিয়ে নেয়া যায়।

কিন্তু তার এই উপহাস বিদ্রূপ ও দোষারোপ মূসা (আ.)-এর মনোবলকে এতোটুকু ক্ষুণ্ন করতে পারেনি। বরং তিনি অবিরাম আল্লাহর সেই মহা বাণী প্রচারের কাজ চালিয়ে যেতে থাকলেন। এরপরও মূসা (আ.)-এর বলিষ্ট দাওয়াত সে বিদ্রোহী, অহংকারী ও অত্যাচারী বাদশাহকে প্রকম্পিত করে চলেছিলো। আল কোরআন বলছে,

'(মূসা) বললো, মাশরেক মাগরেব এবং এ দুইয়ের মাঝে যা কিছু আছে সে সবের রব একমাত্র তিনি, তোমরা যদি তোমাদের বুদ্ধিকে কাজে লাগাও তবে এই মহাসত্যটিকে তোমরাও বুঝবে।'

পূর্ব ও পশ্চিম দুটি নিদর্শন প্রতিদিনই মানুষের সামনে হাযির হচ্ছে, কিন্তু পাগল মানুষ এগুলোর দিকে দেখে না এবং চিন্তাও করে না, যেহেতু এগুলো সব সময় এবং বার বার ঘুরে ঘুরে মানুষের সামনে আসছে এবং দুনিয়ার জীবন এবং পৃথিবীর নানা প্রকার জীবন সামগ্রী নিয়ে মানুষ সব সময়ই ব্যস্ত হয়ে রয়েছে। এখানে ব্যবহৃত শব্দগুলোতে পূর্ব ও পশ্চিম দিক বুঝালেও আসলে শব্দদ্বয় দ্বারা পূর্ব পশ্চিমের সমুদয় এলাকা ও বস্তুগুলোকে বুঝানো হয়েছে, আর উল্লেখিত এ দুটি নিদর্শন এমন উজ্জ্বল যার মধ্যে কোনো পরিবর্তন আনার সাধ্য বলদর্পী-অহংকারী ফেরাউন ও তার আমীর ওমরাদের নাই। এ দুটি জিনিসের দিকে ফেরাউনের মনোযোগ আকর্ষণ করে তার মধ্যে এ চিন্তা সৃষ্টি করে দেয়া হয়েছে যে, এতো শক্তি-ক্ষমতার দাবীদার হওয়া সত্তেও সত্যিই তো এগুলোর ওপর তার কোনো নিয়ন্ত্রণ নাই। আর তার নিয়ন্ত্রণ না থাকলে অন্য আর কার নিয়ন্ত্রণ থাকবে? অবশ্যই এটা সত্য যে এগুলোর গতিকে থামিয়ে রাখা বা এগুলোর গতির মধ্যে কোনো পরিবর্তন আনাও কারো পক্ষে সম্ভব নয়। এই দৃষ্টিআকর্ষণীয় কথাগুলো নির্বোধ অন্তরসমূহকে প্রচন্ডভাবে নাড়া দেয় এবং গাফলতির নিদ্রায় ঘুমিয়ে থাকা যে কোনো বুদ্ধিকে জাগিয়ে তোলে। অন্যদিকে মূসা (আ.) এসব কথা উত্থাপন করে তাদের মধ্যে এক প্রচন্ড বিপ্লব সৃষ্টি করে দিচ্ছেন এবং তাদেরকে গভীরভাবে এসবের ওপর চিন্তা ভাবনা করতে আহ্বান জানাচ্ছেন। বলা হচ্ছে,

'যদি তোমরা বুদ্ধিকে কাজে লাগাও– তাহলে বুঝবে।'

অহংকারীদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, তারা যতোদিন সুস্থ ও সবল থাকে, ততোদিন নিজেকে নিয়ে ও নিজের গৌরব প্রচারে এতোই ব্যস্ত থাকে যে অন্য কারো সম্পর্কে তারা এতোটুকু মাথা ঘামাতে পারে না বা অন্য কারো কোনো ক্ষমতা থাকতে পারে, এসব বিষয়ে চিন্তা করার মতো কোনো অবসর বা খেয়াল তাদের থাকে না; বরং তারা ভয় করে তাদেরকে যারা জাগ্রত হৃদয় এবং যারা যুক্তি দিয়ে কথা বলার সাহস রাখে আর যারা তাদেরকে চিন্তা করতে আহ্বান জানায় বা তাদেরকে ঘুম থেকে জাগাতে চায়, তাদেরকে তারা কিছুতেই সহ্য করতে পারে না। এজন্যে যখনই কেউ তাদের বিবেককে জাগাতে চায়, খুশী হওয়ার পরিবর্তে তারা এ কল্যাণকামীর ওপর মারমুখী হয়ে ওঠে। দেখুন, এই একই কারণে ফেরাউন ক্ষেপে যাচ্ছে মূসা (আ.)-এর ওপর এবং

যখনই মূসা (আ.) তাকে চিন্তা করতে আহ্বান জানাচ্ছেন তখনই তাঁর ওপর সে চড়াও হওয়ার ভাব দেখাচ্ছে। আবার যখন তার মধ্যে কিছু সাড়া জাগাতে চাইছে এবং মূসা (আ.)-এর বলিষ্ঠ কথায় তার অন্তরের জট খুলে যেতে চাইছে, তখনই পাশের মোসাহেব বা উপস্থিত উযির নাযির তাকে এই সাধারণ একজন মানুষের (?) কাছে নতি স্বীকার করতে বাধা দিচ্ছে। দুনিয়ার এটাও এক চিরাচরিত নিয়ম, যখনই কোনো এলাকায় কেউ প্রভাবশালী বা ক্ষমতার অধিকারী হয়ে ওঠে, তখনই তার আশপাশে, বসন্তের কোকিলের মতো কিছু মোসাহেব জুটে যায়। এরা নিজেদের আখের গুছানোর ও তার নেক দৃষ্টি হাসিল করার মাধ্যমে স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে সদা সর্বদা তার প্রশংসার পঞ্চমুখ হয়ে থাকে। এরা তাকে তার দুর্বলতার দিক বুঝতে দেয় না এবং তার সামনে কখনো তার দোষ-ত্রুটি তুলে ধরে না বরং কেউ তুলে ধরতে চাইলে তাকে সর্ব প্রযত্নে বাধা দেয়; এদের প্রশংসায় মুগ্ধ হয়ে ওই ক্ষমতাধর ব্যক্তি তাদেরকেই একান্ত আপনজন ও কল্যাণকামী মনে করে বিভ্রান্ত হতে থাকে ও তাদের ওপর নির্ভর করে ধীরে ধীরে নেমে যায় চরম রসাতলে– এমনই এক পর্যায়ে এসে সত্যের পক্ষে সকল যুক্তি প্রমাণ সবই ব্যর্থ হয়ে যায়। তাই দেখা যায়, মূসা (আ.) এর শাণিত যুক্তির সামনে মনটা নুয়ে পড়তে চাইলেও শেষ পর্যন্ত ফেরাউন বলে উঠলো,

'সে বললো, (শোনো হে যুবক) যদি আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করতে চাও, তাহলে অবশ্য অবশ্যই আমি তোমাকে কয়েদীদের অন্তর্ভুক্ত করে দেবো।(৬)

এটাই হচ্ছে সেই হৃদয়গ্রাহী যুক্তি যার কোনো জবাব দেয়ার ক্ষমতা কারো থাকে না এবং এটাই সেই অকাট্য প্রমাণ যাকে উপেক্ষাও কেউ করতে পারে না। এমনই অবস্থায় অহংকারী ও বলদর্পীরা জেল-জরিমানার ভয় দেখায় ও শারীরিক নির্যাতনের হুমকি দেয়। আসলে জেলখানা বা বন্দীদশা থেকে মূসা (আ.) খুব বেশী দূরেও ছিলেন না, অর্থাৎ মোটেই তিনি স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারছিলেন না, কিন্তু এটাও সত্য, মূসা (আ.) তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে অঘোষিত এই বন্দীদশাকে স্বেচ্ছায় কবুল করে নিয়েছিলেন। ক্ষমতাগর্বীদের পক্ষ থেকে এই অত্যাচার-যুলুম– এটাই হচ্ছে সত্যপন্থীদের কথার জবাব দেয়ার ব্যাপারে তাদের অক্ষমতার প্রমাণ এবং এই যে প্রতিক্রিয়া এটাই হচ্ছে সক্রিয় শক্তির সামনে মিথ্যার দুর্বলতা ও পরাজয়ের লক্ষণ। অতীত ও বর্তমানের বিদ্রোহী ও অন্যায়কারীদের গতি-প্রকৃতি ও কার্যধারার এটা একটা সুস্পষ্ট দিক।

কিন্তু এটাও আমরা দেখতে পাচ্ছি, এসব ফোঁস ফাঁস ও জেল-জরিমানার ধমক-কোনোটাই মূসা (আ.)-কে তাঁর বিজয়াভিযানের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারছে না। কে আছে এমন যে, রুখবে তারে, তিনি যে স্বয়ং আল্লাহর রসূল-বিশ্ব সম্রাটের রাষ্ট্রদূত, কেমনে তার গতি কেউ রোধ করতে পারে, যখন তার ও তার ভাইয়ের পাশে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা রয়েছেন? তার আগমন ও সত্য জ্ঞানের সেই পাতাটি খুলে দেয়ার জন্যে যা চিরদিনের জন্যে বন্ধ করে দিয়ে ফেরাউন স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়তে চেয়েছিলো। তিনি নতুন এক কথা ও সম্পূর্ণ অভিনব এক প্রমাণ দ্বারা সে পাতা খুলে দিচ্ছেন।

'তিনি বললেন, আমি কি তোমার কাছে সুস্পষ্ট এক জিনিস নিয়ে আসিনি?'

অর্থাৎ আমার রেসালাতের সপক্ষে আমি কি সুস্পষ্ট এক দলীল প্রমাণ নিয়ে তোমার সামনে হাযির হইনি? এরপরেও তুমি আমাকে কারারুদ্ধ করতে চাও? এই বলিষ্ঠ যুক্তি পেশ করে এ কথা

(৬) ইতিপূর্বে যেমন বলা হয়েছিল, 'মিনাল মুরসালীন'– এখানেও উপরে বর্ণিত একই উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে 'মিনাল মাসজুনীন'।

দ্বারা উপস্থিত শ্রোতাদের সামনে ফেরাউনের সেই আসল (যুক্তিহীন ও অত্যাচারী) চেহারাকে প্রকাশ করে দেয়া হয়েছে যা মূসা (আ.)-এর কথায় ইতিপূর্বে জানা গিয়েছিলো। এরপরও যদি এসব সুস্পষ্ট প্রমাণের দিকে খেয়াল দিতে সে অস্বীকার করে তাহলে তার এই অস্বীকৃতিই তার মধ্যে শাস্তির ভয় গড়ে তুলবে, যদিও মূসা (আ.)-কে সে পাগল সাজাচ্ছিলো এবং এরপর এমন পেরেশানী তাকে ঘিরে রাখবে যা তার সকল শান্তি নষ্ট করে দেবে। আর তাই বাস্তবে ঘটেছিলো, যার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে তার এ কথায়,

'সে বললো, বেশ তো নিয়ে এসো না, তোমার সেই নিদর্শন যদি তুমি সত্যবাদী হয়ে থাকো!'

অর্থাৎ তোমার (নবী হওয়ার) দাবীতে যদি তুমি সত্যবাদীই হয়ে থাকো তাহলে, অথবা তোমার কাছে 'কিছু আছে'-এ কথায় যদি তুমি সত্যবাদী হয়ে থাকো তাহলে তা নিয়ে এসো না। এ কথা দ্বারা বুঝা যায় যে মূসা (আ.) সম্পর্কে ফেরাউন বেশ দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে ছিলো, বার বার তার এ ভয় হচ্ছিলো যে তার এ সব তর্ক বিতর্কের কারণে তার জাতির মধ্যে নানা সংশয় সৃষ্টি হতে পারে এবং তার ওপর তাদের ভক্তি-শ্রদ্ধাতেও ক্রমান্বয়ে ভাটা পড়ে যেতে পারে।

এমনই এক পর্যায়ে এসে মূসা (আ.) তার সামনে দুটি বস্তুগত অলৌকিক ক্ষমতার নিদর্শন তুলে ধরছেন। মূসা (আ.) এই মোজেযা দুটি দেখাতে বিলম্ব করছিলেন। যাতে করে ফেরাউনের হঠকারিতা তার জাতির কাছে চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত হয়ে পড়ে এবং তাকে সমর্থন দেয়ার মতো মনোবল তাদের শেষ হয়ে যায়। অবশেষে,

'মূসা তার লাঠি ফেলে দিলো, সাথে সাথে এটা রূপান্তরিত হয়ে গেলো বিরাট এক অজগর সাপে এবং সে তার হাতকে বের করলো তার বগল থেকে আর তৎক্ষণাত তা দর্শকদের নযরে প্রতিভাত হলো শুভ্র-সমুজ্জ্বল রূপে।'

এ আয়াতের দ্বারা বুঝা যাচ্ছে লাঠিটা এমন এক বিরাট অজগর সাপে পরিণত হলো যার মধ্যে প্রাণ প্রবাহ বর্তমান ছিলো এবং যখন (বগল থেকে) তিনি হাত বের করলেন তখন বাস্তবে এর থেকে স্বচ্ছ শুভ্রতা ঝলমল করে উঠলো। এ সত্যটিই তাঁর কথা 'ফা-ইযা'-তে (আর অমনি হয়ে গেলো এই কথাতে) প্রকাশ পেলো। এটা যাদুর মতো নিছক ধারণা-দান বা মনে হওয়ার অবস্থা সৃষ্টি করা নয়। যাদুতে বাস্তবে কোনো জিনিসের পরিবর্তন হয় না বরং তাতে দর্শকদের নযরবন্দী করা হয় মাত্র, যার ফলে তারা যাদুকরের ইচ্ছামতো কোনো জিনিস নেহাৎ-সাময়িকভাবে দেখে। কিন্তু জীবনের মোজেযা আসে এমন এক মহা শক্তির কাছ থেকে যা মানুষ বুঝে না। এ মোজেযা প্রতি মুহূর্তে মানুষ দেখে এবং এ মোজেযা কখনো শেষ হয়ে যায় না। যেমন ছিলো সাপের মোজেযা, এটা না ধরা পর্যন্ত শেষ হয়ে যায়নি। এইভাবে আল্লাহ রব্বুল আলামীন যে অসংখ্য নেয়ামত আমাদের জন্যে বিশ্ব-প্রকৃতির বুকে ছড়িয়ে রেখেছেন তার দিকে আমরা খেয়াল করে তাকাই না বলেই সেগুলোর অলৌকিকতা বুঝে উঠতে পারি না। আমরা তাকাই না এই জন্যে দৈনিক এসব দৃশ্য আমাদের সামনে ঘুরে ঘুরে বারবার আসছে। অথবা এ বিষয়ে কেউ জোর দিয়ে না বলার কারণে এগুলোর দিকে সাধারণভাবে মানুষের মনোযোগ আকৃষ্ট হয় না এবং এগুলোর মধ্যে নিরন্তর সংঘটিত পরিবর্তনের দিকে মানুষের নযর পড়ে না। এই ধরনের এক চমৎকার দৃশ্য সামনে আসছে এবং দেখা যাচ্ছে মূসা (আ.)-এর সামনে উপরোক্ত মোজেযা দুটিকে হাযির করে ফেরাউনকে সত্য গ্রহণের জন্যে নৈতিক দিক দিয়ে চাপ দেয়া হচ্ছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে বিষয়টি ফেরাউনের অন্তরে এক প্রচন্ড নাড়া দিচ্ছে এবং তার মধ্যে এক দারুণ ভয় জাগিয়ে দিচ্ছে।

অবশ্যই ফেরাউন মোজেযা দুটির শক্তি ও ব্যাপকতা অনুভব করেছে। এ কারণেই সে ব্যস্ত সমস্ত হয়ে এগুলোর মোকাবেলা ও প্রতিরোধ করার জন্যে অবিলম্বে ব্যবস্থা নিচ্ছে, যেহেতু সে জানে তার দুর্বলতা কোথায়। সে এও জানে এবং বুঝে যে আশেপাশে তার জাতির লোকেরা, তাকে সমর্থনদানকারী যাদেরকে দেখা যাচ্ছে তারা সবাই তাকে নিজেদের স্বার্থের কারণেই তোষামোদ করে মাত্র, অন্তর দিয়ে তাকে সমর্থন করে অথবা সঠিক পরামর্শ দেয়, এ রকম লোক খুব কমই আছে। সেসব লোকদেরকে মূসা ও তার জাতির ভয় প্রচন্ডভাবে প্রকম্পিত করে ফেলেছে, যেহেতু যে মোজেযা তারা দেখেছে, তার শক্তিকে তারা মন থেকে ঝেড়ে মুছে ফেলতে পারছে না। তারা দেখে নিয়েছে দেশের সকল নাম করা ও প্রবীণ যাদুকরদের সকল জারিজুরি খতম হয়ে গেলো এমন একজন তরুণ মানুষের কাছে যাকে তারা জানে ও চিনে এবং তার কাজ তো কোনো সাময়িক নযরবন্দী নয়, বরং ফেরাউনের দাপট ও তার রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে স্থায়ীভাবেই তো সকল যাদুকর তার কাছে আত্মসর্পণ করলো-এটা কোনো সাধারণ ব্যাপার নয়, অবশ্যই এ কাজের পেছনে এমন কেউ আছে যার শক্তি-ক্ষমতা অফুরন্ত, যার কাছে সবাই পরাজিত হতে বাধ্য। তাদের অবস্থা তুলে ধরতে গিয়ে বলা হচ্ছে,

'তার আশেপাশে অপেক্ষমান জনতাকে সে বললো, অবশ্যই এ একজন পন্ডিত যাদুকর, সে তার যাদুর দ্বারা, তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে বের করে দিতে চায় অতএব, তোমরা আমাকে কী করতে বলো?' (আয়াত ৩৫)

ওপরে বর্ণিত ফেরাউনের এ কথাটিতে পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে সে মূসা (আ.)-এর মোজেযাকে যাদু বলে উড়িয়ে দিতে চাইলেও এর বিরাট শক্তির কথা সে অকপটে স্বীকার করছে। আরও দেখুন, সে মূসা (আ.)-কে যাদুকর বললেও সাথে সাথে তাকে জ্ঞানী (আলীম) বলেও সে অভিহিত করছে এবং তার কথায়, তার অন্তরের মধ্যে গভীর ভীতির সঞ্চার হয়েছে বলেও জানা যাচ্ছে, কারণ সে দেখতে পাচ্ছে যে মূসা (আ.) তার অলৌকিক কাজগুলো দ্বারা এমনভাবে সবাইকে প্রভাবিত করে ফেলেছে যে তারা অনেকেই এখন তার দিকে ঝুঁকে পড়েছে। এ জন্যেই সে বলে উঠেছে,

'সে তার যাদু দ্বারা তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে বের করে দিতে চায়। সুতরাং, বলো তোমাদের পরামর্শ কি?'

যখন এ কথাগুলো সে বলছিলো তখন তার শরীর থেকেই তার দুর্বলতা এবং হৃদয়ের প্রকম্পন ফুটে ফুটে বেরুচ্ছিলো, যাদের সামনে নিজেকে সে সর্বশক্তিমান বানিয়ে রেখেছিলো তাদের কাছে পরামর্শ চাওয়ার মাধ্যমে তার চরম দুর্বলতার বহিপ্রকাশ ঘটছিলো এবং এ দুর্বলতার অনুভূতি তাকে যেন মাটির মধ্যে ধসিয়ে দিচ্ছিলো। দেখুন না, কিভাবে সে জিজ্ঞাসা করছে,

'তোমরা আমাকে কী পরামর্শ দিচ্ছ?'

এখানে সহজেই আন্দাজ করা হচ্ছে যে নরপতির ইচ্ছার বাইরে সে রাজ্যে কিছুই হতো না, সে দেখছে তার সামনে দাঁড়িয়ে দৃপ্তকণ্ঠে কথা বলছে সেই যুবককে যাকে এতোদিন ধরে তার লোকজন খুনের অপরাধের কারণে তালাশ করে ফিরছিলো, উপরন্তু সে চ্যালেঞ্জ করছে তার শক্তি-ক্ষমতাকে– সে অবস্থায় তাকে ধরা তো দূরের কথা, তার ব্যাপারে কী করবে সে বিষয়ে পরামর্শ চাইছে সেই সব মানুষের কাছে যাদের এতোদিন ধরে নিরংকুশ আনুগত্য ও পুজা সে পেয়ে এসেছে। তার মনের অবস্থা কী হলে এই অবস্থাটা হতে পারে! সহজেই অনুমেয় যে সে শত চেষ্টা করেও তার হৃদয়ের কম্পন ও দুর্বলতাকে চেপে রাখতে পারছিলো না।

পৃথিবীর বিদ্রোহী ও অহংকারী ব্যক্তিদের প্রকৃতিই হচ্ছে এই যে, যখন তারা দেখে, তাদের পায়ের নীচের যমীন কাঁপছে, তখন তারা ভয়ে কাঁপতে থাকে এবং তার সামনে সামান্যতম ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ যেইই থাকুক না কেন তাদের কাছেই সে সংকট থেকে বাঁচার জন্যে পরামর্শ চাইতে থাকে, মতামত চায় তাদের কাছে, পরামর্শ তাদের কাছে চায় যাদেরকে এতোদিন সে পদদলিত করেছে, আজ তাদেরকে নিয়ে সে গোল টেবিল বেঠক করতে চায়, এ এমন এক অবস্থা যে এ সময়ে তার বুদ্ধির কাজ করে না, মাথা বেঠিক হয়ে যায়, ভয়ের চোটে তার দাপট-দম্ভ সব বিলুপ্ত হয়ে যায়, আর তখন সে ডুবন্ত সমুদ্রযাত্রীর মতো সামান্যতম উপলখন্ডও ধরেও বাঁচতে আশা করে। চিরদিনই যালেমদের দশা এইভাবে একই হয়ে থাকে। ইতিহাসের ধারাবিবরণী চিরদিন এই একই সাক্ষ্য বহন করে এসেছে যে এসব অহংকারী মানুষ বিপদে পড়লেই চিৎকার করতে থাকে, আর ছেড়ে দিলে মনে করে হাঁফ ছেড়ে বাঁচা গেলো, অর্থাৎ তাদের এসব পরামর্শ চাওয়াটা শুধু বিপদ কাটা পর্যন্তই টিকে থাকে, বিপদ কাটার সাথে সাথে তারা পূর্বের মতো একইভাবে অত্যাচারী ও স্বেচ্ছাচারী হয়ে যায়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, এই কঠিন বিব্রতকর অবস্থায় ফেরাউনের আমীর ওমরারা তার দুর্বলতার কথাটা তাকে ইংগীতে জানিয়ে দিলো, যদিও তার এই একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তারের কাজে ওরা,নিজেদের স্বার্থের কারণে বরাবরই তাকে সহায়তা করে এসেছে। কিন্তু আজ তাদের আশংকা দেখা দিলো যে মূসা (আ.) অচিরেই তাদের ওপর বিজয়ী হয়ে উঠবে এবং তারা প্রমাদ গুণলো যে মূসার হাতেই ফেরাউন ও তাদের পতন আসন্ন হয়ে গেছে এবং খুব শীঘ্রই বনি ইসরাঈলরা মুক্তিলাভ করে তাদেরকে পদানত করবে। যখন তারা সে মোজেযাগুলো দেখলো তখন তারা ঠিকই বুঝলো এবং তাদের অন্তর সাক্ষ্য দিলো যে, এগুলো মোটেই যাদু নয়, অবশ্যই এগুলো রব্বুল আলামীন (সমগ্র বিশ্বের মালিক) এর দেয়া ক্ষমতার নিদর্শন। তবুও তারা শেষ ও চূড়ান্ত চেষ্টা হিসাবে পরামর্শ দিলো, দেশের ওস্তাদ যাদুকরদের একত্রিত করে অনুরূপ কিছু শক্তি দেখাতে যেন মূসা (আ.)-কে অবিলম্বে দমন করা যায়। তাদের বুঝতে বাকি ছিলো না যে, মূসা (আ.)-কে ফেরাউনের মিথ্যা দম্ভ ও দাপট দিয়ে পর্যুদস্ত করা যাবে না। যেহেতু মূসা (আ.)-এর বলিষ্ঠ কণ্ঠ ও তার উপস্থাপিত অলৌকিক ক্ষমতার নিদর্শন দুটো ফেরাউনের সকল আত্মম্ভরিতার ওপর ছিলো এমন এক প্রচন্ড আঘাত যে সে মুহুর্মুহু প্রকম্পিত হচ্ছিলো এবং মূসা ও হারুন আলাইহেস সালামকে ধরা বা তাদেরকে শাস্তি দেয়ার কথা চিন্তাই সে করতে পারছিলো না। দেখুন, তার এই অবস্থার সাথে তাল রেখেই ফেরাউনের পরিষদবর্গ তাকে পরামর্শ দিচ্ছে,

'তাকে ও তার ভাইকে (এখনই পাকড়াও করবেন না, বরং) তাদেরকে কিছু সময় দিন, আর দেশের চতুর্দিকে খবর দিয়ে সকল দক্ষ ও ওস্তাদ যাদুকরদেরকে জড়।'

অর্থাৎ তাকে ও তার ভাইকে একটু সুযোগ দিন এবং আপনার দূতদেরকে এই বিশাল সাম্রাজ্যের দিকে পাঠিয়ে দিন, যাতে করে তারা দক্ষ যাদুকরদেরকে একত্রিত করে নিয়ে আসতে পারে এবং একটা চূড়ান্ত ফয়সালায় পৌছানোর জন্যে তাদের ও মূসা (আ.)-এর মধ্যে এক বিরাট প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

মূসা (আ.)-এর সফলতা যাদুকরদের ব্যর্থতা

এই বিয়োগান্ত নাটকের এ দৃশ্যের ওপর আবার পর্দা পড়ছে এবং ভেসে উঠছে আর একটি দৃশ্য। এখানে দেখা যাচ্ছে যাদুকররা দলে দলে এসে জড় হচ্ছে, অসংখ্য মানুষ হক ও বাতিলের

মধ্যে এই সিদ্ধান্তকর প্রতিযোগিতা দেখার উদ্দেশ্যে একত্রিত হচ্ছে। সারা রাজ্যের যতো মানুষ জড় হয়েছে, সবাই চায় যাদুকররা বিজয়ী হোক। এ প্রতিযোগিতা দেখার জন্যে সবার উৎসাহ উদ্দীপনা যেন উপচে পড়ছে এবং হক ও বাতিলের মধ্যে চূড়ান্ত ফয়সালা দেখা অথবা ঈমান ও আল্লাহদ্রোহী শক্তির মধ্যে প্রতিযোগিতার ফল দখার জন্যে সবাই উদগ্রীব। এরশাদ হচ্ছে,

'তারপর যাদুকরদেরকে এক নির্দিষ্ট দিনে, একত্রিত করা হলো আর (এক ঘোষণার মাধ্যমে) লোকদেরকে বলা হলো 'তোমরা একত্রিত হবে তো? হয়তো, আমাদেরকে যাদুকরদেরই অনুসরণ করতে হবে যদি তারা জয়ী হয়ে যায়।'

ওপরের আয়াতের ব্যাখ্যায় বুঝা যাচ্ছে যে, এক মহা উৎসবের দিনে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে বলে যখন ঘোষণা দেয়া হলো তখন সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যে দারুণ উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টি হলো। এই অবস্থাই প্রকাশ পাচ্ছে, এ আয়াতে,

'সবাই তোমরা একত্রিত হবে তো হয়তো আমাদের পক্ষে যাদুকরদেরই অনুসরণ করা লাগবে?'

অর্থাৎ প্রতিযোগিতার জন্যে নির্দিষ্ট দিনে একত্রিত হওয়া এবং কেউ অনুপস্থিত না থাকা অবস্থায় তোমাদের কিছু প্রাপ্য হবে কি? ঘোষণায় একথাটাও এসেছে, প্রতিযোগিতাকালে আমাদের এ জন্যেও সমবেত হওয়া প্রয়োজন যেন আমরা যাদুকরদেরকে উৎসাহ যোগাতে পারি এবং ইসরাঈলী বংশের লোক মূসা (আ.)-এর ওপর তাদের বিজয়ের জন্যে অপেক্ষা করতে পারি। সাধারণ মানুষ বরাবরই হুজুগপ্রিয় হয়ে থাকে এবং এ ধরনের কোনো প্রতিযোগিতা দেখার জন্যে দলে দলে তারা একত্রিত হয়। তারা এটা হিসেব করে না বা করতে পারে না যে তাদের শাসকবর্গ কোনো অন্যায় ও নিরর্থক কাজের অনুষ্ঠান করছে কি না, ভালো মন্দ পরখ করে দেখার মতো যোগ্যতা সাধারণ মানুষের থাকে না বলে যখনই এ রকম কোনো মেলার অনুষ্ঠান দেখা বা প্রতিযোগিতা দেখার আমন্ত্রণ জনগণ পায়, তখন তারা মহাসমারোহে একত্রিত হয়ে যায় এবং উল্লাসে ফেটে পড়তে চায়। এই কারণেই মিসরবাসী মূসা (আ.) ও যাদুকরদের প্রতিযোগিতা দেখার জন্যে বিপুলসংখ্যায় হাযির হয়ে গেলো। এতে কারো প্রতি যুলুম বা অন্যায় হচ্ছে কি না সে বিষয়ে তাদের তেমন কোনো মাথা ব্যথা থাকে না।

এরপর দেখা যাচ্ছে আর একটি দৃশ্য। বাস্তবে প্রতিযোগিতায় নামার পূর্বে যাদুকররা ফেরাউনের দরবারে ভীড় করে আছে, তারা নিশ্চিন্ত হতে চাইছে যে, প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হলে তারা যেন রাজকীয় পুরস্কার থেকে কোনোক্রমেই বঞ্চিত না হয়; ফেরাউনও তাদেরকে তার পাকা ওয়াদা দানের মাধ্যমে নিশ্চয়তা দিচ্ছে যে আজকের এই মহা প্রতিযোগিতায় তারা বিজয়ী হলে তাদেরকে শুধু পুরস্কারই দেয়া হবে না, বরং তাদেরকে রাজকীয় মেহমান হিসেবে তার দরবারে রেখে দেয়া হবে এবং সম্রাট ফেরাউন তাদেরকে তার অত্যন্ত আপনজন হিসেবে গণ্য করবে। দেখুন এ বিষয়ে আল কোরআনের ভাষ্য,

'অতপর যখন যাদুকররা এলো, তারা ফেরাউনকে বললো, আমরা বিজয়ী হলে আমরা পুরস্কার পাবো তো? সে বললো, হাঁ বরং তখন তোমরা আমার একান্ত ঘনিষ্ঠজন হিসেবে গণ্য হবে।'

এইভাবে বিদ্রোহী, অহংকারী ফেরাউন যাদের কাছে সাহায্য প্রার্থী হচ্ছে তারা এমন একদল লোক যারা তার কাছে পুরস্কার পাওয়ার জন্যে লালায়িত। এরা তাদের জারিজুরি দেখিয়ে দু'পয়সা কামানের চিন্তায় অধীর। তারা অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়েছে-কতো তাড়াতাড়ি এই মহাপুরস্কার ও রাজকীয় নেক নযরের মহাদান হাতিয়ে নেয়া যায়। আকীদা বিশ্বাস বা মানুষের কল্যাণ অকল্যাণ, ব্যাপারে এদের কোনো মাথা ব্যথা নেই। এরা তাদের স্বার্থ, পুরস্কার এবং নিজেদের কল্যাণ ছাড়া আর কিছুই বুঝে না। আর এরাই হচ্ছে তারা যারা প্রত্যেক যামানায় ও প্রত্যেক দেশে

ক্ষমতাশীনদের চাটুকারিতা ও গোলামী করে দেশ, জাতি ও জনগণের ভাগ্যে অকল্যান বয়ে আনে।

হাঁ, দেখুন, এগিয়ে আসছে অগাধ পুরস্কারের আশায়, বুক বেঁধে সাম্রাজ্যের প্রবীণতম যাদুকররা। তাদের সাথে তারা নিয়ে এসেছে মানুষের নযরবন্দী করার মতো তাদের নানা উপকরণাদি, এরা পরম পুলকিত বিজয়ের আশায় এবং পুরস্কার ছাড়াও বাড়তি মর্যাদা-প্রাপ্তির প্রতিশ্রুতিতে, কেননা খোদ সম্রাট ওয়াদা করেছে যে, তাদেরকে সে তার একান্ত কাছের লোক বানিয়ে নেবে, আর অবশ্যই সে এটা মনে মনে স্থিরও করে রেখেছিলো। এবারে দেখুন বাস্তবে প্রতিযোগিতা শুরু হওয়ার বর্ণনা।

'মূসা তাদেরকে বললো তোমরা যা কিছু নিক্ষেপ করতে চাও নিক্ষেপ করো ..... অবশ্যই আমরা আশা করি যে আমাদেরকে আমাদের প্রতিপালক আমাদের সকল অপরাধ ক্ষমা করে দেবেন। কারণ আমরা বিশ্বাস স্থাপনকারীদের মধ্যে অগ্রণী ভূমিকা অবলম্বন করেছি।' (আয়াত ৪৩-৫১)

দেখা যাচ্ছে, এ দৃশ্যটি, সাধারণভাবে এবং বেশ ধীর ধীরে সামনে আসছে, অপরদিকে মূসা (আ.) শুরু থেকেই সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত ও নিখাদ সত্যের ওপর তিনি দাঁড়িয়ে আছেন, এ বিষয়ে তিনি দ্বিধা-দ্বন্দ্বহীন। শহর, নগর বন্দর থেকে এবং সারাদেশের সকল নগরী থেকে দলে দলে যাদুকররা এসে জমা হচ্ছে-এসব দেখে তার মধ্যে এতোটুকু ভাবান্তর সৃষ্টি হয়নি, মোটেই তিনি ঘাবড়ে যাননি। নানা সাজে সজ্জিত হয়েও দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে প্রবীণতম যাদুকররা এসেছে। তাদের পাশে সকল সাহায্যের হাত প্রসারিত করে ফেরাউন ও তার আমীর ওমরারা দন্ডায়মান, এতদসত্তেও মূসা (আ.) সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত চিত্তে বলছেন,

'ছুঁড়ে মারো যা কিছু তোমরা ছুঁড়তে চাইছো'।

এর দ্বারা পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে, ওই যাদুকরদের যোগাড় জৌলুস ও যোগাড়যন্ত্রকে মূসা (আ.) তুচ্ছ জ্ঞান করে নিশ্চিন্ত মনে ও বিজয়ের প্রতীক্ষায় বলছেন, 'ফেলো না, কি ফেলতে চাইছো।' ....তাঁর অন্তরে ওদের কোনো জিনিসের প্রতি কোনো গুরুত্ব নেই, তার ভেতর কোনো সীমাবদ্ধতার অনুভূতি নেই, নেই কোনো সংকট-সমস্যার ভাবনা, আর এ জন্যে বিশেষভাবে সতর্কতা অবলম্বনের কোনো চিন্তাও তিনি করেননি।

অপরদিকে, দেখুন যাদুকরদের অবস্থা– তারা ফেরাউন ও তার মান-সম্ভ্রমের নাম নিয়ে সর্ব প্রযত্নে গৃহীত তাদের সকল প্রকার সতর্কতা ও সরঞ্জামকে কাজে লাগাচ্ছে। আল কোরআন সে দৃশ্যটি পেশ করতে গিয়ে বলছে,

'অতপর তারা তাদের দড়ি খড়ি ও লাঠি-ঠ্যাংগা ছুঁড়ে মারলো এবং বললো, ফেরাউনের ইযযতের কসম, আমরাই আজকে বিজয়ী হবো।'

বর্তমান আলোচনার মধ্যে এ কথার কোনো বিস্তারিত বিবরণ আসেনি যে ওরা দড়ি খড়ি ও লাঠি-ঠ্যাংগা ফেলায় সেগুলো কিরূপ ধারণ করলো। বরং সূরায়ে আ'রাফ ও তা-হা-তে এর থেকে আরও অনেক বেশী বিবরণ পাওয়া যায়। যার কারণে সত্যের বিজয়ের ব্যাপারে যে কোনো মুসলমানের হৃদয়ে প্রতীতি জেগে উঠবে এবং প্রতিযোগিতার পরিণতিতে সত্য ও মিথ্যার মধ্যে সংঘর্ষের অবসান হয়ে যাবে বলে আশা করা যায়, আর এইটিই আলোচ্য সূরার লক্ষ্য। এরশাদ হচ্ছে,

'অতপর মূসা তার লাঠিটি নিক্ষেপ করলো, ফলে যা কিছু মিথ্যা ওরা বানিয়ে রেখেছিলো তা গিলে খেয়ে ফেলতে শুরু করলো।'

এ সময়ে হঠাৎ করে সেই অকল্পনীয় ও অপমানজনক ঘটনাটি ঘটে গেলো যা সারাদেশের ওস্তাদ যাদুকররা কিছুতেই আশা করতে পারেনি। আসলে ওরা তো ওদের যাদুবিদ্যার মধ্যে সব থেকে বড় যা শিখেছিলো তাইই প্রয়োগ করেছিলো। তাদের সুদৃঢ় বিশ্বাস ছিলো যে গোটা সাম্রাজ্যের মধ্যে এমন কেউ নেই যে তাদের এ বিদ্যার ওপর কোনো কারসাজি দেখাতে পারে। এ জন্যে তারা একেবারে প্রথমেই সেই বিদ্যা প্রয়োগ করলো যা তাদের ভান্ডারে সর্বাপেক্ষা বড় বলে তারা জানতো এবং সংখ্যায়ও ছিলো তারা অনেক, সকল এলাকা থেকে বাছাই করা দক্ষ যাদুকররাই সেখানে একত্রিত হয়েছিলো। অপরদিকে মূসা একা মাত্র। তার সংগী বলতে ছিলো একমাত্র তার লাঠিটি। এরপরও দেখা গেলো সেই এক লাঠিই ওদের নযরবন্দী করা সকল কিছুকে গিলে খেয়ে ফেললো। দ্রুততার সাথে খাওয়ার জন্যে গিলে ফেলাই হচ্ছে সর্বোত্তমপন্থা এবং তারা যাদুর দ্বারা যা কিছু বানিয়েছিলো তা আসলে ছিলো সব খেয়ালী জিনিস, এমনভাবে মানুষকে নযরবন্দী করা হয়েছিলো যে তাদের দড়ি খড়ি ও লাঠি ঠ্যাংগা সব সচল জিনিস বলে মনে হয়েছিলো, কিন্তু তারা দেখলো ওদের ছুঁড়ে ফেলা কোনো কিছুকে মূসা (আ.)-এর লঠি আর অবশিষ্ট ছাড়েনি। যদি মূসা (আ.) আনীত জিনিসও যাদু হতো তাহলে তা ওদের দড়ি খড়িগুলোকে নিঃশেষে গিলে ফেলতে পারতো না। সাময়িকভাবে গিলতে দেখলেও লোকদের সামনে অবশেষে দড়ি-লাঠি হিসেবে বাকি থেকে যেতো। কিন্তু বাস্তবে পরে তারা ওইসব দড়ি-লাঠি আর খুঁজে পেলো না।

এ অবস্থাটা বাস্তবে যখন যাদুকররা দেখলো তখন তাদের তর্ক-বিতর্ক করার আর কোনো সুযোগ রইলো না এবং তারা ভালোভাবেই বুঝে গেলো যে মূসা হচ্ছেন একজন সত্য-নবী। এই কারণেই তারা যা করলো আল কোরআন তা উদ্ধৃত করতে গিয়ে বলছে,

'অতপর যাদুকররা সেজদায় পড়ে গেলো। তারা বলে উঠলো, 'আমরা ঈমান আনলাম রব্বুল আলামীনের ওপর, ঈমান আনলাম সেই মহান সত্ত্বার ওপর যিনি মূসা ও হারুনের রব-প্রতিপালক।'

এরা তো ছিলো সব ভাড়াটে যাদুকর- যাদুবিদ্যা প্রদর্শনে জয়ী হলে তারা বিরাট মজুরী পাবে বলে আশায় বুক বেঁধে এসেছিলো। তাদের সম্পর্ক ছিলো মজুরী ও পুরস্কারের সাথে, কোনো আকীদার ধারক-বাহক তারা ছিলো না এবং কোনো বিষয়ের সাথে তাদের আন্তরিক কোনো যোগও ছিলো না। কিন্তু মূসা (আ.)-এর সাথে প্রতিযোগিতায় নেমে তারা যে মহাসত্যের সন্ধান পেলো তা তাদের অন্তরের চোখ খুলে দিলো এবং তাদের পরাজয়ের মাধ্যমে সত্যকে বাস্তব চোখে দেখে তারা অভিভূত হয়ে ছিলো। বাস্তবে সত্যের সংস্পর্শে এসে তাদের হৃদয়ে বিরাট এক পরিবর্তন এসে গেলো। যারা কোনো দিন সত্যের সন্ধান পায়নি, আজকে তারা সত্যের ছোঁয়া পেয়ে বিগলিত হয়ে গেলো, আল্লাহ রব্বুল আলামীনের প্রতি ভক্তি-বিশ্বাস ও ভয় তাদেরকে প্রচন্ডভাবে প্রকম্পিত করলো এবং ক্ষণস্থায়ী এ জীবন শেষে সব কিছুর ব্যাপারে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর কাছে হিসেব দিতে হবে তাদেরকে এ চিন্তা গভীরভাবে পেয়ে বসলো, যখন তাদেরকে এ গভীর চিন্তা পেয়ে বসলো তখন তাদের অন্তরের পুঞ্জীভূত জাহেলিয়াতের অন্ধকার ধীরে ধীরে অপসারিত হতে শুরু করলো। অনতিকালের মধ্যেই তাদের মরিচাধরা কলিজার ওপর থেকে কলুষ-কালিমার আবরণ পরিষ্কার হয়ে গিয়ে সত্যের সামনে তারা সর্বান্তকরণে ঝুঁকে ছিলো এবং দেখতে দেখতে ঈমানের মহাশক্তি তাদেরকে এমনভাবে বশীভূত করে ফেললো যে তারা নিজেদের অজান্তেই সেজদায় পড়ে গেলো, অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে তাদের কণ্ঠ থেকে ঈমানের তেজোদ্দীপ্ত বাণী বেরিয়ে এলো,

'আমরা সর্বশক্তিমান রব্বুল আলামীনের ওপর ঈমান এনেছি, সেই মহা পরওয়ারদেগারের ওপর যিনি মূসা ও হারুনের রব।'

মানুষের অন্তর এক আশ্চর্য বস্তু-এমনই আজব তার গতিবিধি যা নিরূপণ করা কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। তবে কোনো সময় এমনও হয়, যখন হঠাৎ করে এতে সত্যের জীয়ন-কাঠির ছোঁয়া লেগে যায়, তখন দেখা যায়, সকল বাধার পর্দা তার সামনে থেকে দূরে সরে গেছে এবং হঠাৎ করে সে উজ্জীবিত হয়ে উঠেছে, প্রচন্ড এক ঝাপটা এসে তাকে পরিবর্তিত এক মানুষ বানিয়ে দিয়েছে।

হাঁ, মহানবী (স.) সত্যই বলেছেন, যতো অন্তর তিনি সৃষ্টি করেছেন তার প্রত্যেকটিই পরম করুণাময় আল্লাহ রব্বুল আলামীনের আংগুলগুলোর যে কোনো দুটি আংগুলের মাঝে অবস্থিত রয়েছে, যখন তিনি চান তাকে সোজাপথে চালিত করেন। আবার যখন তিনি চান তার গতি ফিরিয়ে দেন মন্দের দিকে।(৭)

এইভাবেই ভাড়াটে সে যাদুকরদের হৃদয়ের মধ্যে হঠাৎ করে বিপ্লবী এক পরিবর্তন এসে গেলো। তারা এমনভাবে বলিষ্ঠ হৃদয়ের মোমেন দলে পরিণত হয়ে গেলেন যে তারা ফেরাউন ও তার আমীর-ওমরাসহ সমবেত সকল জামায়েতের সামনে তাদের ঈমান আনার কথা সুউচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করে দিলেন। সে বিদ্রোহী অহংকারী ও স্বেচ্ছাচারী বাদশার সামনে এইভাবে ঈমান আনার ঘোষণা দেয়ার পরিণাম কত ভয়ংকর হতে পারে তার কিছুমাত্র পরওয়াও তারা করলেন না। কে কী ভাববে, আর কে কী বলবে- এসবের কোনো চিন্তাই তাদেরকে সত্যের কাছে নতি স্বীকার করা এবং সত্যের নিশান বরদার হওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারলো না।

অপরদিকে ফেরাউন ও তার পারিষদদলের কাছে অবশ্যই যাদুকরদের ঈমানের এই বিপ্লবাত্মক ঘোষণা এক প্রচন্ড বজ্রপাতের মতো মনে হলো। একি মহা বিস্ময় তারা দেখছে। দেশের আপামর জনতার বিশাল এই সমাবেশ। সেখানে উপস্থিত রয়েছে দেশবরেণ্য নেতৃবৃন্দ ও ফেরাউনের সকল শ্রেণীর অফিসাররা, যারা এই মহা প্রতিযোগিতার তামাশা দেখতে হাযির হয়েছিলো। কিন্তু তারা এখন কী দেখছে, যাদেরকে নিয়ে তারা আশায় বুক বেঁধেছিলো, যারা ছিলো তাদের একমাত্র ভরসাস্থল। যাদের বলে বলীয়ান হয়ে তারা ভেবেছিলো মূসা ও তার বংশদেরকে চিরদিনের মতো শেষ করে দেবে, যাদের বিজয়কে তারা তাদের বিজয় হিসেবে দেখবে, ফেরাউন ও গোটা দেশের বিজয় হিসেবে দেখবে, তারাই কিনা শুধু আত্মসমর্পণ করেই ক্ষান্ত হলো না, বরং সকল ভয়-ভীতিকে উপেক্ষা করে প্রবল প্রতাপান্বিত অহংকারী, দাম্ভিক, অত্যাচারী সম্রাট ফেরাউনের রক্ত চক্ষুর সামনেই দাঁড়িয়ে গেলো তার বিরুদ্ধে! একি বাস্তব? না এ এক দিবা স্বপ্ন। তাদের মনের মধ্যে যে কথাটা বদ্ধমূল হয়েছিলো তা হচ্ছে মূসা ইসরাঈলী একজন (অপরাধী) ব্যক্তি, সে একজন যাদুকর, তার যাদুর সাহায্যে সে চায় গোটা মিসরকে দখল করে ফেরাউন ও তার জাতিকে উৎখাত করে দিতে, সে চায় শাসন ক্ষমতা হাতে নিয়ে তাদেরকে পদানত করতে এবং তার জাতিকে সর্বস্তরে ক্ষমতায় বসাতে। এ জন্যেই তারা আশায় বুক বেঁধে বসেছিলো সারাদেশ থেকে দক্ষ সকল যাদুকর এসে মূসার এ আশা ধূলিসাৎ করে দেবে। কিন্তু হায়! একি হলো। তাদের সকল আশাই ছাই হয়ে গেলো, যাদেরকে নিয়ে তারা তাদের স্বপ্নসাধ গড়েছিলো তারাই কিনা নিজেরাই মূসার অনুসারী হয়ে গেলো! এরা তো সেই যাদুকররা যারা ফেরাউনের নাম নিয়ে ময়দানে নেমেছিলো, যারা ফেরাউনের ইযযতের দোহাই দিয়ে তাদের উপকরণাদি ছুঁড়ে মেরেছিলো, তারাই এমনভাবে প্রথম আঘাতেই পরাজিত হয়ে গেলো আর এতো সহজে তারা তাদের পরাজয়কে মেনে নিলো, তারা মূসার রেসালাতকে স্বীকৃতি দিয়ে দিলো আর

(৭) ইমাম বোখারী তার বোখারী শরীফের মধ্যে হাদীসটি রেওয়ায়েত করেছেন।

তারা তাদের স্বীকৃতির মাধ্যমে প্রমাণ করে দিলো যে মূসা আল্লাহর কাছ থেকেই প্রেরিত হয়েছে। তারা আল্লাহ রব্বুল আলামীনের ওপর ঈমান আনলো। যিনি মূসা (আ.)-কে রসূল বানিয়ে পাঠিয়েছেন তারা ফেরাউনের আনুগত্য করা প্রত্যাহার করলো, অথচ এই কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত তারাই তো ছিলো ফেরাউনের সেই দুরন্ত ও দুর্জয় বাহিনী– যারা তারই খেদমত করার জন্যে এখানে সমাগত হয়েছিলো এবং এই খেদমতের বিনিময় পাওয়ার জন্যে তারা কতো দারুণভাবে প্রত্যাশী ছিলো– কতো হৃদয়াবেগ সহকারে এবং চূড়ান্ত বিজয় লাভের আকাংখায় তারা ফেরাউনের ইযযতের দোহাই পেড়েছিলো!

প্রকৃতপক্ষে মূসা ফেরাউনকে ক্ষমতা থেকে অপসারণ করে নিজের ক্ষমতাকে পাকাপোক্ত করার জন্যে চেষ্টা করছে ফেরাউন সারাদেশব্যাপী যেসব মিথ্যা ধারণা ছড়িয়ে রেখেছিলো তার ওপরই তিনি আঘাতের ওপর আঘাত হেনেছেন। তিনি ফেরাউন কর্তৃক চালু করা জনগণের এই ধারণাকে ভেংগে দিতে চেয়েছেন যে দেব-দেবীরা আল্লাহর সন্তান এবং দেশ পরিচালনা করার জন্যে তার আইনই চলবে। প্রকৃতপক্ষে সকল যামানায় ও সকল ক্ষমতাসীনরা নিজেদের ক্ষমতাকে পাকাপোক্ত করর জন্যে দেশে এই রকম বহু অলীক ধারণা চালু করে রাখে। এসব কাজে যাদুকরদের খেদমতকে কাজে লাগানো হয়েছে। আসলে যাদু-বিদ্যাকে সেসব জাহেলরা বরাবরই এক পবিত্র কৌশল হিসেবে গণ্য করতো। আর এদেরকে অনুসরণ করেই গীর্জার পাদ্রীরা জ্যোতির্বিদ বা গনকরা নানা প্রকার মিথ্যার জালে জনগণকে আবদ্ধ করে নিজেদের স্বার্থ উদ্ধার করেছে। হাঁ, সেই সব যাদুকরই আজ রব্বুল আলামীনের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে বসলো। তারা ঈমান আনলো মূসা ও হারুনের রবের ওপর। সাধারণত জনগণ বিশ্বাসের ব্যাপারসমূহের (আকীদা-বিশ্বাসের) প্রশ্নে ধর্মযাযকদের কথা মতো চলে। যেহেতু তারাই এসব বিষয়ে পারদর্শী এবং তারাই এসব কিছুর পুরোধা। ফেরাউনের সিংহাসন কেমন করে টিকবে শক্তিছাড়া? আর সে শক্তি তো আসবে জনগণের বিশ্বাসের ভিত্তিতে। অর্থাৎ ফেরাউনের প্রচারিত সেই অলীক বিশ্বাসই যদি জনগণ হারিয়ে ফেলে তাহলে কোত্থেকে সে শক্তি পাবে? কাজেই যাদুকরদের আত্মসমর্পণ ও রব্বুল আলামীনের ওপর ঈমান আনার ঘোষণায় ফেরাউনের তখতে তাউস এর ভিত্তি টলমল করে উঠলো।

অকস্মাৎ এই ঘটনা ঘটায় আমরা দেখতে পাচ্ছি, কিছুক্ষণের জন্যে হলেও ফেরাউন ও তার দল-বলের মধ্যে একটা তীব্র আতংক ছড়িয়ে পড়েছে। এতে আমরা আন্দায করতে পারি ওই সব ধর্মগুরু ও যাদুকরদের ঈমান আনাটা এমন ছিলো না যে তারা ঈমান না আনলেও পারতো। আসলে তাদের সব থেকে বড় বিদ্যা যখন খতম হয়ে গেলো তখন তারা বুঝলো মূসা (আ.) প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর রসূল। অতএব ফেরাউনের সাথে থেকে এ পর্যন্তকার সকল পাপের শাস্তি থেকে বাঁচার একমাত্র উপায়ই হচ্ছে তওবা করা ও রব্বুল আলামীনের কাছে আত্মসমর্পণ করা– এটা তারা বুঝতে পেরেছিলো। তাই তারা আনুগত্য ভরা হৃদয় নিয়ে সেজদায় পড়ে গেলো।

এমন সময় আবার ফেরাউনের মাথায় পাগলামি চেপে উঠলো এবং সে যাদুকরদেরকে পয়লা এই বলে দোষারোপ করলো যে ওরা মূসার সাথে গোপনে পরামর্শ করে একসাথে মিলে ফেরাউন ও তার সভাসদদের উৎখাত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে গেছে। অতএব তাদেরকে ফেরাউন চরম শাস্তি দেবে বলে ঘোষণা দিলো। দেখুন এ সময়ে ফেরাউন কি বললো,

'কী! আমি তোমাদেরকে অনুমতি দেয়ার আগেই তোমরা ঈমান আনলে।'

এ কথা সে বলেনি, 'আমানতুম বিহী' (তার ওপর তোমরা ঈমান এনেছো) তার ভাষায় বুঝা যাচ্ছে, সে বলতে চেয়েছে, ঈমান আনবে এতে আমার আপত্তি ছিলো না, কিন্তু আমার অনুমতি না নিয়েই কিভাবে তোমরা ঈমান এনে ফেললে। এর অর্থ দাঁড়ায়, আমি তোমাদের দন্ডমুন্ডের মালিক,

যে কোনো কাজ করবে আমার হুকুমেই করবে। তোমরা মূসার কাছে পরাজিত হয়েছো এবং আল্লাহর ক্ষমতার নিদর্শন দেখে তাঁর ওপর ঈমান এনেছো, এতে কোনো আপত্তি থাকার কথা নয়, কিন্তু আমার খেয়ে এবং আমার পরে এতোবড়ো অকৃতজ্ঞ ও অবাধ্য হলে কেমন করে যে আমার অনুমতি ছাড়াই ঈমান এনে ফেললে। তোমরা একটুও চিন্তা করলে না যে আমি তোমাদের ওপর রাগ করতে পারি এবং তোমাদেরকে চরম সাজা দিতে পারি। স্বৈরাচারী এ বাদশাহ্ বলতে চেয়েছে যে সেই-ই তার অধীনস্থ সবার ইচ্ছাশক্তির মালিক, সেইই জানবে তাদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে। কিন্তু মূর্খটা এটা টের পেলো না, সে যাদুকরদের সারা জীবনের সাধনার ধন ছিলো তাদের যাদু বিদ্যাটুকুই! যার ওপর কেউ কোনো দিন কোনো কথা বলতে পারেনি এবং কেউ তাদেরকে পরাস্ত করতে পারেনি, অথচ আজ যখন তাদের সকল বিদ্যাবুদ্ধিকে ব্যর্থ করে দেয়া হলো তখন বুঝা গেলো, অবশ্যই এটা কোনো মানুষের শক্তি বলে সম্ভব হয়নি। এর পেছনে অবশ্যই সর্বশক্তিমান আল্লাহর ক্ষমতা এবং যাঁর অধীনে চলছে সারা বিশ্বের সব কয়জন মানুষ– তারা এ পর্যন্ত রয়েছে তাদের প্রকৃত মালিককে চেনেনি, তাঁর হুকুম মতো জীবন যাপন করেনি। অজান্তে যে ভুল তারা করেছে, আজকে তাদের জ্ঞান-চোখ খুলে যাওয়ার পর তারা আর কেমন করে আর পিছিয়ে থাকবে? যিনি প্রকৃত মালিক, যিনি তাদের, ফেরাউনের এবং সমগ্র বিশ্বের সবার জীবন মৃত্যুর কর্তা-প্রতিপালক, তাঁর পরিচয় জানার পর আর এক মুহূর্ত বিলম্ব নয়, তাদের চেতনায় উন্নত এসব অনুভূতি কি করে সে অহংকারী বলদর্পী শাসক টের পাবে? এর পর দেখুন স্বেচ্ছাচারী-স্বৈরাচারী সম্রাট আর কাল বিলম্ব না করে এবং অত্যন্ত দ্রুততার সাথে তার দাপট প্রদর্শন করছে এবং তাদেরকে দোষারোপ করতে গিয়ে বলছে,

'হাঁ, বুঝেছি, তোমাদের (এসব যাদু বিদ্যার) নেতা তো সেই, সেই তোমাদেরকে এসব যাদুবিদ্যা শিখিয়েছে'

এ এক আজব দোষারোপ, লোকজন তার, সেই-ই তার অফিসারদের দ্বারা খবর দিয়ে তার দরবারে তাদেরকে জড় করেছে, কতো বয়স্ক ও প্রবীণ লোক তারা, যারা একটু আগ পর্যন্ত ফেরাউনের কাছ থেকে পুরস্কার প্রাপ্তির আশায় সর্বোতভাবে তার মনোরঞ্জন করার চেষ্টা করেছে, যাদের সাথে মূসার পরিচয়ের কোনো সুযোগ ছিলো না, মূসা তো ছিলো পলাতক এক আসামী, ধরা পড়ার ভয়ে নিরুদ্দেশে কাটিয়েছে সে দীর্ঘ বারোটি বছর, সে-ই নাকি সে মহা-মহা পন্ডিত যাদুকরদের নেতা। পাগলের প্রলাপ আর কি! সুতরাং এ কথার কোনো ব্যাখ্যা করা চলে না। শুধু এতোটুকু জানা যায় এবং বলা যায় যে মূসা ফেরাউনের পালক ছেলে থাকাকালে সে সব ধর্ম যাযকদের কেউ কেউ ফেরাউনের প্রাসাদে আসতো এবং তাকে লালন পালনের ব্যাপারে কিছু সহায়তা করতো, মূসাও হয়তো কখনো কখনো তাদের গীর্জা বা এবাদতখানাগুলোতে যাতায়াত করতো, সম্ভবত ফেরাউন এই সব কথাই বলতে চেয়েছিলো। কিন্তু ব্যাপারটাকে অন্যভাবে চিত্রিত করলো এবং আসল কথা 'সে তোমাদের ছাত্র'-এ কথাটার বিপরীত বলে বসলো 'সেই তোমাদের ওস্তাদ'। আসলে ফেরাউন এই জন্যেই সত্যকে চাপা দিয়ে এক ডাহা মিথ্যার আশ্রয় নিতে চেয়েছিলো যেন জনতার চোখে ব্যাপারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দেয় এবং সে নব দীক্ষিত মোমেনদের ঈমান আনাটা সবার কাছে মারাত্মক এক অপরাধ বলে বিবেচিত হয়। আসলে তার পায়ের নীচের যমীন সরে যাচ্ছিলো এবং যখন ওদের ঈমান আনার কারণে সকল মানুষের সমর্থন থেকে ওরা বঞ্চিত হওয়ার উপক্রম হয়েছে ঠিক সেই মুহূর্তেই এই দোষারোপটা ছিলো তার তার এক কূটনৈতিক চাল।

এরপর সেসব লোকদের ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে শেষ চেষ্টা হিসেবে নব্য ঈমানদার যাদুকরদেরকে সে ভীষণ শাস্তির ভয় দেখাতে শুরু করলো। কিন্তু নব দীক্ষিত এই মোমেনদল

ইতিমধ্যেই আখেরাতের চিরস্থায়ী জীবনে মুক্তি লাভের আশায় পরম পুলকিত মনে দুনিয়ার যে কোনো শাস্তি মাথা পেতে নিতে প্রস্তুত হয়ে গেছে। দেখুন ফেরাউনের শাস্তির হুমকির ও ভীতি প্রদর্শনের ভাষা,

'শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে (তোমাদের পরিণতি)। অবশ্য অবশ্যই আমি তোমাদের হাত ও পা বিপরীত দিক থেকে কেটে দেবো এবং তোমাদের সবাইকে শুলিতে চড়াবো।'

অন্যায়কারী শক্তিদর্পী ও বিদ্রোহীরা এই বেওকুফীটাই চিরদিন করে থাকে। যখনই তাদের ক্ষমতার আসন টলটলায়মান হয়ে যায় এবং নিজেদের জীবনকে বিপন্ন দেখে, তখনই তারা এই ধরনের জঘন্য পদক্ষেপ নেয়া শুরু করে দেয়, চরম নিষ্ঠুর ও ঘৃণ্য অত্যাচারের পন্থা উদ্ভাবন করে...... হৃদয় বা বিবেকের সকল বাধাকে উপেক্ষা করে তারা হিংস্র জন্তু-জানোয়ারের ভূমিকায় নেমে আসে।.......আর এটাই ছিলো বিদ্রোহী-অহংকারী-শক্তিদর্পী সেই যালেম ফেরাউনের ঘোষণা, যে তার হুকুমকে কার্যকর করার ক্ষমতা রাখে বলে মনে করতো .....এমতাবস্থা ওইসব মোমেনদের সিদ্ধান্তকর কথা কী হতে পারে, যারা ঈমানের আলো দেখে নিয়েছে।

এসব কথা তো সেসব জাগ্রত হৃদয় থেকে বেরিয়ে আসে যারা আল্লাহ রব্বুল ইযযতকে সত্যিকার অর্থে ভয় করে এবং তার সন্তুষ্টি কামনা করে, যারা কখনো এমন দিকে যেতে পারে না বা এমন কিছু করতে পারে না, যা তাদের এই পরম প্রাপ্তিকে কেড়ে নেবে, কেননা তাদের হৃদয় মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীনের সাথে সম্পর্কিত হয়ে গেছে, অতপর তারা মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভে সম্মানিত হওয়ার মধুর স্বাদ যখন পেয়ে গেছে, তারা আর কখনো তাগূতের সাথে দল বাঁধতে পারে না। এরা এমনই আত্ম মর্যাদাবোধ সম্পন্ন হয়ে যায় যে দুনিয়ার তুচ্ছ ও ক্ষণস্থায়ী জীবনের আর কোনো পরওয়াই তারা করে না। কম পেলো– না বেশী পেলো তারা এসব চিন্তার উর্ধে উঠে যায়– তাদের সকল ধ্যান জ্ঞান হয়ে যায় আখেরাত কেন্দ্রিক। তাই দেখুন এই মুখগুলো থেকে কী বলিষ্ঠ কথা বেরিয়ে আসছে,

'ওরা বলে উঠলো, কোনো অসুবিধে নেই, আমরা আমাদের রবের দিকে প্রত্যবর্তন করেছি।'

আমাদের কামনা-বাসনা মাত্র এতোটুকু, যেন আমাদের রব আমাদের গুণাহ খাতা ও ক্রটি-বিচ্যুতি মাফ করে দেন, যাতে করে আমরা প্রথম ঈমান আনয়নকারী বলে গণ্য হতে পারি।

অর্থাৎ কোনো ক্ষতি নেই, কোনো পরওয়া নেই আমাদের; ফেরাউন আজ আমাদের হাত-পা বিপরীত দিক থেকে কেটে দেয়ার ভয় দেখাচ্ছে? (৮) এসব চিন্তা আর আমাদের কাছে কোনো মুখ্য বিষয় নয়। শুলে চড়ানোতে বা সাজা দেওয়াতে আমাদের কোনোই পরোয়া নেই।

মৃত্যু আসায় বা শাহাদাত লাভ করায় কোনো পরওয়া নেই আমাদের, কোনো কিছুই আর আমাদেরকে ঘায়েল করতে পারবে না– আমরা আমাদের রবের দিকে প্রত্যাবর্তন করেছি, এখন এ পৃথিবীতে আমাদের অবস্থা যা হবে হোক। আমাদের আসল চাহিদা, যার সাথে আমাদের মন-মগয এখন বিজড়িত এবং যা আমাদের একমাত্র কাম্য তা হচ্ছে, 'যেন আমাদের রব আমাদের গুনাহখাতা মাফ করে দেন' আমাদের এই পুরস্কারই যথেষ্ট 'যে আমরা সর্বাগ্রে মোমেন হতে পেরেছি।' অর্থাৎ ঈমান আনার প্রতিযোগিতায় আমরা প্রথম স্থান অধিকার করেছি।

ইয়া আল্লাহ, যখন কোনো ব্যক্তির বিবেকের মধ্যে ঈমানের আগমন ঘটে তখন সে কতো সুন্দর হয় এবং তার রূহের ওপর এর ছাপ পড়ে তখন সে কতো মধুর চরিত্রের অধিকারী হয়ে যায়, তখন এই ঈমানের কারণেই কতো ধীর-স্থির এবং প্রশান্ত বদনে দুনিয়ার নানা প্রকার দুঃখ-কষ্ট জ্বালাকে সে সহ্য করে নেয়; যখন পচা চটকানো মাটির এ পুতুলটিকে ইল্লিয়্যীনে তোলা হবে,

(৮) অর্থাৎ ডান হাত বাম পা এবং বাম হাত ডান পা-এক জনের এক এক রকম।

যখন জীবন শেষে আল্লাহর দরবারে সে অভাবহীন ও প্রাচুর্য নিয়ে পৌঁছে যাবে তখন তার চোহারা কতো মনোরম হবে; তখন পৃথিবীতে যা কিছু স্বার্থ সে ত্যাগ করে এসেছে এবং লোভ-লালসা ও আকাংখার বস্তু যা কিছু সে আখেরাতের জীবনে শান্তি পাওয়ার আশায় ছেড়ে এসেছে- সে সব কিছু তার কাছে অতি তুচ্ছ বলে মনে হবে।

এখানে এ পৃথিবীর প্রচুর সুন্দর বস্তুর ওপর পর্দা নিক্ষেপ করা হচ্ছে, কারণ এসব সৌন্দর্য ইচ্ছা করলেই বাড়ানো যায় না। আসুন আমরা এগুলোর সৌন্দর্য বৃদ্ধির পরিবর্তে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের দরবারে যা সুন্দর বলে বিবেচিত হবে তাই বাড়ানোর চেষ্টা করি এবং সেই সকল কাজ করি যা গভীরভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকবে। এভাবে আমরা দৃঢ় ইচ্ছা নিয়ে চেষ্টা করলে মহান আল্লাহ তায়ালা আমাদের মনকে তৃপ্তিতে ভরে দেবেন। মক্কায় থাকাকালে সাহাবায়ে কেরামকে তাদের সীমাহীন দুঃখ-কষ্ট ও নির্যাতনের মধ্যেও আল্লাহ তায়ালাই সান্ত্বনা দিয়েছেন। এতো সংকট, এতো দুঃখ ও কাফেরদের এতো অত্যাচার সত্তেও তাদের মধ্যে কেউ ঈমান পরিত্যাগ করেননি, এমনি করে সর্বকালে ও সর্বদেশে আল্লাহ রব্বুল আলামীনই ঈমানের পথে চলতে গিয়ে মোমেনদেরকে পাথেয় যোগাড় করে দেন। তাদের দৃঢ়তা অবলম্বনের শক্তি যোগান এবং শত প্রকার যুলুম নির্যাতন সহ্য করার তাওফিক তাদের দেন।

ফেরাউনের সলীল সমাধি

ঈমানের রাস্তায় এ সকল পরীক্ষায় মোমেনরা যখন দৃঢ়তা অবলম্বন করে তখন আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে নিজের শক্তি ক্ষমতা দ্বারা সাহায্য করেন। তিনি নিজেই তাদেরকে পরিচালনা করেন। তাই একদিকে যেমন দেখা যায় মূসা (আ.)-এর ওপর যারা বিশ্বাস স্থাপন করলেন তাদেরকে আল্লাহ তায়ালা নিজে পরিচালনা করে এগিয়ে নিয়ে গেলেন সাগরের দিকে, অপরদিকে ফেরাউন ও সকল প্রকার সাজ সজ্জাসহ তার সমগ্র সেনাবাহিনীকে নির্দেশ দিলো বনি ইসরাঈল জাতির পশ্চাদ্ধাবন করতে। এর বর্ণনা আসছে,

'আমি মূসাকে নির্দেশ দিলাম, আমার অনুগত বান্দাদের সাথে করে নিয়ে এগিয়ে যাও, (সাবধান থেকো) তোমাদেরকে পেছন দিক থেকে ধাওয়া করা হবে।........

তখন ফেরাউন সকল শহর নগর বন্দরগুলোতে ঘোষণা করার ব্যবস্থা করলো যেন সকল এলাকা থেকে সেনাবাহিনীতে আরও মানুষ এসে যোগ দেয়। সে তাদেরকে অভয় দিলো যে মূসা ও তার লোকজন সব মিলেও তো সামান্য কিছুসংখ্যক লোক মাত্র সুতরাং ভয়ের কিছু নেই ওরা আমাদেরকে রাগান্বিত করে তুলেছে। আর আমরা সবাই ওদের কাছে সতর্ককারী আতংক সৃষ্টিকারী হয়ে দেখা দেবো।

এখানে বুঝা যাচ্ছে, মিসর পরিত্যাগ করার পূর্বে বনি ইসরাঈলদের আরও কিছুকাল সেখানে থাকতে হয়েছিলো এবং আরও অনেক ঘটনা ঘটেছিলো যার বর্ণনা এখানে আসেনি, অর্থাৎ প্রতিযোগিতা শেষে বনি ইসরাঈল জাতিকে নিয়ে মূসা (আ.) আরও বেশ কিছু সময় মিসরে বাস করেছিলেন এবং তার জাতিকে নিয়ে রওয়ানা হওয়ার পূর্বে আরও অনেক ঘটনা ঘটেছিলো, যার কিছু বিবরণ সূরায়ে আ'রাফে এসেছে। কিন্তু বর্তমান এই সূরাটিতে এ প্রসংগের আলোচনাকে সংক্ষেপ করা হয়েছে। যাতে করে এখানে মূল যে বিষয়টিকে তুলে ধরতে চাওয়া হয়েছে সেটাকে পরিষ্কার করা যায়।

অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা ওহীর মাধ্যমে মূসা (আ.)-কে নির্দেশ দিয়েছিলেন যেন তিনি আল্লাহর বান্দাদেরকে নিয়ে এলাকা ছেড়ে বেরিয়ে যান এবং রাত্রিতেই যেন আসবাবপত্র গোছগাছ

করে শৃংখলার সাথে রওনা করেন। মূসা (আ.) সবাইকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে অবশ্যই ফেরাউন তার সেনাবাহিনী নিয়ে পেছন থেকে তাদের ধাওয়া করবে। এ জন্যে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে সাগরের কিনারায় পৌঁছে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন (সম্ভবত এটা ছিলো সেই এলাকা যেখানে বর্তমানের সুয়েজখাল মূলহ্রদের অঞ্চলে গিয়ে মিশেছে।)

ইতিমধ্যে ফেরাউন জানতে পারলো যে বনি ইসরাঈলরা অতি সংগোপনে পালিয়ে যাবে, এ জন্যে সে সাধারণভাবে সবাইকে ওদের ধরার জন্যে হুকুম জারি করে দিলো এবং বিভিন্ন শহর থেকে লোক পাঠিয়ে সেনাবাহিনীকে শক্তিশালী করার নির্দেশ দিল, যাতে মূসা ও তার জাতিকে যথাসময়ে পাকড়াও করা যায় এবং তাদের গোপনে বেরিয়ে যাওয়ার সব পরিকল্পনাকে ব্যর্থ করে দেয়া যায়। কিন্তু সে হতভাগা তো এটা জানতোনা যে নবীর পরিকল্পনা তো স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক নির্মিত হয়, কে আছে এমন যে তাকে ব্যর্থ করতে পারে।

ফেরাউনের কর্মকর্তারা সেনাবাহিনীকে বর্ধিত করতে এবং সংঘবদ্ধ করে পরিচালনা করতে শুরু করলো; কিন্তু এই বৃহৎ জমায়েতকে নিয়ন্ত্রণ করা ও খাওয়া থাকার ব্যবস্থা আনজাম দেয়ার কাজটা ফেরাউনের জন্যে ভীষণ উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়ালো। কেননা ইতিপূর্বে প্রতিযোগিতায় ফেরাউনের পরাজয় এবং মূসা (আ.) ও তার জনগণের শক্তির কাহিনী, যার কারণে স্বতস্ফূর্তভাবে কেউই মূসা (আ.) ও তার জাতির মুখোমুখি হওয়ার জন্যে এগিয়ে আসছিলো না, অর্থের লোভ ও নির্দেশ অমান্য করার জন্যে শাস্তির হুমকি– কোনোটাই ফলপ্রসূ হচ্ছিল না। অবশেষে এ প্রবল প্রভাবশালী বাদশাহ যে তার ধারণায় সে সর্বশক্তিমান ও পূজনীয় (ইলাহ) মূসা (আ.) ও তার জনগণের পেছনে ধাওয়া করার জন্যে সাধারণকে নির্দেশ দিলো। অন্যদিকে সে মোমেনদেরকে তুচ্ছ করতে গিয়ে বললো,

'ওরা অবশ্যই ছোট্ট একটি দল মাত্র'

আবার দেখা যাচ্ছে তাদের ব্যাপারে জনগণকে সতর্ক করার জন্যে এই বিপুল আয়োজন– এসব অবস্থা সামনে রাখলে যে কোনো ব্যক্তি বুঝবে কতো গভীরভাবে মোমেনদের ভীতি তার অন্তরে জেঁকে বসেছিলো। মানুষের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা ও ক্রোধের সঞ্চার করার জন্যে আবারও সে পাগলের মতো বললো,

'ওরা আমাদেরকে রাগিয়ে তুলেছে।'

হাঁ, ওরা কাজ ও কথা দ্বারা এমন কিছু করছিলো যার দ্বারা মানুষের মধ্যে অসন্তোষ, রাগ ও ভাবের আবেগ সৃষ্টি হয়।

সুতরাং, দেখা যাচ্ছে, একই সাথে তাদের মধ্যে দুটি অবস্থা বিরাজ করছিলো। একদিকে নিজেদের সংখ্যা ও সরঞ্জামের আধিক্য তাদেরকে উৎসাহ যোগাচ্ছিলো, অপরদিকে মূসা (আ.)-এর মোজেযার কথা ও মোমেনদের আক্রমণ করার ব্যাপারে নানাপ্রকার বাধা-বিপত্তির কথা স্মরণ করে তারা সাহসহারা হয়ে যাচ্ছিল। তবুও তাদের কর্মকতারা বলছিলো, ওদেরকে ধরা এটা কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়, সর্বত্রই আমরা ওৎ পেতে বসে থাকবো, যেন ওরা পালানোর কোনো সুযোগ না পায়। আবার তারা বলছিলো,

'অবশ্যই আমরা সুসংগঠিত এক সতর্ককারী ও আতংক সৃষ্টিকারী দল'

অর্থাৎ, আমাদের তৎপরতা ও সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা তাদেরকে ও নানা প্রকার কলা কৌশল অবলম্বনের দিকে এগিয়ে দিচ্ছে, তারা আমাদের ভয়ে এতোই ভীত যে আমাদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে তারা নানা প্রকার ফন্দী-ফিকির আঁটছে, তাদের সকল কাজে সতর্কতা অবলম্বন করছে এবং বেশ সুশৃংখলভাবে তাদের কাজকে গুছিয়ে নিচ্ছে!

বাতিল শক্তি ও তার ধারক বাহকরা প্রকাশ্যে সত্যের প্রতি যতোই উন্নাসিক হোক এবং যতোই তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করুক না কেন, তাদের অন্তরের গভীরে সত্যের শক্তির ব্যাপারে সদা-সর্বদা এক বিরাট আতংক বিরাজ করতে থাকে এবং মোমেনদের আকীদার মোকাবেলা করার জন্যে সকল সময়েই তারা অস্থিরতার মধ্যে কাটায়।

একদম শেষের অবস্থাটি পেশ করার পূর্বে প্রসংগক্রমে ফেরাউন ও তার আমীর-ওমরাদের নিজ নিজ বাসস্থান ও সুযোগ-সুবিধার সকল ক্ষেত্র পরিত্যাগ করে বেরিয়ে আসা, ডুবে মরা ও পরিশেষে তাদের সকল কিছুর মালিকানা বনি ইসরাঈলীদের হাতে চলে যাওয়ার করুণ ইতিহাস তুলে ধরা হচ্ছে। এরশাদ হচ্ছে,

'আমি তাদেরকে তাদের বাগ-বাগিচা, ঝর্ণাধারা, অর্থ-সম্পদ, ও জাঁক-জমকপূর্ণ বাসস্থানগুলো থেকে বের করে নিলাম। এমনি করে বনি ইসরাঈলদেরকে সব কিছুর ওয়ারিশ বানালাম।'

আল্লাহ রব্বুল আলামীন অহংকারী ও বিদ্রোহী রাজা ফেরাউন ও তার জাতিকে এইভাবে শাস্তি দিলেন যে, তারা মূসা (আ.) ও তার জাতিকে ধরার উদ্দেশ্যে অনুসরণ করার জন্যে তাদের বাড়িঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলো। আর এই বেরিয়ে আসাটাই তাদের শেষবারের মতো বেরিয়ে আসায় পরিণত হলো। বরং তারা ডেকে আনলো তাদের শেষ ও চূড়ান্ত পরিণতি। হায় আফসোস, সে জাতির জন্যে, যারা আরাম আয়েশের সকল উপকরণাদির মালিক ছিলো! বাগ-বাগিচা, ঝর্ণাধারা, সহায়-সম্পদ ও সম্পত্তি কতো উন্নতমানের বাসস্থান, কিন্তু প্রতিহিংসা পরায়নতা তাদেরকে এসব কিছু পেছনে ফেলে রেখে এসে অজানা ও অকল্পনীয় পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে গেলো। আসলে আগ্রাসী নীতি, ক্রোধ, লোভ ও জিদ বরাবরই মানুষকে চরম ধ্বংসের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। তাই, এই বের হওয়াই তাদের শেষ বের হওয়া হলো, পুনরায় আর কোনো দিন তারা তাদের সেসব পরিত্যক্ত বিষয় আসয় ফিরে পাওয়ার জন্যে যেতে পারেনি। এই জন্যেই বলা হয়েছে মোমেন মুসলমানদের পশ্চাদ্ধাবন করতে গিয়ে তাদের এই বের হওয়াই ছিলো শেষ বের হওয়া। এ জন্যে ওদের বেরিয়ে যাওয়ার পর সেসব দ্রব্য সম্ভার ও এলাকা সবই মোমেনদের হস্তগত হয়ে গেলো। যুলুম, অহংকার, বিদ্রোহ ও বিপজ্জনক যেসব কাজ তারা করেছিলো এই চরম বিপর্যয় তারই পরিণতিস্বরূপ তাদের ওপর নেমে এলো। তাই আল্লাহ রব্বুল আলামীন বলছেন,

'আমি এমন করেই বনী ইসরাঈলদেরকে এগুলোর ওয়ারিশ বানালাম।'

অবশ্য মিসর থেকে বেরিয়ে পবিত্র ভূমি বায়তুল মাকদেসের দেশ ফিলিস্তিনে চলে যাওয়ার পর পুনরায় মিসরে তারা ফিরে এসেছিলো কিনা তা জানা যায় না, তবে ফেরাউনের দেশ ধন সম্পদ এবং তার বাসস্থান সব কিছুর উত্তরাধিকারী হয়েছিলো বনি ইসরাঈলরাই। এই জন্যেই মোফাসসেররা বলেছেন, ফেরাউন ও আমীর-ওমরাহরা যে সব জিনিসের অধিকারী ছিলো ওরা ওয়ারিশ হয়েছে।

এসব ঘটনা পেশ করার পর আসছে শেষ এবং চূড়ান্ত দৃশ্য-

অতপর ওরা একদিন সূর্যোদয়ের সময়ে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করলো। যখন তারা পরস্পরকে দেখলো তখন মূসার সংগীরা বললো, আমরা তো সত্যিই পড়ে যাচ্ছি .... তারপর আমি সর্বশক্তিমান আল্লাহ অপর দলটিকে ডুবিয়ে দিলাম।' (আয়াত ৬০-৬৫)

উপরের আয়াতগুলো থেকে জানা গেলো যে মূসা (আ.) আল্লাহর হুকুমে এবং তারই নির্দেশিত পন্থায় আল্লাহর অনুগত বান্দা, অর্থাৎ বনি ইসরাঈলদেরকে নিয়ে রওয়ানা হয়ে গেলেন।

অতপর ভোর বেলায় পরিপূর্ণ শক্তি ও সাজ-সজ্জাসহ ফেরাউনের লোক লস্কর তাদেরকে ধাওয়া করলো। এরপরই এগিয়ে এলো সেই বিয়োগান্ত নাটকের শেষ পালা। আর যুদ্ধাভিযান চূড়ান্ত রূপের দিকে এগিয়ে গেলো .... দেখুন, একদিকে মূসা, তার জাতির লোকদেরকে নিয়ে সমুদ্রের সামনে দাঁড়িয়ে, তাদের কাছে কোনো নৌবহর নেই, যাতে আরোহন করে পার হওয়ার চিন্তা করা যায়, তারা কী করবে কিছুই স্থির করতে পারছে না এবং তাদের কাছে কোনো অস্ত্র শস্ত্রও নেই, যার দ্বারা ফেরাউনের মোকাবেলা করা যায়। ওদিকে তাদের একেবারে কাছাকাছি পৌঁছে গেছে ফেরাউনও তার সেনাবাহিনী, ওরা সর্বপ্রকার অত্যাধুনিক যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত হয়ে তাদের পেছনে ধাওয়া করে আসছে। আজ তারা কোনো দয়া করবে না।

পরিস্থিতি এমনই সংগীন যে সামনে রয়েছে বিশাল সমুদ্র এবং পেছনে রয়েছে চরম হিংস্র দুশমন, এমতাবস্থায় বাঁচার কোনো উপায় আছে বলে মনে হচ্ছে না। এমন অবস্থায় মূসা (আ.)-এর সংগীরা চরম হতাশার সাথে চীৎকার করে বলে উঠছে, 'আমরা তো ধরাই পড়ে যাচ্ছি।'

হ্যাঁ, সংকট চূড়ান্ত রূপ নিয়েছে, পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই তারা সাক্ষাত মৃত্যুর সম্মুখীন হয়ে যাবে। যখন বাঁচার আর কোনো উপায়ই থাকবে না, থাকবে না তাদেরকে সাহায্য করার আর কেউ।

কিন্তু মূসা তো সেই ব্যক্তি যিনি তার রবের কাছ থেকে ওহী পেয়ে থাকেন, দেখা যাচ্ছে, তিনি নির্লিপ্ত নিঃশংক, তার রবের সাহায্য প্রাপ্তির ব্যাপারে তাঁর মধ্যে কোনোপ্রকার সন্দেহ বা সংশয় নেই, তিনি তার রবের ওয়াদার ব্যাপারে পুরোপুরি আস্থাবান, তাঁর সাহায্য অবশ্যম্ভাবী-এ বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ নিশ্চিত। আজ মুক্তি সুনিশ্চিত, যদিও বুঝা যাচ্ছে না তা কেমন করে সম্ভব, কিন্তু শত্রুদের কবল থেকে আজ তারা সবাই মুক্তি লাভ করবেনই এ বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত। আল্লাহ তায়ালা নিজেই তো তাদেরকে এগিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন এবং তাকে পরিচালনা করছেন তাই, 'তিনি দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে বলছেন, না, কিছুতেই না, অবশ্যই আমার রব আমার সাথে আছেন। শীঘ্রই তিনি আমাকে পথ দেখাবেন জানাবেন এই ক্রান্তিকালে কি আমার করণীয়।

'কাল্লা' শব্দটি ব্যবহৃত হয় কোনো বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্ব দান করতে গিয়ে এবং কোনো কথাকে নাকচ করার উদ্দেশ্যে যেমন 'না, কখনো আমরা ধৃত হবো না।, 'না, কিছুতেই আমরা ধ্বংস হবো না', না, কিছুতেই আমরা বিপদাপন্ন হবো না, না, কোনোভাবেই আমরা ব্যর্থ হবো না, 'না, কিছুতে (আমরা ধ্বংস হব) না, নিশ্চয়ই আমাদের সাথে আমাদের রব বর্তমান আছেন, তিনি আমাদেরকে পথ দেখাবেন।' এমনি দৃঢ়তা নিয়ে এবং গুরুত্ব ও নিশ্চয়তা দিয়ে কথা বলার জন্যে 'কাল্লা' শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

এমনই এক কঠিন মুহূর্ত যখন সমাগত, তবুও মূসা (আ.) নির্লিপ্ত নিশ্চিন্ত, এতোটুকু বিচলিতভাব তাঁর মধ্যে নেই, আল্লাহর সাহায্য আসার ব্যাপারে তিনি এতোটুকু সন্দিহান নন, নিরাশার ঘোর আঁধার রাতে অবশেষে শুভ্র সমুজ্জ্বল আশার বাতি ফুটে উঠছে এবং মুক্তির পথ খুলে যাচ্ছে– এমন এক পন্থায় যা কেউ চিন্তাও করতে পারে না। এরশাদ হচ্ছে, ওহী নাযিল করে জানালাম মূসাকে যে তোমার লাঠি দ্বারা সমুদ্রের (বুকের) ওপর আঘাত করো।'

এ প্রসংগে, মূসা (আ.) সমুদ্রবক্ষে লাঠি মারলেন এ কথাটা আর পরিষ্কার করে বলা হয়নি, কারণ এটা এমনিই বুঝা যাচ্ছে যে তিনি লাঠি মারলেন, এ কাজের ফলে সংগে সংগে,

'সমুদ্রের পানি ভাগ হয়ে গেলো এবং দুটো টুকরা দুই দিকে পর্বত খন্ডের মতো উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে গেলো।'

এইভাবে এক অভাবনীয় এক মহা মোজেযা (অলৌকিক ঘটনা) ঘটে গেলো, অবর্ণনীয় ও অচিন্তনীয় সেই সত্য বাস্তবায়িত হলো যার সম্পর্কে মানুষ বলে, 'অসম্ভব', কারণ মানুষের সীমিত জ্ঞানে এর কোনো সম্ভাব্যতা বের করা অসম্ভব। সাধারণভাবে তারা প্রতিনিয়ত যা দেখে চলেছে, সেইটার ওপরই তারা কোনো ধারণা করে। আল্লাহ রব্বুল আলামীন তো সেই মহান সত্ত্বা যিনি দুনিয়া জাহানের জন্যে সকল নিয়ম তৈরী করেছেন (যা সাধারণত. আমরা দেখে থাকি), কিন্তু এ সব কিছুর বাইরে তিনি আরও অনেক কিছু সংঘটিত করতে পারেন এবং যখনই যা কিছু করতে চান তা সম্পন্ন করেন। এ ব্যাপারে তাঁর কোনো সংকট বা সীমাবদ্ধতা নেই।

মোজেযা সংঘটিত হলো এবং পানি দুই ভাগে ভাগ হয়ে দুই দিকে সরে গেলো এবং মাঝখান থেকে সুপ্রশস্ত একটি রাস্তা বেরিয়ে এলো এ রাস্তার দুই দিকে বিরাট পর্বতের মতো উঁচু হয়ে পানি দাঁড়িয়ে গেলো এবং বনী ইসরাঈলরা এই রাস্তা ধরে এগিয়ে চললো .... ইতিমধ্যে ফেরাউন তার লোক লস্কর সহ সেই মহা সাগরের কিনারায় পৌঁছে গেলো এবং এই অলৌকিক দৃশ্য দেখে ফেরাউন ও সেনাবাহিনী চরম বিস্ময়াভিভূত হয়ে পড়লো; অতপর কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দীর্ঘক্ষণ ধরে তারা এই আজব দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে রইলো এবং দেখতে থাকলো যে মূসা (আ.) তার জাতিকে নিয়ে সে মহাসাগর পার হয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। পরে বিস্ময়ের ঘোর একটু কেটে গেলে সে হুকুম দিলো তার সেনাদলকে সে বিস্ময়কর রাস্তা ধরে ওদের পশ্চাদ্ধাবন করার জন্যে। এইভাবে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের মহা পরিকল্পনা পূর্ণতা লাভ করলো। বনী ইসরাঈল অপর কিনারায় পৌঁছে গেলো। কিন্তু তখন ফেরাউন ও তার সকল লোক লস্কর পর্বতসম ওই দুই পানির ভাগের মধ্যে দিয়ে মহা বিক্রমে অগ্রসরমান। এইভাবেই আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে তাদের জীবনের চূড়ান্ত পরিণতির দিকে এগিয়ে দিলেন। সে অবস্থার চিত্র আঁকতে গিয়ে আল কোরআন জানাচ্ছে,

'আমি অপর দলটিকে অগ্রসর করে দিলাম এবং মূসা ও তার সাথীদের সবাইকে মুক্তি দিলাম। তারপর আমি অন্যদেরকে ডুবিয়ে দিলাম।'

এভাবে তাদের এ ঘটনাটি পৃথিবীর বুকে বহুকাল ধরে এক পরম দৃষ্টান্ত হিসেবে রয়ে গেলো। যুগ যুগ ধরে যা মানুষ স্মরণ করতে থাকলো এবং এ ঘটনাটি অসংখ্য মানুষের আলোচনার বিষয়ে পরিণত হলো, কিন্তু এতদসত্তেও অধিকাংশ লোক কি ঈমান এনেছিলো? এই জন্যেই আল্লাহ তায়ালা জানাচ্ছেন,

'অবশ্যই এই ঘটনার (বর্ণনার) মধ্যে রয়েছে এক উজ্জ্বল নিদর্শন, কিন্তু তা সত্তেও ওদের অধিকাংশ মানুষ বিশ্বাসী নয়।'

সুতরাং, এটা প্রমাণিত হলো যে অলৌকিক ঘটনাবলী সব সময় ঈমান আনার ব্যাপারে চূড়ান্ত নিশ্চয়তা দিতে পারে না, যদিও মোজেযা দেখে মানুষ নরম হয়ে পড়ে এবং ঈমান আনার দিকে ঝুঁকে পড়ে! কিন্তু আসলে ঈমান তো হচ্ছে অন্তরের মধ্যে আগত হেদায়াতের এক মহান আলো।

'আর তোমার প্রতিপালকই মহাপ্রতাপশালী করুণাময়।'

ইতিপূর্বে বর্ণিত নিদর্শনাবলী ও কাফেরদের পক্ষ থেকে নবীর দাওয়াত প্রত্যাখ্যানের উল্লেখের পর এই মন্তব্য করা হলো।

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرٰهِيمَ ﴿٦٩﴾ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٧٠﴾ قَالُوا
نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عٰكِفِينَ ﴿٧١﴾ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ﴿٧٢﴾ أَوْ
يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ ﴿٧٣﴾ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذٰلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿٧٤﴾
قَالَ أَفَرَءَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿٧٥﴾ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ ﴿٧٦﴾ فَإِنَّهُمْ
عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعٰلَمِينَ ﴿٧٧﴾ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ﴿٧٨﴾ وَالَّذِي هُوَ
يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ﴿٧٩﴾ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴿٨٠﴾ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ
يُحْيِينِ ﴿٨١﴾ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ ﴿٨٢﴾ رَبِّ
هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصّٰلِحِينَ ﴿٨٣﴾

রুকু ৫

৬৯. (হে নবী,) তুমি ওদের কাছে ইবরাহীমের ঘটনাও বর্ণনা করো। ৭০. যখন সে তার পিতা ও তার জাতির লোকদের (এ মর্মে) জিজ্ঞেস করেছিলো, তোমরা সবাই কার এবাদাত করো? ৭১. তারা বললো, (হাঁ), আমরা মূর্তির এবাদাত করি, নিষ্ঠার সাথেই আমরা তাদের এবাদাতে মগ্ন থাকি। ৭২. সে বললো (বলো তো), তোমরা যখন তাদের ডাকো তারা কি তোমাদের কোনো কথা শুনতে পায়, ৭৩. অথবা তারা কি তোমাদের কোনো উপকার করতে পারে; কিংবা (পারে কি) তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে? ৭৪. তারা বললো, (না তা পারে না, তবে) আমরা আমাদের বাপদাদাদের এরূপে এদের এবাদাত করতে দেখেছি, ৭৫. সে বললো, তোমরা কি কখনো তাদের ব্যাপারটা (একটু) চিন্তা ভাবনা করে দেখেছো–যাদের তোমরা এবাদাত করো, ৭৬. তোমরা নিজেরা (যেমনি করছো)– তোমাদের আগের লোকেরাও (তেমনি করেছে), ৭৭. (এভাবে যাদের এবাদাত করা হচ্ছে,) তারা সবাই হচ্ছে আমার দুশমন। একমাত্র সৃষ্টিকুলের মালিক ছাড়া (তিনিই আমার বন্ধু), ৭৮. তিনি আমাকে পয়দা করেছেন, অতপর তিনিই আমাকে (অন্ধকারে) চলার পথ দেখিয়েছেন, ৭৯. তিনিই আমাকে আহার্য দেন, তিনিই (আমার) পানীয় যোগান, ৮০. আর আমি যখন রোগাক্রান্ত হই তখন তিনিই আমাকে রোগমুক্ত করেন, ৮১. তিনিই আমার মৃত্যু ঘটাবেন, তিনিই আমাকে আবার (নতুন) জীবন দেবেন, ৮২. শেষ বিচারের দিন তাঁর কাছ থেকে আমি এ আশা করবো, তিনি আমার গুনাহসমূহ মাফ করে দেবেন; ৮৩. (অতপর ইবরাহীম দোয়া করলো,) হে আমার মালিক, তুমি আমাকে জ্ঞান দান করো এবং আমাকে নেককার মানুষদের সাথে মিলিয়ে রেখো।

وَاجْعَلْ لِّيْ لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْاٰخِرِيْنَ ﴿٨٤﴾ وَاجْعَلْنِيْ مِنْ وَّرَثَةِ جَنَّةِ

النَّعِيْمِ ﴿٨٥﴾ وَاغْفِرْ لِاَبِيْٓ اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الضَّآلِّيْنَ ﴿٨٦﴾ وَلَا تُخْزِنِيْ يَوْمَ

يُبْعَثُوْنَ ﴿٨٧﴾ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَّلَا بَنُوْنَ ﴿٨٨﴾ اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ

سَلِيْمٍ ﴿٨٩﴾ وَاُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿٩٠﴾ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيْمُ لِلْغٰوِيْنَ ﴿٩١﴾

وَقِيْلَ لَهُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ ﴿٩٢﴾ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۖ هَلْ يَنْصُرُوْنَكُمْ اَوْ

يَنْتَصِرُوْنَ ﴿٩٣﴾ فَكُبْكِبُوْا فِيْهَا هُمْ وَالْغَاوٗنَ ﴿٩٤﴾ وَجُنُوْدُ اِبْلِيْسَ اَجْمَعُوْنَ ﴿٩٥﴾

قَالُوْا وَهُمْ فِيْهَا يَخْتَصِمُوْنَ ﴿٩٦﴾ تَاللّٰهِ اِنْ كُنَّا لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٩٧﴾ اِذْ

نُسَوِّيْكُمْ بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٩٨﴾

৮৪. এবং পরবর্তীদের মাঝে তুমি আমার স্মরণ অব্যাহত রেখো, ৮৫. আমাকে তুমি (তোমার) নেয়ামতে ভরা জান্নাতের অধিকারীদের মধ্যে শামিল করে নিয়ো, ৮৬. আমার পিতাকে (হেদায়াতের তাওফীক দিয়ে) তুমি মাফ করে দাও, কেননা সে গোমরাহদের একজন, ৮৭. আমাকে তুমি সেদিন অপমানিত করো না (যেদিন সব মানুষদের) পুনরায় জীবন দেয়া হবে। ৮৮. সেদিন তো (কারো) ধন সম্পদ কাজে লাগবে না– না সন্তান সন্ততি (কারো কাজে আসবে), ৮৯. অবশ্য যে আল্লাহর কাছে একটি বিশুদ্ধ অন্তর নিয়ে হাযির হবে (তার কথা আলাদা); ৯০. (সেদিন) জান্নাতকে পরহেযগার লোকদের একান্ত কাছে নিয়ে আসা হবে, ৯১. এবং জাহান্নামকে গুনাহগারদের জন্যে উন্মোচিত করে দেয়া হবে, ৯২. (তখন) তাদের বলা হবে, (বলো) এখন কোথায় তারা, (দুনিয়ার জীবনে) যাদের তোমরা এবাদাত করতে, ৯৩. যাদের তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে (এবাদাতের জন্যে) ডাকতে, আজ তারা তোমাদের কোনো রকম সাহায্য করতে পারবে কি? না তারা নিজেদের (আল্লাহর আযাব থেকে) বাঁচাতে পারবে? ৯৪. অতপর (যাদের তারা মাবুদ বানাতো–) তারা এবং গোমরাহ মানুষ (যারা তাদের এবাদাত করতো), সবাইকে সেখানে অধোমুখী করে নিক্ষেপ করা হবে, ৯৫. (নিক্ষেপ করা হবে) ইবলীসের সমুদয় বাহিনীকেও; ৯৬. সেখানে (গিয়ে) তারা নিজেরা এক (মহা) বিতর্কে লিপ্ত হবে এবং (প্রত্যেকেই নিজ নিজ মাবুদদের) বলবে, ৯৭. আল্লাহ তায়ালার কসম, আমরা (দুনিয়াতে) সুস্পষ্ট গোমরাহীতে নিমজ্জিত ছিলাম, ৯৮. (বিশেষ করে) যখন আমরা সৃষ্টিকুলের মালিক আল্লাহ তায়ালার সাথে তোমাদেরও (তাঁর) সমকক্ষ মনে করতাম।

وَمَآ أَضَلَّنَآ إِلَّا ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿٩٩﴾ فَمَا لَنَا مِن شَٰفِعِينَ ﴿١٠٠﴾ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ ﴿١٠١﴾

فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٠٢﴾ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَةً ۖ وَمَا كَانَ

أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٠٣﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿١٠٤﴾

৯৯. (আসলে) এ সব বড়ো বড়ো গুনাহগার ব্যক্তিরাই আমাদের পথভ্রষ্ট করে দিয়েছে। ১০০. (হায়! আজ) আমাদের (পক্ষে কথা বলার) জন্যে কেউই রইলো না, ১০১. না আছে (এমন) কোনো সুহৃদ বন্ধু (যে আল্লাহ তায়ালার কাছে সুপারিশ পেশ করতে পারে?) ১০২. কতো ভালো হতো যদি আমাদের আরেকবার দুনিয়ায় পাঠিয়ে দেয়া হতো, তাহলে অবশ্যই আমরা ঈমানদার হয়ে যেতাম! ১০৩. নিসন্দেহে এ (ঘটনার) মাঝেও (শিক্ষার) নিদর্শন রয়েছে; কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোক তো ঈমানই আনে না। ১০৪. নিশ্চয়ই তোমার মালিক পরাক্রমশালী ও পরম দয়ালু।

তাফসীর

আয়াত-৬৯-১০৪

ফেরাউন, তার দলবল ও হযরত মূসা (আ.)-এর কাহিনী ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। সেই কাহিনীতে ফেরাউনের চরম পরিণতির উল্লেখ রয়েছে। তাতে দুর্বল মোমেনদের জন্যে সুসংবাদ রয়েছে। মক্কায় রসূল (স.)-এর আমলে সংখ্যালঘু মুসলমানদের অবস্থা তাদের মতোই ছিলো। মক্কার যেসব অত্যাচারী ফ্যাসিবাদী মোশরেকরা ফেরাউনের মতো আচরণ করে, তাদের ধ্বংসের বার্তাও সে কাহিনীতে ঘোষিত হয়েছে।

এবার সে কাহিনীর পর আসছে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর কাহিনী। রসূল (স.)-কে আদেশ দেয়া হচ্ছে যেন এই কাহিনী মোশরেকদেরকে শোনান। কেননা তারা দাবী করে থাকে যে, তারা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর উত্তরাধিকারী ও তার আনীত আদি ও আসল ধর্মের অনুসারী। অথচ তারা আল্লাহর সাথে শরীক করে এবং যে পবিত্র ঘর হযরত ইবরাহীম (আ.) একমাত্র আল্লাহর এবাদাতের জন্যে নির্মাণ করেছেন, সেই ঘরের ভেতরে তারা পূজা করার উদ্দেশ্যে মূর্তি স্থাপন করে। আয়াতে বলা হয়েছে, 'তাদেরকে হযরত ইবরাহীমের কাহিনী জানিয়ে দাও', যাতে তাদের দাবীর অসারতা প্রমাণিত হয়।

এই সূরার কাহিনীগুলোতে ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা অনুসরণ করা হয়নি। কেননা এর একমাত্র উদ্দেশ্য হলো শিক্ষা। তবে সূরা আ'রাফ প্রভৃতিতে ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা বর্ণনা করাই উদ্দেশ্য, যাতে হযরত আদম (আ.)-এর সময় থেকে পৃথিবীর উত্তরাধিকার লাভ ও নবীদের আগমনের ধারাবাহিকতা তুলে ধরা যায়। এ জন্যে সেসব সূরায় হযরত আদম (আ.)-এর বেহেশত থেকে অবতরণ ও পৃথিবীতে মানব জীবনের সূচনা থেকে ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা অনুসারে কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে।

এখানে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর কাহিনীর যে অংশটা আলোচিত হয়েছে, তা হলো তার জাতির কাছে তার রসূল হিসাবে আর্বিভূত হওয়া, তাদের সাথে ইসলামী আকীদা বিশ্বাস নিয়ে তার

আলোচনা, তথাকথিত দেব-দেবীর উপাসনাকে তার প্রত্যাখ্যান, একমাত্র আল্লাহর এবাদাত করার ওপর তাঁর গুরুত্ব আরোপ ও আখেরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া সংক্রান্ত। এরপরই তুলে ধরা হয়েছে কেয়ামতের পূর্ণাংগ চিত্র। এই চিত্রে দেখানো হয়েছে যে, দেব-দেবীর পূজারীরা তাদেরকে সেদিন অস্বীকার করবে এবং যে শেরকের কারণে তাদের অমন শোচনীয় পরিণতি হয়েছে তার জন্যে তারা অনুশোচনা করবে। মোশরেকদের জন্যে এ কাহিনীতে যে শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে তা এখানে আলোচিত হয়েছে। এ জন্যে তাওহীদ বিশ্বাসের যথার্থতা, শেরকের অসারতা এবং কেয়ামতের দিন মোশরেকদের শোচনীয় পরিণতি বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। কেননা এগুলোই এর কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয়। এ ছাড়া অন্য যেসব বিষয় আনুষংগিকভাবে এসেছে, তা এখানে সংক্ষেপে ও অন্যান্য সূরায় বিস্তারিতভাবে এসেছে।

হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর কাহিনীর কিছু কিছু অংশ সূরা বাকারায়, আনয়ামে, হূদে, ইবরাহীমে, হেজরে, মারিয়ামে, আম্বিয়ায়, ও হজ্জে আলোচিত হয়েছে। প্রত্যেক সূরায় সে সূরার সাধারণ আলোচনার সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করেই আলোচ্যসূচী স্থির করা হয়েছে এবং সূরার বক্তব্য, প্রেক্ষাপট ও শিক্ষার সাথে সংগতিশীল বিষয়ই তুলে ধরা হয়েছে।

সূরা বাকারায় এসেছে তিনি ও তার পুত্র ইসমাঈল কর্তৃক কা'বা শরীফের নির্মাণের কথা, পবিত্র মক্কা নগরীকে নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ নগরীতে পরিণত করার জন্যে আল্লাহর কাছে তার দোয়ার বিবরণ এবং এই মর্মে তার ঘোষণা যে, কা'বা শরীফ ও তার নির্মাতার উত্তরাধিকার একমাত্র তার আনীত ধর্মের অনুসারী মুসলমানদের জন্যেই নির্দিষ্ট– যারা কেবল তার বংশধর হওয়ার সুবাদে তার উত্তরাধিকারী হওয়ার দাবী করে– তাদের জন্যে নয়। বনী ইসরাঈলের পথভ্রষ্টতা, তাদের অভিশপ্ত ও বিতাড়িত হওয়া এবং হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর আনীত ধর্ম ও তার নির্মিত ঘরকে মুসলমানদের উত্তরাধিকাররূপে চিহ্নিত করার পরিপ্রেক্ষিতেই তিনি সে ঘোষণা দিয়েছিলেন।

সূরা বাকারায় কাহিনীর এ অংশটাও আলোচিত হয়েছে যে, তার সমসাময়িক কাফের বাদশার সাথে আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে তার বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়েছিলো। মহান আল্লাহ তায়ালা যে জীবিতকে মৃত ও মৃতকে জীবিত করতে পারেন, সে সম্পর্কে সে বাদশাহ বিতর্ক তুললে তিনি তাকে চ্যালেঞ্জ দিয়েছিলেন যে, আল্লাহ তায়ালা পূর্বদিক থেকে সূর্য উদিত করেন, তুমি ওটা পশ্চিম দিক থেকে উদিত করে দেখাও। এই চ্যালেঞ্জে কাফের বাদশাহ পরাজিত ও হতবাক হয়ে গিয়েছিলো।

সূরা বাকারায় আরো আলোচিত হয়েছে যে, হযরত ইবরাহীম আল্লাহর কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন যে, তিনি কিভাবে মৃতকে জীবন দান করেন, এটা যেন তিনি তাকে দেখান। আল্লাহ তায়ালা এই আবেদনের জবাবে তাকে চারটি পাখী যবাই করা এবং সে চারটে পাখীর দেহের বিভিন্ন অংশকে বিভিন্ন পাহাড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখার আদেশ দেন। তারপর সেগুলোকে তার সামনেই জীবিত করেন এবং জীবিত হয়ে পাখীগুলো তার কাছে ছুটে আসে।

সে সূরায় এই উভয় কাহিনীই আল্লাহর নিদর্শনাবলী এবং তাঁর জীবিতকে মৃত করা ও মৃতকে জীবিত করার ক্ষমতা সংক্রান্ত আলোচনা প্রসংগেই বর্ণিত হয়েছে।

পক্ষান্তরে সূরা আনয়ামে এসেছে তার আল্লাহ তায়ালা সংক্রান্ত তত্ত্বানুসন্ধান এবং সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র ও প্রকৃতির নিদর্শনাবলী সম্পর্কে তার গভীর চিন্তা গবেষণার পর অবশেষে আল্লাহর সন্ধান লাভের কাহিনী। সমগ্র সূরাটা ইসলামের শাশ্বত আকীদা বিশ্বাস, বিশ্ব প্রকৃতিতে বিরাজমান

আল্লাহর নিদর্শনাবলী এবং এসবগুলো দ্বারা সারা বিশ্বের একমাত্র স্রষ্টার অস্তিত্ব প্রমাণিত হওয়া সংক্রান্ত আলোচনায় ভরপুর।

সূরা হুদে এসেছে হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে ইসহাক নামক পুত্রের সুসংবাদ দানের কাহিনী। আর এটা লূত (আ.)-এর কাহিনী প্রসংগে এবং হযরত লূত (আ.)-এর জনপদ ধ্বংস করার আদেশপ্রাপ্ত ফেরেশতাদের হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় সংঘটিত হয়েছিলো। এতে দেখানো হয়েছে আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রিয় বান্দাদেরকে কতো সাহায্য করেন এবং পাপিষ্ঠদেরকে কিভাবে ও কোন পর্যায়ে গিয়ে ধ্বংস করেন।

সূরা ইবরাহীমে দেখানো হয়েছে, হযরত ইবরাহীম আল্লাহর পবিত্র ঘরের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে সেই ঊষর মরুভূমিতে নিজের যে বংশধর ও পরিবারকে তিনি সে দেশের অধিবাসী করেছেন তাদের জন্যে দোয়া করছেন। বুড়ো বয়সে তাকে ইসহাক ও ইসমাঈল (আ.)-এর ন্যায় সন্তান দানের জন্যে আল্লাহর প্রশংসা করছেন, নিজেকে ও নিজের বংশধরকে নামায কায়েমকারী বানানোর জন্যে তার দোয়া কবুল করার জন্যে এবং কেয়ামতের দিন তাকে ও তার পিতামাতাকে ক্ষমা করার জন্যে কাকুতি মিনতি করে আবেদন জানাচ্ছেন। সমগ্র সূরায় সকল নবীর উম্মাতকে একই আদর্শ তাওহীদের পতাকাবাহী হিসেবে এবং নবীদেরকে যারা প্রত্যাখ্যান করেছে তাদের সকলকে একই কাতারে দেখানো হয়েছে। যেন নবুওত ও রেসালাত হচ্ছে কুফরের ঊষর মরুতে একমাত্র ছায়াদানকারী বৃক্ষ।

সূরা আল হেজরে সূরা হুদে বর্ণিত অংশটাই কিছুটা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। সেই সাথে আল্লাহর মোমেন বান্দাদের প্রতি তার রহমত ও অবাধ্য বান্দাদের প্রতি তার গযব ও শাস্তির বিবরণ দেয়া হয়েছে।

সূরা মারিয়ামে এসেছে বিনয়ের সাথে হযরত ইবরাহীম (আ.) কর্তৃক পিতাকে ইসলামের দাওয়াত দান, পিতা কর্তৃক কঠোরভাবে তা প্রত্যাখ্যান, অতপর তার পক্ষ থেকে পিতা ও সমগ্র জাতির সংশ্রব বর্জন এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে তাকে ইসমাঈল ও ইসহাকের ন্যায় সুপুত্র দানের বিবরণ। এই সূরায় দেখানো হয়েছে আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রিয় বান্দাদের প্রতি কতো স্নেহ মমতা ও দয়ার আচরণ করেন। সমগ্র সূরায় দয়া, মমত্ব ও প্রীতির ভাবধারা ফুটে উঠেছে।

সূরা আম্বিয়ায় পেশ করা হয়েছে তার পক্ষ থেকে তার পিতা ও জাতিকে তাওহীদের দাওয়াত দান, মূর্তিপূজার সমালোচনা, মূর্তিগুলো ভেঙ্গে ফেলা, তাকে আগুনে নিক্ষেপ করণ, আল্লাহর আদেশে আগুন ঠান্ডা হয়ে যাওয়া ও শান্তির উপকরণে পরিণত হওয়া, তার ও তার ভাইয়ের ছেলে লূতের আল্লাহর আযাব থেকে অব্যাহতি লাভ এবং উভয়ের কল্যাণময় ভূখন্ডে হিজরতের বিবরণ। সেই সাথে সঠিক আলোচনা এসেছে সকল নবীর উম্মাতদের তাওহীদের অনুসারী হওয়া এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদেরকে এক আল্লাহর এবাদাতের প্রেরণা দান প্রসংগে।

আর সূরা হজ্জে এসেছে তাওয়াফকারী ও এতেকাফকারীদের জন্যে আল্লাহর ঘরকে পবিত্র করার জন্যে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর প্রতি আল্লাহর আদেশের বিবরণ।

মোশরেকদের সাথে ইবরাহীম (আ.)-এর কথপোকথন

'তাদেরকে ইবরাহীমের কাহিনী শুনিয়ে দাও। ইবরাহীম যখন তার পিতা ও জাতিকে বললো, তোমরা কিসের এবাদাত করছ?'

আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূল মোহাম্মদ (স.) কে আদশে দিচ্ছেন যে, মক্কার মোশরেকদের সামনে সেই ইবরাহীম (আ.)-এর কাহিনী পাঠ করে শোনাও, যার উত্তরাধিকারী বলে ও তার

আনীত ধর্মের অনুসারী বলে তারা নিজেদেরকে দাবী করে থাকে। অথচ ইবরাহীম (আ.) তার জাতির মূর্তি পূজার ঘোর বিরোধী ও কঠোর সমালোচক ছিলেন। আর আজকের মক্কার মোশরেকরা যে ধরনের মূর্তি পূজা করে থাকে, ইবরাহীমের পিতা ও জাতিও ঠিক তদ্রূপ মূর্তি পূজা করতো। তিনি 'প্রচন্ড ক্ষোভ ও বিস্ময়ের সাথে তাদেরকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, তোমরা কিসের পূজা করো?'

'তারা বললো, আমরা কতকগুলো মূর্তির পূজা করি এবং তাদের পাশে অবস্থান করি।'

তারা তাদের মূর্তিগুলোকে ইলাহ বা মাবুদ নামে আখ্যায়িত করতো। কিন্তু তাদের মুখ দিয়ে ওগুলোকে মূর্তি বলা দ্বারা বুঝা যায়, তারা এ কথা অস্বীকার করার ক্ষমতা রাখতো না যে, ওগুলো তাদেরই হাতের তৈরী পাথরের মূর্তি। তথাপি তারা ওগুলোর সামনে ধর্ণা দিয়ে পড়ে থাকে এবং ওগুলোর পূজো করতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। এটা চরম নির্বুদ্ধিতা। কিন্তু বিশ্বাস যখন বিকৃত হয়ে গেলো, তখন সে বিশ্বাসের ধারকদের বুঝবার ক্ষমতাই রইল না যে, তাদের পূজো উপাসনা, ধ্যান-ধারণা ও কথাবার্তা কত নিচের স্তরে নেমে গেছে।

এদিকে ইবরাহীম (আ.) তাদের সুপ্ত বিবেক ও বিভ্রান্ত মনকে জাগ্রত করা ও কোনো চিন্তা ভাবনা ছাড়াই যে চরম নির্বুদ্ধিতার পরিচয় তারা দিচ্ছে, সে সম্পর্কে তাদের সচেতন করা শুরু করে দিলেন,

'সে বললো, ওই সব মূর্তিকে যখন তোমরা ডাক, তখন ওরা কি শুনতে পায়? কিংবা ওরা কি তোমার কোনো ক্ষতি বা উপকার করতে পারে?'

বস্তুত যে মাবুদের পূজা উপাসনা করা হয়, অন্তত পক্ষে তার বিনীত পূজারীর ন্যায় শ্রবণ শক্তি তো থাকা চাই! অথচ এই মূর্তিগুলো এমনই যে, তাদের উপাসকরা যখন তাদের উপাসনা করে এবং ক্ষতি থেকে নিস্তার লাভ ও উপকার প্রাপ্তির জন্যে সকাতর প্রার্থনা করে, তখন তা শুনবার ক্ষমতাও রাখে না। এখন তারা যদি বধির হয়ে থাকে এবং শুনতেই না পায়, তাহলে ওরা লাভ বা ক্ষতি সাধনের ক্ষমতা কোথেকে পাবে? এ দুটোর কোনোটাই মোশরেকরা দাবী করতে পারে না।

ইবরাহীম (আ.)-এর জাতি এ প্রশ্ন ক'টার কোনোটাই জবাব দেয়নি। কেননা ইবরাহীম (আ.) যে তাদের প্রতি বিদ্রূপ করছেন এবং তাদের কঠোর নিন্দা করছেন, সে সম্পর্কে তাদের কোনোই সন্দেহ ছিলো না। ইবরাহীম যা বলছেন, তা খন্ডন করার কোনো যুক্তি- প্রমাণও তাদের কাছে ছিলো না। তাই তারা যখন কথা বললো, তখন কোনো যুক্তি প্রমাণের পরিবর্তে নিজেদের হঠকারিতা ও গোয়ার্তুমির পরিচয়ই প্রকটভাবে তুলে ধরলো, যা বিনা চিন্তা-ভাবনায় ও না জেনে না বুঝে অন্যের পদানুসারীদের চিরাচরিত স্বভাব।

'তারা বললো, আমরা বরং আমাদের বাপ-দাদাদেরকে এ রকমই করতে দেখেছি।'

অর্থাৎ এই মূর্তিগুলো কোনো কথাও শুনতে পায় না, কারো কোনো লাভ ক্ষতিও করতে পারে না। তবে আমরা আমাদের বাপ-দাদাদেরকে এগুলোর সামনে ধর্ণা দিয়ে থাকতে দেখেছি। তাই আমরাও ওগুলোর সামনে ধর্ণা দেই এবং পূজো উপাসনা করি।

এ জবাব যদিও অপমানজনক ও লজ্জাকর। কিন্তু হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সময়কার মোশরেকরা এ কথা বলতে কোনো লজ্জা বা অপমান বোধ করেনি। যেমন মক্কায় মোশরেকরাও করেনি। বাপ-দাদাদের করা যে কোনো কাজ কোনো রকম চিন্তা-গবেষণা ছাড়াই অনুকরণীয় ছিলো। শুধু তাই নয়, বরং প্রকৃত ব্যাপার হলো, ইসলাম গ্রহণের একটা অন্যতম বাধাই ছিলো এই

যে, মোশরেকেরা তাদের বাপ-দাদার ধর্ম ত্যাগ করতে পারতো না, বাপদাদাকে অন্ধভাবে অনুকরণ না করে পারতো না এবং তাদেরকে বিপথগামী বলে স্বীকার করতে পারতো না। এভাবে এ ধরনের বিভিন্ন অন্ধ অনুকরণ সত্যের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। বিভিন্ন সময়ে মানুষের গুণগত ও মানসিক একগুয়েমি ও বিপথগামিতায় আক্রান্ত থাকাকালে এসব অন্ধ অনুকরণ সত্যের ওপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে। ফলে আক্রান্ত লোকদেরকে স্বাধীনতা ও মুক্ত চিন্তার দিকে ফিরিয়ে নেয়ার জন্যে প্রয়োজন হয় জোরদার ঝাঁকুনি দেয়ার।

হযরত ইবরাহীম (আ.) অত্যন্ত উদার ও সহিষ্ণু মানুষ হওয়া সত্তেও তাদের এধরনের গোয়ার্তুমি ও একগুয়েমি দেখে তাদেরকে সজোরে ঝাঁকুনি দেয়া এবং মূর্তিপূজা ও শেরকী আকীদা-বিশ্বাসের বিরুদ্ধে নিজের শত্রুতা ঘোষণা করা ছাড়া আর কোনো উপায়ন্তর খুঁজে পাননি। তিনি বললেন,

'তোমরা কি ভেবে দেখেছো তোমরা ও তোমাদের প্রাচীন বাপ-দাদারা এ কিসের এবাদাত করছো? ওরা সবাই আমার শত্রু। কিন্তু বিশ্বজগতের প্রতিপালক শত্রু নন।'

এভাবে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পিতা ও তার স্বজাতি মূর্তি পূজায় লিপ্ত থাকলেও তিনি নিজের আকীদা-বিশ্বাসকে অটুট ও অম্লান রেখে তাদের কাছ থেকে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করেছেন এবং তাদের ও তাদের প্রাচীন পূর্ব-পুরুষদের আকীদা-বিশ্বাসের প্রতি নিজের শত্রুতার মনোভাব ব্যক্ত করেছেন। এ ব্যাপারে তিনি কোনো বাধাই মানেননি এবং কোনো শক্তিকেই ভয় পাননি।

হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর এই উক্তি উদ্ধৃত করে কোরআন শিক্ষা দিচ্ছে যে, আকীদা বিশ্বাস, নীতি ও আদর্শের ব্যাপারে কারো সাথে আপোষ হতে পারে না– এমনকি প্রতিপক্ষ যদি নিজের পিতাও হয় কিংবা সমগ্র জাতিও হয়, তবে তাদের সাথেও নয়। মানুষের সাথে মানুষের যতো রকমের সম্পর্ক ও বন্ধন থাকতে পারে, তার মধ্যে প্রথম বন্ধন হলো আকীদা বিশ্বাস ও নীতি-আদর্শের বন্ধন। আর মানব সমাজে যতো রকমের মূল্যবোধই থাক না কেন, তন্মধ্যে ঈমানী মূল্যবোধই হলো সর্বপ্রথম ও সর্বোচ্চ মূল্যবোধ। এ ছাড়া আর যা কিছুই থাক এবং যেখানেই থাক, তা ঈমানেরই অধীন এবং তারই শাখা-প্রশাখা।

এখানে লক্ষণীয় যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) তার স্বজাতি ও তাদের পূর্ব পুরুষদের পূজ্য-উপাস্যদের সবার প্রতি শত্রুতা প্রকাশ করলেও 'বিশ্বপ্রভু' আল্লাহকে সেগুলো থেকে বাদ রেখেছেন। তিনি বলেছেন, 'একমাত্র বিশ্ব প্রভু ছাড়া ওরা সবাই আমার শত্রু।' কেননা তাদের প্রাচীন পূর্ব-পুরুষদের মধ্যে এমনও কেউ থাকতে পারে, যে আল্লাহর এবাদাত করতো। জাতির ঈমান আকীদা নষ্ট ও বিকৃত হবার আগে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর এবাদাতকারী মানুষ থাকা বিচিত্র নয়। আবার এমন কেউও থাকতে পারে যে আল্লাহর এবাদাত করেছে। কিন্তু সেই সাথে কিছু তথাকথিত দেব-দেবীকেও শরীক করেছে। সুতরাং এ উক্তিকে বলা যেতে পারে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সতর্কতাও প্রজ্ঞার সাক্ষর। ইসলামী আকীদা বিশ্বাস ও তার সূক্ষ্ম বিষয়গুলোকে তুলে ধরার সময় তিনি এই সতর্কতা ও প্রজ্ঞাকে কাজে লাগাতেন। এ প্রজ্ঞা ও সতর্কতা ছিলো হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বৈশিষ্ট্য।

আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে একজন মোমেনের অভিব্যক্তি

পরবর্তী ক'টা আয়াতে হযরত ইবরাহীম বিশ্ব প্রভুর গুণাবলী এবং সর্বাবস্থায় ও সকল সময় তাঁর সাথে তাঁর সম্পর্কের বর্ণনা দিয়েছেন। এ থেকে আমরা আল্লাহর সাথে আমাদের সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা এবং প্রতিটা কর্মকান্ডে ও প্রত্যেক প্রয়োজনে আল্লাহর সক্রিয় হাতের উপস্থিতি অনুভব করি,

'যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতপর তিনিই আমাকে সুপথ দেখান। আর যিনি আমাকে পানাহার করান। আর যখন আমি রোগাক্রান্ত হই, তখন আমাকে আরোগ্য দান করেন, যিনি আমাকে মৃত্যু দেবেন এবং পুনরায় জীবিত করবেন, আর যার সম্পর্কে আমি আশা করি যে, কেয়ামতের দিন আমার গুনাহ মাফ করবেন।'

এখানে হযরত ইবরাহীম (আ.) যেভাবে আল্লাহর কতিপয় গুণাবলীর বিবরণ দিয়েছেন, যেভাবে আল্লাহর সাথে তার সম্পর্কের চিত্র তুলে ধরেছেন, তা থেকে বুঝা যায় যে, তিনি তার সমগ্র সত্ত্বাকে নিয়েই তার প্রতিপালকের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে অবস্থান করছেন, পরিপূর্ণ আস্থার সাথে তাঁর প্রতি নির্ভরশীল রয়েছেন এবং তাঁর প্রেমে মাতোয়ারা রয়েছেন। এখানে তিনি তাঁর গুণাবলীর বর্ণনা এমনভাবে দিচ্ছেন যে, মনে হয়, তিনি তাকে সচোক্ষে দেখতে পাচ্ছেন এবং নিজের ওপর আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া নেমে আসাকে যেন তার সমগ্র হৃদয়, চেতনা ও অংগপ্রত্যংগ দিয়ে অনুভব করছেন। হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর কথাগুলোকে কোরআন যেরূপ সুমধুর সূরে উদ্ধৃত করেছে, তা এই দয়া ও অনুগ্রহপূর্ণ পরিবেশকে আরো সম্প্রসারিত করতে ও এই ভাবধারার বিস্তার ঘটাতে সাহায্য করেছে।

'যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতপর তিনিই আমাকে সুপথ দেখান।'

অর্থাৎ যিনি আমাকে সম্পূর্ণ নতুনভাবে তৈরী করেছেন এবং তৈরী করার পদ্ধতি ও কৌশল তিনিই জানেন আমি জানি না– আমার জন্মতত্ত্ব আমার গঠন প্রক্রিয়া, আমার কর্মকান্ড, আমার আবেগ অনুভূতি এবং আমার বর্তমান সম্পর্কে একমাত্র তিনিই অবগত।

'অতপর তিনিই আমাকে সুপথ দেখান।'

অর্থাৎ যে পথ দিয়ে আল্লাহর কাছে পৌঁছতে পারবো। যে পথ দিয়ে আমি চলছি, চলবো এবং চলা উচিত, তা তিনিই দেখান। এ কথার মাধ্যমে হযরত ইবরাহীম (আ.) এরূপ মনোভাব প্রকাশ করছেন যেন তিনি মহান স্রষ্টার হাতে নির্মিয়মান একটা কাদার পুতুল। একে তিনি যেভাবে খুশী আকৃতি দেবেন। এ মনোভাব দ্বিধাহীন চিত্তে ও শর্তহীনভাবে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণের শামিল।

'আর যিনি আমাকে খাওয়ান ও পান করান এবং যখন আমি রোগাক্রান্ত হই, আরোগ্য দান করেন'........

এ বক্তব্যের মাধ্যমে হযরত ইবরাহীম নিজের এই অনুভূতি প্রকাশ করছেন যেন রোগে ও সুস্থাবস্থায় তিনি আল্লাহর স্নেহ মমতাপূর্ণ অভিভাবকত্বে অবস্থান করেন। তিনি নবীসুলভ আদব ও ভক্তিশ্রদ্ধার এমন সর্বোচ্চ পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন যে, তিনি রোগাবস্থা ও সুস্থাবস্থা– উভয় অবস্থাই আল্লাহর ইচ্ছাক্রমে সংঘটিত হয় এ কথা জেনেও রোগাবস্থার জন্যে আল্লাহকে দায়ী করেননি, বরং আল্লাহকে কেবল রোগ নিরাময়কারী ও পানাহার করানেওয়ালা হিসাবে তুলে ধরেছেন। যেখানে আল্লাহ তায়ালা তাকে কোনো পরীক্ষা বা দুর্যোগের সম্মুখীন করেছেন, সেখানে সেই দুর্যোগের উল্লেখই তিনি করেননি।

'যিনি আমাকে মারেন ও পুনরায় জীবিত করেন।'

এ থেকে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ঈমানের প্রকৃত রূপ তুলে ধরা হয়েছে। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই মৃত্যুর ফায়সালা করে থাকেন। আর এরই মধ্য দিয়ে একথাও স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, মৃত্যু সংক্রান্ত ঈমান আসলে আখেরাতের পুনরুজ্জীবনে নিশ্চিত বিশ্বাস স্থাপনেরই শামিল।

'যাঁর সম্পর্কে আমি আশা করি যে, তিনি কেয়ামতের দিন আমার গুনাহ মাফ করে দেবেন।' এর অর্থ দাঁড়ালো, হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর মতো নবীও আল্লাহর কাছে এর চেয়ে বেশী কিছু

আশা করেন না যে, কেয়ামতের দিন তিনি তার গুনাহ মাফ করে দেবেন। অর্থাৎ তিনি নিজেকে নিষ্পাপ মনে করেন না, বরং নিজের ঘাড়ে প্রচুর গুনাহ রয়েছে ভেবে তিনি শংকিত ও চিন্তিত। তিনি নিজের সৎ কাজের ওপর নির্ভর করেন না এবং তার বিনিময়ে তিনি নিজেকে কোনো কিছু পাওয়ার যোগ্য বলেও বিবেচনা করেন না। তবে তিনি আল্লাহর অনুগ্রহ ও অনুকম্পা আশা করেন বলেই তার গুনাহ মাফ হবার ব্যাপারে আস্থাশীল।

এ কথার মাধ্যমে তিনি আসলে আল্লাহভীতি, আদব ও সাবধানতার মনোভাবই প্রকাশ করেন। এটাই সঠিক মনোভাব, আল্লাহর নেয়ামত সম্পর্কে এটাই সঠিক অনুভূতি ও মূল্যায়ন। কেননা আল্লাহর নেয়ামত অত্যন্ত বড় ও বিশাল, আর বান্দার সৎ কাজের পরিমাণ খুবই সামান্য ও নগণ্য।

এভাবে হযরত ইবরাহীম (আ.) বিশ্ব প্রভু আল্লাহ সংক্রান্ত বিশুদ্ধ আকীদাসমূহকে একত্রিত করেছেন। সেগুলো হচ্ছে, আল্লাহর একত্ব, পৃথিবীর জীবনের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়েও মানুষের ওপর আল্লাহর প্রত্যক্ষ কর্তৃত্ব, মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবন ও হিসাব নিকাশ আল্লাহর অনুগ্রহ ও বদান্যতা এবং বান্দার ত্রুটি-বিচ্যুতি। এ বিষয়গুলো হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর জাতিও অস্বীকার করতো, অন্যান্য পৌত্তলিকেরাও অস্বীকার করে।

এরপর ইবরাহীম (আ.) আল্লাহর কাছে আরো কয়েকটা সকাতর প্রার্থনা করেন, যেমন,

'হে আমার প্রতিপালক, আমাকে প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতা দান করুন এবং আমাকে সৎ লোকদের সাথে যুক্ত রাখুন, পরবর্তীদের মধ্যে আমার সত্য ভাষণ চালু রাখুন, আমাকে নেয়ামতে পরিপূর্ণ বেহেস্তের উত্তরাধিকারী করুন, আমার পথভ্রষ্ট পিতাকে ক্ষমা করুন, আমাকে কেয়ামতের দিন অপমানিত করবেন না, যেদিন সম্পদ ও সন্তান মানুষের কোনো উপকারে আসবে না। তবে আল্লাহর কাছে যে ব্যক্তি পবিত্র অন্তর নিয়ে উপস্থিত হবে, তার কথা আলাদা।'

এই সমগ্র দোয়ার মধ্যে পার্থিব স্বার্থ সংক্রান্ত বিষয়ে কিছুই চাওয়া হয়নি, এমনকি শারীরিক সুস্থতাও নয়, এ দোয়া দ্বারা শুধু উচ্চতর মার্গে উন্নীত হওয়ার অভিলাষ প্রকাশ করা হয়েছে। এ দোয়ার চালিকা শক্তি ছিলো পবিত্র আবেগ ও নির্মল প্রেরণা। এ দোয়া উঠে এসেছিলো এমন এক হৃদয় থেকে, যা আল্লাহকে চেনার পর অন্যসব কিছুকে তুচ্ছ করতে শেখায়। সে হৃদয়ের কাছে একবার যা মজা লাগে, তা আরো পেতে চায়। সে হৃদয় যা কিছু আশা করে নিজের ইচ্ছা ও অভিরুচির সীমার মধ্যেই আশা করে, আর যা কিছুকে ভয় পায়, নিজের ইচ্ছা ও অভিরুচি অনুসারেই ভয় পায়।

'আমাকে প্রজ্ঞা দান করো'

অর্থাৎ সেই সুক্ষ্ম ও নির্ভুল জ্ঞান দান করো, যা দ্বারা কোনটা ভাল ও কোনটা মন্দ, কোনোটা ন্যায় ও কোনোটা অন্যায়, আমি তা চিনতে পারি, অতপর যা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘস্থায়ী, তার সাথে যুক্ত থাকার পথ যেন গ্রহণ করতে ও তাতেই বহাল থাকতে পারি।

'আমাকে সৎ লোকদের সাথে যুক্ত রাখো।'

লক্ষ্য করার বিষয় যে, এই দোয়া করছেন সেই মহান নবী ইবরাহীম, যার পুণ্যময়তা, মহত্ব, মহানুভবতা, ও ধৈর্যশীলতা সর্বজন বিদিত। কী বিস্ময়কর বিনয়, কী অপূর্ব সতর্কতা, গুনাহে জড়িয়ে পড়ার কতো ভয়, মনের বিপথগামিতা সম্পর্কে কত শংকা এবং সৎ লোকদের সাথে নিছক সংশ্রব ও সংযোগ বজায় রাখার কী তীব্র বাসনা! আর এই সংযোগ বজায় রাখার একমাত্র যোগসূত্র হিসেবে সৎ কর্মের প্রেরণা লাভের জন্যে আল্লাহর কাছে কী সকাতর মিনতি!

'পরবর্তীদের মধ্যে আমার সত্যভাষণ চালু রাখো।'

বংশ বিস্তারের মাধ্যমে নয়, বরং আদর্শের বিস্তারের মাধ্যমে ইসলামী সমাজের সম্প্রসারণ ঘটুক এরূপ আকাংখা থেকেই তার এই দোয়ার উদ্ভব। তিনি চেয়েছেন, তার পরবর্তী বংশধরের কাছে যেন তার দেয়া সত্যের দাওয়াত পৌঁছে, সে দাওয়াত যেন তাদের কাছে হৃদয়গ্রাহী হয় এবং তাদেরকে ইবরাহীমের আনীত সত্য দ্বীন ইসলামে দীক্ষিত করে। সম্ভবত এটা তার সেই দোয়ারই ভিন্ন রূপ, যা তিনি নিজ পুত্র ইসমাঈলকে সাথে নিয়ে পবিত্র কা'বাঘর নির্মাণের সময় করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন,

'হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের উভয়কে তোমার কাছে আত্মসমর্পণকারী বানাও, আর আমাদের বংশধরদের মধ্যে থেকেও তোমার কাছে আত্মসমর্পণকারী একটা উম্মাত গঠন করো। আর আমাদেরকে আমাদের জীবন বিধান শিখিয়ে দাও এবং আমাদেরকে ক্ষমা করো। নিশ্চয় তুমি ক্ষমাশীল ও দয়াময়। হে আমাদের প্রতিপালক! আমার বংশধরদের মধ্যে তাদের মধ্য থেকে এমন একজন রসূল পাঠাও, যিনি তোমার আয়াতসমূহ তাদেরকে পড়ে শোনাবে, তাদেরকে কেতাব ও হেকমত শেখাবে এবং তাদেরকে বিশুদ্ধ করবে। নিশ্চয়ই তুমি মহা প্রতাপশালী ও পরম প্রজ্ঞাময়।'

আল্লাহ তায়ালা তার এ দোয়া কবুল ও কার্যকর করেছিলেন, ইসলামের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার দাওয়াত ও আন্দোলনের যে ধারার সূচনা তিনি করেছিলেন, তাকে পরবর্তীদের মধ্যে অব্যাহত রেখেছিলেন এবং তাদের মধ্যে আল্লাহর বাণী প্রচারকারী, আল্লাহর কেতাব ও হেকমত শিক্ষা দানকারী ও মানুষের চরিত্র সংশোধনকারী একজন রসূল পাঠিয়েছিলেন। এই দোয়া কবুল হয়েছিলো কয়েক হাজার বছর পরে। এটা সাধারণ মানুষের কাছে দীর্ঘ সময়, কিন্তু আল্লাহর কাছে এটা একটা নির্দিষ্ট সময় যার মধ্যে কবুলকৃত দোয়া বাস্তবায়িত হওয়া উচিত বলে তাঁর প্রজ্ঞার দাবী।

'আর আমাকে নেয়ামতে পরিপূর্ণ বেহেশতের অধিকারী করো।'

ইতিপূর্বে তিনি যে দোয়া করেছেন, তার সাথে এ দোয়া সংগতিপূর্ণ। তিনি দোয়া করেছেন আল্লাহ তায়ালা যেন তাকে সৎ কাজে নিয়োজিত থাকার প্রেরণা দেয়ার মাধ্যমে সৎ লোকদের সাথে যুক্ত রাখেন। কেননা সৎ কাজ ও সৎ চরিত্রই মানুষকে সৎ লোকদের অন্তর্ভুক্ত রাখে। আর সেই সৎ লোকদের জন্যেই নির্ধারিত রয়েছে নেয়ামতে পরিপূর্ণ জান্নাত।

'আমার পথভ্রষ্ট পিতাকে ক্ষমা করো।'

পিতার পক্ষ থেকে অত্যন্ত নির্দয় ও নিষ্ঠুর বাক্যবাণ ও প্রচন্ড ধমকে জর্জরিত হয়েও হযরত ইবরাহীম তার জন্যে এ দোয়া করলেন কেবল সেই ওয়াদা পূরণের জন্যে, যা তিনি ইতিপূর্বে তার পিতার সাথে করেছিলেন। অবশ্য কোরআনে সূরা তাওবায় জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, অতি ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হলেও মোশরেকদের জন্যে ক্ষমা চাওয়া জায়েয নয়। সেইসাথে এ কথাও পরিষ্কার করে দেয়া হয়েছে যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) কর্তৃক তার পিতার ক্ষমার জন্যে দোয়া করার একমাত্র কারণ ছিলো ইতিপূর্বে দেয়া তাঁর প্রতিশ্রুতি। পরে তার কাছে যখন একথা স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, সে আল্লাহর শত্রু, তখন তিনি তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলেন। তিনি তখন বুঝলেন যে, রক্তের আত্মীয়তা নয়, আদর্শের ও নীতির আত্মীয়তাই আসল আত্মীয়তা। এটাই ইসলামী শিক্ষার অন্যতম সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্য। ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষে মানুষে সম্পর্কের প্রথম যোগসূত্র হলো আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস। এই যোগসূত্র বাদ দিয়ে দু'জন মানুষের মধ্যে কোনো সম্পর্কই গড়ে উঠতে পারে না। এই যোগসূত্র ছিন্ন হলে অন্য সকল যোগসূত্রই ছিন্ন হয়ে যায়। সে ক্ষেত্রে কোনো সম্পর্কই আর অবশিষ্ট থাকে না।

'আর কেয়ামতের দিন আমাকে অপমানিত করো না। যেদিন কোনো ধন সম্পদ এবং কোনো সন্তান-সন্ততি কোনো উপকারে আসবে না। তবে যে ব্যক্তি বিশুদ্ধ মন নিয়ে উপস্থিত হবে সে মুক্তি পাবে।'

হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর এ উক্তি দ্বারা আমরা বুঝতে পারি একজন সম্মানিত নবী হয়েও তিনি কেয়ামতের ভয়াবহতাকে কতো গভীরভাবে উপলব্ধি করতেন, আল্লাহর সামনে তিনি কতো বিনয়ী ছিলেন, তার সামনে অপমানিত হবার ভয়ে তিনি কতো শংকিত ছিলেন এবং নিজের ভুলত্রুটি সম্পর্কে তিনি কতো উদ্বিগ্ন ছিলেন। তার এ কথা থেকে আরো বুঝা যায়, তিনি কেয়ামতের দিনের প্রকৃত স্বরূপ নির্ভুলভাবে হৃদয়ংগম করেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন যে, সেদিন আল্লাহর জন্যে মনের পরিপূর্ণ আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা ছাড়া এবং সব রকমের স্বার্থপরতা, পার্থিব মোহ, বিকৃতি ও আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কারো বা অন্য কিছুর প্রতি আসক্তি থেকে মুক্ত ও পবিত্র থাকা ছাড়া কারো কোনো সৎ কাজ গৃহীত হবে না। মনের এই পবিত্রতা ও এই সমস্ত কলুষতা থেকে মুক্ত হওয়াই সেদিন প্রত্যেক বান্দার উপকারে আসবে। এ ছাড়া পার্থিব স্বার্থের মোহান্ধ লোকেরা অন্য যেসব জিনিসকে পার্থিব দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যবান মনে করে, আখেরাতের বিচারে তার কোনোই মূল্য নেই।

এরপর কেয়ামতের একটা ভয়ংকর দৃশ্য এমনভাবে তুলে ধরা হচ্ছে যেন, তা এখনই উপস্থিত এবং যেন তা তিনি সাক্ষাত দেখতে পাচ্ছেন। এ দৃশ্যই কেয়ামতকে সেই বিশিষ্টতা দান করছে, যার জন্যে তিনি কেয়ামতকে নিয়ে এত শংকিত,

জাহান্নামে বসে পাপিষ্ঠদের আক্ষেপ

'আল্লাহভীরুদের জন্যে বেহেশতকে নিকটবর্তী করা হয়েছে আর বিপথগামীদের জন্যে উন্মুক্ত করা হয়েছে জাহান্নামকে। ......(আয়াত ৯০-১০২)

এ আয়াতগুলোতে যে দৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে তা এই যে, আল্লাহভীরুদের সামনে উপস্থিত করা হয়েছে এবং তাদের নিকটে আনা হয়েছে। এই আল্লাহভীরুরা পার্থিব জীবনে আল্লাহর আযাবের ভয়ে ভীতসন্ত্রস্ত থাকতো। অপরদিকে বিপথগামী পাপীদের সামনে জাহান্নামকে উন্মুক্ত করা হয়েছে। এরা আখেরাতকে অস্বীকার করতো এবং সত্য ও ন্যায়ের পথ এড়িয়ে চলতো। তারা আজ কেয়ামতের দিন জাহান্নামের কাছে এক ভয়াবহ পরিবেশে অবস্থান করছে। তাদেরকে অধোমুখে জাহান্নামে নিক্ষেপের আগে তারা নানারকমের তিরস্কার ও ধমক শুনতে পাচ্ছে। তারা আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কোন কোন উপাস্যের পূজা করতো, কোনো কোন ব্যক্তি বা মতাদর্শের আনুগত্য করতো তা তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে। আর এই জিজ্ঞাসার সাথে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সাথে তার জাতির লোকদের কথোপকথনের মিল রয়েছে। তিনিও জানতে চেয়েছিলেন যে, তোমরা কিসের পূজা করছো? আজ কেয়ামতের দিন তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে,

'তোমরা যার যার পূজো করতে, তারা এখন কোথায়? তারা কি তোমাদেরকে সাহায্য করতে বা সাহায্য গ্রহণ করতে পারছে?'

এ প্রশ্নের কোনো জবাব শোনা যাচ্ছে না। জবাবের আশাও করা যায় না। কেননা এ প্রশ্ন কেবল ধমক ও তিরস্কারের জন্যেই করা হচ্ছে।

'অতপর তাদেরকে ও পথভ্রষ্টদেরকে অধোমুখে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হয়েছে। সেই সাথে ইবলীসের সকল বাহিনীকেও।'

তাদেরকে অধোমুখে নিক্ষেপ করা হলো।........... তাদেরকে এলোপাতাড়িভাবে ও নিষ্ঠুরভাবে ধাক্কা দিয়ে দিয়ে নিক্ষেপ করার শব্দ যেন আমরা শুনতে পাচ্ছি। এই 'কুবকেবু' শব্দটার

ঝংকার থেকেই এর অর্থের ছবি ফুটে উঠছে। একটা গর্তের পতনোন্মুখ ঢালু কিনারা থেকে ধাক্কা দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে পর্যায়ক্রমে নিচে নিক্ষেপ করা থেকে যে শব্দের সৃষ্টি হয়, সেই শব্দ যেন আমাদের কানে আসছে। যারা এভাবে ধাক্কা খেয়ে জাহান্নামের অতল গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে, তারা সবাই বিপথগামী পাপিষ্ঠ। এই পাপিষ্ঠরা নিক্ষিপ্ত হবার সাথে সাথে ইবলীসের সাংগ-পাংগরাও সবাই নিক্ষিপ্ত হবে, কেউ বাদ যাবে না এবং কেউ রেহাই পাবে না।

এরপর জাহান্নামের ভেতর থেকেও তাদের কথাবার্তা শুনতে পাচ্ছি। তারা তাদের উপাসিত দেবদেবীকে বলছে,

'তোমাদেরকে বিশ্বজগতের প্রতিপালকের সমান গণ্য করার সময় আমরা প্রকাশ্য বিভ্রান্তিতে লিপ্ত ছিলাম।'

অর্থাৎ আল্লাহর সাথে সাথে তোমাদেরও অথবা আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমাদের আনুগত্য করা আমাদের চরম ভ্রান্তি ছিলো। আজ সময় হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার পর তারা এ কথা বলছে। আজ যখন অপরাধীরা নিজ নিজ অপরাধের ফল ভোগ করছে, তখন তাদের মধ্যে এই চেতনা সঞ্চারিত হয়েছে। কিন্তু আজ এই চেতনা ও উপলব্ধি নিস্ফল। 'আমাদের আর কোনো সুপারিশকারী নেই, নেই কোনো অন্তরংগ বন্ধু।'

না কোনো দেব-দেবী বা বা মানবরচিত মতবাদের ধারক বাহক নেতা নেতৃরা আজ সুপারিশ করবে, না কারো বন্ধুত্ব কোনো কাজে লাগবে। অতীতের কৃতকর্মে কোনো সুপারিশের অবকাশ যখন নেই, তখন দেখা যাক অতীতের সেই জীবনটায় আবার ফিরে যাওয়ার কোনো সুযোগ আছে কিনা। না, তাও নেই।

আহা আমাদের যদি আর একবার সুযোগ দেয়া হতো, তাহলে আমরা ঈমানদার হয়ে যেতাম।'

কিন্তু এটা কেবল আক্ষেপের আকারেই থেকে যাবে। পৃথিবীতে ফিরেও যাওয়া যাবে না, সুপারিশও পাওয়া যাবে না। কেননা আজ হলো কর্মফল পাওয়ার দিন।

এরপর আসছে প্রত্যাশিত মন্তব্য,

'নিশ্চয়ই এতে রয়েছে নিদর্শন। তাদের বেশীর ভাগ লোকই ঈমান আনেনি। আর তোমার প্রভু মহাপরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।'

এই একই মন্তব্য এসেছে আদ, সামুদ ও হযরত লূতের জাতির ধ্বংসের কাহিনীর উপসংহারে। আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে প্রত্যাখ্যানকারী প্রত্যেক জাতির ক্ষেত্রেই এরূপ মন্তব্য করা হয়েছে। নবীদের দাওয়াত ও আল্লাহর নিদর্শনকে মিথ্যা সাব্যস্তকারী অন্যান্য জাতির ওপর যে পার্থিব আযাব ও ধ্বংস নেমে এসেছে, হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর জাতি তেমন কোনো আযাব ও ধ্বংসের শিকার হয়েছে বলে এখানে কোনো বিবরণ দেয়া হয়নি। তবে তার পরিবর্তে এখানে কেয়ামতের আযাবের দৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে। এর মাধ্যমেই হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর জাতির ও শেরকের অবসান দেখানো হয়েছে। সমগ্র সূরার শিক্ষার বিষয় এটাই। আর কোরআনে কেয়ামতের ঘটনাবলীকে এমনভাবে দেখানো হয়- যেন তা এখনই ঘটছে, লোকেরা তা যেন সচক্ষেই দেখতে পাচ্ছে, তা দেখে তারা যেন আবেগে উদ্বেলিত হচ্ছে এবং তাদের স্নায়ুমন্ডল যেন রোমাঞ্চিত হচ্ছে, ঠিক যেমনটি ঘটে থাকে প্রকাশ্যে আসমানী আযাবে সংঘটিত ধ্বংসযজ্ঞসমূহের পরিণামে।

كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٠٥﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٠٦﴾
إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٠٧﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٠٨﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ
أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٠٩﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١١٠﴾
قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ ﴿١١١﴾ قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ ﴿١١٢﴾ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّي ۖ لَوْ تَشْعُرُونَ ﴿١١٣﴾ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ
الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٤﴾ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿١١٥﴾ قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا نُوحُ
لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ ﴿١١٦﴾ قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ ﴿١١٧﴾ فَافْتَحْ بَيْنِي
وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٨﴾

রুকু ৬

১০৫. নূহের জাতির লোকেরাও (আমার) রসূলদের মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিলো, ১০৬. যখন তাদেরই ভাই নূহ (এসে) তাদের বললো (হে আমার জাতি), তোমরা কি (আল্লাহ তায়ালাকে) ভয় করো না? ১০৭. নিসন্দেহে আমি তোমাদের জন্যে একজন বিশ্বস্ত রসূল, ১০৮. অতএব, তোমরা একমাত্র আল্লাহ তায়ালাকেই ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো। ১০৯. আমি এ (দাওয়াত পৌঁছানোর) জন্যে তোমাদের কাছে কোনো পারিশ্রমিক দাবী করি না, আমার যা পারিশ্রমিক তা তো রাব্বুল আলামীনের কাছেই (মজুদ) রয়েছে, ১১০. সুতরাং তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো; ১১১. তারা বললো, আমরা কিভাবে তোমার ওপর ঈমান আনবো-যখন আমরা দেখতে পাচ্ছি কতিপয় নীচু লোক তোমার আনুগত্য স্বীকার করে নিয়েছে; ১১২. সে বললো, ওরা (কে) কি কাজ করে তা আমার জানার (বিষয়) নয়। ১১৩. তাদের (কাজের) হিসাব গ্রহণ করা (আমার দায়িত্ব নয়, এটা) তো সম্পূর্ণ আমার মালিকের ব্যাপার, (কতো ভালো হতো এ কথাটা) যদি তোমরাও বুঝতে পারতে, ১১৪. এটা আমার কাজ নয় যে, যারা ঈমান আনবে (নিম্নমানের মানুষ হওয়ার কারণে) আমি তাদের আমার কাছ থেকে তাড়িয়ে দেবো, ১১৫. আমি তো একজন সতর্ককারী ছাড়া আর কিছুই নই; ১১৬. তারা বললো, হে নূহ, যদি তুমি (এ কাজ থেকে) ফিরে না আসো, তাহলে তোমাকে পাথর মেরে হত্যা করা হবে। ১১৭. সে বললো, হে আমার মালিক, (তুমি দেখতে পাচ্ছো কিভাবে) আমার জাতি আমাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করলো! ১১৮. তুমি আমার এবং তাদের মাঝে একটা ফয়সালা করে দাও, তুমি আমাকে এবং আমার সাথে যেসব ঈমানদার মানুষরা আছে তাদের (সবাইকে) এদের (ফেতনা) থেকে উদ্ধার করো।

فَأَنجَيْنَٰهُ وَمَن مَّعَهُۥ فِى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴿١١٩﴾ ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ ٱلْبَاقِينَ ﴿١٢٠﴾

إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٢١﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ

ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿١٢٢﴾

১১৯. (আমি তার এ দোয়া কবুল করলাম,) তাকে এবং তার সংগী সাথী যারা– ভরা নৌকায় (তার সাথে) আরোহী ছিলো, তাদের (মহাপ্লাবন থেকে) বাঁচিয়ে দিলাম, ১২০. অতপর অবশিষ্ট লোকদের আমি ডুবিয়ে দিলাম; ১২১. এ ঘটনার মাঝেও (শিক্ষণীয়) নিদর্শন আছে; কিন্তু এদের মধ্যে অধিকাংশ লোক তো ঈমানই আনে না। ১২২. অবশ্যই তোমার মালিক, মহাপরাক্রমশালী এবং পরম দয়ালু।

তাফসীর

আয়াত–১০৫–১২২

এ সূরায় যেমন হযরত মূসা (আ.)-এর কাহিনী থেকে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর কাহিনীতে ঐতিহাসিক বিবরণের উল্টো উত্তরণ ঘটেছে, তেমনি উল্টো উত্তরণ ঘটেছে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর কাহিনী থেকে হযরত নূহের কাহিনীতে। কারণ ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা এখানে লক্ষ্য নয়, বরং লক্ষ্য হলো শেরক ও ইসলামের দাওয়াত প্রত্যাখ্যানের পরিণাম বর্ণনা করা ও তার শিক্ষা তুলে ধরা।

হযরত মূসা ও হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর কাহিনীর মতো হযরত নূহ (আ.)-এর কাহিনীও কোরআনের একাধিক সূরায় বর্ণিত হয়েছে। ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা সহকারে এ কাহিনী রয়েছে সূরা আ'রাফে, যেখানে হযরত আদমের বেহেশত থেকে অবতরণ থেকে শুরু করে নবী ও রসূলদের বৃত্তান্ত সংক্ষেপে আলোচিত হয়েছে। সেখানে সংক্ষেপে হযরত নূহ (আ.) কর্তৃক স্বজাতিকে দেয়া তাওহীদের দাওয়াত, আখেরাতের ভয়াবহ আযাব থেকে তাদেরকে সতর্ককরণ, তার জাতি কর্তৃক তাকে পথভ্রষ্ট বলে আখ্যায়িত করণ, তাদের কাছে ফেরেশতার পরিবর্তে একজন মানুষকে রসূল হিসাবে প্রেরণে বিস্ময় প্রকাশ, তাকে মিথ্যুক সাব্যস্ত করণ, আর এ কারণে আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক তাদেরকে পানিতে ডুবিয়ে মেরে শাস্তি দান এবং হযরত নূহ ও তার সাথীদেরকে সে শাস্তি থেকে অব্যাহতি দানের কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে।

সূরা ইউনুসেও হযরত নূহের ঘটনা সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে। সেখানে শুধু তার জাতির পক্ষ থেকে তাকে চ্যালেঞ্জ প্রদান ও মিথ্যুক সাব্যস্তকরণ, অতপর তাঁকে ও তার সাথীদেরকে জাহাজের মাধ্যমে অব্যাহতি দিয়ে বাদ বাকী সকলকে ডুবিয়ে মারার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আর সূরা হুদে দেয়া হয়েছে বন্যার বিবরণ। বন্যায় ডুবে মরা অন্যান্যদের সাথে হযরত নূহ (আ.)-এর যে ছেলেটা মারা গিয়েছিলো তার সম্পর্কে বলার পর আল্লাহর কাছে হযরত নূহের দোয়া এবং বন্যার আগে তার সাথে তার জাতির তাওহীদ বিষয়ক বিতর্কের বিস্তারিত বিবরণ।

সূরা মোমেনূনেও হযরত নূহের কেসসা বর্ণিত হয়েছে। হযরত নূহ (আ.) কর্তৃক স্বজাতিকে এক আল্লাহর এবাদাতের আহ্বান, হযরত নূহ (আ.) অন্যান্যদের মতো মানুষ হওয়া সত্তেও

নিজেকে 'সবার চেয়ে ভালো মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চান বলে তার জাতির পক্ষ থেকে আপত্তি জ্ঞাপন ও বিরোধিতা, আল্লাহ তায়ালা ইচ্ছে করলে ফেরেশতা পাঠাতে পারতেন এবং তিনি একজন উন্মাদ এই বলে তার দাওয়াত প্রত্যাখ্যান, অবশেষে হযরত নূহ (আ.) কর্তৃক আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা এবং বন্যা ও জাহাজ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ইংগিত এই কেসসার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এ কেসসাটা সূরা মোমেনূনেও যেমন আদ, সামুদ, মাদায়েনবাসী ও হযরত লূতের জাতির কাহিনীর পাশাপাশি আনুষংগিকভাবেই এসেছে, এখানেও তেমনি এসেছে। এখানে এই কাহিনীর যে দিকটা বিশেষভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে তা হলো, হযরত নূহ (আ.) কর্তৃক তার জাতিকে আল্লাহকে ভয় করার দাওয়াত দেয়া, তার পক্ষ থেকে এই মর্মে ঘোষণা দেয়া যে, তিনি তাদেরকে হেদায়াত করার জন্যে তাদের কাছ থেকে কোনো প্রতিদান চান না এবং তিনি সেই দরিদ্র মোমেনদেরকে কখনো তাড়িয়ে দেবেন না যাদেরকে দেখে জাতির প্রতাপশালী ও ধনী লোকেরা নাক সিটকাতো। বলাবাহুল্য রসূল (স.) মক্কায় অবিকল এ ধরনের পরিস্থিতিরই সম্মুখীন ছিলেন। সবার শেষে এসেছে আল্লাহর কাছে এই মর্মে হযরত নূহের দোয়া যে, তিনি যেন তার সাথে তার জাতির একটা চূড়ান্ত মীমাংসা করে দেন, অতপর আল্লাহর পক্ষ থেকে কাফেরদেরকে পানিতে ডুবিয়ে মারা ও মোমেনদেরকে মুক্তিদানের মাধ্যমে দোয়া কবুল করার বিবরণ।

বিভিন্ন পর্যায়ে নূহ (আ.)-এর দাওয়াত

আল্লাহ তায়ালা বলছেন,

'নূহের জাতি রসূলদেরকে অবিশ্বাস করেছিলো।'

এ হচ্ছে ঘটনার শেষ পর্যায়। এটা দিয়েই কেসসা শুরু করা হয়েছে, যাতে বুঝানো যায় যে, রসূলকে অবিশ্বাস ও প্রত্যাখ্যান শুরু থেকে শেষ পর্যন্তই অব্যাহত ছিলো। এরপর বিশদ বিবরণ দেয়া শুরু হয়েছে।

হযরত নূহ (আ.)-এর জাতি হযরত নূহ (আ.) ছাড়া আর কাউকে অবিশ্বাস করেনি, তবুও বলা হয়েছে যে, তারা রসূলদেরকে অবিশ্বাস করেছিলো। কেননা নবুওত ও রেসালাত মূলত একটাই। রেসালাত হলো এক আল্লাহর এবাদাত ও দাসত্বের দাওয়াতের আরেক নাম। যে ব্যক্তি কোনো একজন রসূলের রেসালাতকেও অস্বীকার করে, সে আসলে সকল নবী রসূলকেই অস্বীকার করে। কারণ এক আল্লাহর এবাদাত ও দাসত্ব মেনে নেয়ার দাওয়াত সকল নবীই দিয়েছেন। কোরআন একাধিক জায়গায় এ দাওয়াতের উল্লেখ করেছে। কেননা এটা ইসলামী আকীদা-বিশ্বাসের অন্যতম মূলনীতি। ইসলামী দাওয়াত ও আন্দোলন মাত্রেই এ মূলনীতির অনুসরণ করে থাকে। আর এরই ভিত্তিতে সমগ্র মানব জাতি অমুসলমান ও মুসলমান– এই দুই শিবিরে বিভক্ত। এ বিভক্তি সকল নবী ও রসূলের যুগে ছিলো, আজও আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে। মুসলমানের দৃষ্টিতে আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত প্রত্যেক আকীদা ও প্রত্যেক দ্বীনের অনুসারীরাই তার উম্মাতভুক্ত। হযরত আদম (আ.)-এর মাধ্যমে মানব জাতির প্রথম আবির্ভাব থেকে সর্বশেষ তাওহীদী ধর্ম পর্যন্ত সকল নবী ও সকল আসমানী কেতাবের অনুসারীরাই মুসলিম। আর যে কোনো ও যে কোনো কেতাব ও নবীর প্রতি অবিশ্বাসীরাই কাফের ও অমুসলিম। যারা মোমেন ও মুসলমান, তারা সকল নবী ও রসূলকেই মানে ও ভক্তি করে। কেননা সকল নবীই তাওহীদবাদী। সকলেই এক আল্লাহর দাওয়াতের প্রবক্তা।

একজন মুসলমানের দৃষ্টিতে মানব জাতি বহু জাতি, গোষ্ঠী, বর্ণ, বংশ ও দেশে বিভক্ত নয়। মানব জাতি শুধু দুটো ভাগে বিভক্ত, হকপন্থী ও বাতিল পন্থী। মুসলমান সব সময় হকপন্থীদের

পক্ষে এবং বাতিলপন্থীদের বিপক্ষে তা সে যে কোনো দেশের ও যে কোনো যুগেরই হোক না কেন। এভাবে ইতিহাসের সকল যুগে মুসলমানের মাপকাঠি ও দৃষ্টিভংগি একই থাকে। তার দৃষ্টিতে বর্ণ, বংশ, ভাষা, ভৌগলিক সীমারেখা ও আত্মীয়তা ইত্যাদি যাবতীয় সংকীর্ণ গন্ডীর উর্ধে থাকে বিচার বিবেচনা ও মূল্যবোধ। সে শুধু ঈমান ও ইসলামের মাপকাঠিতে সবাইকে মাপে ও আপন পর বাছ বিচার করে।

'নূহের জাতি রসূলকে অবিশ্বাস করেছিলো ....' (আয়াত ১০৫-১১০)

এ আয়াত কটাতেই হযরত নূহ (আ.)-এর দাওয়াতের নির্যাস তুলে ধরা হয়েছে। এই দাওয়াত তাদের ভাই নূহই তাদেরকে দিয়েছিলো। অথচ তারা এই ভ্রাতৃত্বেরও কোনো তোয়াক্কা না করে তা প্রত্যাখ্যান করলো। অথচ ভ্রাতৃত্বের দাবী অনুসারে তাদের উচিত ছিলো এই দাওয়াতের প্রতি ঈমান আনা। কিন্তু তারা এই ভ্রাতৃত্বের কোনো কদর করলো না এবং তাদের ভাই-এর দাওয়াতের প্রতি তাদের মন নরম হলো না। নূহ বললো,

'তোমরা কি ভয় করো না?'

অর্থাৎ তোমরা যা করছো, তার পরিণামকে কি তোমরা ভয় করো না? তোমাদের মনে কি আল্লাহর কোনো ভয় নেই?

আল্লাহভীতির এই উদাত্ত আহ্বান সমগ্র সূরা জুড়েই অব্যাহত রয়েছে। এভাবেই আল্লাহ তায়ালা ফেরাউন সম্পর্কেও বলেছেন। হযরত মূসা (আ.)ও এভাবেই ফেরাউনকে সম্বোধন করেছিলেন। সকল রসূলই এভাবেই দাওয়াতের সূচনা করেছেন।

'আমি তোমাদের জন্যে একজন বিশ্বস্ত রসূল।'

আমি তোমাদের সাথে কোনো কারচুপি, ধোঁকা প্রতারণা, বিশ্বাসঘাতকতা করছি না, তোমাদের কাছে যে দাওয়াত পৌঁছানোর দায়িত্ব আমাকে দেয়া হয়েছে, আমি তার কিছুমাত্র কম বা বেশী পৌঁছাচ্ছি না।

'অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার অনুসরণ করো।'

এভাবেই বারবার তাদেরকে আল্লাহর ভয়ের তাগিদ দেয়া হয়েছে। আর এই আল্লাহভীতি দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে আনুগত্য ও আত্মসমর্পণের আহ্বান জানানো হয়েছে।

অতপর তাদেরকে দুনিয়া ও দুনিয়াবী স্বার্থের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত করা হয়েছে। একজন নবী হিসাবে তিনি যে তাদেরকে এক আল্লাহর এবাদাত আনুগত্যের দাওয়াত দিচ্ছেন, তার বিনিময়ে তিনি তাদের কাছে কোনো পারিশ্রমিক চান না, তিনি এর পারিশ্রমিক শুধুমাত্র আল্লাহর কাছেই চান, যিনি এই দাওয়াতের আদেশ দিয়েছেন ও এই কাজে তাকে নিযুক্ত করেছেন। পারিশ্রমিক না চাওয়ার ওপর এতো জোর দেয়ার দ্বারা বুঝা যায় যে, সঠিক দ্বীনী দাওয়াত ও তাবলীগের জন্যে এটা চিরদিনই অত্যন্ত জরুরী। ইসলামের দাওয়াতের সাথে অন্যান্য বাতিল ধর্মমতের প্রচারক ও পুরোহিতদের প্রচারকার্যের পার্থক্য এখানেই সুস্পষ্ট হয়ে যায়।

كَذَّبَتْ عَادُ ِۨ الْمُرْسَلِيْنَ ۝ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ ۝ إِنِّي

لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ۝ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۝ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ

أَجْرٍ ۚ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً

تَعْبَثُونَ ۝ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ ۝ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ

جَبَّارِينَ ۝ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۝ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ ۝

أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ ۝ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ۝ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ

يَوْمٍ عَظِيمٍ ۝ قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ ۝

রুকু ৭

১২৩. আ'দ সম্প্রদায়ের লোকেরাও (তাদের) রসূলদের মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলো। ১২৪. যখন তাদেরই এক (-জন শুভাকাংখী) ভাই (এসে) তাদের বললো (হে আমার জাতির লোকেরা), এ কি হলো তোমাদের, তোমরা কি (আল্লাহ তায়ালাকে) ভয় করবে না? ১২৫. আমি হচ্ছি তোমাদের জন্যে একজন বিশ্বস্ত রসূল, ১২৬. অতএব তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো, ১২৭. আমি তো এ (কাজের) জন্যে তোমাদের কাছে কোনো প্রতিদান চাই না, আমার প্রতিদান তো রব্বুল আলামীন আল্লাহ তায়ালার কাছেই (মজুদ) রয়েছে; ১২৮. তোমরা প্রতিটি উঁচুস্থানে স্মৃতি (-সৌধ হিসেবে বড়ো বড়ো ঘর) বানিয়ে নিচ্ছো, যা তোমরা (একান্ত) অপচয় (হিসেবেই) করছো, ১২৯. এমন (নিপুণ শিল্পকর্ম দিয়ে) প্রাসাদ বানাচ্ছো, (যা দেখে) মনে হয় তোমরা বুঝি এ পৃথিবীতে চিরদিন থাকবে, ১৩০. (অপরদিকে) তোমরা যখন কারও ওপর আঘাত হানো, সে আঘাত হানো অত্যন্ত নিষ্ঠুর স্বেচ্ছাচারী হিসেবে, ১৩১. অতএব তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো, ১৩২. তোমরা ভয় করো তাঁকে– যিনি তোমাদের এমন সবকিছু দিয়ে সাহায্য করেছেন যা তোমরা ভালো করেই জানো, ১৩৩. তিনি চতুষ্পদ জন্তু জানোয়ার, সন্তান সন্ততি দিয়ে তোমাদের সাহায্য করেছেন, ১৩৪. (সাহায্য করেছেন সুরম্য) উদ্যানমালা ও ঝর্ণাধারা দিয়ে, ১৩৫. সত্যিই আমি (এসব অকৃতজ্ঞ আচরণের কারণে) তোমাদের জন্যে একটি কঠিন দিনের শাস্তির ভয় করছি, ১৩৬. তারা বললো (হে নবী), তুমি আমাদের কোনো উপদেশ দাও কিংবা না দাও; উভয়টাই আমাদের জন্যে সমান,

إِنْ هَٰذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٣٧﴾ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿١٣٨﴾ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٣٩﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ

الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٤٠﴾

১৩৭. (তোমার) এ সব কথা আগের লোকদের নিয়ম নীতি ছাড়া আর কিছুই নয়, ১৩৮. (আসলে) আমরা কখনো আযাব প্রাপ্ত হবো না, ১৩৯. অতপর তারা তাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করলো, আমিও তাদের সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিলাম, (মূলত) এ (ঘটনা)-র মাঝেও রয়েছে (শিক্ষণীয়) নির্দশন, (তা সত্ত্বেও) তাদের অধিকাংশ মানুষ ঈমান আনে না। ১৪০. নিশ্চয় তোমার মালিক পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

তাফসীর

আয়াত-১২৩-১৪০

হযরত হুদের জাতি ইয়ামানের সীমান্তবর্তী বালুকাময় পাবর্ত্য অঞ্চল আহকাফে বাস করতো। হযরত নূহ (আ.)-এর প্লাবনের মাধ্যমে সমগ্র পৃথিবী থেকে পাপীদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার কিছুকাল পর যেসব লোক পুনরায় বিপথগামী হয়, হযরত হুদের জাতি আদ তাদেরই অন্তর্ভুক্ত।

আদ জাতির কেচ্ছা সূরা আরাফে ও হুদে কিছুটা বিশদভাবে এবং সূরা মোমেনূনে আদ ও হযরত হুদের নামোল্লেখ ছাড়াই বর্ণিত হয়েছে। আর এ সূরায় বর্ণিত হয়েছে সংক্ষেপে। এখানে শুধু হযরত হুদ (আ.)-এর দাওয়াত ও আদ জাতির মধ্য থেকে যারা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করে তাদের ধ্বংসের কাহিনী উল্লেখ করা হয়েছে। কাহিনীর সূচনাটা অবিকল হযরত নূহ (আ.)-এর কাহিনীর মতোই।

শিল্পোন্নত আদ জাতির ধ্বংসের ইতিবৃত্ত

'আদ জাতি রসূলদেরকে মিথ্যুক সাব্যস্ত করেছিলো। ...... (আয়াত ১২৩-১২৮) হযরত হুদ যে দাওয়াত তার জাতিকে দিয়েছিলেন। প্রত্যেক নবী ও রসূলের দাওয়াতই তদ্রূপ ছিলো। আল্লাহকে ভয় করা ও রসূলের আনুগত্য করার দাওয়াত, যাদেরকে দাওয়াত দেয়া হয় তাদের কাছে কোনো পার্থিব সম্পদ বা পারিশ্রমিক পাওয়ার আশা না করার ঘোষণা, দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জিনিসের মোহ পরিত্যাগ ও আল্লাহর কাছে থেকে চিরস্থায়ী পুরস্কার প্রাপ্তির আশাবাদ প্রত্যেক নবীর দাওয়াতী ভাষণের অংগীভূত থাকতো।

এরপর হযরত হুদ (আ.) তার জাতির বিশেষ অবস্থা ও চরিত্র সম্পর্কেও বক্তব্য রাখেন। নিছক শক্তির দম্ভ প্রকাশার্থে এবং ধন সম্পদের প্রাচুর্য ও স্থাপত্য শিল্পের বড়াই প্রদর্শনার্থে তারা বিলাসবহুল ও কারুকার্য খচিত দালান কোঠা নির্মাণ করতো, পৃথিবীর নানা রকম সম্পদ ও শক্তির অধিকারী হয়ে তারা অহংকারে ধরাকে সরা মনে করতো এবং আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর সার্বক্ষণিক তদারকী সম্পর্কে উদাসীন থাকতো। হযরত হুদ (আ.) আদ জাতির এসব চারিত্রিক দোষ ত্রুটির সমালোচনা ও নিন্দা করতেন। যেমন,

'তোমরা কি প্রত্যেক উচ্চ স্থানে নিষ্প্রয়োজন স্মৃতি সৌধ নির্মাণ করছো এবং বিরাট বিরাট প্রাসাদ নির্মাণ করছো, যেন চিরকাল বেঁচে থাকবে।' (আয়াত ১২৮-১২৯)

'রী' শব্দটার অর্থ হলো উচ্চ স্থান। ১২৮ নং আয়াতের বক্তব্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তারা তাদের এলাকায় যেখানেই কোনো উঁচু জায়গা পেতো, সেখানেই একটা সৌধ বা ভবন নির্মাণ করতো, যা পরবর্তীকালে দর্শকদের কাছে নিছক একটা স্মৃতি চিহ্ন বলেই মনে হতো। নিছক

নিজেদের শক্তি সামর্থ, আর্থিক প্রাচুর্য ও কারিগরি নৈপুণ্য প্রদর্শন করা ছাড়া এর আর কোনো উদ্দেশ্য থাকতো না। এ জন্যে একে 'আবাছ' বা 'নিষ্প্রয়োজন' বলা হয়েছে। এসব সৌধ যদি পথিকের পথ নির্দেশনা বা সেবার উদ্দেশ্যে নির্মাণ করা হতো, তাহলে 'নিষ্প্রয়োজন' কথাটা বলা হতো না। এথেকে বুঝানো হয়েছে যে, শারীরিক শ্রম, কারিগরি নৈপুণ্য ও অর্থ সম্পদ কেবলমাত্র প্রয়োজনীয় ও লাভজনক কাজেই ব্যয় করা উচিত নিছক বিলাসিতা, সাজ সজ্জা, সৌন্দর্য বৃদ্ধি এবং নিছক কারিগরি নৈপুন্য ও কুশলতা প্রদর্শনের জন্যে নয়।

অনুরূপ, ১২৯ নং আয়াত থেকে বুঝা যায়, আদ জাতি স্থাপত্য শিল্পে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছিলো। এমনকি তারা পাহাড় কেটে কেটে প্রাসাদ নির্মাণ, পাহাড়ের গায়ে রকমারি কারুকার্য এবং উচ্চতর স্থানগুলোত অত্যাধুনিক প্রাসাদ নির্মাণ করতো। এ সব ভবন ও প্রাসাদ দেখে সে জাতির মনে হতো যে, এগুলো তাদেরকে মৃত্যু, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্যে যথেষ্ট।

এরপর হযরত হুদ তাঁর জাতির চারিত্রিক ত্রুটিগুলোর সমালোচনা অব্যাহত রাখেন,

'আর যখন তোমরা আঘাত করো, তখন চরম স্বেচ্ছাচারীর মতো আঘাত করো।'

অর্থাৎ তারা এতো স্বেচ্ছাচারী ও অহংকারী ছিলো যে, কারো ওপর আক্রমণ চালালে নিষ্ঠুরতা ও হিংস্রতার সকল সীমা ছাড়িয়ে যেতো।

এই পর্যায়ে তাদেরকে পুনরায় আল্লাহর ভয় ও রসূলের আনুগত্যের তাগিদ দেয়া হয়, যাতে তারা নিষ্ঠুরতা ও হিংস্রতা থেকে বিরত থাকে,

'অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো।'

অতপর তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হচ্ছে যে, আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে কতো নেয়ামত দান করেছেন, যার ওপর ভর করে তারা এতো স্বেচ্ছাচার ও এতো ধৃষ্টতা প্রদর্শন করছে। অথচ সেই সব নেয়ামতের কথা স্মরণ করে তাদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত ছিলো, যিনি এসব সম্পদ ঐশ্বর্য দিতে পেরেছেন তিনি যে কোনো সময় তা ছিনিয়েও নিতে পারেন এবং নিছক বিলাসিতা ও দাম্ভিকতার বশে তারা যে অপচয় ও অপব্যয় করে, তার জন্যে তিনি ভয়াবহ শাস্তি দিতে পারেন একথা মনে করে সংযত ও বিনয়ী হওয়া উচিত ছিলো।

'তোমরা সেই আল্লহকে ভয় করো, যিনি তোমাদেরকে তোমাদের সুপরিচিত সামগ্রী দিয়ে সাহায্য করেছেন, সাহায্য করেছেন চতুষ্পদ জন্তু ও সন্তান-সন্ততি দিয়ে।' (আয়াত ১৩২-১৩৫)

এভাবে প্রথমে নেয়ামতদাতা ও নেয়ামতের কথা সংক্ষেপে স্মরণ করিয়েছেন। 'সুপরিচিত সামগ্রী' বলতে সেই সব সামগ্রীকে বুঝানো হচ্ছে, যা তাদের সামনে উপস্থিত, যেগুলোকে তারা জানে ও চেনে এবং যেগুলোর ভেতরে তারা জীবন যাপন করে। তারপর কিছুটা বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন যে,

'চতুষ্পদ জন্তু, সন্তান-সন্ততি, বাগান ও নদনদী দিয়ে সাহায্য করেছেন।'

তৎকালে এগুলোই ছিলো সুপরিচিত সম্পদ। এগুলো শুধু তৎকালেই নয়, সর্বকালেই সুপরিচিত সম্পদ। অতপর তাদেরকে কেয়ামতের আযাব সম্পর্কে সতর্ক করে দিচ্ছেন এবং সতর্ক করে দিচ্ছেন এভাবে যেন তিনি নিজেই তাদের আযাবের ভয় পাচ্ছেন। কেননা তিনি তো তাদের ভাই এবং তাদেরই একজন। তাই তারা কেয়ামতের আযাবে আক্রান্ত না হোক এটাই তার কাম্য।

কিন্তু এই স্মরণ করানো ও সতর্ক করানো, তাদের বদ্ধ হৃদয়ে কোনো শুভ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারেনি। তারা চরম হঠকারিতা, গোয়ার্তুমি ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ ভাষায় জবাব দেয়,

'তারা বললো, তুমি আমাদেরকে উপদেশ দাও বা না দাও উভয়ই সমান।'

অর্থাৎ তুমি আমাদেরকে উপদেশ দাও বা না দাও, তাতে আমাদের কিছুই আসে যায় না। এ কথার ভেতরে এক ধরনের অবজ্ঞা, ধৃষ্টতা ও ঔদ্ধত্য ফুটে উঠেছে। এর অনিবার্য ফল হলো বুদ্ধির স্থবিরতা, একগুয়েমি ও অন্ধ অনুকরণ।

'এ সব কেবল প্রাচীনকালের লোকদের ঐতিহ্য। আমাদেরকে কোনো শাস্তিই দেয়া হবে না।'

অর্থাৎ কিনা, তাদের চালচলন ও আদত-অভ্যাস, যার জন্যে হুদ (আ.) এতো সমালোচনা করে থাকেন, তা প্রাচীনকালের লোকদের ঐতিহ্য ও আদত অভ্যাস। তারা সেই প্রাচীন ঐতিহ্যেরই অনুসারী! আর প্রাচীনকালের লোকদের ঐতিহ্য অনুসরণের জন্যে কোনোরকম আযাবের সম্ভাবনাকে তারা অস্বীকার করছে।

এরপর তাদের ও তাদের রসূলের মাঝে যে বাক বিতন্ডা হয়েছে, এখানে তার আর কোনো বিবরণ দেয়া হয়নি। এখানে শুধু শেষ অবস্থার উল্লেখ করা হয়েছে,

'অতপর তারা তাকে মিথ্যুক সাব্যস্ত করলো। ফলে আমি তাদেরকে ধ্বংস করে দিলাম।'

মাত্র দুটো বাক্যে কাহিনীর সমাপ্তি টানা হলো, শিল্পোন্নতি, অহংকারী, প্রতাপান্বিত আদ জাতি ধ্বংস হয়ে গেলো। তাদের বিশাল বিশাল স্থাপত্য কর্ম ধুলিস্মাত হয়ে গেলো। তাদের যাবতীয় ধন সম্পদ, সন্তান-সন্ততি, চতুষ্পদ জন্তু, বাগান ও নদনদী সবই ধরাপৃষ্ঠ থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলো।

আদ জাতি ছাড়াও বহু জাতি এভাবে চিন্তা করে থাকে, এভাবে ঔদ্ধত্য ও অহংকার প্রদর্শন করে থাকে, আল্লাহ তায়ালা থেকে দূরে সরে যায় এবং মনে করে যে, মানুষের জীবনে আল্লাহর কোনো প্রয়োজন নেই। কোনো জাতি সভ্যতায় উন্নতি সাধন করলেই তাদের মধ্যে এ ধরনের চিন্তা দানা বাঁধে। তারা নিজেদেরকে শত্রু থেকে রক্ষা করা ও অন্যদেরকে ধ্বংস করার উপকরণাদি তৈরী করে। তারপর নিশ্চিন্ত মনে জীবন যাপন করতে থাকে। সহসা একদিন ওপর থেকে ও নীচ থেকে যে কোনোভাবে আযাবের শিকার হয়।

'এ কাহিনীতে নিদর্শন রয়েছে। কিন্তু তাদের অধিকাংশই ঈমান আনেনি। আর তোমার প্রতিপালক মহাপরাক্রমশালী, করুণাময়।'

كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٤١﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوْهُمْ صٰلِحٌ أَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿١٤٢﴾ إِنِّيْ

لَكُمْ رَسُوْلٌ أَمِيْنٌ ﴿١٤٣﴾ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَأَطِيْعُوْنِ ﴿١٤٤﴾ وَمَآ أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ج

إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٤٥﴾ أَتُتْرَكُوْنَ فِيْ مَا هٰهُنَآ اٰمِنِيْنَ ﴿١٤٦﴾

فِيْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ﴿١٤٧﴾ وَّزُرُوْعٍ وَّنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيْمٌ ﴿١٤٨﴾ وَتَنْحِتُوْنَ مِنَ

الْجِبَالِ بُيُوْتًا فٰرِهِيْنَ ﴿١٤٩﴾ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَأَطِيْعُوْنِ ﴿١٥٠﴾ وَلَا تُطِيْعُوْٓا أَمْرَ

الْمُسْرِفِيْنَ ﴿١٥١﴾ الَّذِيْنَ يُفْسِدُوْنَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُوْنَ ﴿١٥٢﴾ قَالُوْٓا إِنَّمَآ

أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِيْنَ ﴿١٥٣﴾ مَآ أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا ج فَأْتِ بِاٰيَةٍ إِنْ كُنْتَ

مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿١٥٤﴾

১৪১. (এভাবে) সামুদ জাতিও (তাদের) রসূলদের মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলো,

রুকু ৮

১৪২. যখন তাদেরই (এক) ভাই সালেহ তাদের বলেছিলো (তোমাদের এ কি হলো), তোমরা কি (আল্লাহ তায়ালাকে) ভয় করবে না? ১৪৩. নিসন্দেহে আমি তোমাদের জন্যে একজন বিশ্বস্ত রসূল, ১৪৪. অতএব তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো। ১৪৫. আমি তো তোমাদের কাছে (এ কাজের জন্যে) কোনো রকম পারিশ্রমিক দাবী করছি না, আমার (যা কিছু) পারিশ্রমিক তা তো সৃষ্টিকুলের মালিক আল্লাহর কাছেই (মজুদ) রয়েছে; ১৪৬. তোমরা কি (ধরেই নিয়েছো,) এ (দুনিয়া)-র মাঝে যা কিছু রয়েছে, তার মধ্যে নিরাপদে (বাস করার জন্যে) তোমাদের এমনিই ছেড়ে দেয়া হবে, ১৪৭. নিরাপদ থাকবে (তোমরা) এ উদ্যানামালা ও এ ঝর্ণাধারার মধ্যে? ১৪৮. শস্যক্ষেত্র, (এ) নাযুক ও ঘন গোছাবিশিষ্ট খেজুর বাগিচার মধ্যেও (কি তোমরা নিরাপদ থাকতে পারবে), ১৪৯. তোমরা যে নিপুণ শিল্প দ্বারা পাহাড় কেটে রংচং করে বাড়ী বানাও (তাতে কি তোমরা চিরদিন থাকতে পারবে?) ১৫০. (ওর কোনোটাতেই যখন তোমরা নিরাপদ নও তখন) তোমরা আল্লাহ তায়ালাকেই ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো, ১৫১. (সে সব) সীমালংঘনকারী মানুষদের কথা শুনো না, ১৫২. যারা (আল্লাহর) যমীনে শুধু বিপর্যয়ই সৃষ্টি করে এবং কখনো (সমাজের) সংশোধন করে না। ১৫৩. (এসব শুনে) তারা বললো (হে সালেহ), আসলেই তুমি হচ্ছো একজন যাদুগ্রস্ত ব্যক্তি, ১৫৪. তুমি তো আমাদেরই মতো একজন মানুষ, যদি তুমি (তোমার দাবীতে) সত্যবাদী হও তাহলে (ভিন্ন কোনো) প্রমাণ নিয়ে এসো!

قَالَ هٰذِهٖ نَاقَةٌ لَّهَا شِرْبٌ وَّلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ ﴿١٥٥﴾ وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْٓءٍ

فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿١٥٦﴾ فَعَقَرُوْهَا فَاَصْبَحُوْا نٰدِمِيْنَ ﴿١٥٧﴾ فَاَخَذَهُمُ

الْعَذَابُ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ؕ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٥٨﴾ وَاِنَّ رَبَّكَ

لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿١٥٩﴾

১৫৫. সে বললো- এ উষ্ট্রী (হচ্ছে আমার নবুওতের প্রমাণ), এর জন্যে (কুয়ার) পানি পান করার (একটি নির্দিষ্ট) পালা থাকবে, আর একটি নির্দিষ্ট দিনের পালা থাকবে তোমাদের (পশুদের পানি) পান করার জন্যে, ১৫৬. কখনো একে কোনো রকম দুঃখ ক্লেশ দেয়ার উদ্দেশে স্পর্শও করো না, নতুবা বড়ো (কঠিন) দিনের আযাব তোমাদের পাকড়াও করবে। ১৫৭. অতপর (পায়ের নলি কেটে) তারা সেটিকে হত্যা করলো, তখন (কঠিন শাস্তি দেখে) তারা ভীষণভাবে অনুতপ্ত হলো, ১৫৮. অতপর (আল্লাহ তায়ালার) শাস্তি এসে তাদের গ্রাস করলো, এ (ঘটনা)-র মাঝেও রয়েছে (আল্লাহ তায়ালার বিশেষ) নিদর্শন; কিন্তু তাদের অধিকাংশ মানুষ তো ঈমানই আনে না। ১৫৯. নিসন্দেহে তোমার মালিক মহাপরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

তাফসীর

আয়াত-১৪১-১৫৯

এখানেও হযরত সালেহের যে দাওয়াত উদ্ধৃত করা হয়েছে, তা সর্বকালের সকল নবী ও রসূলের দাওয়াত। প্রত্যেক রসূল তার জাতিকে যে দাওয়াত দিয়েছেন, কোরআন তা হুবহু উদ্ধৃত করেছে। এর উদ্দেশ্য নবুওত ও রেসালাত যে মূলত সর্বকালে একই ছিলো তা প্রমাণ করা। রেসালাতের মূল কথা সব সময় এই ছিলো যে, আল্লাহর ওপর ঈমান আনো, তাঁকে ভয় করো এবং আল্লাহর কাছ থেকে আগত নবী বা রসূলের আনুগত্য করো।

এখানে অভিন্ন মূল দাওয়াত তুলে ধরার পর সামুদ জাতির স্বতন্ত্র অবস্থা ও প্রেক্ষাপট এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয় আলোচিত হয়েছে। সামুদ জাতির ভাই হযরত সালেহ তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে কতো সম্পদে সমৃদ্ধ করেছেন। সেই সাথে তাদেরকে সতর্ক করিয়ে দিয়েছেন যে, তারা যদি এই সম্পদের সঠিক ব্যবহার না. করে, তবে আল্লাহ তায়ালা তাদের কাছ থেকে তা ছিনিয়েও নিতে পারেন। পরবর্তীতে এই মর্মেও হুশিয়ার করেছেন যে, তাদের প্রতিটা নেয়ামতের হিসাব নেয়া হবে।

'তোমাদেরকে কি দুনিয়ার এসব নেয়ামত সম্ভারের মধ্যে নিরাপদে ছেড়ে রাখা হবে? ..... (আয়াত ১৪৬-১৪৯)

এ আয়াত ক'টায় হযরত সালেহ যেসব নেয়ামত সামগ্রীর উল্লেখ করেছেন, সামুদ জাতি সে সব নেয়ামত সামগ্রী ভোগ করে মহা আনন্দে উদাসীনভাবে জীবন কাটিয়ে দিচ্ছিলো। কখনো ভেবে দেখতো না কে তাদেরকে এ সব নেয়ামতকে দিলো ও কী উদ্দেশ্যে দিলো। আর এ সব

নেয়ামতের দাতার প্রতি কখনো কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করতো না। এ জন্যেই তাদের নবী তাদের এসব সামগ্রীর নাম ধরে ধরে উল্লেখ করছেন, যাতে তারা এগুলো নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে, এগুলোর মূল্য উপলব্ধি করে এবং এগুলো হারানোর ভয়ে ভীত থাকে।

হযরত সালেহের কথাগুলোতে সামুদ জাতির সুপ্ত বিবেক জাগিয়ে তোলার এবং তাদের মধ্যে যুগপৎভাবে ভীতি ও আশার সঞ্চার করার উপাদান রয়েছে।

'তোমাদেরকে কি দুনিয়ার এসব নেয়ামত সম্ভারের মধ্যে নিরাপদে ছেড়ে রাখা হবে?'

অর্থাৎ তোমরা কি মনে করো যে, তোমরা যেভাবে ভোগবিলাসে গা ভাসিয়ে দিয়ে রয়েছো, সেভাবে থাকবার জন্যে এবং উত্তরোত্তর বেড়ে ওঠার জন্যে তোমাদেরকে লাগামহীন করে ছেড়ে দেয়া হয়েছে? তোমরা কি এরূপ নিশ্চিন্ত মনে থাকতে পারবে যে, তোমাদের জীবন ও ধন সম্পদের কোনো কিছুই হাতছাড়া হবে না, কমবে না বা পরিবর্তিত হবে না?

রকমারি বাগান ও ফসলের ক্ষেত, খেজুরের বাগান এবং সুদৃশ্য ও সহজপ্রাপ্য ফলমূলের বাগান ইত্যাদি নিয়েই তোমরা নিরাপদে ও নিশ্চিন্তে থাকবে? পাহাড়ের ভেতর খোদাই করে চমকপ্রদ বাড়ীঘর তৈরী করে নিজেদের দক্ষতা ও নৈপুণ্যের প্রদর্শনী করে আনন্দে ও গর্বে মেতে থাকবে? আর এভাবে মেতে থাকার জন্যেই কি তোমাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে?

হযরত সালেহ এসব কথা দ্বারা তাদের সুপ্ত বিবেককে একটা ঝাঁকি দিয়ে পরবর্তী আয়াত ক'টাতে তাদেরকে আল্লাহর ভয় ও রসূলের আনুগত্যের আহ্বান জানান এবং যারা সত্য ও ন্যায়ের পথ থেকে বিচ্যুত ও অন্যায় ও বিশৃংখলার দিকে ধাবিত, তাদের বিরোধিতা করার উপদেশ দেন।

'অতএব আল্লাহকে ভয় করো, আমার আনুগত্য করো এবং যারা পৃথিবীতে সংস্কার ও গঠনমূলক কাজের পরিবর্তে বিশৃংখলা ও নাশকতার কাজ করে, সেসব নৈরাজ্যবাদীর অনুগত্য করো না।'

'কিন্তু এসব আহ্বান সেসব বিবেকহীন মানুষের মন গলাতে পারলো না। 'তারা বললো, তুমি তো যাদুকৃত ব্যক্তি। তুমি আমাদের মতো একজন মানুষ ছাড়া আর কিছু নও।

অর্থাৎ তোমার বিবেক বুদ্ধি যাদুর প্রভাবে নষ্ট হয়ে গেছে। তাই যা জানো না তার কথা এতো উচ্ছ্বসিতভাবে বলছো। ভাবখানা এই যে, আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়াটা যেন কেবল পাগলদের কাজ!

'তুমি তো আমাদেরই মতো একজন মানুষ ছাড়া কিছু নও।'

এটাই সেই বক্তব্য, যা পৃথিবীতে একজন রসূল এলেই মানুষকে সন্দেহ সংশয় ও দ্বিধাদ্বন্দ্বে ফেলে দেয়। মানুষ সবসময় নবী ও রসূল সম্পর্কে আজগুবি ধ্যান ধারণা পোষণ করে থাকে। মানুষ রসূল হয়ে দুনিয়ায় আসে এর পেছনে আল্লাহর কী যুক্তি ও কৌশল রয়েছে, তা মানুষ বোঝে না। মানুষকে কেন নবী ও রসূল হিসেবে নিয়োগ করার জন্যে নির্বাচন করা হয়, কেন মানুষকে মানব জাতির সেই সব নেতা বানানো হয় যারা হেদায়াত ও আলোর উৎসের সাথে সংযুক্ত, তাও মানুষ উপলব্ধি করে না।

মানুষ চিরকালই ভেবেছে নবী ও রসূল বুঝি মানবজাতি বহির্ভূত কোনো সৃষ্টি হয়ে থাকে, অথবা হওয়া উচিত অন্তত যখন তিনি আকাশের ও অদৃশ্য জগতের খবর মানুষের কাছে পৌঁছান। কেননা মানুষ কখনো বুঝতে চেষ্টা করেনি যে, নবুওত ও রেসালাত দিয়ে মানুষকে সম্মানিত করার রহস্য কী। সেই রহস্যটা হলো এই যে, এই পৃথিবীতে বসবাস করে, এই পৃথিবীর খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করে, বিয়ে শাদী করে, বাজারে চলাফেরা ও কেনাকাটা করে এবং অন্য সকল মানুষ যে সব

আবেগ জড়িত কর্মকান্ডে জড়িত হয়, তার সব কিছুতে জড়িত থেকেও আল্লাহর সাথে ও ঊর্ধজগতের সাথে সম্পর্ক ও সংযোগ রক্ষা করার ক্ষমতা ও যোগ্যতা একমাত্র মানুষকেই দেয়া হয়েছে।

সকল যুগেই মানুষ নবী ও রসূলের কাছে দাবী জানাতো যে, তিনি যে সত্যিই আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত নবী ও রসূল, তা প্রমাণ করার মতো একটা অলৌকিক নিদর্শন বা মোজেযা দেখান।

'তুমি সত্যবাদী হয়ে থাকলে একটা নিদর্শন নিয়ে এসো।'

সামুদ জাতিও অনুরূপ দাবী জানিয়েছিলো এবং এই দাবী অনুসারে আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দা হযরত সালেহের জন্যে একটা উষ্ট্রীর আকারে অলৌকিক নিদর্শন মঞ্জুর করেন। এই উষ্ট্রীর বৈশিষ্ট্য কী কী ছিলো, তা নিয়ে প্রাচীন মোফাসসেররা অনেক মাথা ঘামালেও আমি ঘামাবো না। কেননা এসব বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আমাদের কাছে কোনো নির্ভুল প্রমাণ নেই। আমরা শুধু এতোটুকু বলাই যথেষ্ট মনে করি যে, সামুদ জাতির দাবী মোতাবেক ওটা একটা অস্বাভাবিক ও অলৌকিক উষ্ট্রীই ছিলো।

'সালেহ বললো, এই যে একটা উষ্ট্রী, এর জন্যে রইলো একদিন পানি ব্যবহারের পালা, আর তোমাদের জন্যেও রইলো একটা নির্দিষ্ট দিন পানি ব্যবহারের পালা। .... (আয়াত ১৫৫-১৫৬)

তাদের কাছে উষ্ট্রীটা এসেছিলোই এই শর্তে যে, তারা যে জলাশয় থেকে পানি ব্যবহার করে, সেটা একদিন সে উষ্ট্রীর এবং একদিন সমগ্র জাতির জন্যে পালাক্রমে নির্দিষ্ট থাকবে। তার পালার দিনে কেউ তাকে উত্যক্ত করবে না, অন্যদের পালার দিনে উষ্ট্রী সেখানে যাবে না এবং উভয় পক্ষের কারো সাথে কারো পানি ব্যবহারের পালা একই দিনে হবে না। তিনি এই মর্মেও স্বজাতিকে সাবধান করে দিলেন যে, কেউ যেন উষ্ট্রীর কোনো রকম ক্ষতি সাধন না করে। অন্যথায় তাদের ওপর ভয়ংকর আযাব নেমে আসবে।

এই অলৌকিক নিদর্শন কি সে হঠকারি জাতির কোনো উপকার করতে পেরেছিলো? না, এ নিদর্শন তাদের অন্ধকার হৃদয়ে ঈমানের আলো জ্বালাতে পারেনি। এই নিদর্শনকে কেন্দ্র করে তাদেরকে কঠোর চ্যালেঞ্জ ও চাপ প্রদান সত্তেও তারা তাদের প্রতিশ্রুতি ও শর্ত পর্যন্ত পালন করেনি,

'তারা উষ্ট্রীটাকে হত্যা করে ফেললো। এর ফলে তাদেরকে অনুতপ্ত হতে হলো।'

জাতির উচ্ছৃংখল, নৈরাজ্যবাদী ও নাশকতাবাদী লোকেরাই তাকে হত্যা করে। হযরত সালেহ তাদেরকে এ ব্যাপারে সতর্কও করেছিলেন। কিন্তু তারা সতর্ক হয়নি। তাই এ পাপের দায়-দায়িত্ব সবার ওপরই বর্তেছিলো এবং সবাইকেই শাস্তি দেয়া হয়েছিলো।

জাতি এই অপকর্মের জন্যে অনুতপ্ত হয়েছিলো। কিন্তু সময় হাতছাড়া হওয়ার পর এবং হুমকি বাস্তবায়িত হওয়ার পর হয়েছিলো।

'তাই আযাব তাদেরকে পাকড়াও করলো।'

আযাবটা কি ধরনের ছিলো, তা এখানে ব্যাখ্যা করা হয়নি সংক্ষেপ করণের উদ্দেশ্যে। এরপর পুনরায় সেই একই মন্তব্য,

'নিশ্চয়ই এ ঘটনায় নিদর্শন রয়েছে। তাদের অধিকাংশই ঈমান আনেনি। তোমার প্রভুই মহা প্রতাপশালী ও দয়ালু।'

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٦٠﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٦١﴾
إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِيْنٌ ﴿١٦٢﴾ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَأَطِيْعُوْنِ ﴿١٦٣﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ
أَجْرٍ ۚ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٦٤﴾ أَتَأْتُوْنَ الذُّكْرَانَ مِنَ
الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٦٥﴾ وَتَذَرُوْنَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ
عٰدُوْنَ ﴿١٦٦﴾ قَالُوْا لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ يٰلُوْطُ لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِيْنَ ﴿١٦٧﴾ قَالَ إِنِّيْ
لِعَمَلِكُمْ مِّنَ الْقَالِيْنَ ﴿١٦٨﴾ رَبِّ نَجِّنِيْ وَأَهْلِيْ مِمَّا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٦٩﴾ فَنَجَّيْنٰهُ
وَأَهْلَهٗٓ أَجْمَعِيْنَ ﴿١٧٠﴾ إِلَّا عَجُوْزًا فِي الْغٰبِرِيْنَ ﴿١٧١﴾ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْاٰخَرِيْنَ ﴿١٧٢﴾

রুকু ৯

১৬০. (একইভাবে) লূতের জাতিও (আল্লাহর) রসূলদের অস্বীকার করেছে, ১৬১. যখন তাদের ভাই লূত এসে তাদের বললো (এ কি হলো তোমাদের), তোমরা কি (আল্লাহর আযাবকে) ভয় করবে না? ১৬২. নিসন্দেহে আমি হচ্ছি তোমাদের জন্যে একজন বিশ্বস্ত রসূল, ১৬৩. অতএব তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো, ১৬৪. আমি তো এ (কাজের) জন্যে তোমাদের কাছে কোনো বিনিময় চাচ্ছি না, আমার বিনিময় তো সৃষ্টিকুলের মালিক আল্লাহর দরবারেই (মজুদ) রয়েছে; ১৬৫. (এ কি হলো তোমাদের! জৈবিক প্রয়োজন পূরণের জন্যে) তোমরা দুনিয়ার পুরুষগুলোর কাছেই যাও, ১৬৬. অথচ তোমাদের মালিক তোমাদের (এ প্রয়োজনের) জন্যে তোমাদের স্ত্রী সাথীদের পয়দা করে রেখেছেন, তাদের তোমরা পরিহার করে (এ নোংরা কাজে লিপ্ত) থাকো; তোমরা (আসলেই) এক মারাত্মক সীমালংঘনকারী জাতি। ১৬৭. তারা বললো, হে লূত, যদি তুমি তোমার এসব (ওয়ায নসীহত) থেকে নিবৃত্ত না হও, তাহলে তুমি হবে বহিষ্কৃতদের একজন। ১৬৮. সে বললো (দেখো), আমি তোমাদের এ নোংরা কাজকে অত্যন্ত ঘৃণা করি; ১৬৯. (এবার লূত আল্লাহ তায়ালাকে বললো,) হে আমার মালিক, তারা যা কিছু করে তুমি আমাকে এবং আমার পরিবার পরিজনকে সে সব (ঘৃণিত কাজ) থেকে বাঁচাও। ১৭০. অতপর আমি লূত ও তার পরিবার পরিজনদের সকলকে উদ্ধার করলাম। ১৭১. (তার পরিবারের) এক (পাপী) বৃদ্ধাকে বাদ দিয়ে, সে (উদ্ধারের সময়) পেছনেই থেকে গেলো (এবং আযাবে নিমজ্জিত হয়ে গেলো), ১৭২. অতপর অবশিষ্ট সবাইকেই আমি সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিলাম,

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا ۖ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ ﴿١٧٣﴾ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۖ

وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٧٤﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٧٥﴾

১৭৩. তাদের ওপর আমি (আযাবের) বৃষ্টি বর্ষণ করলাম, (যাদের ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছিলো) তাদের জন্যে কতো নিকৃষ্ট ছিলো সেই (আযাবের) বৃষ্টি! ১৭৪. এ (ঘটনা)-র মাঝেও (রয়েছে শিক্ষণীয়) নিদর্শন, কিন্তু তাদের অধিকাংশই ঈমান আনে না। ১৭৫. নিসন্দেহে তোমার মালিক মহাপরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

তাফসীর
আয়াত ১৬০-১৭৫

হযরত লূত (আ.)-এর কাহিনী এখানে বর্ণনা করা হলেও এ ঘটনার ঐতিহাসিক অবস্থান হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর কাহিনীর সাথে। কিন্তু আমি আগেই বলেছি যে, এ সূরায় ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা অনুসরণ করা হয়নি। কেবল নবুওত ও রেসালাতের আদর্শগত অভিন্নতা এবং নবুওত প্রত্যাখ্যানকারীদের পরিণামের অভিন্নতাই বিবেচনায় রাখা হয়েছে। আর সেই পরিণাম হলো, প্রত্যাখ্যানকারীদের ধ্বংস ও মোমেনদের নিস্তার লাভ।

কওমে লূতের চারিত্রিক বিকৃতি

হযরত নূহ, হুদ ও সালেহ (আ.) যে কথা দিয়ে দাওয়াত ও প্রচারের কাজ শুরু করেছিলেন, হযরত লূত (আ.) ও সেই কথা দিয়েই শুরু করেন। তাদের ঔদ্ধত্য ও অহংকারের সমালোচনা করেন, তাদের হৃদয়ে আল্লাহর ভয় জাগানোর চেষ্টা করেন, তাদেরকে ঈমান ও আনুগত্যের আহ্বান জানান, তাদেরকে আশ্বস্ত করেন যে, তাদেরকে হেদায়াত করার বিনিময়ে তিনি তাদের কাছ থেকে কোনোই বিনিময় চান না। অতপর তাদেরকে ইতিহাসের সেই বিরলতম পাপাচারের জন্যে তিরস্কার করেন, যাতে তারা বিভোর ছিলো,

'একি! (যৌন চাহিদা পুরণের জন্যে) তোমরা দুনিয়ার পুরুষদের কাছেই আস অথচ তোমাদের প্রভু তোমাদের (এই চাহিদা পুরণের) জন্যে তোমাদের যে স্ত্রীদেরকে সৃষ্টি করেছেন তাদেরকে পরিহার করো? আসলে তোমরা একটা সীমা অতিক্রমকারী জাতি।'

জর্ডান উপত্যকার কয়েকটা গ্রাম জুড়ে বসবাসকারী এই জাতি যে জঘন্য পাপ কাজটার জন্যে কুখ্যাত হয়, তা ছিলো নারীদেরকে বাদ দিয়ে পুরুষদের সাথে পুরুষদের সমকাম। এটা স্বভাবের একটা নিকৃষ্ট বিকৃতি। কেননা আল্লাহ তায়ালা নারী ও পুরুষ উভয়কে সৃষ্টি করেছেন পরস্পরের প্রতি একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ দিয়ে, যাতে নারী ও পুরুষের মিলনের মাধ্যমে মানুষের বংশ বিস্তার ঘটে। নর নারীর এ আকর্ষণ একটা সর্বব্যাপী প্রাকৃতিক নিয়ম। এ নিয়ম বিশ্ব প্রকৃতির প্রত্যেক বস্তু ও প্রাণীকে সৃষ্টি সংক্রান্ত আল্লাহর পরিকল্পিত ইচ্ছা বাস্তবায়নের জন্যে পরস্পরের সহযোগী বানিয়ে দেয়। পুরুষের সাথে পুরুষের সমকাম দ্বারা কোনো লক্ষ্যই অর্জিত হয় না এবং তা এই বিশ্ব প্রকৃতির নিয়ম কানুনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণও নয়। এই অস্বাভাবিক সমকামে আনন্দ উপভোগ করা খুবই বিস্ময়ের ব্যাপার। যে আনন্দ নারী ও পুরুষ তাদের মিলনে উপভোগ করে, তা আল্লাহর ইচ্ছা পূরণকারী একটা স্বাভাবিক পন্থা, সুতরাং হযরত লূতের জাতির এ কাজে প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ সুস্পষ্ট। তাই তাদেরকে এই বিকৃতি থেকে হয় ফিরিয়ে আনা নচেত ধ্বংস করে দেয়া

অনিবার্য ছিলো। কেননা তারা প্রকৃতির কাফেলার সাথে থাকার অযোগ্য হয়ে গিয়েছিলো এবং পৃথিবীতে তাদের অস্তিত্ব টিকে থাকার আর কোনো যৌক্তিকতা অবশিষ্ট ছিলো না। কারণ তাদেরকে তো প্রাকৃতিক নিয়মে বিয়ে ও প্রজননের মাধ্যমে বংশ বিস্তারের উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করা হয়েছিলো।

কিন্তু হযরত লূত (আ.) যখন তাদেরকে এই নব আবিষ্কৃত পাপ পরিত্যাগ করতে বললেন এবং আল্লাহ তায়ালা তাদের জন্যে যে নারী জাতি সৃষ্টি করেছেন তাদেরকে পরিত্যাগ করা, প্রকৃতির ওপর জোরপূর্বক বিকৃতি চাপিয়ে দেয়া ও এতে নিহিত মহৎ উদ্দেশ্য নস্যাৎ করে দেয়ার সমালোচনা করলেন, তখন দেখা গেলো যে, তারা স্বাভাবিক নিয়ম ও স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে প্রস্তুত নয়।

'তারা বললো, ওহে লূত, তুমি যদি আমাদের বিরুদ্ধে এ সব কথা বন্ধ না করো, তাহলে তোমাকে এই দেশ থেকে বহিষ্কার করা হবে।'

সেখানে হযরত লূত (আ.) ছিলেন একজন বিদেশী। তার চাচা হযরত ইবরাহীম (আ.) যখন নিজ পিতা ও জাতিকে ত্যাগ করে এখানে চলে এলেন তখন হযরত লূত (আ.) ও তার সাথে সাথে এসেছিলেন। তিনি হযরত ইবরাহীম (আ.) ও তার সাথী মুষ্টিমেয়সংখ্যক মুসলমানের সাথে জর্ডান নদী পার হয়ে এসেছিলেন। অতপর তিনি এই জাতির সাথে একাকী বাস করতে থাকেন। তারপর যখন তিনি নবুওত লাভ করলেন এবং তাদেরকে তাদের অপরাধমূলক কার্যকলাপ পরিত্যাগ করার আহ্বান জানালেন, তখন তাকে দেশ থেকে বের করে দেয়ার হুমকি দেয়া হলো যদি তিনি এই প্রচার থেকে বিরত না হন।

এ সময় তাদের অস্বাভাবিক অপকর্মের বিরুদ্ধে নিজের অসন্তোষ প্রকাশ করা ছাড়া হযরত লূতের আর কোনো বিকল্প থাকলো না। তাই তিনি বললেন,

'আমি তোমাদের কার্যকলাপের ঘোর বিরোধী।'

'কালীন' শব্দের অর্থ ঘোর বিরোধী ও প্রবলভাবে অপছন্দকারী। একথাটা বলে হযরত লূত (আ.) প্রথমে তাদের কাছে নিজেদের অসন্তোষ প্রকাশ করলেন, অতপর আল্লাহর কাছে এই মুসিবত থেকে তাকে ও তার সন্তান সন্ততিকে অব্যাহতি দানের জন্যে দোয়া করতে লাগলেন।

'হে আমার প্রতিপালক, আমাকে ও আমার পরিবারকে তারা যেসব অপকর্ম করছে, তা থেকে অব্যাহতি দাও।'

তিনি যদিও তাদের এই অপকর্মে জড়িত নন, কিন্তু তিনি নিজের সত্যাশ্রয়ী বিবেক দ্বারা অনুভব করলেন যে, তিনি তাদের ভেতরে থাকা অবস্থায় তারা এমন কাজে লিপ্ত, যার পরিণামে আল্লাহর আযাব ও ধ্বংসযজ্ঞ নেমে আসা অবধারিত। তাই তিনি আল্লাহর কাছে আবেদন জানালেন যে, তার জাতিকে তিনি অচিরেই যে শাস্তি দিতে যাচ্ছেন, তা থেকে যেন তাকে ও তার পরিবারকে নিষ্কৃতি দেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবীর দোয়া কবুল করলেন,

'অতপর তাদের অপকর্ম থেকে আমি তাকে ও তার পরিবারকে রক্ষা করলাম। কেবল এক বৃদ্ধাকে বাদে'—

যে ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত ছিলো। এই বৃদ্ধা হযরত লূত (আ.)-এরই স্ত্রী, যেমন অন্যান্য সূরায় বলা হয়েছে, এই বৃদ্ধা ছিলো ভয়ংকর অপরাধপ্রবণ। সে তার জাতিকে তাদের অপকর্মের সমর্থন ও সহযোগিতা করতো।

'অতপর অন্যদেরকে আমি ধ্বংস করে দিলাম। আর তাদের ওপর বৃষ্টি বর্ষণ করলাম। সেই সতর্ককৃতদের বৃষ্টি ছিলো খুবই অশুভ।'

কথিত আছে, তাদের গ্রামগুলোকে মাটির নীচে ধসিয়ে দেয়া হয় এবং পানি দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়। এগুলোর ভেতরে সদোম নামক গ্রামটাও রয়েছে। ধারণা করা হয় যে, এগুলো জর্ডানে মৃত সাগরের নীচে চাপা পড়ে আছে।

কোনো কোনো ভূ-তত্ত্ববিদ জোর দিয়ে বলেন যে, মৃত সাগরের নিচে এমন কিছু শহর নিমজ্জিত রয়েছে, যা এক সময় জন অধ্যুষিত ছিলো। কোনো কোনো নৃতত্ত্ববিদ এই সাগরের আশপাশে একটা দুর্গের ধ্বংসাবশেষের সন্ধান পেয়েছেন, যার পাশেই কোরবানীর একটা বেদীও রয়েছে।

সে যাই হোক, কোরআন হযরত লূত (আ.)-এর জাতির ইতিহাস এভাবেই বর্ণনা করেছে এবং এ ব্যাপারে কোরআনের বক্তব্যই চূড়ান্ত। অতপর সেই একই মন্তব্যের পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে,

'নিশ্চয়ই এ ঘটনায় নিদর্শন রয়েছে। তাদের বেশীর ভাগই ঈমান আনেনি। তোমার প্রভু মহা প্রতাপশালী করুণাময়।'

كَذَّبَ أَصْحٰبُ لْئَيْكَةِ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٧٦﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿١٧٧﴾
إِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ أَمِيْنٌ ﴿١٧٨﴾ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَأَطِيْعُوْنِ ﴿١٧٩﴾ وَمَا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ
أَجْرٍ ۚ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٨٠﴾ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا
تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُخْسِرِيْنَ ﴿١٨١﴾ وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ ﴿١٨٢﴾ وَلَا تَبْخَسُوا
النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ﴿١٨٣﴾ وَاتَّقُوا الَّذِيْ
خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِيْنَ ﴿١٨٤﴾ قَالُوْا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِيْنَ ﴿١٨٥﴾ وَمَا
أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَإِنْ نَّظُنُّكَ لَمِنَ الْكٰذِبِيْنَ ﴿١٨٦﴾ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا
مِّنَ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿١٨٧﴾ قَالَ رَبِّيْ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٨٨﴾

রুকু ১০

১৭৬. আইকা'র অধিবাসীরাও রসূলদের অস্বীকার করেছিলো, ১৭৭. যখন শোয়ায়ব তাদের বলেছিলো (হে আমার জাতি), তোমরা কি (আল্লাহ তায়ালাকে) ভয় করবে না? ১৭৮. নিসন্দেহে আমি হচ্ছি তোমাদের জন্যে একজন বিশ্বস্ত রসূল, ১৭৯. সুতরাং তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো, ১৮০. (আমি যে তোমাদের ডাকছি−) এ জন্যে আমি তোমাদের কাছ থেকে কোনো পারিশ্রমিক দাবী করছি না, (কারণ) আমার পারিশ্রমিক যা, তা তো সৃষ্টিকুলের মালিক আল্লাহ তায়ালার কাছেই মজুদ রয়েছে; ১৮১. (হে মানুষ, মাপের সময়) তোমরা পুরোপুরি মেপে দেবে, (মাপে কম দিয়ে) তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের দলভুক্ত হয়ো না। ১৮২. (ওযন করার সময়) পাল্লা ঠিক রেখে ওযন করবে, ১৮৩. মানুষদের পাওনা কখনো কম দেবে না এবং দুনিয়ায় (খামাখা) ফেতনা ফাসাদ সৃষ্টি করো না, ১৮৪. ভয় করবে তাঁকে যিনি তোমাদের এবং তোমাদের আগে যারা গত হয়ে গেছে তাদের সবাইকে সৃষ্টি করেছেন; ১৮৫. তারা বললো (হে শোয়ায়ব), তুমি (তো) দেখছি যাদুগ্রস্ত ব্যক্তিদেরই অন্তর্ভুক্ত, ১৮৬. (তুমি কিভাবে নবী হলে?) তুমি তো আমাদেরই মতো মানুষ, আমরা মনে করি তুমি মিথ্যাবাদীদেরই অন্তর্ভুক্ত, ১৮৭. (হ্যাঁ,) তুমি যদি সত্যবাদী হও তাহলে যাও, আসমান (ভেংগে) এর একটি টুকরো আমাদের ওপর ফেলে দাও। ১৮৮. সে বললো, যা কিছু (উদ্ভট দাবী) তোমরা করছো− আমার মালিক তা ভালো করেই জানেন,

فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ ۚ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٨٩﴾ إِنَّ

فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٩٠﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ

الرَّحِيمُ ﴿١٩١﴾

১৮৯. অতপর তারা তাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করলো, পরিণামে মেঘাচ্ছন্ন দিনের এক ভীষণ আযাব তাদের পাকড়াও করলো, এ ছিলো সত্যিই এক কঠিন দিনের আযাব। ১৯০. এ (ঘটনা)-র মাঝেও (শিক্ষার) নিদর্শন আছে; (কিন্তু) তাদের অনেকেই (এর ওপর) ঈমান আনে না। ১৯১. নিসন্দেহে তোমার মালিক মহাপরাক্রমশালী ও পরম দয়ালু।

তাফসীর

আয়াত ১৭৬-১৯১

এ হচ্ছে হযরত শোয়ায়বের কাহিনী। ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতায় এটা হযরত মূসা (আ.)-এর পূর্বে আসার কথা। কিন্তু এখানে এ সূরার অন্যান্য কাহিনীর মতো নিছক এর শিক্ষার দিকটা বিবেচনা করেই বর্ণনা করা হয়েছে। 'আসহাবুল আয়কা' দ্বারা সম্ভবত মাদায়েনবাসীকেই বুঝনো হয়েছে। 'আয়কা' শব্দের অর্থ ঘন গাছপালা। সম্ভবত তৎকালে মাদায়েনের আশপাশে ঘন গাছপালা ছিলো। মাদায়েনের অবস্থান হেজায ও ফিলিস্তিনের মাঝে আকাবা উপসাগরের পার্শ্বে।

অন্যান্য নবীর মতোই হযরত শোয়ায়বও ইসলামের মূল আকীদার দাওয়াত দান ও নিজেকে পার্থিব পারিশ্রমিক বা পারিতোষিকের আশা থেকে মুক্ত বলে আশ্বস্ত করে কাজের সূচনা করেন। তারপর তাদের বিশেষ কর্মকান্ড নিয়ে আলোচনা করেন। যেমন বলেন, তোমরা পুরোপুরি মেপে দাও, মাপে কম দিও না..........। *(আয়াত ১৮১-১৮৩)*

সূরা আরাফ ও হুদে তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে তারা মাপে ও ওযনে কম দিতো এবং জোরপূর্বক বেশী আনতো। তারা বেচাকেনার মাধ্যমে মানুষকে ঠকাতো, অত্যধিক কম দামে কিনতো ও বেশী দামে বিক্রী করতো। মনে হয়, তারা কোনো বাণিজ্যিক পথের পাশেই বাস করতো। তাই তারা বাণিজ্যের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করতো। তাদের নবী বেচাকেনায় সততা ও ইনসাফের আদেশ দেন। কেননা বিশুদ্ধ আকীদা বিশ্বাস মানুষকে সততার সাথে লেন দেনের প্রেরণা যোগায়। লেন দেনে বে-ইনসাফী করতে দেয় না।

এরপর হযরত শোয়ায়ব তাদের মধ্যে তাকওয়া ও আল্লাহভীতির চেতনা জাগ্রত করেন। তিনি তাদের একক স্রষ্টাকে স্মরণ করিয়ে দেন, যেন অতীত ও বর্তমান সকল প্রজন্মকে সৃষ্টি করেছেন। *(আয়াত ১৮৪)*

কিন্তু তার জাতি তাকে যাদুকৃত উন্মাদ ও প্রলাপ বক্তা বলে আখ্যায়িত করে। *(আয়াত ১৮৫)* তারা তাকে মিথ্যুক সাব্যস্ত করে এবং তাদেরই মতো মানুষ হওয়ায় তার নবুওত বিশ্বাসযোগ্য নয় বলে জানায়। (আয়াত ১৮৬)

অতপর তারা তাকে চ্যালেঞ্জ দেয় যে, তিনি সত্যবাদী হয়ে থাকলে আকাশ ভেংগে তার টুকরোগুলোকে যেন তাদের ওপর নিক্ষেপ করে। *(আয়াত ১৮৭)*

এ হচ্ছে চরম ধৃষ্টতা ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ চ্যালেঞ্জ। ঠিক এ ধরনের চ্যালেঞ্জ মোশরেকরা রসূল (স.)-কেও দিয়েছিলো।

'তিনি বললেন, তোমাদের কাজ সম্পর্কে আমার প্রভুই ভালো জানেন।' (আয়াত ১৮৮)

অতপর ঘটনার দ্রুত শেষ পরিণতির বিবরণ দেয়া হয়,

'তারা তাকে মিথ্যুক সাব্যস্ত করলো। ফলে তাদেরকে পাকড়াও করলো 'ছায়ার দিনের' আযাব।' (আয়াত ১৮৯)

কথিত আছে যে, তাদের ওপর প্রচন্ড শ্বাসরুদ্ধকর গরম আবহাওয়া নেমে এসেছিলো। এই সময়ে তারা এক টুকরো মেঘ দেখতে পায়। ছায়া লাভের আশায় তারা সেই মেঘের নীচে আশ্রয় নেয়। প্রথমে তারা কিছু ঠান্ডা অনুভব করে। কিন্তু পরক্ষণেই অনুভব করে যে, তা তাদের জন্যে আরো বিপর্যয়কর এবং তা তাদেরকে চূড়ান্তভাবে ধ্বংস করে ছাড়ে।

এই ছিলো তাদের জন্যে 'ইয়াওমুয্ যুল্লাহ' বা ছায়ার দিন। এই ছায়া আসলে চিহ্নিত আযাবের দিনের প্রতীক ছিলো!

وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعٰلَمِينَ ﴿١٩٢﴾ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿١٩٣﴾ عَلٰى قَلْبِكَ

لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ ﴿١٩٤﴾ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ ﴿١٩٥﴾ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ ﴿١٩٦﴾

أَوَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ اٰيَةً أَنْ يَّعْلَمَهُ عُلَمٰٓؤُا بَنِيٓ إِسْرَآءِيلَ ﴿١٩٧﴾ وَلَوْ نَزَّلْنٰهُ عَلٰى

بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ ﴿١٩٨﴾ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَّا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿١٩٩﴾ كَذٰلِكَ سَلَكْنٰهُ

فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ﴿٢٠٠﴾ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿٢٠١﴾

فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٠٢﴾ فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ ﴿٢٠٣﴾

أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿٢٠٤﴾ أَفَرَءَيْتَ إِنْ مَّتَّعْنٰهُمْ سِنِينَ ﴿٢٠٥﴾ ثُمَّ جَآءَهُمْ مَّا

كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿٢٠٦﴾

রুকু ১১

১৯২. (হে নবী,) অবশ্যই এ (কোরআন)-টি রব্বুল আলামীনের নাযিল করা (একটি গ্রন্থ); ১৯৩. একজন বিশ্বস্ত ফেরেশতা (আমারই আদেশে) এটা নাযিল করেছে, ১৯৪. (নাযিল করেছে) তোমারই মনের ওপর যাতে করে তুমিও সতর্ককারী (নবী)-দের একজন হতে পারো, ১৯৫. (একে নাযিল করা হয়েছে) সুস্পষ্ট আরবী ভাষায়; ১৯৬. আগের (উম্মতদের কাছে) নাযিল করা কেতাবসমূহে অবশ্যই এটি (উল্লিখিত) আছে। ১৯৭. এটা কি এদের জন্যে দলিল নয় যে, বনী ইসরাঈলের আলেমরাও এর সম্পর্কে পূর্ণ অবগত আছে;. ১৯৮. যদি আমি এ (কোরআন)–কে (আরবীর বদলে অন্য) কোনো অনারবের ওপর (তার ভাষায়) নাযিল করতাম, ১৯৯. তারপর সে (অনারব) ব্যক্তি তাদের কাছে এসে এটা (কেতাব) পাঠ করতো, অতপর (ভাষার অজুহাত তুলে) এর ওপর তারা (মোটেই) ঈমান আনতো না; ২০০. এভাবেই আমি এ বিষয়টি নাফরমান অপরাধীদের অন্তরে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছি; ২০১. তারা (আসলে) কখনো এর ওপর ঈমান আনবে না, যতোক্ষণ না তারা কোনো কঠিন আযাব (নিজেদের চোখে) দেখতে পাবে, ২০২. আর সে (আযাব কিন্তু) তাদের কাছে আসবে একান্ত আকস্মিকভাবেই, তারা কিছুই টের পাবে না, ২০৩. তখন তারা বলবে, আমাদের কি (কিছু সময়ের জন্যেও) অবকাশ দেয়া হবে না? ২০৪. (অথচ) সে লোকগুলোই (এক সময়) আযাবকে ত্বরান্বিত করতে চেয়েছিলো! ২০৫. তুমি (এ বিষয়টা) চিন্তা করে দেখেছো কি, যদি আমি তাদের অনেক দিন ধরে (পার্থিব) ভোগবিলাস ভোগ করতেও দিই, ২০৬. তারপর যে (আযাব) সম্পর্কে তাদের ওয়াদা করা হয়েছিলো তা যদি (সত্যিই) তাদের কাছে এসে পড়ে,

مَآ أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يُمَتَّعُونَ ﴿٢٠٧﴾ وَمَآ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا
مُنذِرُونَ ﴿٢٠٨﴾ ذِكْرَىٰ وَمَا كُنَّا ظَٰلِمِينَ ﴿٢٠٩﴾ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ ٱلشَّيَٰطِينُ ﴿٢١٠﴾ وَمَا
يَنۢبَغِى لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿٢١١﴾ إِنَّهُمْ عَنِ ٱلسَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ﴿٢١٢﴾ فَلَا تَدْعُ
مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَذَّبِينَ ﴿٢١٣﴾ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴿٢١٤﴾
وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٢١٥﴾ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّى
بَرِىٓءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢١٦﴾ وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ﴿٢١٧﴾ ٱلَّذِى يَرَىٰكَ حِينَ
تَقُومُ ﴿٢١٨﴾ وَتَقَلُّبَكَ فِى ٱلسَّٰجِدِينَ ﴿٢١٩﴾ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿٢٢٠﴾ هَلْ
أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ ٱلشَّيَٰطِينُ ﴿٢٢١﴾ تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ﴿٢٢٢﴾

২০৭. তাহলে (এই) যে বৈষয়িক বিলাস তারা ভোগ করছিলো, তা সব কি কোনো কাজে লাগবে? ২০৮. আমি (কাফেরদের) কোনো জনপদই ধ্বংস করিনি যার জন্যে (কোনো) সতর্ককারী (নবী) ছিলোনা, ২০৯. (এ হচ্ছে মূলত সুস্পষ্ট) উপদেশ, আর আমি তো যালেম নই (যে, সতর্ক না করেই তাদের ধ্বংস করে দেবো)। ২১০. এ (কোরআন)টি কোনো শয়তান নাযিল করেনি। ২১১. ওরা এ কাজের যোগ্যও নয়, না তারা তেমন কোনো ক্ষমতা রাখে; ২১২. তাদের তো (ওহী) শোনা থেকেও বঞ্চিত রাখা হয়েছে; ২১৩. অতএব তুমি কখনো আল্লাহ তায়ালার সাথে অন্য কোনো মাবুদকে ডেকো না, নতুবা তুমিও শাস্তিযোগ্য লোকদের দলভুক্ত হয়ে যাবে। ২১৪. (হে নবী,) তুমি তোমার নিকটতম আত্মীয় স্বজনদের (আল্লাহ তায়ালার আযাব থেকে) ভয় দেখাও, ২১৫. যে ব্যক্তি ঈমান নিয়ে তোমার অনুবর্তন করবে তুমি তার প্রতি স্নেহের আচরণ করো, ২১৬. যদি কেউ তোমার সাথে নাফরমানী করে তাহলে তুমি তাকে বলে দাও, তোমরা (আল্লাহ তায়ালার সাথে) যে আচরণ করছো তার (পরিণামের) জন্যে আমি কিন্তু (মোটেই) দায়ী নই, ২১৭. (তাদের অবাধ্য আচরণে তুমি মনোক্ষুণ্ন হয়ো না, তুমি বরং) সর্বোচ্চ পরাক্রমশালী ও দয়ালু আল্লাহ তায়ালার ওপরই ভরসা করো, ২১৮. যিনি তোমাকে দেখতে থাকেন, যখন তুমি (নামাযে) দাঁড়াও, ২১৯. এবং সাজদাকারীদের মাঝে তোমার ওঠা বসাও (তিনি প্রত্যক্ষ করেন)। ২২০. অবশ্যই তিনি (সব কিছু) শোনেন, (সব কিছুই) জানেন। ২২১. (হে নবী,) আমি কি তোমাকে বলে দেবো, শয়তান কার ওপর (বেশী) সওয়ার হয়? ২২২. (শয়তান সওয়ার হয়) প্রতিটি ঘোর মিথ্যাবাদী ও পাপী মানুষের ওপর,

يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَٰذِبُونَ ﴿٢٢٣﴾ وَالشُّعَرَآءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُۥنَ ﴿٢٢٤﴾ أَلَمْ تَرَ
أَنَّهُمْ فِى كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ ﴿٢٢٥﴾ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴿٢٢٦﴾ إِلَّا
الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحَٰتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانتَصَرُوا مِنۢ
بَعْدِ مَا ظُلِمُوا ۗ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوٓا أَىَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ ﴿٢٢٧﴾

২২৩. ওরা (শয়তানের কথা) শোনার জন্যে কান পেতে থাকে, আর তাদের অধিকাংশই হচ্ছে (নিরেট) মিথ্যাবাদী; ২২৪. (আর কবিদের কথা!) কবিরা (তো অধিকাংশই হয় পথভ্রষ্ট,) তাদের অনুসরণ করে (আরো) কতিপয় গোমরাহ ব্যক্তি; ২২৫. তুমি কি দেখতে পাও না, ওরা (কল্পনার হাওয়ায় চড়ে) প্রতিটি ময়দানে উদ্ভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়ায়, ২২৬. এরা এমন কথা (অন্যদের) বলে যা তারা নিজেরা করে না, ২২৭. তবে যারা আল্লাহর ওপর ঈমান আনে ও (সে অনুযায়ী) নেক কাজ করে এবং বেশী করে আল্লাহ তায়ালাকে স্মরণ করে, তাদের কথা আলাদা। তাদের ওপর যুলুম করার পরই কেবল তারা (আত্মরক্ষামূলক) প্রতিশোধ গ্রহণ করে; আর যুলুম যারা করে– তারা অচিরেই জানতে পারবে তাদের (একদিন) কোথায় ফিরে যেতে হবে।

তাফসীর
আয়াত-১৯২-২২৭

'এই কোরআন তো বিশ্ব জাহানের পালনকর্তার কাছ থেকে অবতীর্ণ......। (আয়াত ১৯২)

রসূলদের ও তাঁদের রেসালাত সংক্রান্ত বিভিন্ন ঘটনাবলীর বর্ণনা আপাতত শেষ হলো, এসব ঘটনায় আমরা আল্লাহদ্রোহী সম্প্রদায়ের অস্বীকৃতি দেখতে পাই। দেখতে পাই তাদের প্রতি আল্লাহর কঠিন শাস্তির স্বরূপ।

আলোচ্য সূরার ভূমিকায় পরক্ষণেই এসব ঘটনার বিবরণ আরম্ভ করা হয়। ভূমিকায় বিশেষভাবে রসূল (স.) ও মক্কার মোশরেকদের বিষয় স্থান পেয়েছে। শুরুতেই বলা হয়েছিলো, 'তারা বিশ্বাস করে না বলে তুমি হয়তো মর্মব্যথায় আত্মঘাতী হবে। .... (আয়াত ৩-৬)

এরপর রসূলদের ঘটনাবলীর বিবরণ আরম্ভ হয়। তাতে এমন সব জাতি ও সম্প্রদায়ের কথা বলা হয়েছে, যারা আল্লাহর বাণীর প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করতো, বিদ্রূপ প্রকাশ করতো।

আল কোরআন এক মহাসত্য

ঘটনার বিবরণ শেষ হওয়ার পর এখানে আলোচ্য সূরার মূল বক্তব্য আবার ফিরে এসেছে। এই বক্তব্য হচ্ছে পবিত্র কোরআন সম্পর্কিত। এতে অত্যন্ত জোরালোভাবে বলা হচ্ছে যে, এই কোরআন স্বয়ং বিশ্বজাহানের পালনকর্তার পক্ষ থেকেই নাযিল করা হয়েছে। এতে অতীতকালের বিভিন্ন ঘটনাবলীর উল্লেখ রয়েছে, এসব ঘটনাবলীর সত্যতা ও বাস্তবতা সম্পর্কে স্বয়ং বনী ইসরাঈলের পন্ডিত ব্যক্তিরাও জানে। কারণ, এসব ঘটনাবলীর উল্লেখ তাদের ঐশী গ্রন্থেও

রয়েছে। কিন্তু মোশরেক সম্প্রদায় এসব প্রমাণিত ও প্রকাশ্য বিষয়গুলোকে অস্বীকার করে। ওরা মনে করে, এসব যাদু অথবা কল্পনাপ্রসূত কাব্য। এমনকি, এই কোরআন যদি কোনো অনারব, যে মোটেও আরবী জানেনা, তার ওপর নাযিল হতো এবং সে তা ওদের সামনে পাঠ করে শুনাতো তাতেও ওরা বিশ্বাস করতো না, ঈমান গ্রহণ করতো না। এটা কোনো দলীল প্রমাণের দুর্বলতার কারণে নয়, বরং ওদের গোয়ার্তুমীর কারণেই ওরা ঈমান গ্রহণ করে না। ওদের জানা উচিত, এই পবিত্র বাণী মোহাম্মদ (স.)-এর কাছে কোনো জ্বীন-পরী বা কোনো দৈত্য-দানবের পক্ষ থেকে আসেনি, যা সাধারণত গণক ঠাকুরদেরদের কাছে এসে থাকে। ওদের আরো জানা থাকা উচিত, যে এই পবিত্র বাণী কোনো কাব্য সম্ভার নয়। কারণ, এর একটি সুনির্দিষ্ট নিয়ম-নীতি ও পদ্ধতি রয়েছে। অথচ কবিতা হচ্ছে একদল কল্পনা বিলাসী কবিদের উর্বর মস্তিস্কের কল্পনার সমাহার। এতে বাস্তবতার পরিবর্তে কল্পনার প্রাধান্য থাকে বেশী। কিন্তু পবিত্র কোরআন এমনটি নয়। কারণ, আল্লাহদ্রোহী তথা মোশরেক সম্প্রদায়কে সতর্ক করে দেয়ার জন্যে এবং কঠিন আযাবে আক্রান্ত হওয়ার আগেই তাদেরকে সাবধান করে দেয়ার জন্যে এই পবিত্র কোরআন স্বয়ং আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল করা হয়েছে। অন্যথায় তাদেরকে করুণ পরিণতির সম্মুখীন হতে হবে, 'নিপীড়নকারীরা শীঘ্রই জানতে পারবে তাদের গন্তব্যস্থল কি রূপ?' আয়াতে বলা হয়েছে,

'এই কোরআন তো বিশ্ব জাহানের পালনকর্তার কাছ থেকে অবতীর্ণ, বিশ্বস্ত ফেরেশতা একে নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছে তোমার অন্তরে ....। (আয়াত ১৯১-১৯৫)

অর্থাৎ জিবরাঈল (আ.) যিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে পবিত্র কোরআন রসূল (আ.)-এর আত্মার প্রতি নাযিল করেছেন তিনি অত্যন্ত বিশ্বস্ত একজন ফেরেশতা। তিনি কেবল বিশ্বস্তই নন, বরং যা কিছু আল্লাহর পক্ষ থেকে বহন করে এনেছেন তার যথার্থ হেফাযতও করেছেন। আর তার কাছ থেকে সরাসরি আল্লাহর নবী সেই ঐশী বাণী গ্রহণ করেছেন এবং যথাযথভাবে ও প্রত্যক্ষরূপে তা ধারণও করেছেন। উদ্দেশ্য হলো, তিনি যেন আরবী ভাষায় অবতীর্ণ এই ঐশী বাণীর মাধ্যমে তাঁর জাতিকে সতর্ক করতে পারেন, দিক নির্দেশনা করতে পারেন। যেহেতু এই বাণীর ভাষা ছিলো তাদেরই মাতৃভাষা আরবী, কাজেই এর মর্ম ও বক্তব্য বুঝা তাদের পক্ষে কঠিন কিছু ছিলো না। তারা সহজেই বুঝতে পেরেছিলো, এই বাণী কখনো মানুষের মুখের বাণী হতে পারে না। কারণ, এর বাক্য গঠন রীতি, বর্ণনা ভংগি, অর্থ ও বক্তব্যের সুবিন্যস্ততাই প্রমাণ করে এর উৎস মানুষ নয়।

এরপর আর একটি বাহ্যিক প্রমাণের প্রতি ইংগিত করে বলা হচ্ছে, 'নিশ্চয়ই এর উল্লেখ রয়েছে পূর্ববর্তী কেতাবসমূহে।......... (আয়াত ১৯৬-১৯৭)

পূর্ববর্তী আসমানী কেতাবে রসূল (স.)-এর পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। সে কারণেই বনী ইসরাঈলের আলেমরা রসূল (স.)-এর আগমনের প্রত্যাশী ছিলেন। তারা মনে করতেন প্রত্যাশিত রসূলের আগমন কাল ঘনিয়ে এসেছে। এটা নিয়ে তারা পরস্পর বলাবলিও করতেন। বিশিষ্ট সাহাবী সালমান ফারেসী ও আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা.)-এর মাধ্যমে এই বক্তব্য জানা যায়। এ সংক্রান্ত তথ্যগুলোও সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত। তা সত্ত্বেও কেবল অহংকার ও গোঁড়ামীর বশবর্তী হয়ে মক্কার মোশরেক সম্প্রদায় এই পবিত্র বাণীকে আল্লাহর বাণী হিসেবে গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছে। এমন কি কোনো অনারবও যদি তাদেরকে আরবী ভাষায় এই বাণী আবৃত্তি করে শুনাতো, তাতেও তারা এটাকে আল্লাহর বাণী হিসেবে গ্রহণ করতো না, বিশ্বাস করতো না। তাই বলা হয়েছে,

'যদি আমি একে কোনো ভিন্নভাষীর প্রতি অবতীর্ণ করতাম অতপর তিনি তা তাদের কাছে পাঠ করতেন, তবে তারা তাতে বিশ্বাস স্থাপন করতো না।' (আয়াত ১৯৮-১৯৯)

এই আয়াতে একদিকে রসূল (স.)-কে সান্ত্বনা জানানো হচ্ছে এবং অপরদিকে মোশরেকদের সীমাহীন অহংকার ও গোঁড়ামীর চিত্র তুলে ধরা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, এরা কোনো যুক্তি প্রমাণেরই ধার ধারে না। এদের স্বভাবই হচ্ছে, সত্যকে অস্বীকার করা। তবে এই অস্বীকৃতির শাস্তি তাদেরকে অবশ্যই ভোগ করতে হবে। যখন আল্লাহর হুকুমে আযাব আসবে তখন তারা বুঝতেও পারবে না, কিভাবে কি হলো। সে কথাই আয়াতে এভাবে বলা হয়েছে,

'তারা এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে না যে পর্যন্ত তারা মর্মন্তুদ আযাব (সামনে) দেখতে পাবে। অতপর তা আকস্মিকভাবে তাদের কাছে এসে পড়বে, তারা তা বুঝতেও পারবে না'। (আয়াত ২০১-২০২)

আলোচ্য আয়াতের বর্ণনাভংগির মাধ্যমে মোশরেকদের চিরাচরিত একটা স্বভাবকে চাক্ষুসভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, ঈমান গ্রহণ না করা এবং কোরআনকে অস্বীকার করা ওদের মজ্জাগত স্বভাব। এই স্বভাবের কোনো পরিবর্তন হবে না। আল্লাহর গযব বা অন্য কোনো কারণে ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত তারা এই স্বভাবের ওপরই অটল থাকে। অনেকে আবার মৃত্যুর কারণে অথবা হত্যার মাধ্যমে এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে যায়, কিন্তু নিজের এই স্বভাবকে ত্যাগ করতে পারে না। আবার জীবন সায়াহ্নে এসে অনেকে চৈতন্য ফিরে পায়। তখন বলে ওঠে, 'আমরা কি অবকাশ পাবো না?' অর্থাৎ আমাদের কি আর একবার সংশোধনের সুযোগ দেয়া হবে না? কিন্তু, না, তেমন কোনো সুযোগ তখন আর থাকবে না।

ওরা অনেকটা তাচ্ছিল্য ও বিদ্রূপের বশবর্তী হয়েই নিজেদের ওপর আসমানী গযবকে দ্রুত নিয়ে আসার জন্যে আব্দার করতো। ভোগ বিলাসিতার মাঝে ডুবে থাকার কারণে ওদের চেতনা ও অনুভূতি ভোঁতা হয়ে গিয়েছিলো। যার ফলে ওরা কল্পনাই করতে পারতো না যে, আল্লাহর গযবও ওদের ওপর নেমে আসতে পারে, ঠিক সম্পদশালীরা যেমনটি করে থাকে। কারণ, সম্পদশালীরা কদাচিৎ মনে করে থাকে যে, তাদের সম্পদ একদিন শেষ হয়ে যেতে পারে, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা এদেরকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলছেন,

'তারা কি আমার শাস্তিকে দ্রুত কামনা করে? তুমি ভেবে দেখো তো, যদি আমি বছরের পর বছর..... ।' (আয়াত ২০৪-২০৬)

একদিকে আল্লাহর শাস্তি দ্রুত কামনা করা হচ্ছে, অপরদিকে সেই শাস্তি আকস্মিকভাবেই তাদের ওপর পতিত হচ্ছে। ফলে বিদ্রোহীদের এই জীবন চুরমার হয়ে পড়ছে, নিশ্চিহ্ন হয়ে পড়ছে। কোনো কিছুই তাদেরকে রক্ষা করতে পারছে না। কোনো কিছুই তাদের শাস্তিকে লঘু করতে পারছে না।

হাদীস শরীফে বলা হয়েছে, 'কাফেরদেরকে জাহান্নামের আগুনের মাঝে একবার ঠেসে ধরে জিজ্ঞেস করা হবে, তুমি কখনো কি ভালো কিছু দেখেছো? কখনো কি কোনো নেয়ামত দেখেছো? সে বলবে, 'আল্লাহর কসম কখনো না।' এর পর আর একজন লোককে হাযির করা হবে সে পৃথিবীতে অনেক দুঃখ কষ্ট দেখেছে। তাকে জান্নাতের মাঝে একবার ঢুকিয়ে জিজ্ঞেস করা হবে, 'তুমি কি কখনো কোনো দুঃখ কষ্ট দেখেছো?' সে বলবে, 'কখনো না হে আমার প্রভু।' (তাফসীরে ইবনে কাসীর)

এরপর আল্লাহ তায়ালা ওদেরকে সাবধান করে দিয়ে বলছেন যে, 'আমি কোনো জনপদ ধ্বংস করিনি যার জন্যে কোনো সতর্ককারী (নবী) পাঠানো হয়নি........। (আয়াত ২০৮-২০৯)

আল্লাহ তায়ালা মানব জাতির কাছ থেকে একটা স্বভাবজাত অংগীকার নিয়েছিলেন। সেটা হচ্ছে মানব জাতি তাওহীদের বিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে একমাত্র তাঁরই এবাদাত বন্দেগী করবে। কেননা প্রকৃতি নিজেও একক স্রষ্টার প্রমাণ বহন করে। এমনকি সুস্থ মানব স্বভাবও একক স্রষ্টার অনুভূতি লালন করে থাকে। সাথে সাথে গোটা সৃষ্টি জগতও এই একক স্রষ্টারই প্রমাণ বহন করে চলছে। তাই মানুষ যখন স্বভাবজাত অংগীকারের কথা ভুলে যায় এবং ঈমানী চেতনা সৃষ্টিকারী আল্লাহর নির্দশনগুলোর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। তখন তাদেরকে সতর্ক করে দেয়ার জন্যে নবী রসূলদের আগমন ঘটে। তাই নবুওত ও রেসালত হচ্ছে মূলত আত্মভোলা ও গাফেল মানুষদেরকে সতর্ক করার একটা উপায় ও পন্থা। এর মাধ্যমে আল্লাহর দয়া ও ইনসাফেরই বহিপ্রকাশ ঘটে। এর পরও যারা সতর্ক হয় না তাদেরকে শাস্তি দিয়ে ধ্বংস করে দিলে সেটা আল্লাহর পক্ষ থেকে যুলুম হিসেবে বিবেচিত হবে না। বরং সত্য ও ন্যায় পথ থেকে বিচ্যুতির ন্যায্য শাস্তি হিসেবেই গণ্য হবে।

এর পর পবিত্র কোরআন সম্পর্কে বলা হচ্ছে, 'এই কোরআন শয়তানরা অবতীর্ণ করেনি। তারা এ কাজের উপযুক্ত নয় এবং তারা এর সামর্থ্যও রাখে না ....। (আয়াত ২১০-২১২)

পূর্বে বলা হয়েছিলো যে, এই কোরআন বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল করা। এখন কাফের মোশরেকদের ভ্রান্ত দাবী খন্ডন করে বলা হচ্ছে, এই কোরআন শয়তানী পদ্ধতিতে নাযিলকৃত কোনো গণক বা জ্যোতিষীর মুখনিসৃত বাণী নয়। এটা হচ্ছে স্বয়ং আল্লাহর পবিত্র বাণী যার ধারে কাছে পৌঁছার ক্ষমতাও কোনো শয়তানের নেই। এই বাণী মানুষকে সত্য পথের সন্ধান দেয়, সততার প্রতি আহবান করে এবং ঈমানের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে, অথচ শয়তানরা সম্পূর্ণ এর বিপরীত কাজ করে। তারা মানুষকে ভ্রান্ত পথের দিকে ডাকে, অমঙ্গলের পথে ডাকে এবং আল্লাহদ্রোহিতার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে।

পবিত্র কোরআনের মতো কোনো বাণী পেশ করার মতো ক্ষমতা শয়তানের নেই। কারণ, ওহীর উৎস থেকে তারা বিচ্ছিন্ন। এই বাণীর বাহক তো একজন সম্মানিত ও বিশ্বস্ত ফেরেশতা, যিনি আল্লাহর নির্দেশেই এই বাণী বহন করে রসূলের কাছ পৌঁছান। এই মহান দায়িত্ব আঞ্জাম দেয়ার ক্ষমতা কি কোনো শয়তানের থাকতে পারে?

সুপারিশ কারো নয় আমলই একমাত্র নাজাতের উপায়

পরবর্তী আয়াতে সরাসরি রসূল (স.) কে লক্ষ্য করে নির্দেশ দিয়ে বলা হচ্ছে, তিনি যেন শেরক থেকে দূরে থাকেন, আপনজনদের সতর্ক করেন এবং সব বিষয়ে একমাত্র আল্লাহর ওপরই ভরসা রাখেন। আয়াতে বলা হয়েছে,

'অতএব, তুমি আল্লাহর সাথে অন্য কোনো ইলাহকে ডাকবে না, ডাকলে শাস্তিতে পতিত হবে.........। (আয়াত ২১৩-২২০)

আল্লাহর সাথে শেরক করা বা আল্লাহর সাথে শরীক করে অন্য কোনো উপাস্যকে ডাকা রসূল (স.)-এর ক্ষেত্রে কল্পনাই করা যায় না। এরপরও বলা হচ্ছে, তিনি যেন আল্লাহর সাথে অন্য কোনো উপাস্যকে না ডাকেন, যদি ডাকেন তাহলে তিনি কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হবেন। রসূলের ক্ষেত্রেই যদি এই সাবধান বাণী উচ্চারিত হতে পারে, তাহলে অন্যদের ক্ষেত্রে এই সাবধান বাণী কতোটুকু জোরালোভাবে উচ্চারিত হতে পারে তা সহজেই অনুমান করা যায়। কাজেই নিসন্দেহে

একথা বলা যায়, শেরক হচ্ছে এমন একটি মহা পাপ যার শাস্তি থেকে খোদ রসূলও রেহাই পাবেন না, যদি তিনি ঘটনাক্রমে সে পাপে লিপ্ত হন!

এরপর রসূল (স.)-কে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে, তিনি যেন নিজের আত্মীয়স্বজনদেরকে শেরকের ব্যাপারে সতর্ক করে দেন এবং এ কঠিন শাস্তির ভয় দেখান। এর ফলে অন্যরাও সতর্ক হয়ে যাবে। কারণ, খোদ রসূলের আত্মীয়স্বজনরাও যদি শেরকের ওপর মৃত্যুবরণ করে কঠিন শাস্তির হাত থেকে রেহাই না পায়, তাহলে অন্যদের তো কোনো কথাই নেই। আয়াতে বলা হয়েছে,

'তুমি নিকটতম আত্মীয়দেরকে সতর্ক করে দাও।' (আয়াত ২১৪)

বোখারী ও মুসলিম বর্ণিত একটি হাদীসে বলা হয়েছে, যখন এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়, তখন রসূল (স.) সাফা পাহাড়ে উঠে উচ্চস্বরে ডাক দিয়ে বললেন, বিপদ থেকে সাবধান! ডাক শুনে লোকজন তাঁর কাছ জমায়েত হতে লাগলো, অনেকে স্বয়ং এসে হাযির হলো আবার অনেকে তাদের প্রতিনিধি পাঠিয়ে দিলো। তাদেরকে লক্ষ্য করে রসূল বললেন, 'হে আবদুল মোত্তালেবের বংশধরর, 'হে ফেহরের বংশধররা, হে লুয়াই-এর বংশধররা! যদি আমি তোমাদেরকে বলি যে, পাহাড়ের পাদদেশে একটা আশ্বারোহী দল তোমাদের ওপর আক্রমণ করার জন্যে প্রস্তুত রয়েছে তাহলে কি তোমরা আমাকে বিশ্বাস করবে? তারা বললো, হাঁ! তিনি বললেন, 'তাহলে আমি তোমাদেরকে আসন্ন এক কঠিন শাস্তির ব্যাপারে সতর্ক করে দিচ্ছি' তখন আবু লাহাব বলে উঠলো, 'গোটা দিনটাই তোমার জন্যে অশুভ হোক, এজন্যেই কি তুমি আমাদেরকে ডেকেছো?' এই পরিপ্রেক্ষিতেই আল্লাহ নাযিল করেন, 'আবু লাহাবের হস্তদ্বয় ধ্বংস হোক এবং ধ্বংস হোক সে নিজেও।'

আয়েশা (র.)-এর বরাত দিয়ে মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, যখন রসূলের প্রতি নাযিল হলো,

'তুমি নিকটতম আত্মীয়দেরকে সতর্ক করে দাও'.......

তখন তিনি দাঁড়িয়ে তাঁর স্বজনদেরকে উদ্দেশ্যে করে বললেন, 'হে মোহাম্মদের কন্যা ফাতেমা! হে আবদুল মোত্তালেবের কন্যা সাফিয়্যাহ্! হে আবদুল মোত্তালেবের বংশধররা! আল্লাহর সামনে তোমাদের জন্যে কিছু করার মতো ক্ষমতা আমার নেই। আমার ধন সম্পদ থেকে তোমাদের যা চাওয়ার চাইতে পারো।'

আবু হোরায়রা (র.)-এর বরাত দিয়ে মুসলিম ও তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, যখন এই আয়াতটি নাযিল হয় তখন রসূল (স.) কোরায়শ বংশের ছোট বড় সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'হে কোরায়শ বংশধররা! জাহান্নামের আগুন থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করো। হে বনী কা'ব গোত্রের লোকেরা! জাহান্নামের আগুন থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করো। হে মোহাম্মদের কন্যা ফাতেমা! তুমিও নিজেকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করো। কারণ, আল্লাহর শপথ নিয়ে তোমাদেরকে বলছি, আল্লাহর সামনে তোমাদের জন্যে কোনো কিছুই করার ক্ষমতা আমার নেই। তবে আত্মীয়তার দাবী আমি রক্ষা করতে পারি।'

এসব হাদীসের বক্তব্য দ্বারা বুঝা যায় যে, রসূল (স.) উক্ত নির্দেশকে কতটুকু গুরুত্বসহকারে গ্রহণ করেছিলেন এবং তা পালন করেছিলেন। এই নির্দেশ পালন করতে গিয়ে তিনি কিভাবে তাঁর আত্মীয়স্বজন ও বংশের লোকদেরকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন এবং সুস্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, আল্লাহর সামনে রক্তের সম্পর্ক কোনোই কাজে আসবে না। সেখানে ব্যক্তিগত আমলই কাজে আসবে। তিনি আরো জানিয়ে দিয়ে ছিলেন যে, আল্লাহর রসূল হয়েও তিনি

আল্লাহর সামনে কোনো কিছুই করার ক্ষমতা রাখেন না। এটাই হচ্ছে ইসলামের সুস্পষ্ট বক্তব্য। এই বক্তব্যে আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর বান্দাদের মধ্যকার সব ধরনের মধ্যস্থতাকে অস্বীকার করা হয়েছে। এমনকি স্বয়ং রসূলে করীম (স.)-এর মধ্যস্থতাকেও অস্বীকার করা হয়েছে।

মোমেনের আচরণ বিধি

এরপর মোমেনদের সাথে কিভাবে ব্যবহার করতে হবে সে সম্পর্কে নির্দেশ দিয়ে রসূল (স.)-কে বলা হচ্ছে,

'এবং তোমার অনুসারী মোমেনদের জন্যে সহানুভতির ডানা নামিয়ে দাও'। (আয়াত ২১৫)

এই নম্র ও সদয় আচরণকে স্পষ্ট করে তুলে ধরার জন্যে 'ডানা নিচু করা' এর রূপক বর্ণনাভংগির আশ্রয় নেয়া হয়েছে। অর্থাৎ, উড়ন্ত পাখী নিচের দিকে নেমে আসার সময় তার ডানা দুটোকে যেভাবে নামিয়ে দেয় সেভাবেই তুমি মোমেনদেরকে দু'হাত মেলে ধরে নিজের কাছে টেনে নাও। এই কোরআনী নির্দেশ পালন করতে গিয়ে রসূল (স.) জীবন ভর তাঁর অনুসারীদের প্রতি সদয় ছিলেন, মেহেরবান ছিলেন। তিনি ছিলেন কোরআনী চরিত্রের মূর্ত প্রতীক।

এরপর রসূলকে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে, তিনি নাফরমান ও অবাধ্য লোকদের সাথে কি রূপ আচরণ করবেন। এ পর্যায়ে বলা হয়েছে,

'যদি তারা তোমার অবাধ্যতা করে, তবে বলে দাও, তোমরা যা করো, তা থেকে আমি মুক্ত'। (আয়াত ২১৬)

এই নির্দেশ রসূলের মক্কায় অবস্থান ও জেহাদ ফরয না হওয়া পর্যন্ত বলবত ছিলো।

এরপর রসূল (স.)-কে নিজের প্রতিপালক, প্রভু ও মালিকের প্রতি ভরসা রাখার জন্যে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। এর ফলে তিনি সর্বক্ষণ তাঁরই হেফাযতে থাকবেন এবং তাঁরই সাথে সম্পৃক্ত থাকবেন। তাই আয়াতে বলা হয়েছে,

'তুমি ভরসা করো পরাক্রমশালী পরম দয়ালুর ওপর .... । (আয়াত ২১৭-২১৯)

অর্থাৎ কাফের মোশরেকদের কোনো তোয়াক্কা করবে না। ওদের আচার আচরণকে আমলে আনবে না। ওদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে তুমি নিজ প্রভু ও মালিকের প্রতি মনোনিবেশ করো, তাঁর প্রতি আস্থা রাখো ও ভরসা রাখো। তাঁরই কাছে সাহায্য কামনা, সব বিষয়ে তাঁরই কাছে মদদ তলব করো। আলোচ্য সূরাতে আল্লাহর দুটো গুণের উল্লেখ একাধিকবার করা হয়েছে। গুণ দুটো হচ্ছে, শক্তি ও দয়া। আলোচ্য আয়াতে এই গুণ দুটো উল্লেখ করা হয়েছে রসূল (স.)-কে সান্ত্বনা দেয়ার জন্যে এবং তাঁর মনোবলকে দৃঢ় করার জন্যে। এখানে বলা হয়েছে, আল্লাহর দৃষ্টি রসূলের প্রতি সর্বক্ষণই রয়েছে। রসূল যখন একাকী নামায আদায় করেন তখনও আল্লাহর দৃষ্টি তার প্রতি নিবদ্ধ থাকে এবং মুসল্লীদের সাথে একত্রিত যখন সেজদারত থাকেন তখনও আল্লাহর দৃষ্টি তাঁর প্রতি নিবদ্ধ থাকে। অর্থাৎ রসূল (স.) নির্জনবাস, জনসমক্ষে উপস্থিতি, তাঁর চলা ফেরা, ওঠা বসা ও প্রতিটি কাজকর্ম আল্লাহর দৃষ্টিতে রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা তাঁর মনের খবর রাখেন এবং তাঁর দোয়া ফরিয়াদও শুনে থাকেন। কারণ তিনি তো হচ্ছে, 'সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।'

আয়াতের বর্ণনা ভংগির দ্বারা আল্লাহর সার্বক্ষণিক হেফাযত, নেক দৃষ্টি ও কল্যাণ কামনার বিষয়টি ফুটে উঠেছে। ফলে রসূল (স.)-এর মাঝেও এই অনুভূতি জাগ্রত ছিলো যে, তিনি আপন প্রভুর হেফাযতেই রয়েছেন, তাঁর পাশেই অবস্থান করছেন এবং তাঁর দৃষ্টির সামনেই রয়েছেন। অর্থাৎ একটা সার্বক্ষণিক আস্থা ও ভরসার অনুভূতি তাঁর মাঝে বিরাজ করতো।

কোরআন ও কোরআনের বাহক বনাম কাব্য শাস্ত্র

আলোচ্য সূরার সর্বশেষ প্রসংগটিও পবিত্র কোরআনকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে। প্রথম দিকে জোর দিয়ে বলা হয়েছিলো যে, এই কোরআন বিশ্ব জাহানের প্রতিপালকের পক্ষ থেকেই নাযিল করা হয়েছে। সাথে সাথে এ কথা দৃঢ়তার সাথে অস্বীকার করা হয়েছিলো যে, এই পবিত্র কোরআন কখনো কোনো শয়তানের কাছ থেকে অবতীর্ণ হতে পারে না। এখন বলা হচ্ছে যে, মোহাম্মদ (স.)-এর মতো একজন সত্য নবী, বিশ্বস্ত নবী ও আদর্শবান নবীর কাছে কোনো শয়তানের আগমন ঘটতে পারে না। শয়তানদের আগমন তো ঘটে ভন্ডদের কাছে মিথ্যুকদের কাছে, নষ্ট ও ভ্রষ্টদের কাছে এবং সেই সব প্রতারক গণকদের কাছে যারা শয়তানদের কাছ থেকে কিছু ইশারা ইংগিত পেয়ে সেগুলোকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে প্রচার করে বেড়ায়। বলা হয়েছে,

'আমি তোমাকে বলবো কি, কার কাছে শয়তানরা অবতরণ করে? তারা অবতীর্ণ হয় প্রত্যেক মিথ্যাবাদী, গোনাহগারের ওপর।' (আয়াত ২২১-২২৩)

জাহেলী যুগে আরব সমাজে জ্যোতিষী ও গণকদের বেশ প্রভাব ছিলো। তাদের ধারণা ছিলো, জ্বিন পরীরা তাদের কাছে অদৃশ্য জগতের বিভিন্ন খবরাখবর নিয়ে আসে। তাই মানুষ তাদের কাছে আসতো, তাদের ভবিষ্যতবাণীর শরণাপন্ন হতো। অথচ এদের অধিকাংশই ছিলো মিথ্যুক, ভন্ড ও প্রতারক। মানুষ কেবল কুসংস্কারের বশবর্তী হয়ে তাদের কথায় বিশ্বাস করতো। তবে এরা কখনো মানুষকে সত্য পথের দিকে আহ্বান করতো না, সততা ও আল্লাহভীতির নির্দেশ দিতো না এবং ঈমানের দিকেও মানুষকে ডাকতো না। অথচ রসূল তো এমনটি করতেন না। তিনি তো এই কোরআনী নির্দেশের আলোকে মানুষকে সত্যের পথে ডাকতেন এবং একটা সত্য ও সরল আদর্শের প্রতি মানুষকে আহ্বান করতেন।

ওরা পবিত্র কোরআন সম্পর্কে কখনো কখনো বলতো, এটা এক ধরনের কাব্য। এই সুবাদে তারা নবীকে কবি বলে আখ্যায়িত করতো। কিন্তু এই পবিত্র কালামের যে যাদুময়ী প্রভাব তারা অনুভব করতো ও প্রত্যক্ষ করতো তার বিপরীতে কিছু দাঁড় করানোর মতো ক্ষমতা তাদের ছিলো না। তারা হতবাক হয়ে লক্ষ্য করতো কি ভাবে এই বাণীর মর্ম মানুষের হৃদয়ের গভীরে পৌঁছে গিয়ে তাদের অনুভূতিকে নাড়া দিচ্ছে, তাদের ইচ্ছা শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করছে। এটাকে প্রতিহত করার মতো কোনো শক্তিই তাদের ছিলো না।

পবিত্র কোরআন ওদেরকে সুস্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিচ্ছে যে, রসূলের আদর্শ ও কোরআনের আদর্শ কখনো কোনো কবি সাহিত্যিকের আদর্শের মতো নয়। এই দুই আদর্শের মাঝে বিরাট ব্যবধান রয়েছে। কারণ, এই পবিত্র কোরআন সুস্পষ্ট আদর্শ নিয়ে চলে, নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রতি আহ্বান করে এবং এই লক্ষ্যে পৌঁছার জন্যে সহজ সরল পথ অনুসরণ করে। অপরদিকে রসূল (স.)-এর বৈশিষ্ট্য হলো, তিনি যা বলেন তার বরখেলাপ করেন না। তিনি আবেগ ও খেয়াল-খুশী দ্বারা পরিচালিত হন না। তিনি অস্থির চিত্তের মানুষও নন। বরং একটা সুনির্দিষ্ট আদর্শের প্রতি মানুষকে আহ্বান করেন। তিনি নিজেও এই আদর্শের ওপর অটল এবং এই বিশ্বাসের ওপর অনড়। যে আদর্শের তিনি ধারক ও বাহক তাতে কোনো বক্রতা নেই কোনো বিভ্রান্তির অবকাশ নেই। অথচ যারা কবি ও সাহিত্যিক তাদের মাঝে এই গুণগুলো নেই। কারণ, কবি-সাহিত্যিকরা হচ্ছে অস্থির চিত্তের মানুষ। তারা আবেগ ও কল্পনার হাতে ইচ্ছামতো নিজেদের মনের ভাব প্রকাশ করে থাকে। তারা একই বস্তুকে একবার দেখে কালো আর একবার দেখে সাদা। সন্তুষ্ট থাকলে বলে এক কথা, আর অসন্তুষ্ট হলে বলে আর এক কথা। মোট কথা, এরা হচ্ছে অস্থির চিত্তের অধিকারী। এদের মন মেযাজের কোনো ঠিক ঠিকানা নেই।

এ ছাড়া এসব কবি সাহিত্যিকরা নিজেরাই কল্পনার জগত সৃষ্টি করে সেখানেই বাস করতে থাকে। কল্পনা ও আবেগের বশবর্তী হয়ে হয়ে তারা এমন অনেক কথাই বলে যার সাথে বাস্তব জীবনের কোনোই মিল নেই, কোনোই সম্পর্ক নেই। ফলে তারা নিজেরাই সে সব কথার বিপরীতে চলতে বাধ্য হয়। এরা খুব কমই বাস্তবমুখী হয়ে থাকে। এদের কথা ও কাজে কোনো মিল নেই।

কিন্তু যিনি একটি নির্দিষ্ট আদর্শের প্রতি মানুষকে ডাকেন। যিনি বাস্তব জীবনে এই আদর্শের বাস্তবায়ন চান তাঁর কথা ও কাজ এমনটি হয় না। কারণ, তাঁর সামনে একটি লক্ষ্য থাকে, একটা আদর্শ থাকে এবং একটা পন্থা থাকে, তিনি চোখ কান খোলা রেখে এবং সম্পূর্ণ সচেতনভাবে সেই লক্ষ্য ও আদর্শ বাস্তবায়নের জন্যে সুনির্দিষ্ট পন্থা অবলম্বন করে থাকেন। তিনি এক্ষেত্রে কোনো কল্পনাকে প্রশ্রয় দেন না, কোনো খেয়াল জগতে বাস করেন না এবং স্বপ্নের মাঝে ডুবে থাকেন না। তিনি হচ্ছেন বাস্তব দুনিয়ায় বাসিন্দা। কাজেই তাঁর প্রতিটি কথা ও কাজ হয় বাস্তবমুখী।

এই হিসেবে রসূলের আদর্শ ও কবি সাহিত্যিকদের আদর্শের মাঝে তফাত রয়েছে। এ ব্যাপারে সংশয়-সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। কারণ বিষয়টি খুবই সুস্পষ্ট। আয়াতে সে কথাই বলা হয়েছে,

বিভ্রান্ত লোকেরাই কবিদের অনুসরণ করে .... । (আয়াত ২২৪-২২৬)

আয়াতে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, কবি সাহিত্যিকরা হচ্ছে খেয়াল খুশীর দাস। মনে যা আসে তাই তারা করে ও বলে। কাজেই যারা লক্ষ্যহীন, আদর্শহীন, বিভ্রান্ত ও খেয়াল খুশীর হাতে বন্দী কেবল তারাই এসব কবি সাহিত্যিকদের অনুসরণ করে থাকে।

এই কবি সাহিত্যিকরা কল্পনা, জল্পনা এবং আবেগ অনুভূতির স্বপ্নীল জগতে বিচরণ করে। আবেগতাড়িত হয়ে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম কথাবার্তা বলে। এদের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, এরা যা বলে, নিজেরাই তা করে না। কারণ এরা কাল্পনিক জগতের বাসিন্দা। এরা কঠিন বাস্তব জীবন থেকে পলায়ন করে। ফলে এমন অনেক কথাই বলে থাকে যা করার মতো সামর্থ্য তাদের নিজেদেরই থাকে না। কারণ এসব কথাবার্তা হচ্ছে বাস্তবতা বিবর্জিত ও কাল্পনিক গাল গল্প। বাস্তব ও চাক্ষুস জীবনের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই।

ইসলাম হচ্ছে একটি পূর্ণাংগ জীবন বিধান। ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগের জন্যে এই বিধানের প্রবর্তন হয়েছে। এটা এমন একটি বিশাল সংগ্রাম যার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক হচ্ছে আত্মার সাথে এবং দৃশ্যমান জগতের সাথে। কাজেই এই জীবন বিধান তথা ইসলামের প্রকৃতি ও স্বভাব কখনো কোনো কবির স্বভাব ও মানসিকতার সাথে সামঞ্জস্যশীল হতে পারে না। মানব ইতিহাসই হচ্ছে এর প্রধান সাক্ষী। কারণ, একজন কবি মূলত, তার চেতনা ও কল্পনার মাধ্যমে স্বপ্নীল জগত সৃষ্টি করে তাতেই অবগাহন করতে আনন্দ পায়। পক্ষান্তরে ইসলাম স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দান করতে প্রয়াসী হয় এবং এর জন্যে মানুষের গোটা চিন্তা চেতনাকে কাজে লাগাতে চায়।

ইসলাম চায়, মানুষ কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি হোক, এই কঠিন বাস্তবতা থেকে পলায়ন করে মানুষ কাল্পনিক জগতের বাসিন্দা হোক, এটা কখনো ইসলামের কাম্য নয়। যদি এসব কঠিন বাস্তবতা তাদের পছন্দনীয় না হয় এবং ইসলামের আদর্শের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ না হয় তখন ইসলাম তাদেরকে এসব বাস্তবতার পরিবর্তনের জন্যে এবং ইসলামী আদর্শের বাস্তবায়নের জন্যে উদ্বুদ্ধ করে। এর ফলে স্বপ্নীল ও কাল্পনিক জগতে বসবাসের কোনো শক্তিই আর মানুষের মাঝে অবশিষ্ট থাকে না, তখন গোটা মানবীয় শক্তি এক মহান আদর্শের বাস্তবায়নই ব্যবহৃত হয়।

এতসব সত্তেও ইসলাম কাব্য ও শিল্পের বিরোধী নয়। আলোচ্য আয়াতের মর্ম থেকে সেটাই বুঝা যায়। তবে যে আদর্শের ওপর ভিত্তি করে কাব্য ও শিল্প গড়ে উঠেছে, সেটা ইসলামের দৃষ্টিতে সমর্থন যোগ্য নয়। যে আদর্শ আবেগ ও কল্পনা সর্বস্ব, যে আদর্শ মানুষকে বাস্তবতা বিবর্জিত

কর্মকান্ডে জড়িয়ে রাখে, তা কখনো ইসলাম সমর্থন করতে পারে না। তবে, কারো গোটা মন-মানসিকতা ও চিন্তা-চেতনা ইসলামের আলোকে আলোকিত হয়ে পড়লে এবং ইসলামী ভাবধারায় কাব্য ও শিল্প পুষ্ট হয়ে থাকলে তখন এই কাব্য ও শিল্প ব্যবহারিক কল্যাণ সাধন করে। অর্থাৎ ইসলাম চায় না শিল্প কেবলই কল্পনা ও আবেগসর্বস্বই হয়ে পড়ুক, বাস্তব জীবনের পরিবর্তে কল্পনার জগত সৃষ্টি করুক এবং বাস্তব জীবনকে তার বিকৃত, নোংরা ও পশ্চাদপদ অবস্থায় ফেলে রাখুক এটাও ইসলাম সমর্থন করে না।

কোনো মানুষের জীবনের লক্ষ্য ও আদর্শ যদি ইসলাম হয়, তাহলে সে প্রতিটি বস্তুকেই ইসলামী দৃষ্টভংগিতে দেখার চেষ্টা করবে এবং শিল্প ও সাহিত্যে তার প্রকাশও ঘটবে সে একই দৃষ্টিভংগিতে। আর এই পর্যায়ের শিল্প ও সাহিত্যকে ইসলাম কখনো ঘৃণা করে না। আমরা জানি, পবিত্র কোরআনে মানুষের হৃদয় মন ও চিন্তা চেতনাকে প্রকৃতির সৌন্দর্যের প্রতি এবং মানবাত্মার রহস্যের প্রতি আকৃষ্ট করা হয়েছে। বলা বাহুল্য, এসবই হচ্ছে শিল্প ও সাহিত্যের মৌলিক উপাদান। প্রকৃতির সৌন্দর্যকে পবিত্র কোরআন যে পর্যায়ের সচ্ছতা ও হৃদয়গ্রাহী করে প্রকাশ করেছে তা কখনো মানব রচিত কাব্য দ্বারা সম্ভবপর নয়।

পবিত্র কোরআন যে সব কবিদেরকে অস্বীকার করে না, নিন্দা করে না তাদের বৈশিষ্ট্যগুলো এভাবে বর্ণনা করেছে,

'তবে তাদের কথা ভিন্ন, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে।' (আয়াত ২২৭)

অর্থাৎ এরা সাধারণ কবি সাহিত্যিকদের তুলনায় সম্পূর্ণ ভিন্ন গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। এদের হৃদয় ঈমানে ভরপুর। এরা আদর্শবান। এরা সৎ, কাজেই এদের গোটা শক্তি ও প্রতিভা কল্যাণ সাধনে, সৌন্দর্য বিকাশে নিয়োজিত। এরা নিছক কল্পনাবাদী নয়, ভাববাদীও নয়, এরা কঠোর পরিশ্রমী ও সংগ্রামী। এরা অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে লড়াই করে বিজয়ী হয়। এরা নিজেদের আদর্শ ও বিশ্বাসকে ঊর্ধে তুলে ধরতে প্রয়াসী হয়।

এরাই হচ্ছেন, হাচ্ছান বিন সাবেত, কা'ব ইবনে মালেক, আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা, আবদুল্লাহ এবনে সিবআরী, আবু সুফিয়ান ইবনুল হারেস প্রমুখ সাহাবা। তাঁরা ইসলামের জয়গান গেয়েছেন। রসূল (স.)-এর সমর্থনে কবিতা রচনা করেছেন। কাফের মোশরেকদের বিরুদ্ধে কবিতা রচনা করেছেন। এদের মধ্যে শেষের দু'জন ইসলাম গ্রহণ করার পূর্বে রসূলুল্লাহর বিরুদ্ধে কবিতা রচনা করতো। কিন্তু ইসলাম গ্রহণ করার পর তাঁরা ইসলামেরই জয়গান গেয়েছেন এবং রসূল (স.)-এর প্রশংসায় কবিতা রচনা করেছেন।

বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, রসূল (স.) হাচ্ছান বিন সাবেতকে বলেন, তাদের (মোশরেকদের) বিরুদ্ধে কবিতা পাঠ করো, জিবরাঈল (আ.) তোমার সাথে রয়েছেন, অপর এক বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, পবিত্র কোরআনে কবিদের সম্পর্কে আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর রসূল (স.) বললেন, 'মোমেন বান্দা তার তলোয়ার ও ভাষার সাহায্যে জেহাদ করে। যার হাতে আমার জীবন তাঁর শপথ নিয়ে বলছি, এর আঘাতও তোমাদের ছুঁড়ে মারা তীরের আঘাতের মতোই মারাত্মক হয় (ইমাম আহমদ কর্তৃক বর্ণিত)

এর বাইরেও ইসলামী কাব্য ও ইসলামী শিল্প সাহিত্যের অসংখ্য নযির রয়েছে। মোট কথা, জীবনের যে কোনো দিককে কেন্দ্র করে ইসলামী ভাবধারা থেকে উৎসারিত যে, কবিতা বা শিল্প ও সাহিত্য সেটাই হচ্ছে ইসলাম সম্মত শিল্প ও সাহিত্য। ইসলাম সম্মত শিল্প ও সাহিত্যে সরাসরি ইসলামের দাওয়াত দিতে হবে বা ইসলামের সমর্থনে কথা সরাসরি বলতে হবে।এমনটি জরুরী নয়।

এক নযরে
তাফসীর 'ফী যিলালিল কোরআন'এর ২২ খন্ড

১ম খন্ড
সূরা আল ফাতেহা ও
সূরা আল বাকারার প্রথম অংশ

২য় খন্ড
সূরা আল বাকারার শেষ অংশ

৩য় খন্ড
সূরা আলে ইমরান

৪র্থ খন্ড
সূরা আন নেসা

৫ম খন্ড
সূরা আল মায়েদা

৬ষ্ঠ খন্ড
সূরা আল আনয়াম

৭ম খন্ড
সূরা আল আ'রাফ

৮ম খন্ড
সূরা আল আনফাল

৯ম খন্ড
সূরা আত তাওবা

১০ম খন্ড
সূরা ইউনুস
সূরা হুদ

১১তম খন্ড
সূরা ইউসুফ
সূরা আর রা'দ
সূরা ইবরাহীম

১২তম খন্ড
সূরা আল হেজ্র
সূরা আন নাহ্ল
সূরা বনী ইসরাঈল
সূরা আল কাহ্ফ

১৩তম খন্ড
সূরা মারইয়াম
সূরা ত্বাহা
সূরা আল আম্বিয়া
সূরা আল হাজ্জ

১৪তম খন্ড
সূরা আল মোমেনুন
সূরা আন নূর
সূরা আল ফোরকান
সূরা আশ শোয়ারা

১৫তম খন্ড
সূরা আন নামল
সূরা আল কাছাছ
সূরা আল আনকাবুত
সূরা আর রোম

১৬তম খন্ড
সূরা লোকমান
সূরা আস সাজদা
সূরা আল আহযাব
সূরা সাবা

১৭তম খন্ড
সূরা ফাতের
সূরা ইয়াসিন
সূরা আছ ছাফফাত
সূরা ছোয়াদ
সূরা আঝ ঝুমার

১৮তম খন্ড
সূরা আল মোমেন
সূরা হা-মীম আস সাজদা
সূরা আশ শূ-রা
সূরা আয যোখরুফ
সূরা আদ দোখান
সূরা আল জাছিয়া

১৯তম খন্ড
সূরা আল আহকাফ
সূরা মোহাম্মদ
সূরা আল ফাতাহ

سيّد قطب

في ظلال القرآن

باللغة البنغالية

المجلد الثاني

ترجمة القرآن

حافظ منير الدين أحمد

AL-QURAN ACADEMY LONDON

إكاديمية القرآن لندن